সুচিত্রা ভট্টাচার্যের

ভূমিকায় সমৃদ্ধ

নির্বাচিত

রবিবারের গল্প

সম্পাদনা

আবুল বাশার

আনন্দবাজার, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন,
আজকাল, ভোরের বার্তা, NEWZ বাংলা,
সকালবেলা, খবর ৩৬৫ দিন,এবেলা,
দৈনিক স্টেটসম্যান, আবার যুগান্তর,
প্রাত্যহিক খবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটগল্পকে প্রথম প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সাময়িক পত্রিকাই। প্রথম সাময়িক পত্র দিগ্‌দর্শনেই আমরা এই ধরনের ছোট ছোট রচনার সাক্ষাৎ পাই যদিও তাকে ছোটগল্প অ্যাখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের আগে ত্রৈলোক্যনাথ বা চন্দ্রনাথ বসু ছোট আকারের গল্প কিছু লিখেছেন, কিন্তু ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এবং সেই হিসাবে প্রথমে 'সাহিত্য' ও 'হিতবাদী', পরে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকাকেই বাংলা ছোটগল্পের প্রসারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর যেসব পত্রপত্রিকা সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেগুলি আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত। তবে দৈনিক পত্রিকাগুলি যখন রবিবারের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে ছোটগল্পের প্রকাশ শুরু করেছে তখনই ছোটগল্প সৃষ্টির জোয়ার এসেছে মনে করা যেতে পারে, কারণ প্রতি সপ্তাহে আমরা বেশ কিছু গল্প উপহার পেয়েছি। সেগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আগে, এটি তারই দ্বিতীয় খণ্ড।

৩৫০.০০
978-93-81827-17-8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচিত
রবিরারের গল্প

(২০০৭ - ২০১২)

২য় খণ্ড

ভূমিকা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সম্পাদনা

আবুল বাশার

সংকলনে

অতীন ঠাকুর

প্রিয়া বুক হাউস

৭৭/৯, রাইমোহন ব্যানার্জি রোড

কলকাতা-৭০০১০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রদ্ধেয় কবি ও সাহিত্যিক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আনন্দবাজার পত্রিকা
দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান
খবর ৩৬৫ দিন
সংবাদ প্রতিদিন
আবার যুগান্তর
প্রাত্যহিক খবর
ভোরের বার্তা
Newz বাংলা
সকালবেলা
আজকাল
বর্তমান
জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

অল্প গল্প কথা	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	০৯
পতিগৃহে যাত্রা	অমর মিত্র	১৩
অন্তর্ভেদ	অশোককুমার মুখোপাধ্যায়	২১
বহিরাগত	অনিতা অগ্নিহোত্রী	২৯
মোচ্ছব	অনিন্দিতা গোস্বামী	৩৬
অগ্নিপুরাণ	অসীম চট্টরাজ	৪২
আত্মজা	অনুপ ঘোষাল	৪৮
সুগার কিউব	অর্ণব দত্ত	৫৩
পুনর্জন্ম	পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ী	৬১
চমৎকার আলি বৈদ্য	আবুল বাশার	৮১
আত্মজীবনীর কাল	আফসার আমেদ	৮৮
ফোনটা বাজছে	উল্লাস মল্লিক	৯৪
পায়রার আকাশ	উৎপলকুমার গুপ্ত	১০১
বৃক্ষলতা	কিন্নর রায়	১১৪
প্রতিশোধ	চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়	১২০
ভাই বোন	জয়ন্ত দে	১২৪
কৃষ্ণলক্ষ্মী	তারাপদ রায়	১৩০
মালব-কৌশিক	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬
সোনালি বুদ্‌বুদ	তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৩
ফক্কাবাদ	তিলোত্তমা মজুমদার	১৫০
আমি ঘরে ফিরব না	দীপঙ্কর দাস	১৫৮
মেঘদীপের গার্ল ফ্রেন্ডরা	নবনীতা দেবসেন	১৬৩
সাবালকের পত্র	নবকুমার বসু	১৭০
লাল বাতির নিষেধ	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৮৬
অদ্বৈত	নচিকেতা	১৯৫
মেখলীগঞ্জ তিস্তাপারে	নলিনী বেরা	২০৩
বিনোদের ব্যক্তিত্বসঙ্কট ও তার সমাধান	পবিত্র সরকার	২১১
বৃষ্টি	প্রচেত গুপ্ত	২১৭
একদিন সুভদ্রা	প্রদীপ ঘোষ	২২৩
রাম! রাম!	রাণী বসু	২২৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়েন্দা চটক	রাতা বসু	১৩৭
দিনান্তের বিহঙ্গ	স্বাতি চট্টোপাধ্যায়	১৪২
খিড়কি	বিপ্লব রায়	২৪৭
উর্বী	বাণীব্রত চক্রবর্তী	২৫১
টাইটল মিউজিক	বিপুল দাস	২৫৭
মাকড়সা	বিনোদ ঘোষাল	২৬৩
জন্মভূমি	ভগীরথ মিশ্র	২৭৪
লকার	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	২৮০
মুড়িঘন্ট	মানব চক্রবর্তী	২৮৮
আকাঙ্খার শরীর	মণিশঙ্কর দেবনাথ	২৯৪
ঝরে গেল চেরি	মনোজ দে নিয়োগী	৩০২
রাজকন্যা	মনন মুখোপাধ্যায়	৩০৭
মহাযাত্রার রথ	রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী	৩১০
ঋণমুক্তি	রমেন্দ্রনারায়ণ দে	৩১৫
তৃষ্ণা	শক্তিপদ রাজগুরু	৩২৯
নয়নিকা আর চয়নিকা	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩৩৩
আরামদায়ক মৃত্যুর কথায়	শেখর বসু	৩৪০
নাইন ওয়ান ওয়ান	শুভমানস ঘোষ	৩৪৫
হাওয়া-নল	শৈলেন সরকার	৩৫২
সে ও তার সেই কলম	শচীন দাশ	৩৫৮
ছাতাবাহার	শৈবাল চক্রবর্তী	৩৬৬
একাকী	শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়	৩৭১
মাথা উঁচু করে যাওয়া	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭৬
সবাইকে নিয়ে জীবনযাপন	সমরেশ মজুমদার	৩৮৩
অস্তরাগ	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	৩৯১
ক্ষমা চাইছি	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	৩৯৮
অন্ধজনের সরস্বতী	স্মরণজিৎ চক্রবর্তী	৪০৫
জট	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	৪১২
জবান	সিদ্ধার্থ সিংহ	৪১৯
কখন বসন্ত	স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত	৪২৩
তোমার নাম	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত	৪৩১
আত্মজিজ্ঞাসায় রক্তের ঘ্রাণ	সুব্রত রাহা	৪৩৬
আজকের রূপকথা	হিমানীশ গোস্বামী	৪৪৫
যাওয়া আসা	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৪৫০
মেরি ক্রিসমাস	হর্ষ দত্ত	৪৫৬
টারোর চোখ	হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত	৪৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

অল্প গল্প কথা

গল্পপাঠের কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়, গল্পের পূর্বাভাস বা গল্পের আলোচনা তো নয়ই, কারণ সেরকম করলে একদিকে যেমন গল্পকারের প্রতি অবিচার করা হয়, অন্যদিকে গল্পপাঠকের প্রতিও। গল্পকার গল্পে যেটুকু বলার বলেই দেন, আগে-পরে কিছু সংযোজন করে তাঁর গল্প বুঝতে হবে, এরকম উদ্দেশ্য কোনো গল্পকারের থাকে বলে আমি অন্তত জানি না। আর গল্প পাঠকের কথা যদি ধরি, আজ ছোটগল্পের উদ্ভবের অন্তত সওয়াশো বছর পরেও যদি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হয় কোন গল্প কেমন, তাহলে বলতে হবে ছোটগল্পের পরিণত পাঠক আমরা কোনো দিনই পাব না।

আসলে, এই প্রকাশন সংস্থা 'নির্বাচিত রবিবারের গল্প' নিয়ে একটি সংকলন পাঁচ বছর আগেই করেছিলেন। উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু, ছোটগল্পের প্রচার এবং প্রসারের জন্য বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের সাহিত্য-ক্রোড়পত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রতি সপ্তাহে এতগুলি সংবাদপত্রের সারস্বত ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখতে গেলে প্রচুর গল্পের প্রয়োজন, সুতরাং গল্পকারেরও। উপরন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যেসব গল্প প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাম্প্রতিক সমস্যা এবং তথ্যাদি থাকার ব্যাপারটাও থেকে যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাংলা ছোটগল্প কীভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, গল্পের এখন গতি কোনদিকে, ইত্যাকার ধারণাও পাঠকদের মনে তৈরি হয়ে যায় এইসব গল্প একসঙ্গে পড়তে পারলে। এই কারণেই পূর্বের সেই গ্রন্থটি এতটা জনবন্দিত হতে পেরেছিল। যেহেতু একটি গ্রন্থে এত বড়ো একটা উদ্যোগ সম্পূর্ণ করা যায় না, এতদিন পরে সেই একই সম্পাদকের বলিষ্ঠ সম্পাদনায় এই গ্রন্থের পরিপূরক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে, এটি খুবই আনন্দের কথা।

উল্লেখযোগ্য আরো একটি প্রসঙ্গ এখানে বলা যেতে পারে, সেটি হল, পূর্বের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরও বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তারাও যথারীতি রবিবারে সাহিত্যের পাতা সাজিয়ে চলেছেন। সেইসব পত্র-পত্রিকার কয়েকটি—সকালবেলা, নিউজ বাংলা, খবর ৩৬৫ দিন, প্রাত্যহিক খবর, ভোরের বার্তা প্রভৃতি থেকেও রবিবারের গল্প সংগৃহীত হয়েছে, অবশ্য সেই সঙ্গে আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন প্রভৃতি সংবাপত্র তো আছেই। সব মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছি মোট এগারোটি সংবাদপত্র থেকে গল্পগুলি নির্বাচিত ও সংকলিত হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের কিছু ধ্রুপদী গল্পকার যথা, পরশুরাম, বনফুল, মনোজ

নির্বাচিত রবিবারের গল্পদুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখের গল্প আগের গ্রন্থেই আছে, সুতরাং তাঁদের মৃত্যুর কারণেই গল্প পাওয়া যায়নি, সম্ভবত তার জন্য বর্তমান সংকলনে গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে প্রয়াত সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে জীবিত সাহিত্যিকদের গ্রহণ করাই বোধহয় বর্তমান সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল। ব্যতিক্রম তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী এব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তারাপদ রায় এই প্রকাশনীর অত্যন্ত প্রিয় লেখক, সেটা তাঁর অন্তর্ভুক্তির কারণ হতে পারে। হিমানীশ গোস্বামী আসতে পারেন সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক হিসাবে এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ঘটেছে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে, এই গ্রন্থ সম্ভবত তার আগেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় এইজন্যই তরুণতর কিছু সাহিত্যিকের গল্প এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা গিয়েছে, সেটা এক পক্ষে ভালোই হয়েছে, পাঠক-পাঠিকা এখন কী রকম গল্প লেখা হচ্ছে তার একটা ধারণা পেয়ে যাবেন।

বললাম বটে এগারোটি সংবাদপত্র থেকে গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু এর সিংহভাগ আগের মতো এবারও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার, মোট গল্পের সংখ্যা আঠাশ। প্রয়াত সাহিত্যিকদের মধ্যে দুজনের গল্প এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, তারাপদ রায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তারাপদ রায়ের গল্পটি একটি বিদেশিনী চরিত্রকে কেন্দ্র করে এবং অবশ্যই রসরচনা, তাঁর যে ধরনের গল্পের সঙ্গে পাঠকের সম্যক্ পরিচয় আছে, সেরকমই একটি গল্প। সদ্যপ্রয়াত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাথা উঁচু করে যাওয়া' গল্পটি যখন প্রকাশিত হয় তখনই চমকে দিয়েছিল আমাদের। একটি কিংবদন্তী মানুষ রাজা রামমোহন রায়ের শেষ দিন নিয়ে লেখা গল্পটি মনে করিয়ে দেয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুদৃশ্য এবং রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যার বর্ণনা, সেই সঙ্গে আর একবার প্রমাণ করে কত উঁচু মাপের লেখক তিনি ছিলেন।

নামী লেখকদের অনেকের গল্পই আনন্দবাজার থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নয়নিকা আর চয়নিকা' গল্পের জন্য টান টান তো বটেই, একটা নতুন ভঙ্গির জন্যও আকর্ষণীয়। গোটা গল্পটা লেখা হয়েছে নাটকের ভঙ্গিতে, কোনো বর্ণনা নেই, সবটাই সংলাপ, সেটা অবশ্য আমাদের মনে পড়ে গল্পটা শেষ করবার পর। সুচিত্রা ভট্টাচার্য ভালো লাগার মতো গল্প অনেক লিখেছেন, 'অন্তরাগ'ও সেইরকমই একটি গল্প, তবে চমকে দিয়েছেন বাণীবসু তাঁর 'রাম! রাম!' গল্পে। আমাদের যৌবনকালে বাণী রায় লিখতেন এরকম পুরুষালি গল্প, এই গল্প পড়েও বুঝবার উপায় নেই কোনো মহিলার হাত দিয়ে এরকম গল্পের লাইন বার হয় 'আরে বেটা লালবাত্তি কি রাণ্ডিকে পাস অ্যায়সি বডি থোড়ি মিলেগি।' খুব সাধারণ একটা সেন্টিমেন্ট নিয়ে খুব ভালো গল্প লিখেছেন অমর মিত্র। আফসার আমেদের 'আত্মজীবনীর কাল,' সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জট', হর্ষ দত্তের 'মেরি ক্রিসমাস', মানব চক্রবর্তীর 'মুড়িঘণ্ড' ভালো লাগবে। কিন্তু চমকে দিয়েছে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'ক্ষমা চাইছি' গল্পে, তাঁর এই কালো ভাতের গল্প আনন্দবাজার পত্রিকায় যেদিন প্রথম প্রকাশিত হয় সেদিনও অনেকেই চমকে উঠেছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমকে দেবার মতো গল্প আরো অনেকেই লিখেছেন, বিভিন্ন কারণে। যেমন অসীম চট্টরাজের 'অগ্নিপুরাণ', শৈলেন সরকারের 'হাওয়া নল' বা পৌরাণিক গল্পের আমেজ লেখা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালব কৌশিক'। এছাড়াও উপভোগ্য গল্প পাই শুভমানস ঘোষের 'লাইন ওয়ান ওয়ান', সিদ্ধার্থ সিংহের 'জবান', নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'লালবাতির নিষেধ', বাণীব্রত চক্রবর্তীর 'উর্বী', প্রচেত গুপ্তের 'বৃষ্টি'। তরুণদের মধ্যে আছেন উল্লাস মল্লিক 'ফোনটা বাজছে', বিপুল দাস 'টাইটেল মিউজিক' অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় 'অন্তর্ভেদ'। আনন্দবাজার পত্রিকা ভিন্ন পেশার নামী মানুষদের দিয়ে গল্প লিখিয়েছিলেন রবিবারের পাতায়। মানুষগুলি চেনা, তাঁরা কেমন লেখেন, অন্তত গল্প, আমাদের জানা ছিল না। সেটা জানার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেইরকম লেখকদের কয়েকটি লেখা আমরা এই সংকলনে পাচ্ছি—সংগীতশিল্পী স্বাগতলক্ষ্মী দাসগুপ্তের 'কখন বসন্ত', নচিকেতার লেখা 'অদ্বৈত', নাট্যকার ব্রাত্য বসুর লেখা 'গোয়েন্দা চটক' এবং অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের লেখা গল্প 'তোমার নাম'।

সম্ভবত আনন্দবাজার পত্রিকার এই উদ্যোগের কথা স্মরণ রেখেই দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা কিছু বিখ্যাত মানুষকে দিয়ে গল্প লেখাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এখানে সেরকম একটি গল্প আমরা পাচ্ছি, ধ্রুপদ গানের নামী শিল্পী পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ীর লেখা 'পুনর্জন্ম'। দৈনিক স্টেটসম্যান রবিবারের পাতা থেকে আরো পাঁচটি গল্প অবশ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে যেমন আছেন প্রবীণ লেখক দীপঙ্কর দাস 'আমি ঘরে ফিরবনা', তেমনি আছেন নতুন পুরনো কিছু লেখক অনুপ ঘোষাল 'আত্মজা' সুব্রত রাহা 'আত্মজিজ্ঞাসার রক্তের ঘ্রাণ' উৎপলকুমার গুপ্ত 'পায়রার আকাশ' মণি শঙ্কর দেবনাথ 'আকাঙ্ক্ষার শরীর'।

আনন্দবাজারের পরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার গল্প নেওয়া হয়েছে আজকাল পত্রিকা থেকে, গল্পের সংখ্যা মোট আট। প্রত্যেক লেখকই কম-বেশি পরিচিত এবং প্রত্যেকটি গল্পই লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত যে তৃতীয় লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, হিমানীশ গোস্বামী, তাঁর 'আজকের রূপকথা' গল্পটি এই পত্রিকা থেকেই নেওয়া হয়েছে। শেখর বসু 'আরামদায়ক মৃত্যুর কথায়' গল্পে দেখিয়েছেন শেষ বয়সে আরামদায়ক মৃত্যুর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও মৃত্যুর চেয়ে জীবন এখনও মানুষের অনেক বেশি কাম্য। আবার মৃতদেহ কবরস্থ করা নিয়ে অসাধারণ একটি গল্প লিখেছেন আবুল বাশার 'চমৎকার আলি বৈদ্য' লাশবাহক একটি মানুষকে নিয়ে, যার দুই মেয়েও এই একই পেশা গ্রহণ করে এবং বাবার লাশ নিয়ে বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়ে। আকর্ষণীয় গল্প লেখার জন্য কয়েকটি পরিচিত নাম এই পত্রিকার রবিবারের গল্পসংগ্রহে আছে, এঁরা হলেন ভগীরথ মিশ্র 'জন্মভূমি' কিন্নর রায় 'বৃক্ষলতা' শচীন দাশ 'সে ও তার সেই কলম', শৈবাল চক্রবর্তী 'ছাতাবাহার' এবং হীরেন চট্টোপাধ্যায় 'যাওয়া আসা'।

আজকাল এবং দৈনিক বর্তমানের গল্প সংখ্যা প্রায় সমান। প্রবীণ লেখক শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প 'তৃষ্ণা' যেমন এখানে আছে, তরুণ লেখক জয়ন্ত দের গল্পও 'ভাইবোন' রয়েছে এখানে। সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে একেবারে ডকুমেন্টেশনের ভঙ্গিতে গল্প লিখেছেন এই সময়ের অন্যতম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থ অনিতা অগ্নিহোত্রী 'বাহনবাগত' লিখেছেন কবি বীথি চট্টোপাধ্যায় 'দিনান্তের বিহঙ্গ'। মহিলা লেখক আরো আছেন পুরনো দিনের কণা বসুমিত্র 'বিদেশের গ্র্যানি আশোকা' এবং নতুন দিনের অনিন্দিতা গোস্বামী 'মোচ্ছব'। আরো আছেন মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 'লকার' এবং শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় 'একাকী'।

অন্যান্য পত্রিকার উল্লেখ করেছি গল্পকারের নাম বলিনি। সংবাদ প্রতিদিন থেকে সংগ্রহীত হয়েছে চারটি গল্প—'মহাযাত্রার রথ' রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 'একদিন সুভদ্রা' প্রদীপ ঘোষ 'মরে গেল চেরী' মনোজ দে নিয়োগী এবং একেবারে নিজস্ব মেজাজও স্বতন্ত্রতায় আলাদা করে নেওয়ার মতো গল্প 'মেঘদীপের গার্লফ্রেন্ডরা', লেখক নবনীতা দেবসেন। খবর ৩৬৫ দিনে থেকে তিনটি গল্প আছে 'সাবালকের পত্র' নবকুমার বসু 'সোনালি বুদ্‌বুদ' তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'টারোর চোখ' হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত। **Newz** বাংলা থেকে আছে 'প্রতিশোধ' চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, প্রাত্যহিক খবর থেকে 'খিড়কি' বিপ্লব রায়, ভোরের বার্তা থেকে 'রাজকন্যা' মনন মুখোপাধ্যায় আবার যুগান্তর থেকে 'মাকড়সা' বিনোদ ঘোষাল এবং সকালবেলা থেকে 'সুগার কিউব' অর্ণব দত্ত

কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের বিচক্ষণতায় একটি মনে রাখবার মতো সংকলন পাওয়া গেল, এ কথাই সকলে মনে করবেন, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে

২৫.১২.২০১২
কলকাতা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিগৃহে যাত্রা

অমর মিত্র

কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। দিন গুনছে অচিন। একটি করে দিন ডুবে যাচ্ছে. শহরের ওপারে গঙ্গার পশ্চিমকূলে, তার ঘুম যাচ্ছে কমে। জিতেন মণ্ডল, তার অফিসের গ্রুপ ডি কর্মচারী, বলে, আমিও দিন গুনতাম স্যর, আগের অঘঘানে তো আমি বিয়ে দিলাম মেয়ের।

হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে অগ্রহায়ণ নিঃশব্দ পায়ে। বাতাস ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত রাত ধরে টালা পার্কের ঘাসে শিশির পড়ছে। জিতেন মণ্ডল বলে, মাথা ঠান্ডা রাখবেন স্যর, বিয়ে মানে লাখ কথা, লাখ কথা না হলে এ কাজ ওঠে না, অঘঘানই বিয়ের মাস।

হ্যাঁ তাই। মার্গ শীর্ষ অগ্রহায়ণ থেকে বছর শুরু হত এককালে। বছরের আরম্ভে দাম্পত্যের শুরুও তো শুভ। এই মাসে ছায়াপথ ছড়িয়ে থাকে রাতের আকাশের পুব থেকে পশ্চিমে, সন্ধ্যায় মধ্যগগনে জ্বলজ্বল করে মীনরাশি। ছায়াপথের পশ্চিম প্রান্তে ভেসে থাকে শ্রবণা নক্ষত্র। এটি এখন বঙ্গাব্দের অষ্টম মাস। অগ্রহায়ণের আকাশ জুড়ে রোহিণী, ব্রহ্ম হৃদয়, শতভিষা—কত না নক্ষত্র। সপ্তর্ষির আকাশ থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রায় অদৃশ্য এ মাসে। অগ্রহায়ণে পূর্ণিমার চাঁদ মৃগশিরা নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকে আর বৃশ্চিক রাশি সূর্যের সঙ্গে অস্তমিত হয়—অচিন এ সব জেনেছে বিয়ের কথায় কথায়। এই মাসে তার কন্যা কল্যাণীয়া তিস্তা পতিগৃহে যাবে। কথা তো হবেই।

মেয়ে গিয়েছে বড় মামার বাড়ি জলপাইগুড়ি। দু'দিন বাদেই সেখান থেকে ফোন, আমার একদম ভাল লাগছে না বাবা, কী করি?

ফোনটি অচিন তিস্তার মা সুপ্রিয়াকে ধরিয়ে দেয়। সুপ্রিয়া হুঁ হাঁ করে উত্তর দিতে লাগল। কার্ড এসে গিয়েছে ছেপে, ভাল না লাগে তো গেলি কেন?

কথা তো সত্যি। আগে কী বলত মেয়ে, আমি তো তিস্তা নদী, আমার জন্ম ও-দেশে, কলকাতার চেয়ে জলপাইগুড়ি কত ভাল!

সুপ্রিয়া অচিনকে বলল, হবেই তো, এখন কি কোথাও মন বসে, এখানে বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, কেটারার আসছে, প্যান্ডেল লাইটের লোক আসছে। ও কী করে ওখানে থাকবে এখন, কাল মিসেস দত্ত ফোন করেছিলেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, আমি মোবাইল নম্বর দিয়ে দিলাম।

হবু আত্মীয়জনেরা থাকেন ভুবনেশ্বর। ওঁদের ছেলে কৃষ্ণেন্দু থাকে গুরগাঁও। ভুবনেশ্বরবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৩www.amarboi.com ~

মান্যবর সুকেশ দত্ত মশায়ের পৈতৃক নিবাস ফুলবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর জঙ্গলমহল। বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলে তিস্তার বন্ধু কাকলি এসে হইচই পাকিয়ে দিল, কলকল করে বলতে লাগল, গ্র্যান্ড ম্যারেজ সেরিমনি হবে কাকিমা, ফুলবনি তো জঙ্গলমহল, এখন খুব ডিস্টার্বড, প্রায় যুদ্ধ চলছে।

হেসে সুপ্রিয়া বলেছিল, ওরে না, এখন তো ভুবনেশ্বর আর গুরগাঁও।

তা হোক, জঙ্গলমহলের পাত্র! ভাবা যায়!

হ্যাঁ, সেই জঙ্গলমহল এখন অশান্ত। মানুষ মরছে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে ঘটি-বাটি নিয়ে। গ্রাম শূন্য হয়ে যাচ্ছে রাইফেল বন্দুক মাইনের ভয়ে। জঙ্গলমহলে অনাহার, অন্ধকার, ল্যান্ডমাইন, জঙ্গলের কুলিপথে রাত্রিকালে অচেনা বন্দুকধারী, দিনমানে যৌথ বাহিনীর হানা, মার্চ পাস্ট। ইস্! অচিন কী সব ভাবছে। ওঁরা কবে গ্রাম ছেড়েছেন! সুকেশ দত্ত মশায় গ্রামের স্কুল থেকে দারুণ রেজাল্ট করে কলকাতায় হস্টেলে থেকে বি.এস.সি., এম.এস.সি.-র পর চাকরি নিয়ে কলকাতা-দিল্লি-মুম্বই-ভুবনেশ্বর করে বেড়াচ্ছেন কত কাল ধরে। তাঁর ছেলে কৃষ্ণেন্দু সেন্ট জেভিয়ার্স, খড়্গপুর আই আই টি থেকে আমেরিকায় আড়াই বছর করে দিল্লি-গুরগাঁও। সে তো জঙ্গলমহল চেনেই না।

তা হোক কাকু, শিকড় তো ওখানেই।

হ্যাঁ তা তো বটে, জন্মভূমি তো জঙ্গলমহলই।

কাকলি কোন এক মানবাধিকার সংগঠন করে। চাঁদাও তোলে গরিব আর্ত মানুষের জন্য। আয়লার পর এ-বাড়ি এসে এক গাঁয়ের কাপড়চোপড় নিয়ে গিয়েছিল সুন্দরবনে পাঠানোর জন্য। সে সমস্ত পরিচয় পেয়ে বলতে লাগল, জঙ্গলমহলের মানুষের মেধা হবে নাকি আমাদের মতো পরগাছা কুটবুদ্ধির মানুষের তা হবে কাকিমা, রাইট ডিসিশন, হ্যাঁ রে, 'তিস্তা নদী' ছবিটা দেখাবি?

অরকুটে কৃষ্ণেন্দুর ছবি দেখল কাকলি, নাইস নাইস। তোর পছন্দ আছে, এ তো সত্যিকারের শাল জঙ্গলের ছায়ার মানুষ, কী শান্ত স্নিগ্ধ মুখ, ব্ল্যাক! আই লাইক ব্ল্যাক, আমার মা ব্ল্যাক, আমার মামারা ব্ল্যাক, মাসিরা ব্ল্যাক, আমার বাবা ফর্সা তাই আমি ফর্সা, কিন্তু আমি নিজে ব্ল্যাক হলে খুশি হতাম, কাকিমা।

তুইও তা হলে জঙ্গলমহলে যাবি সংসার করতে? সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করেছিল কাকলিকে। শুনে কাকলির কী হাসি, বলেছিল, আমি তো অলরেডি সেট্‌ল্‌ড কাকিমা, সে আবার পৈতে ছাড়া গোরা বামুন, চাটুজ্জ্যে, ও জার্নালিস্ট কিন্তু ওর কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ওরা লড়াই করছে।

এ সব কথা বিয়েরই কথা। হ্যাঁ, সত্যিই লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। অচিন তার মেয়েকে নজরে রাখছে। তার হাঁটা-চলা মুখের ভাবই বদলে গিয়েছে।

জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ির আদর জমা রেখে বাস ধরে কলকাতা ফিরে এল। ছেপে কার্ডটা কেমন হল দেখবে না? এত দিন বাদে তিস্তার ভিতরে চঞ্চলতা, ক্ষিপ্র ভাব এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হলে তো ও মেয়ে খুব শান্ত। একেবারে দ্বিপ্রহরে শালজঙ্গলে ঘুমিয়ে থাকা ছায়ার মতো আলোর মতো। কে যেন বলেছিল, ওর নাম তিস্তা না হয়ে ডুলুং হতে পারত। ও নদী স্থির। সেই কবে বর্ষা হবে পশ্চিমের পাহাড়ে, জল নেমে আসবে নীচে, তখন নদীতে ঢল নামবে কয়েক ঘন্টার জন্য। এর পর সেই জল সুবর্ণরেখায় গিয়ে পড়লে ডুলুং শান্ত।

বিয়ের কার্ড একটু আগেই এসেছে। এখন নেমন্তন্নে বেরোলে লোকে ভুলে যাবে। কার্ড নেড়েচেড়ে দেখে মেয়ে। রঙিন কার্ড থেকে গোলাপি আলো গিয়ে লেগে যায় মেয়ের মুখের এখানে ওখানে। বলল, বাবা খুব সুন্দর ছেপেছে, লেখাটাও ভাল হয়েছে, এ বার তো হলুদ টিপ পরাতে হবে খামে, তার পর খামের ভিতর কার্ড ভরা হবে। তার পর নাম লেখা হবে।

হুঁ। অচিন পরে সুপ্রিয়াকে বললে, তোমার বিয়ের সময় তুমি কার্ড এমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছিলে বাবার সামনে?

সুপ্রিয়া বলল, দিন পালটে গেছে মশায়, এখন কী রকম নাম ধরে 'কৃষ্ণেন্দু কৃষ্ণেন্দু' করছে মেয়ে, আমি কি এখনও তোমার নাম ধরতে পারি?

অচিন হেসে বলল, আমার ঠাকুমা যাদবপুরকে 'ওইপুর' বলত, যাদব ছিল তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের নাম।

বদলে গিয়েছে। সব বদলে গিয়েছে। তিস্তা ওর মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে ভাবি-শাশুড়ি, দিদিশাশুড়ির বালুচরী, গরদ পছন্দ করছে। দোকানে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা আর তো দিতে হবে না, এখন যা চাইব তাই দেবে।

বলল বটে, কিন্তু তেমন কিছু চাইল না মেয়ে তার বাবার অন্ধকার মুখ দেখে। বাড়ি ফিরে অচিন রাগ করল, কী বললি তখন, তুই কি আমার মেয়ে থাকবি না?

আহা, তাই বলেছি নাকি?

তা-ই তো বললি। অচিন আরও রেগে গেল, আর দিতে হবে না মানে, তোকে এতটা বড় করলাম, জ্বর হলে রাত জাগল তোর মা কত বার, তোর জন্মের সময় সমস্ত রাত হাসপাতালের সিঁড়িতে বসেছিলাম, তুই আমার থাকবি না?

ইস্! ও কি তাই বলেছে, তুমি বাবা তুমি তো এ সব করবেই। সুপ্রিয়া মেয়ের পক্ষ নিল।

তা হলে কী বলেছে?

বলেছে আর তো আবদার করে চাইবে না।

অচিন রাগে ফেটে পড়ে, তার মানে?

সুপ্রিয়া বুঝল তার বলাটা ঠিক হয়নি। অচিন ঠিক বুঝছে না। সে কথা ঘুরিয়ে বলল, ওর সংসার হবে, ওর নিজের বাড়ি হবে।

এ বাড়ি ওর না?

সুপ্রিয়া বলল, তুমি কী রকম বাচ্চাদের মতো কথা বলছ, আমার বাপের বাড়ি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাড়ি আছে, এক জনের ক'টা বাড়ি থাকে?

আচমকা রাগ পড়ে গেল অচিনের। তার পর বিষণ্ণ গলায় বলল, সে দিন কে যেন বলছিল, মেয়েদের হয় বাপের বাড়ি না হয় শ্বশুরবাড়ি, নিজেদের বাড়ি কই?

ওটা কথার কথা। শ্বশুরবাড়িই নিজের বাড়ি। বলল সুপ্রিয়া, তাই তো হয়।

হুঁ। অচিন আরও বিষণ্ণ, ঠিকই তো, ওর নিজের বাড়ি হবে, নিজের সংসার হবে, ওর তো গোত্রান্তর ঘটে যাবে।

বাবা মায়ের কথার ভিতরে আনন্দ নেই দেখে তিস্তা বলল, বাবা আমি তো তোমারই মেয়ে থাকব, গোত্রান্তর কি দেখা যাবে?

না যাবে না। সুপ্রিয়া বলল।

গোত্রান্তর ঘটলে কি মানুষ বদলে যায় মা?

উফ্! তুই পারিসও বটে, আমার গোত্র ছিল বিশ্বামিত্র, এখানে এসে হলাম গৌতম গোত্র, কিন্তু ও-সব কে মনে রাখে, মনে রাখার দরকারই বা কী?

অচিন মনে মনে বলল, রাখে রাখে। সে কি বিয়ের কার্ডে লেখেনি ফুলবনি,পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নিবাসী ...? অচিন কি ওদের বলেনি, কার্ডে লিখবেন আদি নিবাস গ্রাম ঃ ধূলিহর জেলা ঃ খুলনা, উপজেলা ঃ সাতক্ষীরা, লিখবেন প্রয়াত অধীরকুমার বসু ও পূর্ণিমা বসুর পৌত্রী; শ্রী অচিনকুমার বসু ও শ্রীমতী সুপ্রিয়া বসুর একমাত্র কন্যা ...। এই তো যতটা সম্ভব পরিচয় বলে দেওয়া। মানুষ তো আকাশ থেকে নামে না। মানুষের একটা গ্রাম থাকে, সমাজ থাকে, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ ... থাকে। গোত্র থাকে। পিছতে পিছতে গোত্রে তো পৌঁছে যায় মানুষ। বিয়ের পর তা বদলাবে তো নিশ্চয়।

অচিন স্বাভাবিক হয়ে বলল, কী দরকার বল, দেব।

কিছু দরকার নেই বাবা। মেয়ে গলা ভার করে মুখ নিচু করল।

অফিসের জিতেন মণ্ডল বলল, মেয়ে তো চাইবে না স্যার, ওদের তো মায়ার শরীর। কিন্তু আপনি দেবেন যতটা পারবেন, আমি তো দিয়েছি মেয়ের বিয়ে, জানি, এ সময় খুব দিতে ইচ্ছে হয়।

তুমি অনেক দিয়েছ?

যতটা পেরেছি স্যার।

এ সবও বিয়ের কথা। লাখ কথার কিছু কথা। জিতেন মণ্ডল মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনেক অভিজ্ঞ। অচিনকে উপদেশ দেয়, বলে, ভাববেন না স্যর, ঠিক হয়ে যাবে, এখন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যাবে হঠাৎ হঠাৎ, মেয়ে তো যাবে পরের ঘরে।

তোমার মেয়ের বিয়ে তো গ্রামের বাড়ির কাছে হয়েছে?

হ্যাঁ স্যর, সাইকেল আধ ঘন্টা, তবু তো স্যর অন্য গ্রাম অন্য ঘর।

জামাই ভাল হয়েছে?

জিতেন বলে, হ্যাঁ স্যর, খুব পরিশ্রমী, তবে এখন ব্যবসাটা মার খাচ্ছে, গোলমাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে সেই ভোটের পর থেকে। পুলিশও রাস্তা থেকে অল্পবয়সীদের তুলে জেলে ভরে দিচ্ছে, পার্টিতে পার্টিতে লেগেই আছে।

সাবধানে থাকতে বোলো।

সে কী বলি না স্যর, কিন্তু ঘরে তো বসে থাকতে পারে না।

অচিন শুনতে শুনতে যেন নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরায়। গুরগাঁও নতুন শহর। ও শহরে এ সব নেই। আছে শুধু কাজ। চব্বিশ ঘন্টা কাজ চলছে। বড় বড় শপিং মল সমস্ত রাত আলো জ্বেলে বসে আছে। ওখানে কোনও ভয় নেই। একটু দূর বটে, কিন্তু উড়ানে গেলে আড়াই ঘন্টা। ওই সময়ে কি জিতেন তার মেয়ের বাড়ি পৌঁছতে পারবে? ছ'সাত ঘন্টা যে লেগেই যায়। আর রাস্তা বন্ধ হলে, পার্টিতে পার্টিতে যুদ্ধ হলে রাস্তায় রাত কেটে যাবে হয়তো। ও সব জায়গা তো আর আগের মতো নেই।

ক'দিন বাদে সুপ্রিয়া বলল, আরে নোটিস করতে হবে তো রেজিস্ট্রির। ফর্ম পাঠিয়ে দিতে বলেছে, এক মাসের নোটিস ছাড়া তো হয় না রেজিস্ট্রি।

এ দিকটা ভুলেই গিয়েছিল অচিন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে পায় কোথায়? পাড়ার এক জন বলল, ল্যাম্প পোস্টে দেখুন, বোর্ড লাগানো থাকে, নম্বর পেয়ে যাবেন। কথাটা সত্যি। যে বাড়িটি বুক করা হয়েছে বিয়ের জন্য, সেই বাড়ির দশ হাতের ভিতরে যে ল্যাম্প পোস্ট তাতেই টিনের পাতে মোবাইল নম্বর লেখা। ফোন করে সময় নিয়ে তাঁর অফিসে গিয়ে অচিনকে আধ ঘন্টা বসতে হল। অতঃপর তিনি রিকশা থেকে নেমে খুপরি অফিস ঘরে ঢুকলেন, বছর ষাট, শালোয়ার কামিজ ওড়না। মাথার চুলে বাদামি রং, পনিটেল ঘাড়ের উপর দুলছে।

নমস্কার, কবে বিয়ে? ছেলে কোথায় থাকে? কী করে? অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ? খবরের কাগজ না ইন্টারনেট? কত কৌতূহল তাঁর? অচিনের ঠিকানা দেখে বললেন, ও-পাড়া তো আমার চেনা দাদা, হরেকৃষ্ণ বাড়িতে আমার পিসতুতো ননদের বিয়ে হয়েছে, ওদের সঙ্গে আলাপ আছে?

মুখ চেনা আছে। যে বাড়ির গায়ে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম' খোদাই করা আছে, সেই বাড়ির কথা বলছেন মিসেস মাইতি। দশ বছরে বিরানব্বইটা বিয়ে দিয়েছেন, সবাই খুব সুখী। তাঁর বিয়ে দেওয়া দম্পতি কানাডায় থাকে, অস্ট্রেলিয়ায় থাকে বলে তিনি পানপরাগ মুখে দিলেন। তিনটি ফর্মের দাম দেড়শো টাকা। উঠে গিয়ে বেসিনে পিক ফেলে এসে বললেন, বিয়ে বাড়িতে রেজিস্ট্রি হলে দু'হাজার, আর তাঁর অফিসে এলে দেড়। কীভাবে কোন কলম ভর্তি করতে হবে, তাও বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, কুরিয়র করে দিন, ব্রাইডগ্রুম ফুল সিগনেচার করে পাঠিয়ে দিক, তার পর আমার কাজ।

এও বিয়ের কথা। রেজিস্ট্রার মিসেস সুজাতা মাইতি ছাড়তেই চান না অচিনকে। বললেন, দাঁড়ান, চা খেয়ে যান, গয়নাগাটি করা আছে তো, এখন যা সোনার দর!

আছে আছে বলতে বলতে অচিন কোনও রকমে বেরিয়ে এল। সই করে কাগজ ফিরে

নির্বাচিত রবিবারের গল্পদুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে তাকে আবার আসতে হবে এখানে। অচিন ফর্মটি স্পিড পোস্টে পাঠিয়ে সে-দিন সন্ধেয় ফোন করল কৃষ্ণেন্দুর মোবাইলে। ফোন বাজতে লাগল। একা একা এগারোশো বর্গফুট ফ্ল্যাটে থাকে। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। না হয় স্নানে ঢুকেছে। ফোন কেটে গেল বেজে বেজে।

বিয়ের কথা হতে হতে জামাইয়ের কথা হতে হতে জিতেন মণ্ডল এক দিন বলেছিল না, তার মেয়ে তখন এখানে এসেছে, চেতলায় তার বাসায়, টিভিতে সন্ধেবেলায় দেখলে পুড়শুড়ায় কতগুলো বাড়ি জ্বলছে, মেয়ে ভয় পেয়ে ফোন করল জামাইকে। ফোন নট রিচেব্‌ল হয়েই থাকল সমস্ত রাত। মেয়ে ভয়ে কাঁদে ফেলল। জিতেন করবে কী? আর তো কোনও উপায় নেই যোগাযোগের। কী ভয়ে যে রাত কেটেছিল তাদের। পর দিন জামাই-ই যোগাযোগ করে। অচিনের সে ভয় নেই। তার হবু জামাইও রিং ব্যাক করল একটু বাদে।

দিন গড়াতে লাগল। অচিন তার বন্ধুর সঙ্গে আন্দুল গেল। সেখানে পরপর কাঠের ফার্নিচারের দোকান। আসল শাল সেগুন। কলকাতায় সেগুন বলে কী গছিয়ে দেবে, কে বলতে পারে? শালও কি চেনে অচিন? ফার্নিচার পছন্দ করে অর্ডার দিতে দিতে তার আচমকা মনে হল চিনলেও চিনতে পারেন কৃষ্ণেন্দুর বাবা। ফুলবনিতে শাল-সেগুনের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের কাঠ কি এল এই আন্দুলে? ফার্নিচার হয়ে ফুলবনিরই মানুষের ঘরে তা ফিরে যাচ্ছে। গাছের গায়ে গুলির চিহ্ন লেগে নেই তো।

ফার্নিচারের কথা শুনে পর দিন জিতেন মণ্ডল বলল, দেখবেন স্যর অসার কাঠ যেন না দেয়।

অসার কাঠ মানে?

ঘুণ ধরা কাঠ, সিজিন না করা কাঠ অমনি হয়।

না না, তা হবে কেন?

হয় বলে বলছি, খরচা করছেন, কিন্তু ঠকে যেন না যান।

অচিনের খুব ভাল লাগল জিতেনের কথা। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন কাঠ দিয়েছ জিতেন, চাঁপা কাঠ না মালয়েশিয়ান টিক, সেগুন কি দিতে পেরেছ?

দিইনি স্যর, শুধু বিছানা, পারতামও না স্যর, আপনি কি ক্যাশ দেবেন?

উঁহু। ও-সব উঠে গেছে জিতেন।

জিতেন বলল, আমি দিয়েছি স্যর, বউভাতের খরচ, আমাদের আছে।

ছেলে কী করে?

ব্যবসা, হাওড়া হাট থেকে রেডিমেড কিনে সাপ্লাই করে। নিজেও দোকান করবে এ বার। আমি বলেছি কিছু দেব।

দাও, দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক।

জিতেন বলল, কী যে হবে স্যর, গোলমাল থামছে না, বাড়ি ঘর দোর জ্বলছে, জামাই

AMARBOI.COM

যে চলে আসবে এ দিকে, সে উপায় নেই, জমিজমা ফেলে তো আসতে পারে না।

অচিন বলল, থেমে যাবে। এ ভাবে চিরকাল চলে না।

জানি স্যার, আগে এক পার্টিকে চাঁদা দিতে হত, এখন দুই পার্টিই নেয়, দুই পার্টিই মারে, যাবে কোথায়? পুলিশও চোখ রাঙিয়ে ঘুরছে সব সময়।

অচিন বলল, এই ভাবে আমরা শেষ হয়ে যাব, বাইরে গিয়ে দ্যাখো কোনও গোলমাল নেই। এই তো ছেলেটা, গুরগাঁও থাকে, ও দিকে কেউ বসে থাকে না।

জানি স্যার, আপনার জামাই লাকি, ফুলবনি থাকতে হবে না ওকে, আপনারও চিন্তা নেই।

বিড়বিড় করছিল জিতেন, যখন ফুলবনি জঙ্গল মহলের কথা বলেছিলেন স্যার। খুব ভয় হয়ে গিয়েছিল, আমার যা হয়েছে স্যারেরও যদি তা হয়, মোটর ভেহিকেলে কাজ করে নিতাই সামন্ত। ওর তো মৌলবনি বাড়ি, ফুলবনির পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে, বাড়িতে তালা মেরে সবাইকে নিয়ে চলে এসেছে। ওর খুড়তুতো ভাইটা পাগলা, পুলিশ তাকে তুলে নিয়েছে টেররিস বলে, এ দিকে বহিরাগতরা মাসে হাজার টাকা চাঁদা চেয়েছিল, অন্য পার্টি এসে শাসিয়ে গিয়েছিল চাঁদা দিলে পুলিশ লেলিয়ে দেবে, সাহায্য করা অপরাধ।

হুঁ। অচিনের আর ভাল লাগছিল না। এ সব কথা বিয়ের লাখ কথার ভিতরে পড়ে না। তবু বিয়ে প্রসঙ্গেই না শুনতে হচ্ছে। সে বলল, থাক জিতেন।

জিতেন বলল, হ্যাঁ স্যর, আলোচনা করাও ঠিক না, তার উপরে মেয়ের বিয়ে সামনে, লোকের মনে শুধু হিংসা, রাস্তায় নামলে মনে হয় সবার কোমরে বোধ হয় গুলি বন্দুক।

তখন অচিনের মোবাইল বাজতে সে যেন বাঁচল। জিতেন মণ্ডল সরে গেল। সন্ধের পর সে বাড়ি ফিরে দেখল মস্ত শতরঞ্চি পেতে মা-মেয়ে খামের মাথায় হলুদ আর সিঁদুরের টিপ পরাচ্ছে। এক ধারে বসে আছে কাকলি। সে ঢুকতেই কাকলি বলল, কাকুকে কি এখন জানাবে কাকিমা?

জানাতে তো হবেই।

কাকলি বলল, কাকু শুনুন, জঙ্গলমহল চলে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড।

তার মানে?

মানে খুব সহজ, এখনই কৃষ্ণেন্দু ফোন করেছিল, পাসপোর্ট বানাতে বলল তিস্তাকে, সুইজারল্যান্ড থেকে বড় অফার এসে গিয়েছে, হিপহিপ হুররে।

সুইজারল্যান্ড! অচিন বিড়বিড় করল, 'অতদুর'! গলার স্বর ভার হয়ে গেল মুহূর্তেই।

হ্যাঁ বাবা। তিস্তার চোখমুখ ডগমগ করছে। ঝলমল করছে আনন্দে।

কবে যাবে?

জানুয়ারিতে, ও অ্যাকসেপ্ট করেছে, না করলে লস করবে অনেক।

তুই যাবি? মেয়েকে জিজ্ঞেস করল অচিন।

যাবে তো, ও কি এখানে থাকবে? কাকলি বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও থাকবে না? আবার জিজ্ঞেস করে অচিন।

না থাকবে কী করে? বলল সুপ্রিয়া। ওকে নিয়ে যাবে বলেই তো জানুয়ারি পর্যন্ত যাচ্ছে না, যাবেই তো।

না গেলে হত না?

কী বলছ তুমি! সুপ্রিয়া রেগে গেল, যেমন ছেলে তেমনি অফার পেয়েছে, না গেলে এই অফার কি সেকেন্ড টাইম আসবে?

অচিন বলল, 'আগে তো বলেনি! মেয়েকে অত দূর পাঠিয়ে আমি থাকব কী করে?' ব্যাগ মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল অচিন, কপালে হাত! অত দূর!

নেটে দেখবেন কাকু, ওকে লাইভ দেখতে পাবেন, এই তো আমার দাদা আছে ডেনভার, মাকে নেট সার্ফ করা শিখিয়ে দিয়েছি, ওখানে সন্ধে মানে এখানে পরের দিন সকাল, মা ভোর বেলায় উঠে কম্পিউটারে বসে যায়! বলতে বলতে কাকলি উঠল, বিড়বিড় করে সুপ্রিয়াকে শোনাল, এ বার আকাশ থেকে বায়ুসেনা জঙ্গলে বোমা ফেলবে, ফায়ার করবে, জঙ্গলমহল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, একেবারে শূন্য! সবাই চলে যাচ্ছ, সব গ্রামের সবাই!

অচিন মাথা নামিয়ে ছিল। ভাবতেই পারছিল না তিস্তা অনেক অনেক দূর— পৃথিবীর আর এক দিকে—ওফ্! কেন যে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়।

কাকলি চলে যেতে সবাই চুপচাপ। লাখ কথার একটিও আর ফুটছে না। পরদিন সবটা শুনে জিতেন মণ্ডল, এখেনে থাকলে তো জঙ্গলমহল টানত স্যর, চলে যাচ্ছে যাক, তবে ফিরে আসবে বছর দেড় দুই বাদে। থাকতে পারবে না দেখবেন।

অচিন চুপ করে আছে।

জিতেন মণ্ডল বিষণ্ণ গলায় বলল, খুব কষ্টের ব্যাপার স্যর। কষ্টটা হবে পরের দিন স্যর, যখন সে পতিগৃহে যাবে, মাথায় সিঁদুর, বেনারসি, গা-ভরা গয়না, আপনি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না, লুকিয়ে থাকবেন ঘরে, লাখ কথাও তখন ফুরিয়ে গিয়েছে স্যর, আপনি তখন বোবা, আপনাকে কেউ খুঁজে পাবে না, আমাকেও পায়নি সেদিন, মেয়ে তো চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে মেয়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জানুয়ারি ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্ভেদ

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক বললেন, আসলে সল্টলেকে একটু বেশি লাগে।

ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ, বালি আছে না ...

ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন গরমের কথা বলছেন ওঁরা। মর্নিং-ওয়াকে এসে এমন টুকরো কথা শুনেই ইন্দ্রনাথ মজুমদার বুঝে যান কে কী বিষয়ে কথা বলছে।

সল্টলেকের এই আয়তাকার উদ্যানটি হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত। পার্কের মধ্যে সীমানা বরাবর সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা। বারো পাক দিতে পারলে পাঁচ কিলোমিটার হয়ে যায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে ইন্দ্রনাথের।

হাঁটবার সময় অনেকে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে, কেউ বা মোবাইলে অনর্গল কথা বলে যায়। ইন্দ্রনাথ যদিও রবীন্দ্রসংগীতের পরম অনুরাগী, কিন্তু প্রাতর্ভ্রমণের সময় গান শোনা একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। কথা বলাও নয়। সকালে হাঁটবার সময় ইন্দ্রনাথের প্যান্টের পকেটে শুধু একটি রুমাল ছাড়া কিছুই থাকে না। মানিব্যাগ মোবাইল, কিছু না। বরং উড়ে আসা কথায় মনের খোরাক পাওয়া যায়। কথা শুনে বক্তা-শ্রোতার সম্পর্ক অনুমান করার চেষ্টা করেন তিনি।

এক পাক ঘোরবার পর ভদ্রলোকটিকে ভাবলেশহীন চোখে নজর করে নিলেন ইন্দ্রনাথ। লোকটির বয়স নিশ্চয়ই ষাটের ওপরে। পরনে খয়েরি বারমুডা, টি-শার্ট। ত্বক শিথিল এবং পীতাভ। নখ রক্তবর্ণ। চোখ লালাভ। মাথায় টাক। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। লোকটি নিশ্চিত পিত্তপ্রকৃতির। এই জাতীয় লোকেরা খেতে খুব ভালবাসে। ঔদরিক বলা যেতে পারে। এদের পছন্দ ঠান্ডা। এরা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায়, আবার দ্রুত শান্তও হয়। শারীরিক সামর্থ্য মাঝারি মাপের। আয়ুও মধ্যম। তবে এদের মেধা কিছু উঁচু মানের। কোনও সমস্যা চট করে বুঝে নিতে পারে। ভাষণ দিতে এরা পারদর্শী। এরা সহজে ভয় পেয়ে মাথা নোয়ায় না। যারা এদের বশ্যতা স্বীকার করে না তাদের ওপর এরা খুবই কঠোর। আশ্রিতদের এরা পাগলের মতো ভালবাসে। এই সব লোকের প্রভুত্ব করার ইচ্ছের সঙ্গে মিশে থাকে বহুগামিতার ইচ্ছাও।

সমুদ্রবিদ্যার চর্চা করেন ইন্দ্রনাথ। চেহারা দেখে চরিত্র অনুমান করবার এই বিদ্যাটি নিয়ে তিনি বিস্তর নাড়াঘাটা করেছেন। মানুষের মুখ দেখলেই তাঁর মনে এসে যায় সমুদ্রবিদ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা। আজও এল। 'পিত্তপ্রকৃতির মানুষেরা সর্পের ন্যায় ক্রূর-তেজস্বী, উলূকের ন্যায় রাত্রিজাগরূক, গন্ধর্বের ন্যায় সংগীতপ্রিয় বা বিলাসী, যক্ষের ন্যায় ধনসঞ্চরী, মার্জারের ন্যায় অকৃতজ্ঞ বা আমিষপ্রিয়, বানরের ন্যায় চঞ্চল, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, ভালুকের ন্যায় শীতলতাপ্রিয় এবং নকুলের ন্যায় বদমেজাজি হইয়া থাকে।'

ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথ। মহিলার গলা ভেসে এল—সব খাতা শেষ করে ফেলেছি, কী যেন আনন্দ হচ্ছে। ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন ভদ্রমহিলা শিক্ষিকা। গরমের ছুটিতে ছাত্রদের হোমটাস্কের খাতা দেখার কথা বলছেন উনি।

আনন্দের বার্তাবাহীটিকে পরের পাকে দেখে নিলেন ইন্দ্রনাথ। মধ্য পঞ্চাশের মহিলাটির পরনে মেরুন তাঁতের শাড়ি। দেহে স্নিগ্ধ লাবণ্য। চোখের প্রান্ত রক্তবর্ণ। শরীরের গঠনে সুবিন্যস্ত ভাব। ইনি শ্লেষ্মপ্রকৃতির মানুষ। এরা কষ্টসহিষ্ণু। গুরুমান্যকারী। সত্ত্বগুণসম্পন্ন। শৃঙ্খলাপরায়ণ। এরা বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয়। হাতি ঘোড়া সিংহ রাজহাঁস—এই সব পশুপাখির অধিকাংশ গুণ এদের মধ্যে পাওয়া যায়।

শ্লেষ্মপ্রকৃতির মহিলাটির সঙ্গে পিত্তপ্রকৃতির পুরুষটির সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে? খারাপ কিছু হবে না বলেই মনে হয়। পুরুষটি প্রভুত্বপরায়ণ। মহিলাটি গুরুমান্যকারী। বশ্যতা স্বীকার করলে পুরুষটি অকুণ্ঠচিত্তে দান করে যাবে তার ভালবাসার মানুষটির জন্য। আর সাত্ত্বিক গুণসম্পন্না, শৃঙ্খলাপরায়ণ মহিলাটি যথাযথভাবে তাদের এই অবেলার প্রেমটিকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। ভালই হবে।

সাত পাকের মাথায় এক পুরুষকণ্ঠ কানে এল—সে সময় তো তিন রকম পাওয়া যেত—অর্ডিনারি, ফাইন, সুপার ফাইন। অর্ডিনারি ছিল চুরাশি পয়সা কেজি।

ইন্দ্রনাথ বুঝলেন রেশনের চালের গল্প হচ্ছে। 'সে সময়' বলতে ষাট দশকের গল্প বলছেন পুরুষটি। তখন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট। চাল-চোরাকারবারিদের সুখের সময়। চাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এক বিশেষ ধরনের জামা দর্জির ঘরে কিনতে পাওয়া যায়। দাম পাঁচ-ছ টাকা। আট-দশ কিলো চাল অনায়াসে ভরে নেওয়া যায় জামাটিতে। চাল-জামাটি প্রথমে ফতুয়ার মতো পরে, ওপরে অন্য পোশাক পরা হয়।

বক্তার দিকে তাকালেন ইন্দ্রনাথ। কৃশকায়, পক্ককেশ প্রৌঢ়। পরনে প্যান্ট-টি শার্ট। কর্কশ ত্বক। শিরাফোলা হাত পা। চোখ গোলাকার। উলকো-ফুলকো চাউনি। শ্রোতা মধ্য-চল্লিশের দুই যুবতী। এরা তো এয়ারকন্ডিশনড ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে চাল কেনে। নিশ্চয় চোদ্দো-ষোলো টাকা কিলোর চাল। সম্ভবত, এদের বাজার করবার গল্প প্রসঙ্গে পক্ককেশ শোনাচ্ছেন সে আমলের কথা। যখনকার গল্প হচ্ছে এই যুবতীরা তখন চার-পাঁচ বছরের শিশু।

বক্তাটিকে আর এক বার নজর করলেন ইন্দ্রনাথ। প্রৌঢ়টি নিশ্চিত বায়ুপ্রকৃতির। সমুদ্রবিদ্যা বলছে এরা রাতজাগায় পটু। ঠান্ডা ভালবাসে না। কথায় কথায় ক্রুদ্ধ হয়, নখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামড়ায়, দাঁতে দাঁত ঘষে। অধৈর্য্য। ধীর লয়ে হাঁটতে পারে না। প্রগল্‌ভ। মিথ্যা বলতে সংকোচ বোধ করে না। মাঝে মধ্যে অসংলগ্ন কথাও বলে। আর শরীরকে এরা সুস্থির রাখতে পারে না—হয় হাত নাচাচ্ছে, কিংবা পা নাচাচ্ছে। এই প্রকৃতির মানুষেরা কেউ ছাগলের মতো শৃঙ্গারী, কেউ শেয়ালের মতো ধূর্ত, কেউ খরগোশের মতো ভিতু। আবার কেউ ইঁদুরের মতো খুটখাট করতে ভালবাসে।

পক্ককেশটি যুবতীদের সঙ্গে একটু খুটখাট করতে চাইছেন মনে হয়।

সম্মেলক হাসির শব্দে সচকিত হলেন ইন্দ্রনাথ। লাফিং ক্লাবের সদস্যরা তাদের ফাইনাল রাউন্ডে'র অট্টহাসি হাসছে। দলের ক্যাপ্টেন হাঁক পাড়ল, ওয়ান্স এগেন। আবার অট্টহাসি। মাঝে মধ্যে হাসির শব্দের তারতম্য কী যে হয়, ইন্দ্রনাথের ভেতরেও হাসি গুড়গুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এদের অট্টহাসি খুবই যান্ত্রিক। হাসির উদ্রেক করে না।

শেষ চক্কর মারবার সময় পার্কের উত্তর প্রান্তে পৌঁছে পাওয়া গেল এক তরুণ কণ্ঠ—কী মামু হ্যাং করে গেলে না কি? এ হল এখানকার ভাষা। তবু বুঝলেন ইন্দ্রনাথ। যার উদ্দেশে এ কথা বলা হচ্ছে, সে কোনও খবর শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে। খবরটি নিঃসন্দেহে ভাল। সে জন্যই তাকে লঘু গলায় প্রশ্ন ছুড়ছে তরুণটি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তরুণদের জটলাটিকে এক বার দেখে নিলেন ইন্দ্রনাথ। তার পর উদ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সপ্তাহের অন্য দিনগুলির সঙ্গে রবিবারের পার্থক্যটি পার্কে এলেও চোখে পড়ে। রবিবার ওয়াকারদের সমাগম একটু বেশি। অনেক কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের হাঁটতে দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের উড়ে আসা কথায় অশেষ লাভবান হয়েছেন ইন্দ্রনাথ। এখানকার তরুণ-তরুণীদের কথা বলার ধরনটা বুঝতে পারেন তিনি। বোঝা যায় ওদের মনোভঙ্গি। এক রবিবার, ইন্দ্রনাথের কানে এসেছিল তরুণীকণ্ঠ—আরে ছোড়ো না, হমে উস্‌মে কেয়া হ্যায়? এর পিঠোপিঠি ভেসে এল তরুণের হাসি। ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন প্রায় ছ'ফুট লম্বা তরুণটি, পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতার তরুণীটিকে তার কোনও প্রাক্তন বন্ধুর কথা বলে একটু লেগ পুলিং করছে।

রবিবারে বাগানের দক্ষিণ প্রান্তের চাতালে মেয়েদের জটলা থেকে গান ভেসে আসে। 'তুমি কি কেবলই ছবি' গাইছিলেন এক জন। চাতালের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন 'ছবি'তে 'ছ' উচ্চারণ করবার সময় ভদ্রমহিলার জিহ্বা মুখের ভেতর এমন জায়গায় পড়ছে, যেখানে জিহ্বা 'চ' উচ্চারণের সময় ঠেকে।

বাড়িতেও মাথা চলে ইন্দ্রনাথের। নতুন করে 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ে ফেলেন তিনি। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের একাংশে চোখ আটকে যায়। সেই যেখানে শৈলেশ্বরের মন্দিরের অন্তরালবর্তিনী নারীর নির্দেশে রাজপুত যুবক মন্দিররক্ষক ভৃত্যের বাড়িতে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে এবং সেই "মন্দিরক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যু-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না।"

'বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ' আর 'দস্যু-লক্ষণ' দু'টি কথা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ইন্দ্রনাথকে। কী কী লক্ষণ দেখে মন্দিররক্ষকের মনে হল লোকটি দস্যু নয়?

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রোমা রলাঁ-র লেখাটিও মন দিয়ে পড়েছেন ইন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দের চেহারার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়— তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়। ওজন ১৭০ পাউন্ড। সমান্তরাল স্কন্ধদ্বয়, প্রশস্ত বক্ষ, তাতারদের মতো বহিরাগত হনু। পেশিবহুল হস্তযুগল, যাহা সর্বপ্রকার ক্রীড়াকৌশলের উপযোগী করিয়া গঠিত; হরিৎ গাত্রবর্ণ; মুখমণ্ডল ভারী এবং সুন্দর পদ্মপলাশলোচনাদ্বয়। বোঝাই যায় বিবেকানন্দকে রোমা রলাঁ 'বিশেষ পর্যবেক্ষণের পর' ওই লেখা লিখেছেন।

টেলিভিশনের খবরে প্রবল আগ্রহ ইন্দ্রনাথের। তিনি মন দিয়ে লক্ষ করেন বুদ্ধ বিমান সোমেন মমতার কথা বলার ধরন। গভীর অভিনিবেশ দেখেন তাদের মুখমণ্ডল। বিনয় কোঙার যেদিন বলেন—ওদের লাইফ হেল করে দেব, ইন্দ্রনাথ দ্রুত দেখে নেন শ্রীযুত কোঙারের দাঁতের সারি। একেই বলে করাল দংষ্ট্রা রেখা! কিংবা বুদ্ধদেববাবু যেদিন দায় স্বীকার করে মৃদু হাসেন; ইন্দ্রনাথ দেখেন তাঁর স্মিতমান মুখমণ্ডলে অহংকার লুকোচুরি খেলছে। কোনও কোনও রাজনীতিবিদের মুখ ভাবলেশহীন। যেমন সনিয়া গাঁধী। এঁরা খুবই চেষ্টায় মনোভাবটিকে গোপন রাখেন। সক্রেটিস নাকি এ রকম পারতেন। তাঁর শিষ্যরা সক্রেটিসকে নিয়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রবিদ্যা বিশেষজ্ঞের কাছে। সমুদ্রজ্ঞ পণ্ডিতরা সক্রেটিসকে দেখে বললেন—এ লোভী, কামুক, পরনিন্দাপ্রিয় এবং পাপী। সক্রেটিসের মনে পাপ? শিষ্যরা হেসে উঠল। পরিহাস শুরু করল সমুদ্রজ্ঞদের নিয়ে। সক্রেটিস শিষ্যদের ভর্ৎসনা করলেন, তোমরা থামো। এঁরা ঠিকই বলছেন। এই সবক'টি দোষই আমার আছে। কিন্তু আমি সেগুলি জ্ঞানবলে, অভ্যাসবলে নিয়ন্ত্রণে রাখি।

আকবর বাদশাও নিজেকে বুঝতেন। তিনি পিত্তপ্রকৃতির মানুষ। হঠাৎ রেগে যান, পরক্ষণেই ঠান্ডা। নিজের এই স্বভাবটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বাদশা নিয়ম করেছিলেন, পর পর তিন বার তিনি অনুমোদন দিলে তবেই কোনও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হবে।

চরিত্রানুমান ইন্দ্রনাথের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। খবরের কাগজে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মুন্ডিতমস্তক নীতীশকুমারের ছবি দেখে প্রথমেই মনে আসে চ্যাপ্টা মাথার মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি। রাস্তায় চলতে ফিরতে পুরুষকণ্ঠে 'ব্যাপারটা একটু পর্যালোচনা করা দরকার' শুনলে ইন্দ্রনাথ বুঝে যান বক্তা সরকারি কর্মচারী এবং ইউনিয়নের মাঝারি নেতা। অফিস যাওয়ার পথে চার নম্বর ব্রিজ থেকে নামার মুখে অকস্মাৎ এক জন দৌড়ে রাস্তা পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। শেয়ারের গাড়ির ড্রাইভার সজোরে ব্রেক কষে। ড্রাইভার গালাগাল দেয় না, বলে ওঠে, পথচারীদের নিয়ে আর পারা যায় না। ইন্দ্রনাথ বুঝে যান লোকটি মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে। সম্ভবত, আনন্দবাজার।

অফিসেও বিষয়ানুমান, চরিত্রানুমান বিদ্যার প্রয়োগ করেছেন। ইন্দ্রনাথ। দুপুর দেড়টার সময় বড়বাবু বলেন, মজুমদার সাহেব এই চেকটা একটু ... ইন্দ্রনাথ বুঝে যান বড়বাবুর বক্তব্য। কোনও কাস্টমার টাকা তুলতে এসেছে, কিন্তু তার ক্লিয়ার ব্যালেন্স নেই। তার জমা দেওয়া কিছু চেক এখনও ক্লিয়ার হয়ে আসেনি। ইন্দ্রনাথ বলেন, ক্লিয়ার ব্যালেন্স কত?

— চল্লিশ হাজার।

— ক্লিয়ারিং-এ আছে কত টাকা?

— দু'লক্ষ ষাট হাজার, স্যর।

— পার্টি কত তুলতে চায় এখন?

— স্যর, এক লাখ দশ।

— পাস্ট রেকর্ডস কেমন?

— ভাল স্যর।

যদি ক্লিয়ারিং-এ পাঠানো ওই দু'লক্ষ ষাট হাজার টাকার চেক কোনও কারণে বাউন্স করে তা হলে মুশকিল। সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে পার্টির নামে জমা আছে চল্লিশ হাজার আর ব্যাঙ্ক তাকে দিয়ে দিয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। তখন ব্যাঙ্কের ঘর থেকে এই সত্তর হাজার টাকা দেবার জন্য ইন্দ্রনাথের শাস্তি হবে। ওই সত্তর হাজার টাকা তো তাঁর পকেট থেকে যাবেই, চাকরিও যেতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজকর্ম অনেকটাই এমন বিশ্বাসের ওপর চলে। একেবারে নিয়মতান্ত্রিক হলে বিজনেস বাড়বে না ব্রাঞ্চের। আর তা ছাড়া বড়বাবু বহু দিন আছেন এই ব্রাঞ্চে। সমস্ত বড় কাস্টমারের হাল-হকিকত ওঁর নখদর্পণে। এখানে বদলি হয়ে আসার পর ইন্দ্রনাথকে এই ব্রাঞ্চের যাবতীয় খুঁটিনাটি সব হাতে ধরে শিখিয়েছেন ওই বড়বাবুই। ইন্দ্রনাথ সই করে দেন চেকের মাথায়। চেক পেমেন্ট হয়ে যায়।

ব্যাঙ্কের ব্যবসা বাড়ে, ইন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাসও। টুকরো কথা শুনে চরিত্রানুমানের বিষয়টিকে এক ধাপ উপরে নিয়ে গেছেন ইন্দ্রনাথ। এখন তিনি কথা শুনে বক্তার অবয়ব নির্মাণের চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে চোখ বন্ধ করে টেলিভিশনের খবর শুনতে শুনতে মিলিয়ে নিতেন তাঁর অনুমান। কখনও মিলত, কখনও নয়। তার পর এক দিন এসে গেল।

টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে এক জন স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল যে সে-ই তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। চোখ বন্ধ করে হত্যার বিবরণ শুনছিলেন ইন্দ্রনাথ। এমন নিষ্ঠুর যাদের মতিগতি তাদের কপালটি নিচু হবে—লোকটির নিশ্চয়ই নিম্নললাট। মাথাটি নিশ্চয়ই টিঙের মতো চ্যাপ্টা- চিপাটমস্তক। কোনও রকম ক্ষমতা থাকলে চ্যাপ্টা মাথার লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাকাণ্ডের মতো নিষ্ঠুর কাজ করবে। সামর্থ্য না থাকলে এরা মনে মনে নিষ্ঠুর সংকল্প করবে এবং তা কাজে রূপান্তরিত না করায়, গুমরে মরবে। এদের মন ভয়ংকর বিষাক্ত, সন্দেহ নেই। হত্যাকারীর অবয়বটি ভেসে উঠল ইন্দ্রনাথের মনে। তিনি চোখ খুললেন। টিভি-র পর্দায় লোকটিকে দেখে চমকে উঠলেন। আরে, অবিকল এই লোকটিকেই তো তিনি ভাবছিলেন! সেই নিম্নললাট, চিপীটমস্তক।

সকালে পার্কে গিয়েও অবয়ব নির্মাণ বিদ্যার প্রয়োগ করলেন ইন্দ্রনাথ। তিন নম্বর রাউন্ডের মাথায় উদ্যানের চাতাল থেকে পুরুষকণ্ঠের গান ভেসে এল—আমায় ডবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে ...। গান শুনে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ। পাশ দিয়ে দুই বৃদ্ধ উল্টো দিকে চলে গেলেন। বাম দিকের লাঠিধারী বৃদ্ধটি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, আবার কী রগড় শুরু হল?

ইন্দ্রনাথ চোখ বুজলেন। অন্ধকারে তারার ফুলকি। আস্তে-ধীরে ভেসে উঠল বৃদ্ধটির অবয়ব। গৌরবর্ণ বৃদ্ধটি সল্টলেকে আসবার আগে নিশ্চয়ই বাগবাজারে থাকতেন। আর তাঁর গলায় নিশ্চিত দু'টি লাল রঙের তিল আছে।

পরের রাউন্ডে দুই বৃদ্ধের মুখোমুখি হতেই ইন্দ্রনাথের শরীর কেঁপে উঠল। সত্যিই লাঠিধারী বৃদ্ধটির গলদেশে লাল তিল আছে। এবং দুটি-ই রয়েছে! বাগবাজারে থাকতেন কি না, জিজ্ঞেস করা হল না বৃদ্ধটিকে।

পার্কের বেঞ্চে পা তুলে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মুখোমুখি বসে তরুণ-তরুণী। ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ। মেয়েটি উনিশ-কুড়ি হবে। পাশ দিয়ে যেতে ইন্দ্রনাথের কানে এল ছেলেটি ধরা গলায় বলছে, আমায় যে যেতেই হবে সোনা। ইন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন। মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। ঈষৎ খয়েরি চুল, পাকা, কাজুবাদাম রঙের মেয়েটির চোখ ভরে গেছে জলে। পরের রাউন্ডে ইন্দ্রনাথ দেখলেন মেয়েটির চোখ লাল হয়ে গেছে।

ইন্দ্রনাথ যথারীতি অধীত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অফিসেও। তাঁর কাজে সাফল্য এসেছে। সুনাম বেড়েছে। ব্রাঞ্চের ব্যবসা বেড়েছে বহু গুণ। সাফল্যের পাশাপাশি বেড়েছে শত্রুসংখ্যাও। অন্যান্য ব্রাঞ্চের ম্যানেজাররা অপপ্রচার চালায়ে তাঁর নামে। বিরোধীদের অপপ্রচারে মোটেই বিচলিত নন ইন্দ্রনাথ। সংলাপ শুনে অবয়ব নির্মাণের নেশায় তিনি উপেক্ষা করেন শত্রুপক্ষকে।

শুক্রবার বিকেলে টয়লেটের হ্যান্ড ড্রায়ারে ভেজা হাত শুকোচ্ছিলেন ইন্দ্রনাথ। ভেজা হাতে গরম হাওয়ার প্রবাহ খুবই আরামদায়ক। চোখ বুজে এসেছিল তাঁর। হঠাৎ পার্টিশনের ওপার থেকে ভেসে এল চাপা কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ হয়ে যাবে ... একটু রবীন্দ্রসংগীত, শোনাতে হবে। এর পরে মৃদু খুকখুক হাসি।

কেউ মোবাইলে কথা বলছে? কার গলা বুঝতে পারেন না ইন্দ্রনাথ। বলার ধরনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু সুরছুট লাগে।

নিজের সঙ্গে কথা বলেন ইন্দ্রনাথ।

সমুদ্রজ্ঞ ইন্দ্রনাথ বলে, বলার সঙ্গে তো গলা মিলল না বাপু। সমুদ্রজ্ঞ নির্দেশ দেয়, বলো তো, কী সুন্দর গোলাপ। বলো, বলো ...

ইন্দ্রনাথ মনে মনে উচ্চারণ করেন কথা ক'টি।

— এ বার বলো, মেয়েটি সুন্দর কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভাল নয়।

ইন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেন।

সমুদ্রজ্ঞ বলে, কী, এই দুই সুন্দর গলার আওয়াজ একই জায়গা থেকে বেরুল?

ইন্দ্রনাথ বুঝে যান ব্যাপারটা। দ্বিতীয় বাক্যের 'সুন্দর'টিকে যদি গোলাপের 'সুন্দর' বলায় প্রয়োগ করা যায়, যে রকম বিষম ঘটনা ঘটবে তেমনই কিম্ভূত কাণ্ড ঘটিয়েছেন ওই চাপা কণ্ঠস্বরের মালিক। রবীন্দ্রসংগীত শোনাবার কথা তো মানুষ এমন ভাবে বলে না?

বলার সঙ্গে তো গলা মিলল না বাপু! কথাটি ইন্দ্রনাথের মনে একেবরে চৌচাপটে ধরে যায়। বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত রাস্তাটা 'একটু রবীন্দ্রসংগীত শোনাতে হবে' নিয়ে নাড়াচাড়া করেন ইন্দ্রনাথ। নানা পর্দায় নানা স্বরে বলে যান ওই কথাটি। চোখ বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। অন্ধকারে আলোর ফুলকি। অবয়ব ফুটে ওঠে। লোকটির ললাট শিরাবহুল— শিরাসন্তত ললাট। এরা অর্ধমরুচির লোক, গোপনে অধর্ম করে থাকে। লোকটির ভুরুর মাঝখানটা বাঁকা অথবা নিচু। লোকটির মাথার গড়ন কী রকম? এর মাথা গোলাকৃতি নয়, ছত্রাকারও নয়। ঘটমূর্ধা, নিম্ন, বহুনিম্ন শ্রেণিতেও পড়বে না লোকটির মস্তক। তা হলে? লোকটির নিশ্চিত দ্বিমস্তক। ওর কপালের উপরে আর শিখা-স্থানের নীচে একটি 'থাক' আছে। এদের অন্তর বিষাক্ত সর্পবৎ। কিন্তু এরা কোনও মতেই ধনবান হতে পারে না। লোকটির বাম কানের তলায় আঁচিল আছে।

শনিবার নিয়মমত অফিসে যান ইন্দ্রনাথ। বারোটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে। দ্রুত কাজ সেরে ফেলতে হয়। রাম অবতার এসে একগাদা ভাউচার দিয়ে যায়। কলম খুলে ইন্দ্রনাথ সই করে যান।

— মজুমদার সাহেব এই চেকটা একটু ...

— ক্লিয়ার ব্যালেন্স কত?

— সত্তর হাজার।

— ক্লিয়ারিং-এ আছে কত টাকা?

— তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার স্যর।

— পার্টি কত তুলতে চায় এখন?

— স্যর, আড়াই লাখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— পাস্ট রেকর্ডস কেমন?

— ভাল স্যর।

ইন্দ্রনাথ মাথা তোলার আগেই বড়বাবু বলেন, স্যর রাজেশ্বরী দত্তের গলায় আপনি 'দিন পরে যায় দিন' শুনেছেন?

মাথা তোলেন ইন্দ্রনাথ। বড়বাবুর দিকে তাকান।

— হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের গান, এই গান রাজেশ্বরী দত্তের গলায় অসাধারণ লাগে।

চেক 'পাস' করাবার ভূমিকা হিসাবে বড়বাবু আজ রবীন্দ্রসংগীতের কথা বলছেন!

ইন্দ্রনাথ ভালো ভেবে দেখে নেন বড়বাবুকে। শিরাবহুল ললাট। মধ্য-বিনত ভ্রূদেশ। দ্বিমস্তক। এবং বড়বাবুর বাঁ কানের তলায় চোয়ালের প্রান্তে একটি বাদামি আঁচিল। সব মিলে যায়।

কলম বন্ধ করেন ইন্দ্রনাথ। বুক পকেটে কলমটিকে রেখে ইন্দ্রনাথ হাসেন। বুঝতে পারেন না তিনি কার মুখ ধার করবেন! বিনয় কোঙারের করালবদন? না বুদ্ধদেবের ম্লানমুখে অহংকারের লুকোচুরি? নাকি সনিয়া গাঁধীর ভাবলেশহীন ট্রেসিং পেপার মোড়া মুখ? তিনি হাসেন। বড় অনিশ্চিত সেই হাসি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ আগস্ট ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিরাগত

অনিতা অগ্নিহোত্রী

আর সয় না।

কত আর নিতে পারে মানুষ!

পূষণের মনের ভিতর যে টানাপোড়েন চলছে, তা বুঝি আর তাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না।

অথচ নিশ্চিন্তে থাকবে বলেই পূষণ সাদাসিধে সরকারী চাকরি করে গোড়া থেকেই, সব সময়ের লেখক হয়ে অনাহারের কাদাজলে কোমর ডোবা হয়ে থাকার চেষ্টা করেনি, যদিও তাতে স্বাধীন থাকার সুযোগ ছিল একশো ভাগ। আর কে না জানে, স্বাধীন মানুষদের টানাপোড়েন সইবার দায় থাকে না। পূষণ একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবি। আর দশজন বুদ্ধিজীবির মতন বামপন্থী আবেগের উত্তাপে যৌবন থেকে মাঝ বয়সের দিকে চলেছে। চাকরি করে। এমন বড় কিছু নয়। দায়িত্বের বোঝা বলে বেড়াবার মতো না। কিন্তু লেখালেখির সময় যথেষ্ট পায়। সভাসমিতি, সাহিত্যের আড্ডায় যেতে পারে। আর মুক্ত চিন্তার পরিবেশে বহাল তবিয়তে থেকে কমন সিভিল শেড অথবা বাঙালির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যে কোন বিষয় নিয়ে দশ মিনিট একটানা কথা বলে যেতে পারে। লেখকও তো বটে সে, গদ্য আর পদ্য—দুটোরই। এইভাবেই গত দেড় দশক ধরে গদ্য পদ্য লিখেছে পূষণ। নর্মদা আন্দোলন থেকে, বামিয়ান, ইরাক থেকে ইকুয়েডর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে তিয়েন আন মেন স্কোয়ার। এবার সে বিচ্ছিরিভাবে আটকে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। অথচ দীর্ঘদিন পিঁজরায় থেকে, রৌদ্রের অভাবে, তার হাড়গুলি জীর্ণ, ফুসফুস কয়কাশের আতঙ্কে কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে, চিন্তাভাবনার হাড়ে হাড়ে অতি অল্প বয়েসেই অস্টিও আর্থারইটিসের লক্ষণ।

সকালে উঠে চায়ের সঙ্গে পাতাজোড়া রঙিন ছবি পেয়েছে। খাসজমিতে নিখুঁত শৃঙ্খলার সঙ্গে বড় বড় খুঁটি পুঁতছে গাদা গাদা লোক। এরা পুলিশও নয়, জমির মালিক নয়, আবার শিল্পপতিদের ভৃত্যস্থানীয়ও না। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, শাল কি আমের লম্বা লম্বা খুঁটি। এত গাছ কাটা পড়েছে কি রাতারাতি? নিচে লেখা, 'শিল্পায়নের পথে আর এক কদম।'

নিচে ভাঙাচোরা বিধানসভার উল্টোনো টেবিলপত্র দেখতে পিলপিল করে মানুষ ঢুকছে। বন্‌ধ-এর দিন চিড়িয়াখানার চেয়ে বেশি ভিড় বিধানসভায়। মানে কি?

জন্তুদের চেয়ে মানুষকে বেশি টানছে বিরোধীদের তাণ্ডব। পাশে সংখ্যা দেওয়া আছে, কোথায় কত ভিড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পর্যন্ত কোনও মতে নিয়েছিল পূষণ।

স্নান সেরে বেরিয়ে যখন সে দেখল বিছানার উপর রাখা কলেজ স্ট্রিটে পরে যাবে বলে সদ্য ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবিপাজামার উপর হাঁটু দিয়ে বসে স্প্রিং এর বাঁদরের মতো লাফাচ্ছে তার সাত বছরের মেয়ে রিয়া অথবা শ্রুতকীর্তি—

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, খুব পেটাচ্ছে, খুব ... টিভি স্ক্রীন জুড়ে ধোঁওয়া, দৌড়, ইতস্তত ফাঁকা যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে ক্যামেরা সরে মানুষের বাড়িতে, হ্যাঁ খুব পেটাচ্ছেই বটে, ছাদের উপর পেড়ে ফেলে, ঘরে ঢুকে মেয়েদের রেয়াৎ করছে না, জাস্ট মারছে, হাততালি দেবার মতনই নিঃশব্দ নিখুঁত অপারেশন, চব্বিশ ঘন্টা জোড়া নিউজ চ্যানেলের হিন্দি তাকে এক লহমার জন্য হকচকিয়ে দিলেও পূষণ বুঝতে পেরে যায় এটা পশ্চিমবঙ্গ ... জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে সংখ্যাতীত সশস্ত্র পুলিশ। আর দেব না, আর দেব না ধান, মোদের প্রাণ গো—এর জায়গায় টাটাদের জন্য খুঁটি পোতা ... তবু এটা বাংলাই। পূষণ আর সইতে না পেরে মেয়েকে ভুরু কুঁচকে বলে, এটা কি হচ্ছে মামণি, জামাকাপড় ধামসাচ্ছো, চেয়ারে নেমে বসো...

মেয়ে হাঁটুর নীচ থেকে দোমড়ানো পাজামা বার করে দিলে। কোমরে তোয়ালে জড়ানো পূষণ হাত দিয়ে টেনে সমান করার চেষ্টা করে অত্যাচারের চিহ্নগুলো, তার মুখ ঈষৎ সাদা, যেন রিয়া তারই বুকে হাঁটু দিয়ে লাফাচ্ছিল এতক্ষণ। তার বুকই হয়তো নয়, কিন্তু তারই মেয়ে তো, ভাবতে ভাবতে আরও ধক্কে পড়ে পূষণ, সত্যিই কিছু নিষ্ঠুরতা এইভাবে জিনবাহিত হয়ে ওর মেয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে কি? তা নিশ্চয়ই নয়। পাশের ফ্ল্যাটের শুভাশিসের স্ত্রীর দিকের দু'জন আত্মীয় ওই দিকের জমির মৌলিক মালিকানার খাতিরে প্রচুর ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। ও বাড়ির আনন্দফূর্তির ভিতর বড়দের বলা কোনও চোখা কথা হয়তো রিয়ার কানে ঢুকেছে। কতগুলো লোক কারখানা তৈরি আটকাচ্ছে, বিনা মতলব ঝামেলা করছে। বাইরের লোকেদের ডেকে ঘোঁট পাকাচ্ছে—পুলিশ তাদের মারবে না তো, কি কোলে বসিয়ে জামাই আদর করবে?

বাবার মুখ দেখে রিয়া বোঝে যে, হাঁটু নয়। আসলে হাততালিটাই তার মুখ্য অপরাধ। কিন্তু কাছে আসে না, বরং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের সাজগোজের জিনিস ঘাঁটতে চলে যায়। এখন সে গালে কম্প্যাক্ট বোলাবে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাবে। অবিকল এক আয়না কোম্পানির অবিনশ্বর বিজ্ঞাপনের কায়দায়।

শনিবারের এই না-শীত না-গরম সুন্দর বিকেলে তার কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বসার অভ্যেস। ওখানেই লেখালিখির বাবুরা আসবেন। বেহালা থেকে অনিমেষ, শ্যামবাজার বরানগর থেকে তীর্থ আর সন্দীপ, হাজরা থেকে অরূপা। টিভি স্ক্রিন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখন তাদের মধ্যেও যে জোরাল বিস্ফোরণের জের চলবে, তাতে সন্দেহ নেই। পূষণের কেবল অসুবিধে হচ্ছে নিজেকে নিয়ে। ঘাড়ের কাছে স্থানীয় সমস্যা এসে পড়ায় বুদ্ধিজীবি হিসেবে তার কি বলা উচিত বা করা দরকার, সে বুঝতে পারছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরূপা একজন নিটোল গৃহবধূ, মস্ত টিপ-কাজল সব কিছু পরা, সুন্দর খোঁপা বাঁধা। অনিমেষ চাকরি বাকরি করে না। হোলটাইমার লেখক, কাজেই অবস্থা ভালো না। জিভেও খুব ধার। ভাগ্যিস সে শিল্প বিভাগে চাকরি করেনা। পূষণ ভাবে, নইলে আজ অনিমেষ ছেঁচে দিত তাকে। আবার এটাও হতে পারে যে, অনিমেষ কিছুই বলল না। কারণ সে শিল্পায়ন চায়। যেহেতু বেকারত্বের জ্বালা তার মজ্জার ভিতর। অনিমেষ একবার বলেছিল, সাধারণ মানুষের জীবনে আসে সমস্যা। আর বুদ্ধিজীবির যেটা হয়, সেটা 'সংকট' গলা একটু সরু করে, সামান্য টেনে 'সংকট' কথাটা উচ্চারণ করেছিল অনিমেষ। সেই সংকটই বোধহয় এসে পড়েছে পূষণের জীবনে এবার।

এমন কত ছোটখাট সংকটের কাঁটা জীবনে গেঁথে যায়, আর তুলেও ফেলতে পারা যায় তাদের। কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, আশেপাশে কে বা কারা, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ব্যক্তির সমস্যা, বা সংকট যাই বল, তা সামাজিক মানুষের চেয়ে অনেক সহজ।

হেলমেট পরা র‍্যাফ দিন মজুরের রোগা বউকে পেটাচ্ছে। ভাগ্যিস দৃশ্যটা টিভি'র পর্দায় ছিলনা। না হলে কী করত পূষণ? বছর দশেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়লে এখনও তার গায়ে কাঁটা দেয়। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘটনাটা কেউ জানে না। তার বউ সখীও না। দক্ষিণ, উড়িষ্যায় বেড়াতে গিয়ে একটু ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল পূষণ। আদিবাসী একমেয়ে একরাশ কাঠকুটোর সঙ্গে কিছু পাতা সহ ডালও কেটে নিয়ে যাবে। মাথায় বিঁড়ে চাপিয়ে বোঝাটি সবে চাপিয়েছে, এমন সময় দু'জন জঙ্গল কর্মীর হাতে পড়ে গেছে। মাথার বোঝা সামলাতে ব্যস্ত মেয়েটির আঁচল নিচে লুটোচ্ছে, এমন অবস্থায় শাড়ির প্রান্ত ধরে টেনে পাকেপাকে খুলে তাকে নগ্ন করতে থাকে একজন। অন্যজন বেদম হাসছে। মেয়েটি, কৃশ, ভীত ও একা—মাথায় বোঝা নিয়ে পাকে পাকে ঘুরছে, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেও ভয় পাচ্ছে, এমনই সময় পূষণ ওখানে। পূষণের গলা কাঠ, কারণ সেও একা, অচেনাজায়গায়, তবু সাহস করে একটু গলা তুলে বলেছিল, এই, কি হচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিন—লোক দুটি একটুও চমকায়নি, বরং অন্যদিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলেছিল, যান যান নিজের কাজে যান, এদিকে দেখতে হবে না।

আতঙ্কিত মেয়েটিকে একা রেখেই সরে পড়েছিল পূষণ, তার দুইহাত থর থর করে কাঁপছিল পকেটের ভিতর।

নিজের মেয়ের সামনে টিভি স্ক্রিনে তাকিয়ে কি দু-এক মুহূর্ত সেই লজ্জা বা অসহায়তা বোধ করেছিল পূষণ। হ্যাঁ, লজ্জা হয়েছিল তার। তারপরেই সে দ্রুত সামলে নেয়। কারণ ওগুলো মার খাওয়া মানুষের চলমান ছবি, সামনের বাড়ির বা গলির বাস্তব দৃশ্য না। এখানে সংকট মোচনের কোনও দায় নেই পূষণের।

সখী। সখী। সখী!

বউকে উঁচু গলায় ডাকে পূষণ। অকারণেই। বিয়ের পর যখন তারা বেশ নতুন নতুন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে ডাকাডাকি করতে ভালো লাগত পূষণের। হাতে কাগজশুদ্ধ সুডোকু আর পেন নিয়ে সখী আসে। সারা সপ্তাহ সেও অফিস করে। তার চলনে শনিবারের আরাম, রবিবারের জন্য আকাঙ্ক্ষা। অথচ রবিবার কেমন যাবে পূষণের কাছে তা স্পষ্ট নয়।

খুব খিদে পেয়েছে, চল না খেয়ে নিই।

সখী হেসে বলে, আমার এখনও স্নান হয়নি।

একদিন খেয়ে স্নান করলে কিছু হয় না। রিয়াকে ডাকো। মেয়েটা বোধহয় আবার শুভাশিসদের ফ্ল্যাটে।

দাঁড়াও, দেখছি।

থাক, থাক, পূষণ হাত তুলে বিরক্তি জানায়।

জমির আদি মালিকদের আত্মীয়ের খপ্পরে তার মেয়ের সমাজবোধ—এ খবর তাকে মোটেই প্রীত করে না।

এখন ভাত খেতে বসলে অনেক দ্বন্দ্বের জট ছাড়ানো যেত। গরম ভাতের ধোঁয়া, মচমচে বেসনে ডোবান উচ্ছে, মাছের ঝোল। নতুন মটরশুঁটি দিয়ে দ্রবীভূত করে দেওয়া যেত বুদ্ধিজীবির সংকট। তাতে অনেক বাধা।

ঠিক আছে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। তোমরা তৈরি হলে ডেকো। বলে শোবার ঘরে গিয়ে শাল মুড়ি দেয় পূষণ।

পরের দিন সকালের কাগজে তারই প্রতো, অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাত বুদ্ধিজীবিদের মতামত পড়ে পূষণ। তার মত স্বভাবতই জানতে চায়নি কোনও কাগজ। জানতে চাইলে পূষণ বিনা দ্বিধায় নিন্দে করত পুলিশি বর্বরতার। সে তুলনায় কাগজে ছাপা বিবৃতিগুলো খুবই ভীতু আর ধোঁয়াটে...

—শিল্পায়ন কাম্য, তবে বর্বরতা না হওয়াই ভালো।

—শিল্পায়নের জন্য সব কিছু মেনে নেওয়া যায়।

—এখন ব্যস্ত, এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না।

—এসব আমার ভালো লাগেনা, আমাকে জড়াবেন না।

—পুরো ঘটনাটা খতিয়ে দেখে তবেই মতামত দিতে পারি।

খুবই আশ্চর্য, কাগজে যা এসেছে সবই খুব শব্দহীন পরিশীলিত, আর শত ধৌত অবস্থায়। ইরাক যুদ্ধের সময় এইরকম নিঃশব্দ যুদ্ধ সংবাদ পরিবেশনা নিয়ে তারা কত আলোচনা করেছিল। বিদেশী সংবাদমাধ্যমের সেই নিপুণ গলা পাড়ার কাগজও শিখে গেল তাহলে।

স্টীল ছবিতে কেবল গ্রামের রাস্তায় পুলিশ টহলের দৃশ্য। আর অদৃশ্য প্রতিপক্ষের দিকে তাক করে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার ফটো। অর্থাৎ পুলিশের পিছনে ফোটোগ্রাফার। গতকাল খাস জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়েছিল, আজ এত হাঙ্গামা সত্ত্বেও আরও দু'কিলোমিটার। এইভাবে সাতদিনে সবজমি ঘেরা হয়ে যাবে। পুলিশের ডি আই জি বলছেন, একটু অসুবিধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল—ত। বন্‌ধের জন্য। আমরা যথেষ্ট রি ইন ফোর্সমেন্ট আনিয়ে নিয়েছি। কাগজ জুড়ে কেবল যথাযথ পুলিশি ব্যবস্থার তৃপ্ত বর্ণনা।

গতকালের টিভিতে দেখা দৃশ্যগুলোর সঙ্গে খবর কাগজের স্থিতধী শান্ততা মেলাবার চেষ্টা করে পূষণ। ও বুঝতে পারে, একটা গণ্ডগোল হচ্ছেই। সেটা বোধহয় দেখার দৃষ্টিকোণের জন্য। পুরোটাই ক্যামেরার কারিকুরি। প্রবীণ বামপন্থী নেতা বিরোধীদের বলেছেন, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পুলিশ তো হাতে পেন বা ক্যামেরা নিয়ে কাজ করে না। তাদের কাজ নিরাপত্তা দেওয়া।

একটু পরে অনিমেষ এসে হাজির হয় বাড়িতে। দু'দিনের না কামানো কাঁচা-পাকা দাঁড়ি। মাথার চুলে তেল নেই। সামনের দিকে টাক পড়েছে।

বলে, কাল এলি না। তীর্থরা এসেছিল। তোর জন্য অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম আমরা। কথায় কথায় ফোন করতে খেয়াল হয়নি।

অরূপা?

মেয়েটা গেছে ওখানে। এত ইমোশনাল আর জেদী। নাকি ওর চেনাজানা নকশালরাও ছিল।

অ্যারেস্ট হয়েছে?

অ্যারেস্ট তো কাউকে করছে না ওরা। সব ভাঁটিক আর ফেরৎ। এত বড় অপারেশন হল দেখলি না, ব্লাডলেস! একটা ফায়ারিং হয়েছে। কেউ মরল?

অনিমেষ এই নিঃশব্দ অভিযানের সমর্থক না বিরোধী পূষণ ঠিক বুঝতে পারে না। দীর্ঘদিনের বেকারত্ব, যা এখন এক নিদিষ্ট অভ্যাস, হাত খরচের জন্য বউ-এর উপর দীর্ঘ নির্ভরশীলতা ওর ভিতরে কথাগুলোকে জমিয়ে পাথরই করে দিয়েছে।

এরা পশ্চিমবঙ্গে কিছু হতে দেবে না বুঝলি। এই যে সস্তায় গাড়ি—এই নিয়ে দুই গাড়ি কোম্পানির লড়াই। বাইরের লোকজন গিয়ে ঢুকেছে ফায়দা তুলতে। আমরা তাহলে কোনওদিন শিল্প গড়ব না, অ্যাঁ! এরা যদি ভয় পেয়ে পালায়! আর কেউ কিন্তু কোনওদিন আসবে না পশ্চিমবঙ্গে।

পূষণ বোঝে চাকরিজীবি সম্পন্ন বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে সে এখন অনিমেষের টার্গেট। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কোন পন্থাটা নেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বলা যায় কি, না রে অনিমেষ, আমিও তোর মতন ভূমিহীন, প্রায় সর্বহারা একজন। অথবা লড়াই এর গোড়ার বৃত্তান্তেও ফিরে যাওয়া যায়—একেবারে বর্গা অপারেশনের সময়কাল থেকে—।

এত বেলায় এসেছে অনিমেষ, ওকে খেতে বললে হয়তো থেকে যাবে। খেয়েছেও এ বাড়িতে আগে অনেকবার। আজ আর ঠিক সাহস হয় না পূষণের। মাছের ঝোলের সঙ্গে উচ্ছেদ বিষয়ক যুক্তিতর্ক তেমন জমে না। ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে উঠলে সামলাবে কে? সখীকে চা এর সঙ্গে টিড়ের পোলাও বলে এসে কিছুটা দায়িত্বশীল মনে হয় নিজেকে। তাতে অনিমেষ খালি পেটে ফেরৎ যাবে না। পূষণের দুপুরের খাওয়াটাও শান্তিপূর্ণ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোচ্ছব

অনিন্দিতা গোস্বামী

অজয়ের দুহাত ধরে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এসে লতা বলল—দেখো কী সুন্দর। অজয় তখন সবে অফিস থেকে ফিরেছে, পোশাকও বদলায়নি। উর্দি পরে বসে বসেই একটু টিভি দেখছিল। হাবিলদার থেকে সদ্য এস.আই.এ পদোন্নতি পাওয়া অজয়ের অফিস থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই পোশাক বদলাতে ইচ্ছে করে না আজকাল। খাঁকি রঙের ফুলপ্যান্ট, খাঁকি শার্ট, কাঁধের ওপর জ্বলজ্বল করছে রুপোলী তারা। লতার সামনে এ পোশাক পরে কেমন একটা আত্মশ্লাঘা অনুভব করে সে। লতার টানাটানিতে অজয় বারান্দায় এসে দেখলো চারিদিকে চকচকে রোদ, অথচ ফুই ফুই করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। লতা বলল—'ইল্‌শেগুড়ি'। অজয়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে উঠোনে নামিয়ে এনে বলল—এই বৃষ্টিতে ভিজতে না দারুন মজা। অজয় আঙুলের টোকাতে জামা থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল 'বৃষ্টির জল জামায় লাগলে তিলে পড়ে যায়, দিল্লি তো আমার উর্দিটা নষ্ট করে।' লতার অলকদামে তখন চূর্ণ চূর্ণ হিরের কণা, আঁখি পল্লবে ঘোর, বলল 'সাধে কি আর লোকে বলে বুড়ো বর মানে জীবনই বৃথা'। অজয় লতার গাল টিপে দিয়ে বলল 'হুঁ তাই বুঝি, আজ রাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি কতটা বুড়ো।'

গ্যাস জ্বেলে চা বসাল লতা, বলল—পাঁপড় ভাজছি, খাবে তো? অজয় বলল 'আজ মনে হচ্ছে মহারানীর মুড খুব ভালো'। লতা জলে দু-চামচ চিনি আর এক চামচ চা দিয়ে সস্‌প্যানের মুখে ঢাকা চাপিয়ে বলল, আচ্ছা এই বৃষ্টির নাম ইল্‌শেগুড়ি কেন গো, ইলিশ মাছ খুব ভালো পাওয়া যায় বুঝি এখন?

কি জানি, হতে হয়তো, তোমার খেতে ইচ্ছে হয়েছে তো বল কাল নিয়ে আসব। আঁচলে সস্‌প্যানের হাতল চেপে ধরে চা ছাঁকতে ছাঁকতে লতা বলল—খুব দাম না?

দাম তো কি? তোমার বর এখন সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, বাজারে গিয়ে একটা মাছ চাইলে লোকে পাঁচটা মাছ দেবে।

উর্দি ছেড়ে অজয় লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়েছে এখন। দুবার উর্দিটা খুব জোরে জোরে ঝাড়া দিয়েও শান্তি হয়নি তার। ইস্ত্রি গরম করে চালাতে চালাতে বলল—তোমার ওই ইল্‌শেগুড়ি, না কি বৃষ্টি দিলো আমার ড্রেসটাকে শেষ করে। এবার অত্যন্ত রেগে গিয়ে লতা বলল—ঘাট হয়েছে আমার তোমাকে বৃষ্টি দেখানো। এবার উর্দি নিয়ে তোমার আদিখ্যেতা বন্ধ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজয় খুব গম্ভীর হয়ে বলল—যে পোশাক তোমার অন্ন জোগাচ্ছে তাকে অবহেলা করো না লতা।

পরদিন সকালে অজয় বাজার থেকে একটা মস্ত বড় দেড় কেজির ইলিশ এনে ফেলল লতার সামনে।

বলল—কী খুশি তো?

লতা লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল—এ বাবা এত বড় মাছ, কারো গাঁট কাটোনি তো?

অজয় বললো—এই মাছ দেখেই চমকাচ্ছো, সে যদি বল আমি দেখেছি ইলিশ। মাঠ ভর্তি ইলিশ। সে কী আশ্চর্য সকাল, তুমি হলে বলতে ইলিশ ভাঙা রোদ।

ভ্রু যুগল ধনুকের মতো বাঁকিয়ে লতা বলল—সে কি রকম?

অজয় বলল—সে এক গল্প।

লতা বলল—রক্ষে কর। তোমার গল্প মানে তো চুরি, রাহাজানি, খুন, জখম। ও আমার শুনতে মোটেই ভালো লাগে না।

দু'বছর হয়ে গেল ওদের বিয়ে হয়েছে, এখনও কোনও সন্তান আসেনি ওদের। ডাক্তার বলেছেন কোনও অসুবিধা নেই। কারও কারও একটু দেরি হয়। এখনও চিন্তা করা সময় হয়নি। লতার কেমন ভয় হয়। মনে হয় কোন নিরাপরাধীকে কোন দিন বা অজয় অপরাধী বানিয়ে আসবে। সেই পাপ এসে লাগবে ওদের সংসারে।

অজয় বলল—এ আর ছুটকো ছাটকা চুরি নয়। একেবারে ট্রেন ডাকাতি। আর এ আমার চাকরি জীবনের ঘটনাও নয়, বাল্যকালের ঘটনা।

মাছ কাটতে পারে না লতা, অজয়ই বসেছে মাছ কাটতে। বলল—কি মোটা তেল দেখো। খুব ভালো দিয়েছে মাছটা।

লতা বলল হ্যাঁ তাতো দিয়েছে, কিন্তু কি যেন একটা গাঁজাখুরি গল্প বলছিলে—মাঠভর্তি মাছ, কই বললে না তো গল্পটা।

মাছ ধুয়ে মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে অজয় বলল নাও মহারানি, এত ভালো মাছ, বেগুন কেটে শুধু কাঁচালঙ্কা আর কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে পাতলা ঝোল কর। তবে মাছ দেখেছিলাম সেদিন, জীবনের স্বাদ পূর্ণ হয়ে গেছিল।

লতা বলল—সেই থেকে ভনিতাই তো করে যাচ্ছো। গল্প তো আর তোমার শুরু হয়না। অজয় টুল নিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজার সামনে বসল, বলল—গল্প কী আর শুধু শুধু বলা যায় একটু চা না পেলে। চা চাপালো লতা, বলল—এতো ভালো মাছ তবু কেমন যেন আঁশটে গন্ধ লাগছে কেন বলত?

অজয় বলল—বা রে ইলিশ মাছে আঁশটে গন্ধ উঠবে না তো কি, পোনা মাছে উঠবে?

একটা মাছভাজা প্লেটে করে অজয়েরসামনে ধরে লতা বলল—নাও চাও দিলাম টাও দিলাম। এবার শুরু কর।

অজয় মাছে একটা কামড় বসিয়ে বলতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। মাত্র কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে অজয়রা এসেছে ভারতে। অনেক ধরাধরি করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের কল্যাণে এক টুকরো জমি মিলেছে বারোহাত কলোনির পূর্ব সীমানায়।

তিন ভাই নিয়ে মা-বাবার সংসার তখন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। চোখের জল ছিল নিত্যসঙ্গী। অর্ধাহার, অনাহারে থাকা এমনই স্বাভাবিক ছিল, যে তাই নিয়ে আর অভিযোগ ছিল না কারোর। তবু যে তারা লড়াই করার শক্তি হারিয়ে ফেলেনি তার কারণ ছিল চারপাশের বস্তিবাড়িগুলোর সংগ্রাম।

তবে মা ভয় পেত খুব। যখন দেখত বাড়ির পিছনে বসে কেউ কেউ বারুদ, নারকোল দড়ি আর সব নানানরকম জিনিস দিয়ে বোমা বানাচ্ছে কিংবা রাতের অন্ধকারে মোটা লোহার শিকল হাতে জড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কোন অজানা ঠিকানায়। তিন ভাইকে বুকে চেপে ধরে মা খুব জোরে জোরে আদর্শের কথা শুনাতো। বলত—চুরি করা মহাপাপ। কারোর ওপরে হিংসা করো না বাবা। কারোর বেশি আছে। ওরা ওদের ভাগ্যে পেয়েছে, কারোর নেই তাও তাদের ভাগ্যে। অন্যায় দেখলে পুলিশ ডাকবে, নিজে কখনও দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়াবে না।

তাও কি শেষ রক্ষা হল? অজয়ের দাদা বিজয় জড়িয়ে গেল ওই সঙ্গেই। বোমা তৈরিতে সে হয়ে উঠল পাকা ওস্তাদ! স্কুল পালিয়ে সারা দুপুর বিড়ি ফুঁকে কাটিয়ে দিত গাছের তলায় বসে। কখনও মদের গন্ধও নাকে পেত মা'র। অবরুদ্ধ কান্নার বেগ আঁচলে চেপে ভাত বেড়ে দিত মা। বিজয় অতি উৎসাহে বিজয়ী বীরের মতো গল্প করত ভাইদের শালা, আজ একটা আদলা ইট ছুঁড়ে দিয়েছি একটা ট্যাক্সির কাচ ফাটিয়ে। মিঞা বিবি গিয়েছিল হলে। এই ফাঁকে বুঝলি। উঃ গাড়ি চড়বেন। আমরা না খেতে পেয়ে মরছি, ওনারা ফূর্তি মারাচ্ছেন। অজয় মাকে অনুসরণ করে বলত—'ওরা নিজের পরিশ্রমে করেছে দাদা, ওদের ওপর হিংসা কর কেন? বরং তুমিও চেষ্টা কর না এদের মতো হতে।'

বিজয় রেগে যেত। বলত—'চুপ কর, মার মতো কথা বলিস না, বাবা কি পরিশ্রম করে না? আমরা ভিটে মাটি ছেড়ে এসেছি, ওরা কেউ আমাদের কিছু দেবে না, সব কেড়ে নিতে হবে।'

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, টানা বৃষ্টি নেমেছে দশ বারো দিন ধরে। থামার আর নামই নেই। সূর্যের মুখ যে শেষ কবে কে দেখেছে, তা আর মনে করতে পারছে না কেউ। রেডিওতে খবর পড়ছে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমুক বাঁধের অবস্থা ভালো না, তমুক নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। উৎকণ্ঠায় ঘুম আসছে না কারোর। প্লাবিত হচ্ছে একের পর এক গ্রাম। খবর এসেছে জল ঢুকে পড়েছে পিকনিক গার্ডেন পর্যন্ত। তবু মানুষ ঘর ছাড়ছে না। আশা, যদি আর জল না বাড়ে, যদি বন্ধ হয় বৃষ্টি। পোঁটলায় যেটুকু বাঁধাছাঁদা করা সম্ভব বাঁধাছাঁদা করে চুপ করে বসে আছে সবাই বিপদ সঙ্কেতের অপেক্ষায়।

শেষ পর্যন্ত ঢুকেই পড়ল জল কলোনির রাস্তায়। দেখতে দেখতে উঠোনের জল পায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতা ছেড়ে হাঁটু, হাঁটু ছেড়ে কোমর—দৌড়, দৌড়, দৌড়। পাড়ার মাতব্বররা জোগাড়যন্ত্র কিছু করেই রেখেছিল। রেললাইনের উঁচু ধার ঘেঁষে রেলগেট থেকে সাহেব বাগান পর্যন্ত খটাখট্ খটাখট পড়ে গেল তাঁবু। চারিদিকে শুধু জল আর জল। সাদা হয়ে আছে মাঠঘাট। কলার ভেলায় চেপে সারতে যেতে হচ্ছে প্রাতঃকৃত্য। জলের ঘূর্ণিতে ভেসে বেড়াচ্ছে শহরের বর্জ্যপদার্থ।

ত্রাণ আর আসে না। দু-একদিন হেলিকপ্টার থেকে দু-চারটে চিঁড়ে মুড়ির প্যাকেট এসে পড়ছে লাইনের ওপরে, কিন্তু তা নিয়ে শত লোকের এমনই কাড়াকাড়ি যে তার অর্ধেকই ফেটে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ঘরের ভাঁড়ারও শূন্য হয়েছে সবার। আসেপাশের টিউবওয়েলগুলো পর্যন্ত গেছে ডুবে। খিদে তেষ্টায় দিশাহারা অবস্থা তখন মানুষের। গত রাত থেকে পিত্তি বমি করছে অজয়। বাবার কাপড়ের দোকানের সামনে একহাঁটু জল। দোকান বন্ধ করে একসপ্তাহ হল মালিক চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। গত মাসের মাইনে পর্যন্ত দিয়ে যায়নি হাতে।

বস্তিতে বেশিরভাগই জনমজুর, মাঠেঘাটে জল উঠে যাওয়ায় কাজ নেই কারোর। বস্তিতে দুই মস্তান কালু আর বঙ্কা। বঙ্কা সবাইকে ডেকে বলেছে, দুধের শিশুগুলো চিল্লাচ্ছে আর চুপ করে থাকা যায় না। কাল সকালের মধ্যে আমি সবার নুন-ভাতের ব্যবস্থা করব। রাতের অন্ধকারে লোহার শিকল শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেল কালু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। বিজয়ও গেল ওদের সঙ্গে।

বঙ্কার মান যায় না। কালু যদি সবার পাতে নুন-ভাত তুলে দেয়, বঙ্কা তবে কী করবে? বসে বসে আঙুল চুষবে। ঘট্ ঘটাং ঘট্ ভোররাতে পার হয় মালগাড়ি। বারোহাত কলোনীর বঙ্কা মেসিন বার করে ধরল কেবিনম্যানের মাথায়। কী যায়? থরথর করে কাঁপছে কেবিনম্যান। বলল,—আমি জানি না গার্ডসাহেব জানেন। বঙ্কা বলল—দাঁড় করা, শিগগির দাঁড় করা গাড়ি। লাল পতাকা উড়িয়ে কেবিনম্যান দাঁড় করাল গাড়ি। জানা গেল ভাণ্ডার বোঝাই পদ্মার ইলিশে।

উফ্ও! খুশিতে লাফ দিয়ে উঠল বঙ্কা। এমন হয়। মাছভাতের স্বপ্নে চক্‌চক্ করে উঠল তার সাঙ্গপাঙ্গদের চোখ। রেলগেট থেকে সাহেববাগান ক্ষুধার্ত মুখে লক্‌লক্ করে উঠল অনাস্বাদিত ঝোল। উত্তেজনায় ভোর হবার আগেই আঁচ পড়ে গেল তাঁবুতে তাঁবুতে। গরমভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল পরিপাটি ভুলে যাওয়া সুখস্বপ্নের মতো আবিষ্ট করল বাতাস। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল ক্ষুধা।

পিঠে চালের বস্তা নিয়ে সার সার ঢুকছিল কালুর সাঙ্গপাঙ্গ। এলাকায় ঢুকতেই খবর পেল ইলিশ আসছে, পদ্মার ইলিশ। কোনও দিন পাতে পড়েনি সেই অসাধারণ বস্তু। সমস্ত পুরনো ঝগড়া ভুলে কালু জড়িয়ে ধরল বঙ্কাকে। বলল—ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত খাবোরে বঙ্কা। আমরাও হাত লাগাবো তোর অপারেশনে। লুঠতেই হবে মাল, যা থাকে কপালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইনের ওপর আড়াআড়ি করে গজাল ঠুকে পোঁতা হল মোটা মোটা লোহার শিকল। তার নিচে মানুষের মানুষে ধরাধরি করে অভেদ্য প্রাচীর। ভোর হচ্ছে তখন। আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। বিপদ বুঝে ড্রাইভার ট্রেন রেখে ঝাপ দিল জঙ্গলে।

লাফিয়ে লাফিয়ে ওয়াগনে উঠে পড়ল জনা কুড়ি ছেলেপুলে। শাবল গাঁইতি দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভাঙা হল লোহার দরজা। রেললাইনের ধার জুড়ে তখন লোকে লোকারণ্য। ছেলেরা ট্রেন থেকে ঝুড়ি উপুড় করে ফেলতে লাগল চকচকে রুপোলী ইলিশ আর সাদা বরফ। দেখতে দেখতে মাঝে মাছে ঢেকে গেল উঁচু রেলবাঁধ। চকচকে সাদা গলানো রুপো ঝকঝক করছে রোদে। হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল মেয়ে বউ, বাচ্চা বুড়ো সবাই। ইলিশ ভাঙা রোদ। রেলগেট থেকে সাহেববাগান যেন স্বপ্নপুরী।

ঘোর ভাঙতেই শুরু হয়ে গেল কাড়াকড়ি। দুহাত ভরে পয়সার মতো কেউ কেউ তুলছে আর ফেলছে। কেউ হাত বুলাচ্ছে রুপোর চাদরে। কেউ বঁটি নিয়ে গিয়ে কাটতে বসে গেছে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে কানকো, নাড়ীভুঁড়ি, পটকা। কেউ শামুকখোলের খোঁচায় আঁশ ছড়াচ্ছে দ্রুত। তেল খরচ করা রান্না করার মতো ঘরে কিছু ছিল না অনেক দিন। তাই গেরস্থের ভাণ্ডারে তেল ছিল ধরাই। কড়াইয়ে তেল ঢালা হয়েছে। বন্যার জলেই ধোয়া হচ্ছে মাছ। নাড়ীভুঁড়ির গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এসেছে কাক, চিল। ক্ষুধা তৃপ্তির উল্লাসে আজ কাক, চিল, মানুষ সবাই সমান। সবাই চিল্লাচ্ছে সমান উৎসাহে।

অজয়ের বাবা খুব সংকোচে চেয়ে এনেছেন এক ব্যাগ চাল, মাঠের কোন থেকে তুলে এনেছেন একটা ইলিশ। লজ্জায় মা যেন মরে যাচ্ছেন, অথচ দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলে না দিতে পারলে অজয়টা বাঁচবে না। বিজয় বলল—মা, এখনও তোমার লজ্জা। মা বললেন—লজ্জা নয় এ লুঠের ধনে পেটে সইবে না দেখিস। বিজয় চোখ দিয়ে যেন একরাশ ঘৃণা ছিটকে দিল মাকে, বলল—খেয়ো না তোমরা কেউ এই ভাত, এই মাছ খেয়ো না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক, কখন চিঁড়ের ঝুলি নামে। একদিক দিয়ে ভালো হল, এখন অন্তত আর চিঁড়ের ঠোঙা নিয়ে টানাটানি হবে না। তোমাদের সবার পেট বেশ ভালোভাবে ভরে যাবে। মা বললেন—রাগ করিস কেন বাবা, আমারও কি ভালো লাগছে না। কলোনির সবাই আজ ইলিশ মাছ ভাত খাবে, তবু বড় ভয় হয়।

উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে শিকল। ছোট ছোট ঝুড়িতে বিশ-পঁচিশখানা মাছ উঠিয়ে নিয়ে কেউ কেউ ছুটেছে শহরের দিকে। যা আসে এই দুর্দিনে।

গরমভাত আর টাটকা মাঝের গন্ধে ম ম করছে চারিধার। ইতিমধ্যে কোন কোন বাড়িতে নেমেও গেছে কড়াই। বাচ্চাগুলো পারলে দু'হাতে খায় ভাত। আহা কি স্বাদ। মুখোমুখি খেতে বসেছে কালু আর বঙ্কা। পাড়ার মেয়ে বৌরা সব আদর করে খাওয়াচ্ছে ওদের। ওদের জন্যেই না এতদিন পরে ক্ষুধার অন্ন জুটেছে আজ সবার মুখে। বঙ্কা বলল—বুঝলি কালু আর মস্তানি করব না, মাছের ব্যবসাই শুরু করব ভাবছি। কালু বলল—সেই ভালো। চল দুজনে একসঙ্গে শুরু করি, মাছের মতো নোলা বাঙালির আর কিছুতেই নেই। দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তানের ভাব জমে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছে কলোনির লোক। দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করছে ওদের। দুজনের রেষারেষিতে কি অশান্তিই না ছিল কলোনিতে।

পোঁ পোঁ শব্দে ঢুকল পুলিশের গাড়ি। সে কি ঠ্যাঙানি। লাঠির ঘায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল হাঁড়ি, কড়াই। ভেঙে গেল উনুন, ছিটকে পড়ল মাছ, কাঁটা। পুলিশের খাতায় নাম ওঠা দুই মস্তান বঙ্কা আর কালুকে একসঙ্গে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। দুহাতে দুজনার কলার চেপে ধরে বলল, উঃ মাছ খাওয়া হচ্ছে! চল্ ওঠ। বঙ্কা দু'হাত জোড় করে বলল—স্যার আর কোনও দিন এ জিনিস খেতে পাব না স্যার, খাওয়াটা সেরে নিতে দিন স্যার। কর্ণপাত করলেন না এস আই। সব মেয়ে বউরা জোড় হাত করে বলল—ওদের খেয়ে নিতে দিন স্যার। স্যার বুটের লাথিতে উলটে দিলেন থালা। অজয় দেখল উর্দির কি মাহাত্ম। কালু, বঙ্কার মতো মস্তানও যেন কেঁচো। ইন্সপেক্টর গলা ধাক্কা দিয়ে দুটোকে ধরে উঠিয়ে দিলেন প্রিজন ভ্যানে। যাকে হাতের কাছে পেলেন তাকেই পুরলেন ভ্যানে। বিজয়ও পড়ল ধরা।

একদমে এতগুলো কথা বলে থামল অজয়। বলল—দাও খেতে দাও। লতা বলল, গল্প শুনতে শুনতেই তো বেলা গড়াল, স্নান সেরে আসি।

স্নান সেরে ভিজে চুল পিঠে ফেলে লতা খেতে দিল অজয়কে। বলল—দাদা কবে ছাড়া পেয়েছিল? অজয় বলল—দিনদুয়েক বাদেই। তবে পড়াশোনাটা দাদার আর হল না। এখন তো ও ভালোই আছে বল? রীতিমত ছোটখাট একটা হোটেলের মালিক। ওর দৌলতে ভাইটারও হিল্লে হয়ে গেল। ওই এখন আমার ওর কর্মচারীদের বলে, কোন জিনিস দরকার থাকলে হাত পেতে চেয়ে নিবি কিন্তু চুরি করবি না বা কেড়ে নিবি না। বলে হা হা করে দুলে দুলে হাসতে লাগল অজয়।

ইলিশের বাটিটা পাতের উপর উপুড় করেই গা'টা গুলিয়ে উঠল লতার। মনে হল বঙ্কা যেন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে পাতের সামনে। বলছে জীবনে একবার অন্তত খেতে দিন তৃপ্তি করে। অজয় তার লাঠির আঘাতে শুইয়ে ফেলেছে বঙ্কাকে। বলছে, যা ওঠ্ শালা বস্তির বাচ্চা, আবার পদ্মার ইলিশ খাবে, শখ কত! জানিস এর দাম? পাঁচশো টাকা কিলো!

হর্ হর্ করে বমি করছিল লতা, ইলিশ মাছভাতে ভরে যাচ্ছিল কলতলা। এককণা মাছের টুকরোও আর থাকতে চাইছিল না পেটে। উঠোনের কোণে সপ্তপর্ণী গাছের পাতার ফাঁক থেকে পাখিটা ডাকছিল—খোকা হোক', 'খোকা হোক'।

বর্তমান, ১১ নভেম্বর ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপুরাণ

অসীম চট্টরাজ

সুকদেব ঠিক কত বছর বয়েসে ঝুকুটিয়া গ্রাম ত্যাগ করেছিল, সেটা যেমন কেউ মনে রাখেনি, তেমনই কত বছর বয়েসে, কোন দিন ও আবার গ্রামে ফিরে এল, সে কথাও সকলে ভুলে গিয়েছে। তবে একটা কথা সবাই, না, শুধু সবাই বললে ভুল হবে, দলমত নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে, ও যখন গ্রাম ছাড়ে তখন ঝুকুটিয়া গ্রাম ছিল বর্ধিষ্ণুসম্পন্ন গ্রাম। আর গ্রামে সবে পঞ্চায়েতরাজ শুরু হওয়ায় তখন গ্রামবাসীদের সব বিষয় দলমত নির্বিশেষে একমত না হলেও চলত।

গ্রামের আগে বর্ধিষ্ণুসম্পন্ন এ সব বিশেষণ বসালেই সকলে ধরে নেয়, এটা বোধ হয় কৃষিপ্রধান গ্রাম। কত বছর আগে যে এই গ্রামের লোকেরা কৃষিকাজ ভুলে গিয়েছে, তা কেউ জানে না। তখন গ্রামের আকাশে, ধূসর আকাশে, সরকারি কয়লাখনি আর ইস্পাত কারখানার কাঁচা টাকা—সাদা বা কালো—হরির লুটের খইয়ের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। ধরার জন্যে খুব একটা ছোটাছুটিরও দরকার হত না। পরিবারে এক জন ইস্পাত কারখানা বা খনিতে ঢুকতে পারলে পরিবারের সব সোমত্থ ছেলের চাকরি পাকা। শুধু ঠিক জায়গায় হাতটা পাতলেই হল, টাকা আপনেই ধরা দেবে। সাদা বা কালো।

এক সময় গ্রামে যারা কৃষিশ্রমিক ছিল, হাড়ি-ডোম-সাঁওতাল-বাউরি-বাগদি, তারা হল খনির মালকাটার। আর যারা জমির মালিক তারা হয়েছে লোডিং ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ওয়েল্ডার, ফিটার, ক্লার্ক, পেটে একটু বিদ্যে থাকলে অফিসার পর্যন্ত। যারা একটু চালাকচতুর চাকরির পাশাপাশি তারা শুরু করেছে সাইড বিজনেস। মুদিখানার দোকান থেকে ট্রান্সপোর্ট পর্যন্ত গ্রামে হাইস্কুল আছে, আছে খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, ক্লাব, পাকা দালান বাড়ি। পুরনো ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে টেরাকোটার দোল মন্দির, চাটুজ্জ্যেদের দুর্গা মন্দির। একটা গ্রামকে বর্ধিষ্ণু বলতে আর কী লাগে।

চাকরির সেই ভরভরন্তের যুগে সুকদেব যে কেন গ্রামে ছেড়ে চলে গেল সেটা বেশ রহস্য। কেউ সন্ধানও করেনি সবে কিশোর ছেলেটা কোথায় গেল, বেঁচে আছে না মরে গেল। ও ছোটবেলা থেকেই একটু ছিটেল। আর সবাই তো জানে, বাবা-মাও, ছিটেলরা এমনি করেই এক দিন পালায়। ও দিকে ঈশ্বর যেন পাগলদের সব নিরাপত্তা ছড়িয়ে রেখেছে ফুটপাথ, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শেডে। এদেরকে ঝড়-বৃষ্টি-শীত চোর গুণ্ডা [illegible] কেউ কাব [illegible] পাগল না খেতে পেয়ে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

মরে না, রোগে ভোগে মরে না, মরে না অ্যাক্সিডেন্টে। যুদ্ধ থেকে ফিরে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যায় শোনা গিয়েছে, কিন্তু কোনও পাগল যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছে এমন খবর আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। পাগল ফসলের দাম না পাওয়া কৃষকের বা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমিকের মতো আত্মহত্যা করে না। ওদের নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশী, বাপ মা ভাই বেরাদার, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, একনায়ক, হাইকমান্ড, পলিটব্যুরো, সুপ্রিমো কেউ কিছু না ভাবলেও পাগলেরা দিব্য বেঁচে থাকে। পাগল যেন পাগল হয় শুধু বেঁচে থাকার জন্যে। ওদের বেঁচে থাকার এই রহস্যটা সকলেই জানে। তাই কেউ ওর খোঁজ করেনি। শুধু মনে মনে কামনা করেছে ছিটেল কিশোরটা এক দিন গভীর অধ্যবসায়ে চর্চা করতে করতে পরিণত সফল পাগল হয়ে উঠল, পাগলামির চূড়ান্ত সফলতা এক দিন অর্জন করতে পারবেই ও। প্রতিভা তো ওর আছেই, দরকার শুধু চর্চার।

সুকদেবের ফিরে আসার দিনটাকে কেউ মনে না রাখলেও, বা ফিরে আসার দিনটা আর সব দিনের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় এখন আর খুঁজে পাওয়া না গেলেও, ওর ফিরে আসাটাকে অস্বীকার করতে পারে না গ্রামের লোকেরা। গ্রামের লোকের আতঙ্ক যত বাড়ছে, ততই ও যেন প্রতিদিন একটু একটু করে ওদের জীবনের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে। আকাশের যে ধূসরতায় এক দিন ছিল সমৃদ্ধির হাতছানি, আজ তা যেন আগুন হয়ে গিলতে আসছে গোটা গ্রামটাকে। আগুন আকাশে। আগুন মানুষের মনে। চণ্ডীমণ্ডপের বিচারসভা স্থান বদল করেছে পঞ্চায়েত অফিসের উঠোনে। ঐক্যমত মানে রাজনৈতিক ঐক্যমত, না হলে যাত্রাপালা বা ফুটবল খেলা কোনওটাই ঠিকমতো পরিচালনা করা যায় না। সুখের সময়ে এই গ্রামের মানুষ জানত কয়লা শুধু মাটির উপরে জ্বলে। আজ তারা জেনেছে কয়লা জ্বলছে মাটির নীচেও। এই গ্রাম একটা কড়াই, ওদেরকে ছাই করে দিতে শুধু তপ্ত হওয়ার অপেক্ষায়। আর এই আতঙ্কের দিনে গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা, না কোনও মন্ত্রী-সান্ত্রি প্যাকেজ নয়—সুকদেব। আহা। ওর মতো যদি পেগলে যেতে পারতাম আমাদের ভাবতে হত না কোথায় যাব, কোথায় শোব, কী খাব, কী পরনে দেব। আহা। আমরা যদি সবাই ওর মতো হতাম। ঈশ্বর তো শুধু পাগলদের পাশেই থাকেন।

ঝুকুটিয়া গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। এই কথাটার মধ্যে কোনও সাহিত্য নেই। নেই অলঙ্কারের সৌন্দর্য বা সংকেতের মহিমা। শুধু যেটুকু নতুনত্ব এই ঘটনাটার মধ্যে আছে, সেটা হল এই স্থলভূমি তলিয়ে যাচ্ছে স্থলভূমিতে। ঝুকুটিয়া যেন দাঁড়িয়ে ছিল মাটির তলার আর একটা ঝুকুটিয়াতে। আজ দৃশ্যমান ঝুকুটিয়া সেঁধিয়ে যাচ্ছে সেই অদৃশ্য ঝুকুটিয়ায়। শুরু হল দৃশ্যমানদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। আশেপাশের তিন-চারটে খনি আর সরকারি ইস্পাত কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে সবার আগে অদৃশ্য হল বাতাসে উড়ে যাওয়া সাদা টাকাগুলো। কালো টাকা অবশ্য কয়লা মাফিয়াদের নেতৃত্বে তখনও উড়ছিল বন্ধ হয়ে যাওয়া খনির অবৈধ খননে। গ্রামের হাড়ি-বাগদি মালকাটাররা দুটো পয়সার মুখ দেখছিল। এর পর হঠাৎ এক দিন অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রামের মাঝে সবচেয়ে বড় পুকুরটার জল। একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে দোল মন্দিরে, স্কুলবাড়িতে, পাকা দালানে দেখা গেল ফাটল। মাল কাটাররা ছাড়া সবাই যখন পালানোর ফিকির খুঁজছে, সেই সময় সুকদেব ফিরে এল যেন কোনও পৌরাণিক উপাখ্যানের নায়ক হয়ে। যে দিন সুকদেব এল তার কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারি নোটিস জারি হল, মাইকে প্রচার হল এ গ্রামে ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। গ্রামটা বিপজ্জনক। অবশ্য সেই প্রচারে এটা উল্লেখ করা ছিল না কোথায় যেতে হবে।

সুকদেব আসার পর একটা বড় প্রশ্নে গ্রামটা কয়েক দিন মেতে ছিল। যে এসেছে সে কি সত্যিই সুকদেব? গ্রামের একদল একটা যুক্তি খাড়া করল। ওরা বলল ওকে প্রথম দেখা গিয়েছিল অনেক দিন আগে মৃত ওর বাবা-মায়ের জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে। অনেকে পাল্টা প্রশ্ন তুলল ওকে তো ভোরবেলা কারও না কারও বাড়ির উঠোনে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। অন্য পক্ষ বলল তাতেই তো বোঝা যায় ও এই গ্রামের ছেলে। আর এ গ্রাম থেকে সুকদেব ছাড়া কোনও পাগল তো পালায়নি। বিশ্বাস ও সন্দেহের ঘোর কাটিয়ে এক সময় সকলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেল আগন্তুক সুকদেব ছাড়া কেউ না। এর পরের প্রশ্ন ও খায় কী? ও ভিক্ষা করে না। ওকে প্রকাশ্যে কেউ কোনও দিন কিছু খেতে দেখেনি। তা হলে ও খায় কী? ওকে যে প্রশ্ন করে জানবে, যদি উত্তর না দেয়। আরও বিপদ যদি উত্তর দেয় আর সে উত্তর বোঝা না যায়। পাগলের উত্তর তো কেবল পাগলেই বোঝে। তাই গ্রামের আধপাগলা হেডমাস্টারকে গ্লাস খাওয়ানো হল, যে মানুষটা সরকারি ঘোষণার পর থেকে স্কুলের উঠোনে অবস্থান করছেন। প্রতিজ্ঞা অন্য কোথাও আর একটা এ রকম স্কুল বানিয়ে না দিলে তিনি এখানেই দেহত্যাগ করবেন। প্রথম প্রথম মিডিয়া এটার খবরও করেছিল। তাতে গ্রামের ভদ্রলোকদের সঙ্গে তিনি নিজেও বেশ তেতে ছিলেন। তিনি অবস্থান করছিলেন, আর তাকে ঘিরে থাকা মাস্টারমশাইরা বাইট দিচ্ছিল। দু'দিনে মিডিয়ার মাতন মিটে গেল। তিনি কিন্তু অবস্থান বদল করতে পারলেন না দু'টি সামান্য বস্তুর অভাবে। কয়েক গাছা গাঁদার মালা আর এক গেলাস শরবত, যার জোগান গাঁয়ের লোকেরা কেউ দিল না, এমনকী তার বউও না।

এক দিন পাগলটা স্কুলের দিকে যেতে হেডমাস্টার ওকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। পাগলটাও কেমন বাধ্য ছাত্রের মতো মাস্টারমশাইয়ের পাশে গিয়ে বসল। মাস্টারমশাই ওর মাথায় কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, সুকু! তুই এত দিন কী করতিস রে। সুকু অনেকক্ষণ হেডমাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক। তার পর ব্যাঙের মতো দু'বার থপ থপ করে লাফিয়ে বলল, ছরকাস! ছরকাস!

— ও! তা তুই সার্কাসে কী করতিস! দড়ির খেলা!

প্রবল অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে ও বলল— হিক হিক হুঃ। যেন দড়ির খেলাটা কোনও খেলাই নয়।

— তা হলে কী খেলা?

এ বার সুকু দু'হাতের ভঙ্গিতে গোটা শরীরটা আগুনের শিখার মতো জ্বালিয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করল।

— আগুনের খেলা?

ওর কথা বুঝতে পেরেছে দেখে সুকু আনন্দে খিলখিল করে হেসে যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

— আগুন নিয়ে তুই কী করতিস রে?

— মেনু চার্ট। উল্ল উল্ল গব গব।

— ও ও ও।

গ্রামের লোকেরা যখন হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস করল তিনি বললেন, আমরা যা খাই সুকুও তাই খায়।

নাছোড়বান্দা এক ছাত্র বলল, কিন্তু ওকে তো আমরা কিছু খেতে দেখি না।

— তুই যা খাস সব দেখতে পাস?

— পাই না।

— না, পাস না।

— কী খাবার স্যর, যা খাবার সময় দেখা যায় না?

— ওরে গবেট, আগুন আগুন। আমাকে আর জ্বালাস না। যা তোরা।

মাস্টারমশাইয়ের কথায় কে কী বুঝল কে জানে, তবে সবাই, মানে দলমত নির্বিশেষে সবাই, একমত হল গ্রামে পাগলের সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন হেডমাস্টারের কথার হাতে গরম প্রমাণ পাওয়া গেল। চাটুজ্জ্যেদের দুর্গা এখনও ঐতিহ্য মেনে শালবল্লির মাচানে কুড়ি জন কাহারের কাঁধে চেপে জলে পড়েন বা কৈলাসে ফেরেন। এখন কাহাররা মালকাটার, বছরে এক বার মা দুর্গা. আর সারা বছর কয়লা বওয়া ছাড়া যারা আর কিছু বয় না। সেই ভাসানের সমারোহে সুকুকে দেখা গেল সবার প্রথমে। কোথা থেকে একটা মশাল জোগাড় করেছে। মশালটা কেরোসিনে চুবিয়ে এক বার জ্বালছে, আবার গিলে ফেলছে। আর ঢাকের তালে তালে উদ্দাম নাচতে নাচতে বলছে, ঠাকুর আসতে যতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

সুকদেবের খাওয়া নিয়ে সমস্যা মিটল। এ বার সুকদেবের পরনের কাপড়। সে সমস্যা গ্রামবাসীরা পুরনো কাপড় দিয়ে মিটিয়ে দিত ওর নয়, নিজেদের লজ্জা ঢাকতে। ওর মতো আমার উলঙ্গ থাকতে পারব না, এই লজ্জাটুকুর জন্যেই হয়তো দারিদ্র মোচনে সরকারি প্রজেক্টগুলোর চাইতে এটা ছিল অনেক আন্তরিক, রেশন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত। লজ্জা মানুষের থাকে। সরকার মানুষ নয়, সে মানুষের চেয়ে মহান।

এক দিন রাতে একটা বিকট শব্দ, সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে কিছু একটা ধসে পড়ার আওয়াজে গ্রামের মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। বিকট শব্দটা সকলের চেনা। কয়লা মাফিয়ারা অবৈধ খাদানে কয়লা চুরি করছে। কিন্তু ওই শব্দটা কীসের? বাইরে বেরিয়ে এসে সকলের দেখল শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মূল সড়কটার একটা অংশ মাটির তলায় সেঁধিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে। এ বার সম্পন্নদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গ্রাম ছেড়ে পালানোর। হয়তো এই আতঙ্কে গোটা রাস্তাটাই যদি নেই হয়ে যায় আমরা কোন অদৃশ্য সেতু নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাব।

প্রথম গ্রাম থেকে যে পরিবারটা পাত্তাড়ি গোটালো তাদের কত্তার কয়লা মাফিয়া বলে সুনাম ছিল। সে দিন সুকদেব একটা বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। মালপত্র সব বাঁধা হয়ে গিয়েছে ট্রাকে। দোঠো টাটা সুমোয় পরিবারের লোকেরা অপেক্ষা করছে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে নতুন বাসস্থানের দিকে রওনা দিতে। বাড়ির কত্তা শিব মন্দিরে প্রণামটি সেরে যে গাড়ির দিকে এগোবে, হঠাৎ সুকু যেন আকাশ থেকে পড়ল সামনে, হাতে একটা কাঠি। কেউ কিছু বোঝার আগেই 'মেজিক মেজিক মেজিক' বলে কর্তার চার দিকে একটা গণ্ডি কেটে দিল। তার পর গণ্ডিটা পাক খায় আর বলে— আঃ তু তু তু ... বেরো বেরো ... দেখি কেমন বেরোতে পারিস ... বেরো ... আঃ তু তু তু ...

প্রথমে কত্তামশাই হেসে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গণ্ডির বাইরে বেরোলেই যে তার নামের আগে সারমেয় বিশেষণটির সিলমোহর লেগে যাবে। তাই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর কত্তামশাইয়ের চোয়াল শক্ত হতে শুরু করল, গালে লালের আভা, শরীর কাঁপছে। কত্তামশাই আরও রেগে গেল আশেপাশে যারা ঘটা করে বিদায় দিতে এসেছিল তারা কেউ সুকুকে কিছু বলতে না দেখে। শেষে পরিবারের লোকেরা গাড়ি থেকে নেমে রে রে করে তেড়ে আসতে সুকু ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্তা গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, হর্নটা জোরে বাজিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চল, যাতে বিদায় জানাতে আসা লোকেদের বেদম হাসি কানে না যায়।

লোকে তারিফ করে বলল পাগল হো তো অ্যাইসা।

আস্তে আস্তে সব সম্পন্ন লোকই পাত্তাড়ি গোটালো। শুধু হেডমাস্টারমশাই বসে রইল স্কুলে, চিরতরে বিদায় নেওয়ার সময়েও তাকে কেউ অবস্থান ভাঙার অনুরোধ না করায়।

মাস্টারমশাইয়ের দজ্জাল বউ অবস্থানের তিন দিনের মাথায় দুই ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েবাপের বাড়ি চলে গেছিল। সকলের গ্রাম ছাড়ার খবরটা কানে যেতে এক দিন একটা ট্রাক নিয়ে তিনি সোজা স্কুলে মাঠে হাজির। দুম দুম করে পা ফেলে কাছে গিয়ে সটান প্রশ্ন—তোমার দেহত্যাগ করা কি শেষ হয়েছে?

মাস্টারমশাই মিনমিন করে বলার চেষ্টা করলেন—না, মানে ওরা কেউ আমাকে কিছু বললো না তাই ...

— চোপ! ওরা তোমার কে যে বলবে। লোকে দলত্যাগ করে পয়সা কামাতে আর পদত্যাগ করে সম্মান বাঁচাতে। আর উনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত্যাগ করার আর জিনিস পেলেন না, ঘটা করে বসলেন দেহত্যাগ করতে। জীবনে না হল পয়সা, না হলো সম্মান। ওঠো।

মাস্টারমশাই সুড়সুড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এ বার চলো।

— কোথায়?

— কোথায় আবার কী। আমার বাপের বাড়ি। তা ছাড়া তোমার যাওয়ার জায়গা আছে কোথায়। দেহত্যাগ না করে আমাকে ত্যাগ করলে বেঁচে যেতুম।

— আমি না হয় শ্বশুর বাড়ি গেলাম। কিন্তু যাদের শ্বশুর বাড়ী নেই।

— তাদের ভাবনায় তোমার কী কাজ?

— কাজ নেই?

— না।

— তা হলে নেই।

এক দিন গভীর রাতে পুলিশ আর র‍্যাফ বেশ কিছু খালি ট্রাক্ নিয়ে এসে নিঃশব্দে নেমে পড়ল হাড়ি বাগদি ক্যাওট ডোমেদের পাড়ায় পাড়ায় আচমকা আক্রমণে নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা জোয়ান সবাইকে ঠেলে তুলল গাড়িতে। ওদের চোখের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া হল পাড়াকে পাড়া। তার পর মাইকে করে ওয়ারেন্ট শোনানো হল—বন্ধ হওয়া খনিতে কয়লা চুরির অপরাধে তোমাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হল।

ট্রাকগুলো ওদের নিয়ে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ জানে না।

ছায়া গ্রামে থেকে গেল ছায়া মানুষ সুকদেব কোনও এক ভৌতিক প্রজ্ঞায় ও ঘুরে বেড়ায় ভেঙে পড়া পাঁচিল, ফাটল ধরা দেওয়াল, চোখের কোটোর থেকে খুবলে নেওয়া মাণির মতো হা হা করা জানলা দরজার ফ্রেমের ফাঁকে ফাঁকে। এই স্থির জগতে একমাত্র চলমানতা সুকদেব আলো-ছায়ার মায়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে ভেসে যায় এক অনন্ত বেঁচে থাকার দিকে।

যে বেঁচে থাকা রাষ্ট্রের সংরক্ষণের খাতায় এখনও তালিকাভুক্ত হয়নি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ আগস্ট ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মজা

অনুপ ঘোষাল

কলেজটা দূর থেকে দেখেই অমৃতার ভালো লেগেছিল। কলকাতা থেকে অনেকটা। আড়াইশ কিলোমিটারের কম নয়। গঙ্গার ধারে মনোরম পরিবেশ। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা। বিশাল কম্পাউ' । অগণ্য গাছগাছালি। যত্নের ছাপ স্পষ্ট। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই চমৎকার বাগান। আসন্ন শরতেও মরসুমি ফুল ঝলমল করছে। দু'জন মালি পরিচর্যার ব্যস্ত।

প্রধান কটকের ওপর উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা — রানি গিরিজাবালা মহিলা মহাবিদ্যালয়। এখানকার প্রাক্তন মহারাজা মহেন্দ্র সিংহের পত্নীর নামাঙ্কিত এলাকার এই একমাত্র মেয়েদের কলেজ। পড়াশোনার পরিবেশ ভালো। কড়া অধ্যক্ষ ডঃ মাধবী চ্যাটার্জির প্রশাসনে মেয়েদের বিশৃঙ্খল হওয়ায় বিন্দুমাত্র উপায় নেই। রেজাল্টের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে। মাধবীদেবী কলেজ-কম্পাউন্ডের পূবদক্ষিণ কোণের স্টাফ-কোয়ার্টার্সে থাকেন। বিয়ে-থা করেননি। তিন ইয়ারের হাজারখানেক ছাত্রীই যেন ওঁর মেয়ে। মায়ের মতো সকলকে আগলে রাখেন। কলেজটাই ওঁর পরিবার।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নতুন প্যানেল বেরিয়েছে। প্রথম চান্সেই যে এমন ওপরের দিকে নিজের নাম বেরিয়ে যাবে, ভাবেনি অমৃতা। সবে গতবার পাশ করেছে। ইতিহাস। অল্পের জন্য ফার্স্টক্লাস পায়নি। শিক্ষকতার ইচ্ছে ছিল। আশা ছিল, দু'তিন বছরের মধ্যে ডক্টরেট করে নিয়ে রেজাল্টের সামান্য খামতিটুকু পুষিয়ে দেবে। অনার্সে লেডি ব্রেবোর্ন থেকে প্রথম শ্রেণিই পেয়েছিল। এম.এ-তে মাত্র চার নম্বরের জন্য কী করে যে এক দাঁড়িটা মিস হয়ে গেল!

চাকরি পেয়ে এখন স্বস্তি। মারণ অসুখে তার মাথার ওপর থেকে দুটো ছাতাই সরে গেল। কলেজে পড়া মেয়েটি তখন থেকেই একেবারে একা। হয়ত আর্থিক অনটন ছিল না। কিন্তু একটা অবলম্বন না পেলে সে বাঁচত কি নিয়ে? প্রেম তার জীবনে এসেছিল। কিন্তু কবির ভাষায় — নিঃশব্দ চরণে। ছেলেটি ছিল মুখচোরা। নিজের পছন্দ বা ভালোবাসার কথা উচ্চারণ না করে শুধু আভাস দিয়েই চলে গেল। অনেক দূর। সাত সাগরের পার। জি আর ই আর টোয়েফল্-এ ভালো স্কোর করে একেবারে বস্টন ইউনিভার্সিটি। আমেরিকা। ফিরবে কিনা আর কে জানে। তেমন মাখামাখি তো ছিল না। কফি হাউসে কদিনের আলাপ। অমৃতার বাবা-মা নেই জেনে কিছু সহমর্মিতা এবং কৃতজ্ঞতার আদানপ্রদান। শারীরিকভাবেও [illegible] অমৃতার সাহসে

AMARBOI.COM

দুর্বলতার [illegible] পাঠক [illegible] www.amarboi.com

ফুলোয়নি। সেই রক্ষণশীলতা কিংবা ভীরুতাকে অনিমেষ নামের ওই মেধাবী ছেলেটি অনিচ্ছা বা অসম্মতি ধরে নিয়ে হঠাৎ দূরে সরে গেল। শুধু মানসিক দূরত্বই নয়, ভৌগোলিক পরিমাপেও হাজার হাজার মাইল।

এমন অসহায় মুহূর্তে অমৃতা সি এস সি-র সিলেকশনটা পেয়ে খুব খুশি। মনের মতো এই পেশাটাকে অবলম্বন করে নিশ্চয় নতুন স্বপ্ন দেখা সম্ভব। দেখতে তো সে মন্দ কিছু নয়। গায়ের রং একটু চাপা, হয়ত রূপসী আখ্যা তাকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল বড় বড় দুই চোখ, মুখের মায়াময় আদল এবং ঝলমলে হাসি — সব মিলে অবশ্যই যে কোনও পুরুষের নজর টেনে রাখার স্পর্ধা রাখে। অতএব তার মেধা শিক্ষাদীক্ষা এবং এই সম্মানীয় পেশা যোগ্যতর যুবককে পুনশ্চ কাছে টেনে আনবে আগামীতে। জীবনটা ব্যর্থ হবে না।

প্রিন্সিপাল ছিলেন ক্লাসে। দেখা হয়নি। তাঁর রেখে যাওয়া নির্দেশমতো অমৃতা আগে পাঠানো প্রত্যয়িত কপিগুলোর সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট ইত্যাদি হেডক্লার্কের সামনে বসে মিলিয়ে দিচ্ছিল। বয়সে প্রবীণ বড়বাবু মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ লক্ষ করে স্নেহের স্বরে বললেন, 'মাত্র তেইশ আমার মেয়ের চেয়েও এক বছরের ছোট। এ'বছর ও কল্যাণীতে বাংলায় এম এ দেবে। খুব কম বয়সে চাকরিতে এলেন। সার্ভিস লেনথ্ সাঁইত্রিশ বছর।'

'অত দূরের কথা ভাবি না।' হেসে বলল অমৃতা, 'চাকরিটা এখনই আমার দরকার ছিল।'

চশমাটা চোখ থেকে টেবিলের ওপর নামিয়ে বড়বাবু বললেন, 'ওই দূরটাই আমার খুব কাছে এসে গেছে, ম্যাডাম। আর মাত্র দেড়খানা বছর। তাই ওই সাঁইত্রিশ বছরের কথা বললাম। আমিও বাইশ বছর বয়সে এখানে টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছিলাম। আটত্রিশটা বছর যেন ফুস্ করে ফুরিয়ে গেল।'

ফের চশমাটা পরে ভদ্রলোক অমৃতার দিকে চেয়ে থাকলেন। সরাসরি মুখের দিকে। অনেকক্ষণ। এত নিরীক্ষণের কী আছে? নিজের মেয়ের কথা মনে পড়েছে? অমৃতাকে কি তার মতো দেখতে? ভদ্রলোক ফুটফুটে ফর্সা। চেয়ারে বসে আছেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে বেঁটেখাটোই মনে হয়। মুখখানা গোলগোল। দাড়িগোঁফ কামানো। মাথায় চকচকে টাক। অমৃতা ফর্সা নয়। অনেকটা লম্বা—পাঁচ ফুট পাঁচ অন্তত। ওঁর মেয়ের কাল্পনিক চেহারার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না।

ভদ্রলোক ওর দিকে প্রায় অপলক চেয়ে আছেন, থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন, 'আপনার সঙ্গে প্রিন্সিপালের আত্মীয়তা আছে?'

অমৃতা চমকে উঠল। এ আবার কেমন প্রশ্ন? এই অধ্যক্ষের সঙ্গে টেলিফোনে বারদুয়েক কথা হয়েছে, এখনও ওঁর চেহারাই দেখেনি অমৃতা। ওঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্কের জোরে এই চাকরিটা ম্যানেজ করে নিয়েছে মেয়েটি, এমন কি ভাবছেন বড়বাবু?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলায় বিরক্তি মিশিয়েই অমৃতা বলল, 'আত্মীয়তা মানে?'

নবাগতার কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গি দেখে প্রৌঢ় একটু গুটিয়ে গেলেন, 'না, মানে ...'

মানে আর ব্যাখ্যা করলেন না, ভদ্রলোক। সার্টিফিকেটগুলো মেলানোর পর গুছিয়ে তুলে দিলেন অমৃতার হাতে। তাঁর কৌতূহলী চোখ তখনও নবীনা এই অধ্যাপিকার মুখে। অমৃতার বিরক্তিটা উষ্মায় বিবর্তিত হতে যাচ্ছিল, সামলে নিতে হল। প্রথম দিনেই রূঢ় ব্যবহার করতে শালীনতায় বাধে।

অধ্যক্ষ ক্লাসে গিয়েছিলেন। সবে ফিরেছেন। তার ডাক পড়ল। জয়েনিং রিপোর্টটা হেডক্লার্ককে একবার দেখিয়ে নিয়ে প্রিন্সিপালের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমৃতা।

'আসব ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। টু ইয়াং আই সি।' ফাইল থেকে আলগোছে, নজর তুললেন ভদ্রমহিলা, 'তুমি বলছি, কিছু মনে কোরো না। বোসো বোসো।'

অমৃতা বসবে কি, থ হয়ে গেছে একেবারে। এতক্ষণে হেডক্লার্কের কৌতূহলের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। প্রিন্সিপ্যালের দিকে চোখ রেখে অমৃতা হতভম্ব।

বয়স পঁয়তাল্লিশ মতো মনে হচ্ছে। একটু ভারী শরীর। কিন্তু মুখখানা তারই মতো। চশমাটা খুলে নিলে হুবহু এক। বয়সের ছাপটুকু ছাড়া কোনও তফাৎ নেই। শ্যামলী। তেমনই ঝকঝকে দৃপ্ত দুই চোখ। একইরকম ভ্রূ-র বাঁক। নাকের গড়ন, চিবুকের টোল। এবং অবিকল তার মতই মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। এমন মিল কি দুজনের চেহারায় থাকা সম্ভব? মনে হচ্ছে, অমৃতার যমজ বোনকে টাইমমেশিনে ফেলে বিশ-বাইশ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ওই প্রিন্সিপালের চেয়ারটায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুজনের মধ্যে এমন সাদৃশ্য দেখে হেডক্লার্ক কেন, সকলেই তাজ্জব বনে যাবে।

এতক্ষণে অধ্যক্ষ মহোদয়া নিজেও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন অমৃতার দিকে। একটু যেন উচ্ছ্বসিত। জয়েনিং রিপোর্টটা ভালো করে পড়লেনই না, হাতে ধরে রেখে বললেন, 'এখানে কোথায় উঠেছ? বাড়ির আর কেউ আসেননি?'

একটা ঘোরের মধ্যে দু'দিকে মাথা নাড়ল অমৃতা, 'স্টেশনের কাছেই এক হোটেলে। দু'একদিন ওখানে থেকেই ঘরটর খুঁজে নেব। মেয়েদের হস্টেলে একটা সিঙ্গল্ সিটেড্ রুমের ব্যবস্থা যদি করে দেন।'

প্রিন্সিপালের গাম্ভীর্যের মুখোশটা খসে পড়েছে। অমৃতার দিকে এক আশ্চর্য স্নেহের দৃষ্টি মেলে বললেন, 'সেসব পরে দেখা যাবে। অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টারে সময়টা মেনশান করে আজকের তারিখের ঘরে একটা সই করে দাও। নাও, এখানে।'

অমৃতা গুহ—নামটা নিজের হাতেই লিখে দিলেন নির্দিষ্ট কলামের মাথায়।

সই-এর পর খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে ডক্টর মাধবী চ্যাটার্জি বললেন, 'আর একটা ব্যবস্থাও হতে পারে। আমার কোয়ার্টারে তিনটে বেডরুম। বেশ বড়সড়ই। আপাতত সেখানে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদিন থাক, আমার কোনও অসুবিধে নেই। বরং খুশি হব। আমি আর ছেলে থাকি। একটা ঘর ফাঁকাই পড়ে আছে।'

অমৃতার আর একবার অবাক হওয়ার পালা, 'ছেলে মানে? শুনেছিলাম—আপনি নাকি ...'

'হ্যাঁ, আনম্যারেড। ও ছোট থেকে আছে। সন্তানের মতই। ছোট মানে, একেবারে বাচ্চা অবস্থা থেকে নয়—তখন ও আট-দশ বছরের ছেলে। সেই ধানবাদের মাইন-এ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল না! ওর বাবা-মা দুজনেই লেবার ছিলেন সেখানে। মারা যান। বিহারি। পদবি পালটে অ্যাডপ্ট করিনি। ললিত ঝা। ওর সব মনে আছে। ব্রিলিয়ান্ট। ফিজিক্সে ইউনিভার্সিটির টপার। সদরের বি এন কলেজে পড়ায়। পি এইচ ডি হল বলে। ও আমার কাছে উনিশ-কুড়ি বছর আছে। সেদিন টেলিফোনে বললে, তোমারও বাবা-মা নেই। স্যাড। কী হয়েছিল ওঁদের?'

মাথা নীচু করল অমৃতা, 'পরে বলব।'

অধ্যক্ষ বাড়তি কৌতূহল দেখালেন, 'কোনও অ্যাক্সিডেন্ট? কিছু মনে কোরো না, এনিথিং আনন্যাচারাল? আজকাল যা-সব হচ্ছেটচ্ছে চারদিকে।'

অমৃতা দু'দিকে মাথা নেড়ে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, 'আপনাকে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি।'

হাসছেন রাশভারী অধ্যক্ষ, 'আমিও কম হইনি। দুজন মানুষের এমন মিল হয়? পাশাপাশি চলেছে ...' কথা কেড়ে নেয় অমৃতা, 'দুই বোন মনে করবে সকলে।'

'কিংবা মা-মেয়ে।'

অধ্যক্ষের কথাটায় অমৃতার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সত্যিই তো, তার মা আজ কোথায় সে জানে না। যাঁদের ঘরে ও মানুষ হয়েছিল, একটা মারাত্মক অসুখে মাত্র ছ'মাসের তফাতে দুজনে মারা যাওয়ার আগে মা-বাবা বলে ডাকত—তাঁরাও তার পালক মাতা-পিতা মাত্র। এঞ্জিনিয়ার বিজন গুহ ছিলেন নিঃসন্তান। মাদার টেরিজার মিশনারিজ অব চ্যারিটি থেকে তাকে ওঁরা দত্তক নিয়েছিলেন। অমৃতা সব জানত। ও একটু বড় হতেই গুহ-দম্পতি তাকে সবকিছু বলে দিয়েছিলেন।

কলেজ ছুটির পর প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে ঢুকে আর এক চমক। ললিত ওর কলেজের ক্লাস সেরে সেদিন ফিরেছে খানিক আগেই। যখন কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিল তখন সে তার পালিকা মায়ের একখানা বাঁধানো পুরনো ফোটোগ্রাফ ঝেড়েমুছে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখছিল। ওই যুবক অবাক হয়ে একবার ফটোটার দিকে একবার অমৃতার দিকে, আর একবার মাধবীর দিকে তাকাচ্ছে। বিশ্বাস করা যাবে কী করে। এই ছবিটা যে, সে প্রায় কুড়ি বছর ধরে বসার ঘরে ঝুলতে দেখেছে। সেই ছবি আজকের এই মেয়েটির। কেমন করে?

অমৃতার কাছে সব কাহিনি শুনে মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে মাদার টেরিজার হোমে কোনখান থেকে আনা হয়েছিল, ঠিক জানো?'

AMARBOI.COM

দু'দিকে মাথা নাড়ল অমৃতা, 'যখন বাবা আর মা দু'জনেরই এইড্‌স্ ধরা পড়ল, জানা গেল—ওঁরা আর বাঁচবেন না, তখন আমাকে নিয়ে ওঁরা মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে শুধু নয়, অনেকের কাছেই গিয়েছিলেন। আমার জন্ম-পরিচয় জানার জন্য। পারেননি। আমিও পরে নিজে কম চেষ্টা করিনি। ভেবেছিলাম—বাবাকে হয়ত পাব না, কিন্তু মাকে যদি চিনতে পারি। এই অনাথ মেয়েটাকে তিনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। আমি নিশ্চয় বাকিটা জীবনের জন্য একটা স্নেহের আশ্রয় খুঁজে পাব। সেটাও হল না।'

মাধবী আর সামলাতে পারছেন না নিজেকে। অমৃতার জন্মের বছর এবং মাস জানার পর তাঁর আর কোনও সন্দেহই থাকল না। ললিত পাশের ঘরে যেতেই গলা নামিয়ে তিনি শুধোলেন, 'কিছু মনে কোরো না, তোমার পিঠের দিকে জামাটা একটু তুলে দেখাবে আমাকে? ডান দিকটায় একটা বড় বাদামি জড়ুল ছিল, জন্মের দাগ।'

অমৃতা জাড়িয়ে ধরল মাধবীকে, 'আমি দেখেই চিনেছি তোমাকে। হ্যাঁ মা, সেই দাগটা আজও আছে—তুমি চিনে নেবে বলে। শুধু একটা জবাব দাও তো মা, আমাদের কেন এত বছর আলাদা থাকতে হল!' মাধবী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছেন অঝোরে। পিঠে হাত বুলিয়ে বলছেন, 'সেই লজ্জা, সেই অন্যায় ... থাক, বলব। সব বলব।'

দৈনিক স্টেটসম্যান, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুগার কিউব

অর্ণব দত্ত

তাচ্ছিল্য করারই জিনিস পিঁপড়ে। কেউ কস্মিনকালে পিঁপড়েদের উপর নেকনজর দিয়েছে বলে জানা নেই। রসিক অবশ্য একবার, সে অনেককাল আগে, যখন স্কুলের নিচু ক্লাসের পড়ুয়া ছিল, ভেবেছিল পিঁপড়ে পোষার কথা। বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে পুষেও ছিল কাচের বয়ামে। চিনির দানাটানাও দিত।

অচিরেই রসিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। ক্লাসমেট অয়ন সে বছর বারো বছরের জন্মদিনে একটা অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা উপহার পায়। অয়নের পিসেমশাই না মেসোমশাই, কেউ একজন দিয়েছিলেন। জন্মদিনের পার্টিতে তুলতুলে জন্তুটিকে দেখে অমন একটা পেতে ইচ্ছা হয়েছিল। দিনকতক বায়না চালিয়ে গিয়েছিল। শিঁকে ছেড়েনি। বাড়িতে কুকুর-টুকুর ঢোকানোয় সব্বার তুমুল আপত্তি।

রসিকের আসলে অন্য প্ল্যান ছিল। এ পাড়ায় দু'একটা ছেলে রয়েছে—যারা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওকে একা পেলেই লাগোয়া বস্তির কয়েকটা ছেলে টিটকিরি দেয়। সেদিন কালোপানা ষন্ডা ছেলেটা রসিককে তাক করে ইটের ঢেলাও ছুড়েছে।

খুব রাগ হয়েছিল। ওই ছেলেটাকে উচিত শিক্ষা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। অন্তত একটা মোক্ষম ঘুষি। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। তার চেয়ে কালোপানা ছোঁড়াটার গায়ের জোর অনেকটাই বেশি।

অয়নের অ্যালসেশিয়ানটা দেখে রসিকের মনে হয়েছিল, অমন একটা থাকলে শিক্ষা-টিক্ষা দিয়ে বডিগার্ড বানিয়ে নিতাম। কেউ বেশি ট্যাঁ-ফোঁ করলেই লেলিয়ে দেব। পালাবার পথ পাবে না।

বাড়ির কেউ রাজি নয়। কুকুর পোষাটা তাই হল না। বয়ামের পিঁপড়েগুলোকে নিরীহ নিরুপদ্রব অপদার্থ মনে হওয়ায়— সে যাত্রায় রসিকের হাত থেকে মুক্তি পায় ওরা।

মানুষের জীবনটা আসলে আজব। যেন ম্যাজিকের মতো। নাকি ম্যাজিকই? জীবনের প্রথম চাকরিটা পাওয়ার পর বছর ঘুরতে চলল। আজ ছুটি। ছুটির দিনটা রসিক শুয়ে-বসে কাটায়। গানটান শোনে, সময় কাটে সিনেমা দেখে বা ফেসবুকে চ্যাট করে।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলল রসিক। উনি বললেন, ভাই, তোমার কাছেই এসেছি।

তাই? আসুন বলে পাশ থেকে ভদ্রতা করে বলল সে।

AMARBOI.COM

~ www.amarboi.com ~

উনি ঢুকলেন। — তোমার তো আজ ছুটি? শুনেছি, বড় কম্পানিতে চাকরি পেয়েছ। কী যে গর্ব হয়, তোমার মতো। হিরের টুকরোদের জন্য!

ওঁর গলাটা বেশ মিষ্টি। এ পাড়াতেই থাকেন। মুখচেনা হলেও কথাবার্তা হয়নি কখনও। নিজের প্রশংসা শুনতে বেশ লাগল।

ও বলল, বসুন না। চা না কফি, কী খাবেন?

— চা হলে মন্দ হয় না।

গলা ছেড়ে রসিক বলল, মা, চা হবে?

রসিক এমন কিছু চাকরি করে না। তবে হ্যাঁ, কম্পানিটা বড়। আর চাকরিটাও স্থায়ী। হুট করে ব্যবসা-পত্তর গুটিয়ে ধাঁ হয়ে যাবে না কম্পানি। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর বহু ছেলেই সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে। ভবিষ্যৎটা যেন আটকে রয়েছে সিলিংয়ে। হয়তো বা আরও কয়েকটা বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে সময় নষ্ট হয়। রসিক সে পাট এড়িয়ে গিয়েছে। বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর আগেই এখানে-ওখানে অ্যাপ্লাই করছিল। সে কথাবার্তাতে চৌখস, দেখতে মন্দ নয় এবং আশা ছিল বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাসটা পাবে। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করার সুবাদে ইংরেজি ভাষায় অনায়াস দক্ষতা রয়েছে। এসব গুণাবলীর জন্য সেলসের চাকরিটা জোটাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মাথায় একটাও চুল নেই। চকচকে টাকওয়ালা ওই লোকটাকে হয়তো বা টাকেরই কারণে, বেশ বিচক্ষণ মনে হয়েছিল।

সেলস ম্যানেজার দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন, ফার্স্ট ক্লাশ ছাড়া আমরা নিই না। বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে তোমার রেজাল্ট যদিও ভাল...

রসিক বুঝেছিল, ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন। ও জবাব দেয়, জানি, কোনও অঘটন না হলে ফার্স্ট ক্লাশটা পাবই।

— অঘটন? দাশগুপ্ত সাহেব কিছুটা অবাক হয়ে বলেন।

মানে ইউনিভার্সিটি যদি আমার খাতাটা মন দিয়ে না দেখে।

চাকরিটা হয়ে গেল রেজাল্ট বেরনোর আগেই। ট্রেনি হিসেবে করেছে রসিক। ফার্স্ট ক্লাশ না পেলে কম্পানি ওকে কনফার্মেসন দেবে না। এটা শর্ত।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, তা ভাই, তোমায় আমার একটা উপকার করতে হবে। তাতে অবশ্য তোমারও লাভ।

রসিক বল, আচ্ছা, আচ্ছা। বলুন না?

আজকাল বাড়ির মেয়ে-বউরা অনেকেই এসব কাজ করেন। তাতে নিশ্চয়ই ভালই আয়-টায় হয়। ইনিও ওদের মতো একজন।

রসিক নিজেও প্রোডাক্ট বেচে। ও দেখেছে, প্রোডাক্ট বেচার সময় কথাকে কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করলে মোক্ষম কাজ হয়। কথা বলাটা একটা শিল্পই। সেটা যে সবসময় মিষ্টি মিষ্টি ভাল কথা হতে হবে, এর কোনও মানে নেই। ভয় দেখানো কথার, কাউকে লোভে বা চাপে রাখাটাও —কথার প্রয়োগনৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে।

ভদ্রমহিলা বললেন, দেখো ভাই, কাজটা চেনাজানাদের ভিতরই করা যায়। প্রসপেক্টও ওই যাকে বলে, স্কাই ইজ দ্য লিমিট।

ঘুড়িটা কতদূর ওড়ে, তা দেখার কৌতূহল হচ্ছে রসিকের। ও বলল, কী রকম?

উনি বললেন, আমার জামাইবাবু ভিআরএস নেওয়ার পর ওই কাজটাই করছেন। মেয়েকে ম্যানেজমেন্ট পড়াচ্ছেন, চার হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট কিনেছেন। পাঁচ বছরে কয়েকবার বিদেশেও গিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা ঠোঁট টিপে হাসেন। রসিক দেখল। বেশ স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী না হলেও আলগা-চটক রয়েছে। এই ধরনের মেয়েদেরই বোধহয় বলে আবেদনময়ী।

বুকের আঁচলটা ইচ্ছে করেই কিছুটা সরিয়ে দিলেন উনি। আড়চোখে রসিক দেখল। বক্ষদেশের নিটোল মাংসখণ্ড উত্তেজিত করল ওকে। ৩০ লাখ ঠিক আছে কাকিমা। আমি ভেবে দেখব। আসলে আমার নতুন চাকরী। কাজের খুব চাপ।

উনি বললেন, শাইন করতে গেলে চাপ তো নিতেই হবে ভাই। ওটা তোমাদের মতো বিলিয়ান্ট ছেলেদের কোনও সমস্যাই নয়। আচ্ছা, তোমার তো আজ ছুটি। তাই না?

রসিক বলল, হ্যাঁ।

— তা বিকেলের দিকে আমার ফ্ল্যাটের দিকে একদিন এসো না। ও সময়টায় একাই তো থাকি। গল্প করা যেত? উনি যেন রহস্য করে হাসলেন।

সামান্য শিহরিত হল রসিক। বলল, যাব একদিন, নিশ্চয়ই।

উনি বললেন, ঠিক? তা হলে আসছে সপ্তাহে?

উনি সাত-সাতটা দিন যেন অপেক্ষা করে থাকবেন। রসিক রঙিন হয়। একজন মানুষের আর একজনের জন্য অপেক্ষা এক হিসেবে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ওর ডাকে যেন লুকানো ইশারা রয়েছে। সারাটা সপ্তাহ ওর জন্যে একজন অপেক্ষা করে থাকবে। বিরাট প্রাপ্তি মনে হল।

রসিক যায়নি। সাত-পাঁচ ভেবে এড়িয়ে গিয়েছে। দেখা হলে কাটিয়ে দিয়ে বলেছে, একদিন যাব। আসলে অফিসের চাপ। সময়ই পাচ্ছি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা উতরোনোর পর কয়েকটা বছর রকে বসে থাকাটাই সাধারণত রীতি। বিড়ি-সিগারেট টানা, সন্ধের পর লুকিয়ে-চুরিয়ে মদে চুমুক, এর-তার কাছে হাত পাতা, রোজগার বলতে টিউশন — নাহ, এই জীবনটা কাটাতে হয়নি রসিককে। গরিব মানুষের সমস্যা বুঝতে হলে, হতদরিদ্র না হলেও চলে। সে হিসেবে রসিক জানে বেকারত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা দারিদ্রের কী যন্ত্রণা। অপমানও তো দেদার। একজন সমর্থ মানুষের হাত পাতাটা ভিক্ষেই!

এই এলাকাটা পুরনো। শহরটা গড়ে ওঠার সময়ই জনবসতির পত্তন হয়েছিল এদিকটায়। পুরনো আমলের বড় বড় বাড়ির সামনের রোয়াক থাকাটা ছিল সে যুগের ফ্যাশন। বাবুরা রোয়াকে বসে হয়তো রাজা-উজির মারতেন। এ পাড়ার রোয়াকগুলোতে এখন ছেলে-ছোকরাদের ভিড়। রাজনীতি, সংস্কৃতির ভূত-ভবিষ্যৎ চর্চিত হয়। কাপ কাপ চা চুমুকে চুমুকে উড়ে যায়।

ওই ছেলেটাকে কোথায় জানি দেখেছে, হয়তো বা রোয়াকেই, রসিককে বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল দাদা?

রসিক বলে, বলো না?

ছেলেটা কেমন ইতস্তত করে। বলে, না, যদি একটু সময় দেন। মানে কথাটা পার্সোনাল।

রসিক ভাবছিল, কী বলবে। এমন সময় ছেলেটা ফের বলল, যদি সময় দেন, আপনার বাড়িতে একবার যাব। খুব বেশি সময় নিতাম না।

— ঠিক আছে। এসো একদিন। আমার ছুটির দিনেই না হয় এসো।

ছেলেটার হাতে রসিক একটা কার্ড ধরিয়ে দেয়। ফোন করে এসো ভাই। মোবাইল নম্বরটা দেওয়া আছে।

খুব বিনীতভাবে ছেলেটা বলল, আসছে সপ্তাহেই আসছি তাহলে?

মানুষের সমগ্র জীবনে নাকি যন্ত্রণার ভাগই বেশি। তিন ভাগ জলের মতো তিন ভাগ যন্ত্রণা। এ কথাটা কোনও এক লেখক বলেছিলেন। খুব সত্যি কথা! অথচ, দুনিয়ায় সহানুভূতিশীল মানুষ যেন ক্রমাগত কমছে।

রাস্তাঘাটে কত সমর্থ মানুষ ভিক্ষে করে। কেউ কেউ বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখিয়ে ভিক্ষে চায়। কেমন অবাক লাগে। সামান্য একটাকা, দু'টাকার প্রত্যাশায় আত্মসম্মানটুকুও বিকিয়ে দিচ্ছে মানুষ।

— ভিখিরিতে শহরটা ছেয়ে যাচ্ছে।

— গ্রামে কাজ নেই তো। কী করবে? খেতে তো হবে।

— কে বলেছে কাজ নেই? গরিবদের জন্য সরকার নিত্যনতুন প্রকল্প নিচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। আসলে ওরা কামচোর। কেবল ফোকটে খাওয়ার ধান্দা।

— দুর মশাই, আপনি কোনও খবরই রাখেন না। খবরের কাগজ পড়ে কি দেশের সত্যিকারের খবরগুলো জানা যায়? খবরের কাগজওয়ালা সব ঠান্ডা ঘরে বসে বানিয়ে বানিয়ে লেখে। আই ওয়াশ।

— ঠিক বলেছেন। আরে! এ অনেকটা সে চৌবাচ্চার অঙ্কটার মতো। যত জল ভর্তি হচ্ছে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পুরোটাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— খাঁটি কথা বলেছেন। দুর্নীতি গোটা দেশটাকে ফোঁপড়া করে দিল। দুর্নীতিবাজদের গুলি করে মারা দরকার।

— কার অত দম আছে? আপনি পারবেন? আমি পারব? চেষ্টা করে দেখুন না। ভিটেমাটি চাঁটি হয়ে যাবে।

— কী হবে, তা কেউ জানে না ভাই।

ভদ্রলোক বাস থেকে নেমে গেলেন। আর জানলা দিয়ে শহরটাকে দেখতে দেখতে রসিক অনেক কিছু দেখতে পেল—যা আগে কখনও দেখেনি।

বাসটা পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে ক্লান্ত বোধ করছিল রসিক। আজকাল ট্রাফিক সিগন্যালেও বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভরদুপুরে বাজছে, আজি জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। খবরের কাগজে নেতারা শহরটাকে নিয়ে নানান বিবৃতি দিচ্ছেন। শহরটা নাকি কিছুদিনের ভিতরই লন্ডন হয়ে যাবে। হাস্যকর মনে হয় গোটা ব্যাপারটাই। দমফাটা একটা হো-হো হাসি বুকের কাছটায় এসে দলা পাকায়।

রসিক স্পষ্ট শুনতে পায়, কারা জানি গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। কান পাতে সে। দেখে, কিছু মানুষ এগিয়ে আসছে। ওরা স্লোগান দিচ্ছে। প্রেম দাও, দিতে হবে। প্রেম চাই, পেতে হবে।

ওটা কখনও সঙ্ঘবদ্ধ দাবি হতে পারে? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তীতায় কেমন ঝাপসা লাগে। এই দুপুরবেলাটা, রাস্তাঘাট, এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি, ট্র্যাফিক সিগন্যালের রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাসে ঠাসাঠাসি করে থাকা সহযাত্রীদের কেমন অবাস্তব লাগে। পুরোটাই যেন তাৎক্ষণিক স্বপ্নের মতো ভঙ্গুর। সামান্য ছোঁয়ায় চুরচুর হয়ে ভেঙে-গুঁড়িয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে কেমন ঘোর লেগে যায়। সেই সময় কারা যেন সমস্বরে বলতে থাকে, অন্ধকার নিপাত যাক। প্রাণের আলো জিন্দাবাদ।

এটা আর একটা মিছিল। দলটা ক্রমেই বাড়ছে। এত মানুষ আলো চায় প্রাণে? প্রেমের দাবিতে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে? নাকি সে পাগল হয়ে যাচ্ছে? হ্যালুসিয়েশনের শিকার?

আর ভাবতে পারে না রসিক। ভয় করে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। জোরে জোরে দুটো টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে।

মোবাইলটা বেজে ওঠে। বাজতেই থাকে। শব্দটা তাড়া করে কেজো বাস্তবে ফিরিয়ে আনে রসিককে। সুইচ টিপে মোবাইলটা রিসিভ করে রসিক।

— হ্যালো।

— কী খবর বস?

গলাটা চিনতে পারে না রসিক। — কে বলছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রান্ত বলে, তোর ঠাকুরদা। এবার চিনতে পারছিস?

এবার বুঝতে পারে রসিক? — কোথায় ছিলি এতদিন? কবে থেকে তোকে খুঁজছি।

— আমিও খুঁজছিলাম। তুই এখন কোথায়? তোর সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আছে।

— বল না?

— ফোনে বলার অসুবিধা রয়েছে। আজ বিকেলে একবার দেখা করতে পারিস?

অফিসের একটা মিটিং রয়েছে যদিও। অতনুর ফোন পেয়ে আবেগতাড়িত রসিক বলল, নিশ্চয়ই। একটা কাজ ছিল, সে না হয় কাটিয়ে দেব। বল, কোথায় আসবি?

আজ সব যেন কেমন অন্যরকম লাগছে। অফিসে রুটিন মিটিং ছিল। রসিক ফোন করে জানিয়ে দিল ব্যক্তিগত একটা সমস্যায় আটকে পড়েছে।

হাতে এখনও কয়েক ঘণ্টা সময়। কী করা যায়? বাসস্টান্ডের কাছে একটা পার্ক রয়েছে। দুপুরবেলায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। রসিক একটা ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

অতনু কোত্থেকে ওর নম্বরটা পেল? জিজ্ঞেস করা হল না। কলেজে ওদের চেয়ে সিনিয়র ছিল। অতিবাম রাজনীতি করত। অন্যরকম কথাবার্তা বলত। রসিকের মনে পড়ল, ও অতনুকে স্বপ্নসন্ধানী বলে ডাকত। সত্যিই আশ্চর্য রকম স্বপ্ন দেখত ছেলেটা। রসিকেরা টের পেত স্বপ্নগুলো অলীক। অলীক হলেও তা বড় বিচিত্র আর সুন্দর ছিল।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষাটাই দিল না। পরেও বোধহয় পরীক্ষা-টরীক্ষা দেয়নি। অতনু কি এখনও ওরকম সব অসম্ভব স্বপ্ন দেখে?

জানতে খুব আগ্রহ হচ্ছিল রসিকের। ভিতরে ভিতরে কিছুটা উত্তেজিত হয় সে। অবাক হওয়ার পালা অতনুকে দেখে। নতুন কেনা গাড়ি। দরজা খুলে বলল, ওঠ শালা। দামি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

— তুই তো ওখানে আছিস। তাই না?

রসিক বলল, বাব্বা, কোথায় চাকরি করি তাও দেখছি জানিস? পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলি নাকি?

পুরনো অতনুর সঙ্গে আজকের মানুষটার কোনও মিলই নেই। পালটাতে চেয়ে নিজেই যেন পুরোপুরি পালটে গিয়েছে ও। রসিক দেখে।

— কী দেখছিস?

— কিছু না। এমনিই। কেমন আছিস? — কেমন দেখছিস?

— অনেক বদলে গেছিস রে তুই।

অতনু হা-হা করে হাসে। —একদিন আমি খুব বোকা ছিলাম রে রসিক?

— বোকা?

— তা বোকাই তো। নাই বা বললাম তার চেয়ে খারাপ কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— নিজের সম্পর্কে খারাপ কথা বলবিই বা কেন? বললি না তো, তুই কী করিস?

সংক্ষেপে অতনু বলল, বিজনেস।

— কিসের বিজনেস?

— সে ব্যাপারেই তোর হেল্প দরকার। তাতে অবশ্য তোরও মোটা লাভ।

— হেল্প?

— দেখ, মেডিসিনের র মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আমার। তোর সঙ্গে তো দাশগুপ্ত সাহেবের সম্পর্কটা খুব ভাল। ভদ্রলোক তোকে বেশ স্নেহ করেন শুনেছি। ঠিক?

রসিক হিসেবটা বোঝার চেষ্টা করছিল। — তা করেন। কিন্তু তার সঙ্গে তোকে হেল্প করার কী সম্পর্ক? তাছাড়া, কী ধরনের সাহায্য তোর দরকার, সেটাই তো জানি না?

— বলছি-বলছি। তোদের কম্পানিতে মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের টেন্ডারটা আমায় পাইয়ে দিতে হবে।

— দেখ অতনু, আমার অত ক্ষমতা নেই। আমি কেউকেটা কেউ নই। সামান্য চাকুরে।

— একটু চেষ্টা করলেই দাশগুপ্তকে তুই কনভিন্স করতে পারবি। তারপরের কাজটা আমার।

— না, মানে ...

— দেখ, রসিক তোকে একটা বড় সুযোগ দিচ্ছি। ক'টাকা মাইনে পাস তুই? আমার কাজটা হয়ে গেলে বসে বসে যে টাকাটা আসে মাসে মাসে পার্সেন্টেজ হিসেবে পাবি, তা তুই কল্পনাও করতে পারছিস না।

বিপ্লবের সঙ্গে ব্যবসায়িক বুদ্ধির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা জানা নেই। তবে নানা যুগের দামাল বিপ্লবীদের কেউ কেউ যে হাতিয়ার ছেড়ে বিত্তসাধনায় সাফল্য পেয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও খুব একটা কম নেই। সে হিসেবে অতনুর বদলে যাওয়াটা বিরল মোটেও নয়। কেন জানি ভিতরে ভিতরে তবু অস্বস্তি হচ্ছে।

রসিক বলল, ঠিক আছে অতনু। একটু ভেবে দেখি।

খুব বেশি ভাবাভাবির ঝামেলায় যাস না। হা-হা করে হেসে অতনু বলে, ভাবা একটা খারাপ রোগ। ভেবেটেবে সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়। আসল ব্যাপার হল অ্যাকশন।

কয়েক বছর আগেও অতনু অ্যাকশনের কথা বলত। সে কথাই বলছে আজও। সেদিনের অ্যাকশনের সঙ্গে আজকের অ্যাকশনের তফাত আকাশ-পাতালের।

একটু একা থাকার দরকার। রসিক ভাবে।

সারাদিন ধরে আজ যা ঘটছে, মেলাতে গিয়ে কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা আগেই তো স্পষ্ট শুনেছে, কারা বলছিল, আলো দাও, অন্ধকার হঠাও। ওরা কারা,

AMARBOI.COM

যারা বলছিল, প্রেম চাই, প্রেম দাও? গোটা ব্যাপারটাই কেমন ভুতুড়ে। মানুষগুলোকে ছায়াময় দেখেছে। মনে নেই কোনও মুখ, একটিও অবয়ব। প্রেম, আলো — এ কি দাবিতে মেটার? মেলে কি জোর করলেই? নাকি সে মানসিক কোনও সমস্যায় ভুগতে শুরু করল? যা বাস্তববোধবর্জিত কল্পনার আবোল-তাবোল জগতে তলিয়ে দিচ্ছে?

বিভ্রান্ত লাগে। আর কিছু নয়, উঁচু কম্পানিতে চাকরি করে সে। ঠিক কী ভুল, সে কথা না হয় বাদ। কতজন ওকে কতভাবে চাইছে। আবাসনের কাকিমা, পাড়ার ওই বেকার ছেলেটা বা প্রাক্তন আগুনখোর অতনু— যেন খুঁজে পাওয়া গেল বিশেষ যোগসূত্র।

ছোটবেলায় পিঁপড়ে পুষতে চায়নি রসিক। পিঁপড়েদের নেহাতই পরজীবী মনে হয়েছিল সেদিন। দাঁত নেই, গর্জন নেই— সৃষ্টিকর্তার নেহাতই দুর্বল সৃজন। করুণার।

রসিকের মনে হল, যেন খুঁইয়ে ফেলছে যে মানুষটাকে সে চেনে, তার সবটুকুই। কে না জানে, সবই পালটায়। এই-ই সত্য। এভাবে তো পালটাতে চায়নি ও। প্রতিরোধ করে রসিক। শক্তিতে কুলায় না। মনে পড়ছে মাকে, বাবাকে মনে পড়ে। ওরা আর ওকে খুঁজে পাবে না। স্বজনহারানোর যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় চেতনা।

দেখতে দেখতে প্রমাণ মাপের একটা সুগার কিউব হয়ে গেল রসিক।

সকালবেলা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনর্জন্ম

পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ী

পরেশবাবুর নাতি হয়েছে। বাড়িতে খুশির হাওয়া। গৃহিণী লীলা দেবী রান্নাঘর সামলে তুলে নিয়েছেন তার পরিচর্যার ভার। পরেশবাবু খোঁজ করেন একজন সর্বক্ষণের পরিচারিকা। অনেকে দেখা করে। কিন্তু রাতে কেউ থাকতে চায় না। বাড়ির কাজের মেয়েটি দিনে দু'বার কাজ করে যায়। অবশেষে পরেশবাবু সন্ধান পান ভারতী সেবা কেন্দ্রের। দেখা করেন মালিক হরিহর সামন্তের সঙ্গে। পরেশবাবু বলেন তাঁর প্রয়োজনের কথা।

হরিহরবাবু বলেন, 'স্যার আপনার বাড়ির পরিবেশটা যদি জানান।'

পরেশবাবু বলেন, 'আমি স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন অফিসার। সম্প্রতি রিটায়ার্ড, আমার মিসেস লীলা দেবী, ছেলে প্রবীর একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ম্যানেজার, বউমা সুচন্দ্রা একটা ইংলিশ স্কুলের টীচার। বর্তমানে তিন মাসের মাতৃত্বের ছুটিতে বাড়িতেই রয়েছে। আর একজন নবাগত। যার জন্য এসেছি।'

'তাহলে তো সেইরকম মেয়েকেই দিতে হবে। আমার কাছে একটি মেয়ে আছে। সে আজ আসেনি। আপনি অ্যাড্রেস দিয়ে যান, কালকে পাঠিয়ে দেব। হঠাৎ পরেশবাবুর চোখ যায় পাশের ঘরে। কয়েকটি মেয়ে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করেন,

'আচ্ছা ওরা কি আয়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওদের কয়েকজনের মাথায় সিঁদুর দেখছি। ওরা কি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ স্যার। সকলেই স্বামী পরিত্যক্তা। কেউ স্বামী মারা যাওয়ায় বিতাড়িত। এরা কত ধর্ম ভীরু। স্বামী তাড়িয়ে দিলেও কপালে সিঁদুরটুকু বজায় রেখেছে। এখনও গ্রামে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে কি গ্রাম, কি শহর সর্বত্রই নারী নির্যাতন চলে আসছে।'

পরেশবাবু বলেন, 'আচ্ছা আজ চলি। নমস্কার।'

পরদিন সকাল ন'টা। সদর দরজায় বেল বাজে। পরেশবাবু খোলেন দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। বলে, 'আমি পম্পা দাস। হরিহর জেঠু আমায় পাঠিয়েছেন সেন্টার থেকে।' পরেশবাবুর পায়ের হাত দিয়ে প্রণাম করে।

পরেশবাবু বলেন, 'মিয়াবাড়ি আছ হও। ভেতরে এসো।' মেয়েটিকে দেখে ভালোই মনে

www.amarboi.com

হয়। বেশ নম্র-ভদ্র। রুচিশীল পোশাক পরিচ্ছদ। গৃহিণীকে ডাকেন, 'কই গো শুনছো। একবার এদিকে এসো।' লীলা দেবী বেরিয়ে আসেন রান্নাঘর থেকে।

পরেশবাবু বলেন, 'এর নাম পম্পা। সেন্টার থেকে এসেছে।' পম্পা প্রণাম করে লীলা দেবীকে। লীলা দেবী, 'থাক থাক', বলে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি রাত্রে থাকবে তো মা?' পম্পা বলে, 'হরিহর জেঠু দু'বেলার কথাই বলেছেন। আপাতত সাত দিনের কথা বলেছেন। যদি আপনাদের ভালো লাগে আরও সময় বাড়িয়ে দেবেন।'

সুচন্দ্রা এগিয়ে এল। পরেশবাবু বলেন, 'বউমা এ পম্পা। সেন্টার থেকে এসেছে। এবার থেকে তোমার ছেলের পরিচর্যা করবে।' সুচন্দ্রার ভালোই লাগে মেয়েটিকে, তারই বয়সী। হেসে বলে, 'শুধু ছেলের পরিচর্যাই নয়, আমারও একজন গল্প করার লোক পাওয়া যাবে।'

লীলা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছে?' পম্পা বলে, 'আমার বাবা নেই। মা, দাদা আর একটা বোন।' এবার লীলার প্রশ্ন, 'দাদা কি করে?'

—'রিক্সা চালায়। আমরা বড় গরীব মাসিমা।'

প্রবীর অফিসের পোশাকে বেরিয়ে আসে। পরেশবাবু বলেন, 'খোকা তোর ছেলের দেখভালের জন্য এই মেয়েটি রাখব ভাবছি।' প্রবীর মন্তব্য করে, 'ভালোই তো মায়ের বোঝা কমবে।'

পম্পা বলে, বউদিদি বাবুসোনাকে একবার দেখব।'

সুচন্দ্রার উত্তর, 'নিশ্চয়ই। ঘরে এসো।' পম্পা দেখে, কি সুন্দর ছোট্ট সোনা। অকস্মাৎ দু'চোখ ভরে জল নামে। তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে খোকনের কপালে একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পম্পা পরদিন এল তার জিনিসপত্তর নিয়ে। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

—'বসিরহাট থেকে অনেকটা দূরে। মথুরাপুর গাঁয়ে। ম্যাটাডোরে যাতায়াত করতে হয়।'

ড্রইংরুমের পাশের ঘরটা পড়েই ছিল। ওখানেই হল পম্পার থাকার ব্যবস্থা। কয়েক দিনের মধ্যেই সকলের মন জয় করে নেয় তার ব্যবহার দিয়ে। খোকন তার মমতার সবটুকু কেড়ে নিয়েছে। পরিচর্যার কোনওরকম ব্যতিক্রম হতে দেয় না। সুচন্দ্রা বলে, 'মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে মনে হয়, কে খোকনের মা। তুমি না আমি।'

পম্পা উত্তরে বলে, 'আপনি ওর মা। আমি মাসি। মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি এটা জানেন তো।' দু'জনেই হেসে ফেলে।

সুচন্দ্রা বলে, 'দেখ তুমি আমি প্রায় সমবয়সী। আমরা দু'জনে কি বন্ধু হতে পারি না। এবার থেকে আপনি নয় তুমি।'

—'ধ্যাত, তুমি বলতেই পারব না।'

—'তাহলে খোকনকেও পাবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না বউদিদি, খোকনকে পেয়ে অনেক কষ্ট ভুলে থাকি।'

সুচন্দ্রা বলে, 'সেদিন খোকনকে দেখার সময় তোমার দু'চোখে জল দেখেছিলাম। মাঝে মাঝে লক্ষ করি তোমার মনের মধ্যে যেন কোনও কষ্ট লুকিয়ে আছে। তোমার জীবনের ঘটনা একদিন শুনতে চাই।' পম্পা 'ও কিছু না,' বলে এড়িয়ে যায়।

সুচন্দ্রা বলে, 'আমি কিন্তু তোমার বন্ধু। বন্ধুর কাছে কিছু লুকোতে নেই।'

পম্পা সুচন্দ্রার দুটো হাত ধরে বলে, 'বউদিদি তুমি এত ভালো।'

—'তুমি যে ভালো তাই।'

পম্পাকে এখন আর গাঁয়ের মেয়ে বলে মনে হয় না। যেন এ বাড়িরই মেয়ে। তবে কথায় গ্রাম্য টান রয়ে গেছে। সাত দিনের জায়গায় একমাস পার হয়ে গেছে। পরেশবাবু কবে থেকে যেন 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ নেমে এসেছেন।

সুচন্দ্রার স্কুল সেদিন ছুটি। প্রবীর যথারীতি অফিসে। সকলে দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রামরত। সুচন্দ্রা পম্পাকে তার ঘরে ডাকে। পাশে বসিয়ে পম্পার ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় দিয়ে বলে, 'আমার মাথার দিব্যি রইল, আজ সব খুলে বলতেই হবে।'

পম্পা শিউরে ওঠে। ঝরঝর করে ঝরে পড়ে দু'চোখের জল। বলে, 'বউদিদি আমার কষ্ট আমার মনেই থাক। কাউকে বলতে চাই না। যখন এতবড় দিব্যিটা দিলে তখন তোমাকে সব বলছি।'

পম্পা শুরু করে তার জীবনবৃত্তান্ত—

"আমার বাবা নাই। মা দাদা আর একটা ছোট বোন। আমরা খুব গরীব। বাবা অনেক কষ্ট করে একটা রিক্সা কিনেছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা ছোট বয়স থেকেই রিক্সা চালায়। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে। গ্রামে রঞ্জিৎ চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোক বিনা পয়সায় গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে যেতাম। পড়তে খুব ভালো লাগত। মা পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'নেকাপড়া শিখে কি রাজরানি হবে। গরীবের ঘরে যাদের গতর খেটে খেতে হয়, তারা নেকাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্টর হবে? ওসব স্বপ্ন দেখা ছাড়ো। দুধের ছেলেটা কষ্ট করে রেসকা চালায় বলে দু'বেলা দুটো ভাত জুটছে। গাঁয়ের ক'টা লোক নেকাপড়া জানে?"

সুচন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বিয়ে কত বছর বয়সে হয়েছে।'

পম্পা জানায়, 'বারো পেরিয়ে তেরো বছর বয়সেই।'

সুচন্দ্রা অবাক হয়, 'মাত্র তেরো বছর বয়সেই!'

পম্পা বলে, "হ্যাঁ বউদিদি, গাঁয়ে-গঞ্জে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। তাছাড়া এই তেরো বছরেই শরীর এত পুষ্ট হয়ে যায় যে, লোকের নজর লাগতে শুরু করে। একদিন পাশের দোকানে মুড়ি আনতে গেছি। দূরে একটা গাছতলায় কয়েকটা ছোকরা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে সিটি বাজিয়ে নানারকম খারাপ অঙ্গভঙ্গি করছে। ভয়ে পালিয়ে এলাম। পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। একদিন ওপাড়ার পদ্মপিসি এসে মাকে বলল, 'বাসন্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিদি তুমার পম্পা যেমন গায়ে গতরে পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে তাতে আর ঘরে রাখা ঠিক না। এবার বিয়ের ব্যবস্থা কর। অনন্তপুরের নিতাই মণ্ডলের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে? নিতাই দাদা মানুষ ভালো। একটাই ছেলে। একুশ বছর বয়স। মানাবে ভালো। অবস্থা ভালো। ক'বিঘা জমি আছে। লাঙ্গল-বলদ, গাই-গোরু সব আছে। তাছাড়া পাড়ায় একটা মুদিখানার দোকান আছে। বিক্রিবাটা ভালোই। বলত চেষ্টা করে দেখি।'

মা বলেন, 'দিদি সবই তো বুঝল্যাম কিন্তুক অত পয়সা কুথায়। দেনা পাওনার টাকা কুথায় পাবো।'

পদ্মপিসি বলে, 'দেখি একবার চেষ্টা করে।'

একদিন ছেলে এলো তার মায়ের সঙ্গে আমাকে দেখতে। সামনে আসতেই সে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ জোড়া আমার সারা দেহের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভীষণ লজ্জা পেলাম। সরে গেলাম। ছেলেটি ওর মাকে বলল, 'চলো মা আমার দেখা হয়ে গেছে। এই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব।' মা ছেলের মাকে বলল, 'দিদি আমাদের অবস্থা তো দেখছেন। আপনারা দয়া করলে তবেই বিয়ে হতে পারে।' ছেলের মা তার কোনও উত্তর দিলেন না।

কয়েকদিন পর পদ্মপিসি এলো। মাকে বলল, 'কই গো বাসন্তী দিদি এদিকে যে সব ঠিকঠাক করে এলাম। নিতাই দাদা বলল, 'ছেলের যখন পছন্দ হয়েছে আর মেয়ে যখন ভালো তখন আমার আপত্তি নাই। শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই মেয়েকে ঘরে আনবো। শুধু বরযাত্রী খরচটা যেন ওরা দিয়ে দেয়।' শুধু তপনের মা গজ্‌গজ্ করতে লাগল, 'আমার একটা ছেলে। তার বিয়েতে দান-সামগ্রী কিছুই পাবো না, এটা কোনও কথা হল।' নিতাই দাদা বললেন, 'বউ, জীবনে পয়সাটাই বড়। আমার তো অভাব নাই। পরের ধনের ওপর লোভ কেন? তাছাড়া বেয়ানের তো দেওয়ার মতো সঙ্গতিও নাই। বউমা ভালো হলেই হল।' নিতাই দাদা বিয়েতে রাজি হয়েছেন। পদ্মপিসি হাসতে হাসতে বলেন, 'কই এবার ঘটক বিদায় দাও।' মা, পদ্মপিসির দু'হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দিদি তুমি যে উপকার করলে এটা কোনও দিন ভুলতে পারব না। আগের জন্মে তুমি আমার সত্যিকারের দিদি ছিলে।'

বিয়ে হয়ে গেল। গেলাম শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরমশাই খুব খুশি। বললেন, 'একেবারেই বাচ্চা মেয়ে। ঘরকন্নার কাজ করতে পারবে তো মা। বললাম, হ্যাঁ বাবা সব পারব।' দেখলাম, শাশুড়ির মুখ ভার। স্বামী তো আমায় নিয়ে মেতে উঠল। ওর ভালোবাসার অত্যাচারে মাঝে মাঝে অতিষ্ট হয়ে উঠতাম। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও মূল্যই দিত না। একদিন ওর সঙ্গে গেলাম বসিরহাটে মামার বাড়ি। সেখানে সবাই খুব যত্ন করল। একদিন আমায় বলল, এবার কলকাতা দেখাতে নিয়ে যাবে। মনে হল, ও সত্যিই আমায় ভালোবাসে। এরমধ্যে পেটে সন্তান এল। সে সময়ও ভারী ভারী কাজগুলো করতে হত। মাঝে মাঝে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কেউ ফিরেও তাকাত না। তারমধ্যে শাশুড়ির গঞ্জনা।"

সুচন্দ্রা বলে, 'এই অবস্থাতেও তোমাকে বিশ্রাম দেয়নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না বউদিদি, কোন ওষুধপত্তরও দেয়নি।'

—'ওরা কি মানুষ?' পম্পা বলতে থাকে,

—'অদৃষ্টের ফেরে মেয়ে জন্মাল।' সচন্দ্রা বলে,

—'কেন অদৃষ্টের ফেরে কেন? মেয়ে জন্মানো কি অপরাধ?

—'হ্যাঁ বউদিদি, গঁয়ে-গঞ্জে লোকে বলে ছেলে জন্মানো সুলক্ষণ।'

—'অদ্ভুত সব কুসংস্কার।'

পম্পা বলে, "সাতদিন যা আঁতুর ঘরে বিশ্রাম পেয়েছিলাম। তারপর যে শাশুড়ি মেয়ে হয়েছে বলে গঞ্জনা দিল, সে-ই কোলে নিয়ে, 'কি চাঁদপানা মুখ' বলে নিজের হেফাজতে নিয়ে নিল। বলল, 'দিদু আমার কাছেই থাকবে। বউমাকে ওর জন্য আর ভাবতে হবে না।'

বুঝলাম, মেয়ের দেখভালের অছিলায় সমস্ত কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। সব কাজই করতে হত। ওকে বলতাম, সারাদিন না হয় কাজের মধ্যে থাকি রাত্রিবেলায়ও কি মেয়েটাকে পাবো না কোলের কাছে। ও বলত, 'ভালোই তো। মেয়ে থাকলেই মাঝরাত্রে বিছানা ভিজিয়ে দিত। কান্নায় ঘুম ভাঙিয়ে দিত।'

বুঝলাম, ওকে বলে কোনও লাভ নেই। শুধু সন্ধ্যেবেলায় বুকের দুধ খাওয়াতে নিয়ে আসত। ওইটুকুই যা শান্তি। বাড়ির কাজের মেয়েটা যতটা পারত সাহায্য করত। একদিন কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান হলে দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার কাছে ডাক্তারবাবু বসে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো?' বললাম, 'ভালো।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, দুর্বলতা আর মানসিক চিন্তায় এটা হয়েছে। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাবে।' শাশুড়ি শুনে বললেন, 'ও কিছু না, কাজ না করার বাহানা।' ও বলল, 'তাহলে ক'দিন মায়ের কাছে রেখে আসি। শাশুড়ি বলল, 'বাড়ির বউ যখন তখন হুটহাট করে বাপের বাড়ি যাবে কি রকম! এখানেই থাকবে।' শুনে রাগ হল। ভাবলাম, কোথাও যাব না। এখানে থেকেই মরব।

একদিন কাজের মেয়ে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'জানো, বউদিমণি ওপাড়ার পরাণ মণ্ডলের নাতনি পিঙ্কির সঙ্গে দাদাবাবুর খুব ভাব হয়েছে। দু'জনে দোকানে বসে, হাসি-মস্করা করে। পিঙ্কি দেখতে বেশ ডাগর ডোগর।' শুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু অশান্তির ভয়ে কিছু বললাম না। বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, 'বউমা তোমার শরীরটা দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে কেন? ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছ না?' আমি উত্তর দিতাম, 'না'।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর শ্বশুরমশাই বিছানায় বসে। আমি তামাক সেজে নিয়ে গেছি। টান হুঁকোতে দুটো টান দিয়েই ঢলে পড়লেন বিছানায়। হুঁকোটা ছিটকে পড়ে। চিৎকার করে উঠি, 'বাবা কি হল, ও বাবা কথা বলছেন না কেন?' চোখে মুখে জল দিই। কল্কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুনটা নিবিয়ে দিই। চিৎকারে সকলে এসে জড়ো হয়। ও তাড়াতাড়ি ডাক্তার নিয়ে আসে। উনি দেখেই বললেন, 'উনি আর নেই। হার্ট ফেল করেছেন।' শাশুড়ি বাবার পায়ে মাথা ঠুকে, 'ওগো আমার একি হল গো। তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো। তখনই বলেছিলাম, ওই হাড়হাভাতে অলক্ষুণে মেয়েকে ঘরে আনিস না। আমার কথা কেউ শুনলে না', বলে কাঁদতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে মনে হত, ও যেন বদলে যাচ্ছে। দিন দিন যেন রুক্ষ হয়ে উঠছে। একদিন দোকান থেকে এসে এক গ্লাস জল চাইল। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় দিতে একটু দেরি হল। ও রাগ করে বলে, 'কি এমন রাজকাজে ব্যস্ত ছিলে, এক গ্লাস জলও ঠিমতো দিতে পারো না', বলে জলশুদ্ধ গ্লাস বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলে, 'রূপ দেখে বিয়ে করেছিলাম, এখন তো হাড়গিলের মতো চেহারা হয়েছে।'

আমার কান্না পায়। বলি, 'কোনওদিন জানতে চেয়েছ কেন এমন চেহারা হয়েছে? একদিনে তো হয়নি। এই যে ঝি-এর মতো সারাদিন খাটি তাতে তো তোমার মনে একটুও দয়া হয় না। তার ওপর তোমার মায়ের গঞ্জনা। কত আর সহ্য করব বলতো। মা হয়ে মেয়েটাকেও পেলাম না। সবই আমার অদৃষ্ট।' ও চুপ করে থাকে।

একদিন দেখি ওপাড়ার ক্ষ্যান্ত পিসি মায়ের ঘরে ঢুকল। কেমন সন্দেহ হল। দরজার আড়াল থেকে শুনতে লাগলাম ওদের কথা। ক্ষ্যান্ত পিসি শাশুড়িকে বলে, 'হ্যাঁ গা, তপনের মা তুমার তপন তো পরাণ মুগুলের লাতনি পিঙ্কির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছে। বলতো পরাণ মুগুলকে বলি উয়াদের বিয়েটা দিয়ে দিক। পরাণের অবস্থা ভালো, দিবে থুবে খুব। এই বো তো ঘাটের মড়া হয়েছে।' শাশুড়ি বলে, 'আর বলো কেন। ওই অপয়া হতচ্ছাড়ির সঙ্গে বিয়েতে আমার একটুও মত ছিল না। তপন তো রূপ দেখে ভুলেছিল। আর ওর বাবা একেবারে ধম্মপুত্তুর হয়ে বিনা পণে বাড়ি নিয়ে এল। তুমি চেষ্টা কর। হলে তোমাকেও খুশি করে দেব।'

আর দাঁড়াতে পারলাম না। মাথাটা ঘুরতে লাগল। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। নাঃ আর সহ্য করা যায় না। এবার প্রতিবাদ করতেই হবে যা থাকে কপালে। ও দোকান থেকে এসে আমায় শুয়ে থাকতে দেখে বলে, 'মহারানির আবার কী হল? অসময়ে শুয়ে?' আমি প্রথমেই বললাম, 'পিঙ্কি কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তোমাদের ঢলাঢলি গাঁয়ের লোক পর্যন্ত জেনে গেছে?।' ও রুখে উঠল, 'পিঙ্কি যেই হোক তাতে তোর কি হারামজাদি।' বললাম, 'বাঃ মুখ ফুটেছে দেখছি।' ও বলল, 'মুখ ফুটেছে এবার হাত ছুটবে। বলে আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে গালে এক চড়। চিৎকার করে বলি, 'এখন তো তাড়াতে পারলেই বাঁচো, না হলে পিঙ্কির সঙ্গে মজা লুটবে কি করে? তোমার মা তো প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে আবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি কিছু জানি না ভেবেছ? লম্পট কোথাকার।' ও বলে, ' কি বললি হারামজাদি, আমি লম্পট। এখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।' বলে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে রাস্তায় বের করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। আমি বাড়িতে ঢুকে উঠোনে বসে পড়ি। বলি, 'একা কেন যাব। আমার মেয়েকে দেবেন না।' শাশুড়ি গর্জে ওঠে, 'মেয়ে আমাদের বংশের। তুই জন্ম দিয়েছিস মাত্র। আর কোনও সম্পর্ক নাই।' চিৎকার করে বলি, 'মেয়েকে না নিয়ে এক পাও নড়ব না।' শাশুড়ি তখন একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে বেদম মারতে থাকে। চিৎকার করে বলি, 'মেয়ে না দিলে পুলিশের কাছে যাব।' 'তাই যা', বলে ও আমাকে দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে একটা লাথি মারে। আমি হুমড়ি খেয়ে দরজার বাইরে পড়ে যাই। কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। ও দরজা বন্ধ করে দেয়। সারারাত ওইভাবে দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে থাকি। ভোর হতেই বাড়ির দিকে রওনা দিই।"

পম্পার কথা শুনতে শুনতে সুচন্দ্রার চোখ জলে ভরে আসে। বলে, 'মানুষ এত নৃশংস হতে পারে? সহ্য করা যায় না।'

পম্পা বলে, 'গাঁ ঘরের কথা তুমি কিছু জানো না বউদিদি। আমার মতো কত মেয়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেছে কত মেয়ে পাচার হয়ে যায়।'

সুচন্দ্রা বলে, 'মেয়েদের প্রতি এই অত্যাচার অপমান কি চিরকাল চলতেই থাকবে। কোনওদিন এর বিহিত হবে না?

পম্পা বলে চলে, "বাড়িতে মায়ের কাছে আসতেই মা আমাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'একি চেহারা হয়েছে তোর?' আমি মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বলি, 'মা গো ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। চিরদিনের মতো। আর কখনও ঢুকতে দেবে না। ওর আবার কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা চলছে। মেয়েটাকে দিলো না।' দাদা এসে দেখে বলল, 'এখুনি আমার বন্ধুদের নিয়ে ওদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ছাড়ব। ঘর-বাড়ি চুরমার করে দেব।' অনেক কষ্টে ওকে থামালাম। বললাম, 'ও সব করেলাম যাস না। ওদের পয়সা আছে। তোকেই জেলে পুরে দেবে।'

পরের দিন গেলাম বিষ্টুপুর থানার ডায়রি লেখাতে। থানার বড়বাবু চক্রপাণি সমাদ্দার আমাদের কথা ভালোভাবে না শুনেই বললেন, 'ওসব পারিবারিক ব্যাপারে আমরা মাথা ঘামাই না।' বলে ভাগিয়ে দিলেন। দিন পাঁচেক পরে ডেকে পাঠালেন থানায়। বললেন, 'সই করতে পারো?' বললাম, 'হ্যাঁ হুজুর।' উনি বললেন, 'তুমি কি আর তোমার শ্বশুরবাড়ি যেতে চাও?'

—'না হুজুর।'

—'তাহলে এই লেখাটার নিচে সই কর। এতে লেখা আছে, আমি শ্রীমতি পম্পা মণ্ডল স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছি। আর কখনও সেখানে যাইব না।' সই করে দিলাম। শুনলাম ওটাকে মুচলেকা বলে। থানা থেকে বেরিয়ে একটা গাছতলায় বসেছি। একজন লোক এসে বলল, 'এমনি হবে না। মালকড়ি ছাড়তে হবে, তবে সব হয়ে যাবে।' বললাম, 'টাকা পয়সা থাকলে কি এখানে আসতাম আদালতে যেতাম। চল মা', বলে বাড়ি চলে আসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার পাঠশালায় যাই। দেখি সে পাঠশালা আর নাই। সরকার থেকে ইস্কুল করে দিয়েছে। এখন দু'জন মাস্টারমশাই একজন দিদিমণি। শুনলাম দুপুরে নাকি খেতে দেয়। মিড ডে না কি যেন বলে। ভর্তি হলাম। মাস তিনেকের মধ্যে বাংলা লিখতে পড়তে শিখলাম। ইংরেজি অক্ষরগুলো চিনতে পারি। এখন খবরের কাগজ পড়তে পারি। একদিন হেড স্যার রতন চক্রবর্তী আমাকে বললেন, 'তোমার মাথায় সিঁদুর দেখছি। তুমি কি বিবাহিতা?' উনি অন্যগ্রাম থেকে আসেন বলে আমার ব্যাপার কিছুই জানতেন না। তাঁকে সব খুলে বললাম, খুব দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন, 'এজন্যেই দেশে শিক্ষার কত প্রয়োজন। শিক্ষার আলো না ঢুকলে এরা কোনওদিন মানুষ হবে না।' উনি দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন বললেন, 'শোন পম্পা তোমার বাড়ির যা অবস্থা, তাতে তোমার কিছু রোজগার করা উচিত। তুমি যদি বলো তবে আমার পরিচিত একজনের কাছে নিয়ে গিয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি। আয়ার কাজ করতে আপত্তি নেই তো?' বললাম, 'না, স্যার।' নিয়ে গেলেন কলকাতার ভারতী সেবাকেন্দ্রে। মালিক হরিহর সামন্তকে বললেন, 'মেয়েটি আমার স্কুলের ছাত্রী। লেখাপড়ায় বেশ আগ্রহ। কিন্তু বড় গরীব। যদি আপনার আশ্রয়ে থাকে তবে খুশি হই।' হরিহরবাবু বললেন, 'আয়ার কাজ করতে পারবে তো?' বললাম, 'হ্যাঁ পারব।' উনি একটা ছবি চাইলেন। রতনবাবু সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলালেন। নাম-ঠিকানা দিয়ে ছবি সমেত ফর্ম ভর্তি করলাম। রতন স্যার-এর দু'টো পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললাম, 'স্যার, আপনি আমার জন্য যা করলেন, নিজের বাবাও এতটা পারতেন না।' উনি বললেন, 'মানুষ হয়ে একজন দুঃস্থ মানুষের জন্য যদি কিছু না করি তাহলে কিসের মানুষ আমি।'

তারপর থেকে এই আয়ার কাজ করছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমাদের মতো মানুষের ঘরে কাজ পেয়েছি। সুচন্দ্রা বলে, 'দেখ তোমার শ্বশুরবাড়ির ওরাও মানুষ, আবার রতনবাবুও মানুষ কিন্তু কত তফাত। রতনবাবু ঠিকই বলেছেন, যতদিন না শিক্ষার আলো এদের মধ্যে পৌঁছোবে ততদিন এরা মানুষ হবে না।'

পরেশবাবু শুনতে পান, সুচন্দ্রা যেন কাউকে বকছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। দেখেন, পম্পা বসে আছে খাটের এক কোণে। সুচন্দ্রা উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে। বলছে, 'এখন তো নারীর অধিকার নিয়ে চারিদিকে আন্দোলন হচ্ছে। মহিলা কমিশন হয়েছে। নারী সুরক্ষা সমিতি হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে। যত আন্দোলন শহরে। গ্রামের খবর কে রাখে? এখনও মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। এই যুগে এখনও নারীরা পাচার হয়ে যায়। পেটের তাড়নায় বিক্রি হয়ে যায়। এই সভ্য শহরেও তো কত মেয়ে পণ প্রথার বলি হচ্ছে। দিকে দিকে মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে। পথে-ঘাটে আত্মসম্মান নিয়ে চলা দায় হয়ে পড়ছে। একজন নারী হয়ে অপর এক নারীর প্রতি অত্যাচার লাঞ্ছনা কিছুতেই সহ্য হয় না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেশবাবু ঘরে ঢোকেন। বলেন, 'কি হয়েছে বউমা, অত উত্তেজিত কেন?'

সুচন্দা বলে, কি হয়নি তাই বলুন। সংক্ষেপে পম্পার জীবনের ঘটনা খুলে বলে।

পরেশবাবু বলেন, 'ছিঃ ছিঃ এতো ক্রিমিন্যাল কেস। এর তো শাস্তি হওয়া উচিত।

সুচন্দা বলে, 'আমি মহিলা কমিশনে যাব। প্রশাসনের কাছে যাব। একজন নারী হয়ে নারীত্বের এ অপমান সহ্য করা যায় না।

অত উত্তেজিত হয়ো না। পরেশবাবু বলেন, ব্যাপারটা আমার ওর ছেড়ে দাও। ওই বর্বরদের জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ব।

দপ্তরে কাজ করার সময় সিআইডি ইন্সপেক্টর রণজয় মিত্রের সঙ্গে পরেশবাবুর গভীরভাবে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। পরদিন দেখা করেন তাঁর সঙ্গে। দীর্ঘদিন বাদে দেখা হওয়ায় রণজয়বাবু খুশি। বলেন, 'কি ব্যাপার দাদা। আমার কাছে। কোনও গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে কি?

পরেশবাবু পম্পার ব্যাপার আদ্যোপান্ত সব বলেন। রণজয়বাবু বলেন, 'উঃ মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?

পরেশবাবু বলেন, আমি ওদের বিরুদ্ধে কেস করব।

এখুনি নয়। আমি পুরোটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য লোক পাঠাচ্ছি। রিপোর্ট হাতে পেলে তারপর ব্যবস্থা। রণজয়বাবু অপারেটরকে নির্দেশ দেন, বসিরহাটের মথুরাপুর গ্রামে বা তার পাশে যে থানা আছে সেখানে লাইনটা লাগিয়ে দিন।

অপারেটর বলে, ওখানে বিষ্টুপুর গ্রামে থানা আছে। আমি এখুনি লাগিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিপ্রহরিক আহারের পর থানার বড়বাবু চেয়ারে বসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। টেলিফোনটা বেজে ওঠে। বিরক্ত বড়বাবু ধরে গলায় বলেন, কে আপনি? এই অসময়ে জ্বালাতন। কি চাই?

ওধার থেকে গলা ভেসে আসে ফোনের আবার সময় অসময় আছে নাকি? কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালুম বুঝি। শুনুন আমি ভবানীভবন থেকে সিআইডি ইন্সপেক্টর রণজয় মিত্র বলছি।

চক্রপানির তন্দ্রা ছুটে যায়। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে হাওয়ায় সেলাম ঠুকে বলে, হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার।

রণজয় বলেন, শুনুন আপনার এরিয়ার মথুরাপুর গ্রামের পম্পা মণ্ডল সম্বন্ধে কিছু চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। ইনভেস্টিগেশনের জন্য কাল প্রণব নায়েক ও তাপস বসু যাবে। ফাইলপত্তর রেডি রাখবেন।

চক্রপানির শরীরে কাঁপুনি ধরে। পম্পার কেস ভবনীভবন পর্যন্ত চলে গেছে। আসল কথা ফাঁস হলে তো চাকরি চলে যেতে পারে।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ পুলিশের জীপ এসে দাঁড়ায়। চক্রপাণি ব্যস্ত সন্তস্ত হয়ে অভ্যর্থনা জানান, বসুন স্যার। ওরে লঘনা দুটো চা নিয়ে আয়। লখনা চা নিয়ে আসে।

প্রণববাবু বলেন, 'কই পম্পা মন্ডলের কেসের কি ফাইল আছে দেখি।

চক্রপাণি মুচলেকা লেখার স্ট্যাম্প পেপার ছাড়া আর কিছুই দেখাতে পারে না।

AMARBOI.COM

প্রণববাবু জানতে চান, আচ্ছা, পম্পার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

চক্রপাণি জানায়, তা তো জানি না স্যার।

ও যে স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িতা সেটা জানেন তো?

—ডায়রী করতে এসেছিল তাই জানলাম।

কই ডায়রীর পেপারটা দেখান।

পারিবারিক ব্যাপারে পুলিশকে জড়াতে চাইনি তাই নিইনি।

—খুব অন্যায় করেছেন। এর জন্য আপনার শাস্তি হতে পারে, জানেন?

চক্রপাণি চুপ করে থাকে।

প্রণববাবু আবার বলেন, যাইহোক, এবার একটা লোক দিন অনন্তপুরে তপন মণ্ডলের বাড়ি যেতে হবে।

লখনা বলে, 'আমি যাবো স্যার।

অনন্তপুর যাওয়ার পথে প্রণববাবু লখনাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই যে ভাই তোমার ভালো নাম কি?

লখনা উত্তর দেয়, আজ্ঞে লখিন্দর, স্যার।

প্রণবাবু জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বড়বাবু কেমন লোক?

লখিন্দর বলে, এমনিতে খারাপ নয় হুজুর, তবে পয়সার লোভ খুব। এই তো পরশুদিন তপন মণ্ডল পাঁচ হাজার টাকা ভেট দিয়ে গেল।

প্রণববাবু বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে রাতের অন্ধকারে কত মেয়ে পাচার হয়ে যায়। বড়বাবু অ্যাকশন নেয় না? সত্যি কথা বলো না হলে তোমার বিপদ হবে।

—সত্যি বলছি স্যার, এদিকে চুরি-ডাকাতি কম। কিন্তু মাঝে মাঝে মেয়েরা পাচার হয়ে যায়। বড়বাবু জানেন না মনে করেন। পাচারকারীরা মোটা টাকা প্রণামী দেয়—। আমরা কিছু বলতে গেলে বলেন, 'চাকরি করার ইচ্ছা থাকে তো চুপ করে থাক। বেশি মাথা ঘামাস না। থানার কাউকে ভাগ দেয় না, সবটাই আত্মসাৎ করে। এই রে সব বলে ফেললাম। কিছু হবে না তো স্যার?

তুমি সত্যি কথা বললে কোনও ভয় নেই।'

পুলিশের জীপটা এসে দাঁড়ালো তপনের বাড়ির সামনে। দরজা খোলাই ছিল। প্রণববাবুরা বাড়িতে ঢুকে বললেন, তপন মণ্ডল কে আছেন? আমরা সিআইডি দপ্তর থেকে এসেছি।

তপন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বলে, আমি তপন মণ্ডল।

তপন ওঁদের বাইরের ঘরে নিয়ে বসায়। বলে, কি খাবেন স্যার? চা, শরবত।

প্রণববাবু বলেন, কিছুই প্রয়োজন নেই। আমরা যা জিজ্ঞাসা করব সঠিক উত্তর দেবেন। আচ্ছা বাড়িতে মাঙ্গলিক চিহ্ন দেখছি, কারো বিয়ে থা হয়েছে বুঝি?

—আমার স্যার।

প্রণববাবু জানতে চান, তাহলে পম্পা মণ্ডল কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আমার আগের বউ। নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। আর ফিরবে না বলে গেছে।

প্রণববাবু বলেন, আচ্ছা, আগের বউকে ডিভোর্স করেছেন? ডিভোর্স না করলে অন্য মেয়েকে বিয়ে করা অপরাধ সেটা জানেন?

তপন বলে, ডিভোর্স কি স্যার তা তো জানি না।

আগেকার আর এখনকার বিয়ের রেজেস্ট্রির কাগজপত্র আছে তো?

রেজিস্টারি তো জমিজমা বিক্রি করতে লাগে, বিয়েতে রেজেস্টারি করতে হয় তা তো জানি না। আমাদের গাঁয়ে এইসব কোথাও শুনিনি।

দুটো বিয়েই আন রেজিস্টারড।

এর ফাঁকে তাপসবাবু বাড়ির কাজের মেয়েটাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে যান। দু'জনের মধ্যে কিসব কথাবার্তা হয়। তাপসবাবু সেটা নোট করে নেন।

প্রণববাবু তপনকে বলতে থাকেন, পম্পাকে ডিভোর্স না করে আপনি অন্য আর একটি মেয়েকে বিয়ে করছেন, এজন্য আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে পম্পাকে দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে আপনার মা এবং আপনি উভয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং থানার বড়বাবুকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আর কখনও এ বাড়িতে আসবে না বলে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়েছেন।

এরপর ধমক দিয়ে বলেন, 'একথা অস্বীকার করতে পারেন? যতক্ষণ ডিভোর্স না হচ্ছে ততক্ষণ এ বিয়ে সিদ্ধ নয়। আইনত পম্পা এখনও আপনার স্ত্রী।

ইতিমধ্যে তপনের মা শান্তি দেবী বেরিয়ে আসেন। তাপসবাবু বলেন, 'কি মাসিমা, এবার ছেলের বিয়েতে বেশ ভালোমতন মালকড়ি বাগিয়েছেন। একটা অসহায় মেয়েকে পয়সার লোভে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে আপনার বিবেকে বাধল না?

শান্তি দেবী বলেন, না বাবা, আমরা তাড়াইনি। ও নিজে থেকেই, আর আসবো না বলে চলে গেছে।

—কিন্তু আপনি যে ঝাঁটা দিয়ে নির্মমভাবে মেরে মায়ে-ছেলেতে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, প্রচুর ধনরত্ন, দানসামগ্রী নিয়ে আবার ছেলের বিয়ে দিলেন। এসব কি মিথ্যা বলতে চান? জানেন কি এ কেস আদালতে গেলে আপনাদের কি শাস্তি হবে?

তপন এবার ভেঙে পড়ে। প্রণববাবুর পা ধরে বলে, 'স্যার আমাদের বাঁচান। যত টাকা চান দেব।

প্রণববাবু বলেন, তাহলে স্বীকার করছেন, আপনারা অন্যায় করেছেন।

প্রণববাবুরা থানায় এলেন। চক্রপাণিকে বলেন, এরিয়ার কোনও খবর আপনি রাখেন না। কিন্তু আপনার জ্ঞাতসারেই প্রায়ই এ অঞ্চল থেকে মেয়ে পাচার হয় এবং পাচারকারীরা আপনাকে মোটা টাকা দেয়। সম্প্রতি তপন মণ্ডল আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রণামী দিয়েছে। একথা অস্বীকার করতে পারেন। লালবাজারে আপনার রেকর্ড ভালো নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্রপাণি হাত জোড় করে বলেন, আমায় বাঁচান স্যার। ছাপোষা মানুষ লোভ সামলাতে পারি না। সত্যি বলছি স্যার, হারামের পয়সা আর খাবো না।

—এরপর যদি এ অঞ্চলে কোনও মেয়ে পাচার হয়, কিংবা কোনও মেয়ে নির্যাতিতা হয় তবে আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

প্রণববাবুরা তাঁদের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট রণজয়বাবুর হাতে তুলে দিল। রণজয়বাবু সেটা পুরোপুরি দেখে পরেশবাবুকে পম্পার হয়ে আদালতে মামলা করতে বলেন। পরেশবাবু পম্পার হয়ে মামলা শুরু করেন। বিচারপতি আদিত্য দেবনাথের এজলাসে। বাদী পম্পা মণ্ডল। সাক্ষী বাসন্তী দেবী ও সুচন্দ্রা গাঙ্গুলি। বিবাদী তপন মণ্ডল, মা গীতারাণি মণ্ডল। সাক্ষী কাজের মেয়ে ঝর্ণা বাউরী। পরেশবাবু নামী উকিল রাজনারায়ণ গুপ্তকে নিয়োগ করেন। জজ সাহেব প্রথমে পম্পাকে তার জবানবন্দি দিতে আহ্বান জানান। পম্পা বলে চলে। এই সময়ে রাজনারায়ণবাবু তাঁর অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে কিসব নির্দেশ দেন। সেই উকিলবাবু পম্পার মেয়ে ঝুম্পাকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, দিদুভাই ওই যে কাঠের খাঁচায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে, ওঁকে তুমি চেন?

ঝুম্পা বলে, 'বা রে, ও তো আমার মা।'

উকিলবাবু বলেন, 'মায়ের কাছে থাকতে ভালো লাগে না তাই না? দিদা বুঝি খুব ভালোবাসে?

ঝুম্পা বলে, ছাই, মার কাছে যাবো বলেছি বলে, মার কথা যদি বলবি তো গলা টিপে খুন করে ফেলব। শুধু বলে, 'অপয়ার, পাটি।'

—আচ্ছা, তোমার কার কাছে থাকতে ইচ্ছা করে?

—আমি মার কাছে যাবো। মার কাছে থাকব। উকিলবাবু পুরোটা টেপ করে নেন।

পম্পার জবানবন্দির সময়, বিপক্ষের উকিল কমলেশ চক্রবর্তী বারবার বলতে থাকেন, হুজুর সব মিথ্যা। সাজানো গল্প। আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।'

জজ সাহেব বলেন, আগে সবার জবানবন্দি নেওয়া, হোক, পরে সত্যি মিথ্যা যাচাই হবে।

এবার বাসন্তী দেবীর ডাক পড়ে। রাজনারায়ণবাবু জানতে চান, আচ্ছা, আপনি কি জানেন, সরকারি আইনে মেয়েদের আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া যায় না।

বাসন্তী দেবী বলেন, হুজুর আমরা গাঁয়ের লোক। ওসব আইনের কথা কিছুই জানি না। আমাদের গায়ে দশ-বারো বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। তাছাড়া আমার মেয়ে গায়ে-গতরে যেভাবে বেড়ে উঠছিল, তাতে ভয় লাগত। আর বেয়াইমশাই বিনা পণে মেয়েকে ঘরে নিলেন, তাই বিয়েটা দিতে পারলাম।

রাজনারায়ণবাবু অপরপক্ষের উকিল কমলেশবাবুকে বলেন, আপনার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

কমলেশবাবু বাসন্তী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, নিতাই মণ্ডল আপনাকে কত টাকা দিয়ে আপনার মেয়েকে নিয়েছেন?

বাসন্তী দেবী কেঁদে ফেলেন। বলেন, হুজুর বেয়াইমশাই দয়া করে আমার মেয়েকে ঠাঁই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন। আমিই পয়সার অভাবে পণ দিতে পরিনি। বেয়াইমশাই আমাকে টাকা দিতে যাবেন কেন?

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'অবজেকশন ইয়োর অনার। একটা অবান্তর প্রশ্ন। পণ পায়নি বলে যে বাড়ির কর্ত্রী বাড়ির বউকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারা বিয়েতে মেয়েপক্ষকে টাকা দিয়ে কিনে আনবে?'

জজসাহেব বলেন, অবজেকশন সাসটেইন্‌ড। এবার সুচন্দ্রার ডাক পড়ে। রাজনারায়ণবাবু বলেন, শুনলাম পম্পার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। একজন কাজের মেয়ের সঙ্গে আপনার মতো উচ্চশিক্ষিতা রুচিশীলা মহিলার বন্ধুত্ব হয় কি করে?

সুচন্দ্রা বলে, স্যার ও কাজের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু ওর ভদ্র-নম্র ব্যবহার, রুচিশীলতা, আমাকে মুগ্ধ করেছে। ও আমার বয়সী একজন নারী। ওর মধ্যে একজন সত্যিকারের নারীকে দেখেছি বলেই মেয়েটিকে এত ভালোবেসেছি। এতো অত্যাচার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও তার অন্তরের দুঃখ ব্যথা কাউকে বলতে চায়নি। আমাকে বারবার এড়িয়ে গেছে। তারপর মাথার দিব্যি দেওয়াতে সব খুলে বলেছে। একজন নারী হয়ে নারীত্বের এই অপমান কি সহ্য করা যায়? আপনিই বলুন। বলতে পারেন, নারীত্বের এই অপমান লাঞ্ছনা কি আবহমানকাল ধরে চলতেই থাকবে? কি শহর কি গ্রাম সর্বত্র একই অবস্থা। এত মহিলা কমিশন, নারী সুরক্ষা সমিতি কত কি-ই তো হয়েছে। কিন্তু সমাধান হচ্ছে কই। ইয়োর অনার আমি ওই শয়তানদের কড়া শাস্তি চাই।

জজ সাহেব বলেন, সুচন্দ্রা দেবী, আমিও বিশ্বাস করি আমাদের দেশে মেয়েরা সত্যি অসহায় এবং নির্যাতিতা। কিন্তু যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, শিক্ষার আলো না পৌঁছোয়, সমাজ ব্যবস্থা ঠিক না হয় এবং প্রশাসন কড়া না হয় ততদিন এই ঘৃণ্যপ্রথা চলতেই থাকবে। আমরা বিচার করে রায় দিই, কিন্তু সেটাকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব প্রশাসনের।

অপর পক্ষের উকিলকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, নো কোশ্চেন।

সুচন্দ্রা দেবী নেমে এলেন। বাদীপক্ষের জবানবন্দি শেষ। এবার বিবাদী পক্ষ। প্রথমেই ডাকা হল তপন মণ্ডলকে। কমলেশবাবু এলেন জেরা করতে, 'আচ্ছা, তপনবাবু আপনার স্ত্রী পম্পা মণ্ডলকে কি আপনারা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অকথা অত্যাচার করেছেন। যেটা পম্পা তার জবানবন্দিতে বলেছে।

তপন বলল, না হুজুর, ওর ওপর কোনও অত্যাচারই আমরা করিনি। ও নিজের ইচ্ছেতে আমাদের বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আমরা অনেক করে থাকতে বলেছি। কিন্তু শোনেনি। মা তো ওকে খুব ভালোবাসতো।'

কমলেশ বলে, 'দেখুন হজুর পুরো কেসটাই সাজানো, মিথ্যা। দ্যাট্‌স অল ইয়োর অনার।'

এবার রাজনারায়ণবাবু জেরা শুরু করেন, 'আচ্ছা তপনবাবু পিঙ্কিকে চেনেন?

তপন বলে, আমার স্ত্রী।

কিন্তু আমরা তো জানি পম্পা মণ্ডল আপনার স্ত্রী। এক স্ত্রী থাকতে তাকে বিয়ে করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? তার রূপে মুগ্ধ হয়ে? আচ্ছা আপনি পিঙ্কিকে বিয়ে করার আগে পম্পাকে ডির্ভোস করেছিলেন? আপনি কি জানেন প্রথম স্ত্রীকে ডির্ভোস না করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করা আইনত অপরাধ? তাছাড়া যতদিন ডিভোর্স না হবে ততদিন আইনত সে আপনার স্ত্রী। যে কোনও সময় আপনার বাড়ি এসে তার অধিকার কায়েম করতে পারে।

এই সময় কমলেশ বলে, 'স্যার গ্রামে-গঞ্জে ওসব কেউ জানেই না।'

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'কেস যখন আদালত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যখন আইনি লড়াই শুরু হয়েছে, তখন তো আইনকে অস্বীকার করার যাবে না। আইন ও সব ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করে না। সে শহরেই হোক, আর গ্রামেই হোক। আচ্ছা তপনবাবু, আপনার মেয়ে যখন জন্মাল, তখন পম্পার বিশ্রাম আর ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করেননি কেন? আপনি তো দেখতেন, মেয়েটা দিন দিন কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। তখনও তার দিকে নজর দেওয়ার কথা মনে হয়নি। তখন থেকেই কি পিঙ্কির খপ্পরে পড়েছেন? পম্পা নামে আপদটা এমনি করে শেষ হয়ে যাক, এটাই চাইছিলেন। তারপর সে যখন পিঙ্কির কথা জানতে চাইল তখন তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। পম্পা যখন ফিরে এসে উঠোনে বসে মেয়ে না নিয়ে যাবে না বলল, তখন আপনারা মা এবং ছেলে মিলে ঝাঁটা পেটা করে লাথি মেরে বাইরে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন এবং থানায় কর্তাবাবুকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি আর কোনওদিন যাবে না বলে, মুচলেকা লিখিয়ে নেন। এছাড়া সিআইডি ইন্সপেক্টরকেও ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন।

এরপর ধমক দিয়ে বলেন, বলুন এসব মিথ্যা। সিআইডি অফিসারের কছে দোষ স্বীকার করেছেন এবার আদালতে সত্যি কথাটা বলুন।

জেরায় তপন ভেঙে পড়ে। বলে, 'সত্যি হুজুর আমি অন্যায় করেছি।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'দ্যাট্‌স অল ইয়োর অনার।'

এবার শোনা গেল, 'গীতারাণি মণ্ডল হাজির....।'

গীতারাণি কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। রাজনারায়ণ জেরা শুরু করলেন, 'আচ্ছা, গীতা দেবী আপনি তপনের প্রথম বিয়েতে কিছুই পাননি। পম্পার মা দান-পণ কিছু দেয়নি, তাই না। তপনের মতো ছেলের বিনা পনে বিয়ে দিতে হল। আপানদের মতো পরিবারে এটা ঠিক হয়নি। যাইহোক, এবারের বিয়েতে মোটা টাকা নগদ, প্রচুর দানসামগ্রী তো পেয়েছেন। এবার খুশি নিশ্চয়ই।

গীতা দেবী বলেন, হ্যাঁ হুজুর, এবার বেয়াই অনেক দিয়েছেন। আর পম্পার মা ভিখিরির মতো বলল, কিছুই দিতে পারব না। তপনও ওকেই বিয়ে করবে বলল, আর বাড়ির কত্তাও ধম্মপুত্তুর হয়ে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে ঘরে তুলল। সবই আমার অদৃষ্ট।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, আহারে সেই দুঃখটা এখনও ভুলতে পারেননি। তাই না? যে কারণে পথের কাঁটা দূর করার জন্য মেয়েটাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলেন।

গীতাদেবী বলেন, না হুজুর, ও নিজে থেকেই চলে গেছে।

এবার রাজনারায়ণবাবু একটা ঝাঁটা নিয়ে বলেন, এটা চিনতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গীতা দেবী চমকে ওঠেন।

কমলেশবাবু বলেন, ওরকম ঝাঁটা বাজারে অনেক পাওয়া যায়।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, আমার মান্যাবর বন্ধুকে বলি, এই ঝাঁটায় যে ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে সবই গীতা দেবীর।

জজ সায়েব বলেন, প্রসীড।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, পিঙ্কির দাদুর কাছে মোটা পণ পাওয়ার লোভে পম্পার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যেতে লাগলেন। অথচ আপনার স্বামী কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন বলুন তো। আপনি ঠিক তার উল্টো। বাচ্চা মেয়েটাকে কোন মতলবে তার মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন? আপনি না একজন মা। আপনার বিবেক বলে কি কিছুই নেই?

গীতা দেবী বলেন, ওর মা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে, ওকে দেখার সময় পায় না তাই।

যদি বলি, নিজে আয়েস করার জন্য সমস্ত কাজ পম্পার ওপর চাপিয়ে দেন। একজন মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানকে দূরে রাখা যে কত অমানবিক কাজ, নিজে মা হয়েও সেটা বোঝেননি। ছিঃ। আপনি কি জানেন আপনার নাতনি আপনার কাছে থাকতে চায় না।

কমলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমার মাননীয় বন্ধু বোধহয় হাত গুণতে জানেন। বলে দিলেন নাতনি তার ঠাকুমার কাছে থাকতে চায় না। অথচ আমরা জানি বা দেখেছি সে ঠাকুমার কাছ থেকে কোথাও যেতে চায় না।

রাজনারায়ণবাবু একটা টেপ রেকর্ডার বের করে বলেন, রাজনারায়ণ গুপ্ত প্রমাণ ছাড়া কোনও কাজ করেন না। বলে তিনি টেপটা চালিয়ে দিলেন। সকলে ঝুম্পার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পায়।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, কি গীতা দেবী এরপরও আপনার কিছু বলার আছে? আপনার ছেলের সঙ্গে পম্পার ডিভোর্স হয়নি, অথচ সে আবার বিয়ে করেছে। আপনি পয়সার লোভে তাদের বিয়ে দিয়ে অপরাধ করেছেন। শুনুন আপনার অপরাধ। বাড়ির বউকে ঠিকমতো খেতে না দিয়ে, অসুখের চিকিৎসা না করিয়ে, তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। পম্পার ভাগ্য ভালো সে মারা যায়নি। দ্বিতীয়ত, একজন মায়ের কাছ থেকে তার মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখে, দিনের পর দিন মানসিক কষ্ট দিয়েছেন। তৃতীয়ত, বাড়ির বউকে ঝাঁটা পেটা করে, লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। আপনি যেতে পারেন।

তারপর শোনা গেল, 'ঝর্ণা বাউরী হাজির....।'

ঝর্ণা কোনওদিন কলকাতা দেখেনি। তারপর কোর্ট-কাছারি, কালো কালো জামাপরা উকিলবাবুদের দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। জামাপরা উকিলবাবুদের দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে কাঠগড়ায় দাঁড়াল, মনে হল এখুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

রাজনারায়ণবাবু বললেন, আরে অত ভয় পাচ্ছ কেন? যা জিজ্ঞাসা করব ঠিক ঠিক জবাব দেবে। তোমার নাম কি?

ঝর্ণা, ঝর্ণা বাউরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কতদিন ও বাড়িতে কাজ করছ?'

—'তা পাঁচ বছর তো হবে আজ্ঞা।'

-আচ্ছা তপনের আগের বউ পম্পা খুব দজ্জাল আর ঝগরুটে ছিল, তাই না?

ঝর্ণা গালে হাত দিয়ে বলে, 'ওমা গো, কোন মড়া, খেকোর ব্যাটা একথা বলে? বউ দিদিমণির মতো মানুষ হয় না। কত কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করত। কারুকে কিছু বলত না। দেখে আমার খুব কষ্ট হত। একবার তো কলতলাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বড়মা বললে, ওসব কাজ না করার ফন্দি। কিছু হয়নি।' কেমন নোক গো। কতদিন ভালো করে খেতেই পারত না। আমি বা পারত্যাম কাজ করে দিত্যাম। মেয়ে হওয়ার পর কোনও চিকিচ্ছেও হয়নি। তারওপর ওই খাটনি। আমন সুন্দর শরীলটা হাড় বার কারা কঙ্কাল হয়ে গ্যালো। তপন দাদাবাবু পেথম পেথম ভালোই বসতো। কিন্তুক, ওই সর্ব্বোনাশী পিঙ্কির সঙ্গে পিরীত হওয়ার পর থেকে দাদাবাবু বদলে গেল। কথায় কথায় মারধোর করত।

রাজনারায়ণবাবু ঝাঁটাটা নিয়ে বলেন, একটা চিনতে পারো?

—ওমা ওই তো সেই নোয়া বাঁধানো ঝ্যাঁটা। এটা দিয়েই তো বড়মা বউদিদিমণিকে কি মার মারলে গো। সব্বাঙ্গ কেটে রক্ত পড়ছিল। ওই মার খেয়েও বউদিদিমণি কঁকাচ্ছে, 'আমার মেয়ে ফেরত দাও। নাহলে পুলিশের কাছে যাব। তখন তপন দাদাবাবু চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে, 'পুলিশের কাছে যাবি হারামজাদি, তাই যা' বলে পেছন থেকে এক নাথি।

বউদিদিমণি মুখ থুবড়ে দরজার বাইরে পড়ে গেল। দাদাবাবু দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর থেকে আর বউদিদিমণিকে কোনওদিন দেখিনি।

রাজনারায়ণবাবু জজ সায়েবের দিকে চেয়ে বললেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আই উইটনেস।'

ঝর্ণাকে বললেন, 'তুমি যাও। কোনও ভয় নেই।' এবারে ডাক পড়ল দারোগা চক্রপাণি সমাদ্দরের। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খটাস্ করে একটা সেলাম করলেন।

রাজনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'মি. সমাদ্দার আপনি তো বিষ্টুপুর থানার বড়বাবু অর্থাৎ বড় দারোগা তাই না? মথুরাপুর আর অনন্তপুর আপনার জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে, তাই তো?

চক্রপানি বলেন, ইয়েস স্যার।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'শুনুন মি. সমাদ্দার, আপনার নামে অনেক কমপ্লেন আছে। পম্পা দাস বলে মেয়েটির জীবনে যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে আপনি তার কোনও খবর রাখেননি। আপনি তার ডায়রী নিতে অস্বীকার করে আইনত অপরাধ করেছেন। এরপর তপন মণ্ডলের কাছে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে, পম্পার কাছে লিখিয়ে নেন—সে স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। আর কখনও সেখানে যেতে চায় না। আপনার এরিয়ার রাতের অন্ধকারে কত মেয়ে পাচার হয়ে যায়। পাচারকারীরা আপনাকে মোটা টাকা ঘুষ দেয়। অথচ আপনার এরিয়ায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে কোনও খবরই রাখেন না। আপনার মতো দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ তো সমাজের শত্রু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্রপাণি মাথা নিচু করে সব শুনছিলেন। এইবার মাথা উঁচু করে দু'কানে হাত দিয়ে বলেন, 'এই কান ধরছি স্যার, আর কখনও ওসব হবে না।'

এজলাসে সকলে হেসে ওঠে।

চক্রপাণি বলেন, 'ছাপোষা মানুষ স্যার। লোভ সামলাতে পারি না, দু-চার পয়সা খেয়ে থাকি। আর কখনও হারামের পয়সা খাবো না স্যার। যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব। শুধু দেখবেন, চাকরিটা যেন না যায়। তাহলে ধনের প্রাণে মারা পড়ব স্যার।

রাজনারায়ণবাবু বলেন, সেটা আদালতের বিষয়, লালবাজারও আপনার রেকর্ড খুব ভালো নেই। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। এখন যান।'

জর্জ সায়েব জিজ্ঞাসা করেন, আর কোনও সাক্ষী আছে?

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'না স্যার, আজকের মতো শুনানী শেষ।'

জর্জ সায়েব বলেন, 'আগামী ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার, রায় দান হবে। দ্যা কোর্ট ইজ অ্যাডজরন্ড।

২ এপ্রিল। আদালত উপছে পড়ছে ভিড়ে। অধীর আগ্রহে সবার অপেক্ষা, কি হবে আজকের রায়ে। সময়মতো এলেন জজ সায়েব। শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য, 'বাদী এবং বিবাদী পক্ষের সমস্ত বক্তব্য এবং সিআইডি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বাদী পম্পা দাসের ওপর যে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা করা হয়েছে, তা সর্বাংশে সত্য। এই নির্মম অত্যাচারের ফলে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আদালত তার মর্মবেদনা উপলব্ধি করে তার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। মাননীয় পরেশ গাঙ্গুলি ও সুচন্দ্রা গাঙ্গুলির সহৃদয়তার পম্পা তার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। এরজন্য পরেশবাবু ও সুচন্দ্রা দেবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আদালতের পক্ষ থেকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে ঝুম্পা অর্থাৎ পম্পার মেয়ে এবার মায়ের কাছে থাকবে। বাদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী বাসন্তী দেবী একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ, আইন কানুন কিছুই জানেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপাকে পড়ে পণ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেয়ে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আদালত তাঁর এই অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে।

সাক্ষী সুচন্দ্রা দেবীর বক্তব্য আদালত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুমোদন করে। আদালতও মনে করে এদেশে নারীরা কত অসহায়। কি শহর, কি গ্রাম সর্বত্র সমান। নারীত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা এখনও সমানভাবেই সক্রিয়। প্রশাসন যদি সক্রিয় না হয়, তাহলে অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই হবে না। যতদিন মানুষ সত্যিকারের মানুষ না হবে ততদিন সমাজে এই সব জঘন্য প্রথাগুলো চলতেই থাকবে।

বিবাদী তপন মণ্ডলের অপরাধের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রথমত—জ্ঞাতসার বা অজ্ঞাতসারে একজন নাবালিকাকে বিয়ে করা, দ্বিতীয়ত—প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাকে ডির্ভোস না করে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা, তৃতীয়ত—অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসা না করিয়ে পর্বতপ্রমাণ কাজের বোঝা চাপিয়ে তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, তার ওপর তাকে নির্মমভাবে মারধোর করে, অপর একটি মেয়ের প্রতি মোহ বশত নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে চিরদিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে আর কোনওদিন ও বাড়িতে না আসা এই বিষয়ে জোর করে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, সিআইডি ইন্সপেক্টরকে ঘুষ দিতে যাওয়া এ সমস্তই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই সমস্ত অপরাধ সংগঠিত করার জন্য তপন মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। আপাতত সে পুলিশের হেফাজতে থাকবে। গীতারাণি মণ্ডলও একই দোষে দোষী। মা ও ছেলের যুগ্ম অত্যাচারে একটি মেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোনও নারী যে অপর একটি নারীকে নির্মমভাবে ঝাঁটা দিয়ে মারতে পারে এটা একটা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। প্রভূত যৌতুকের লোভে পিঙ্কি মণ্ডলের সঙ্গে তপনের বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম পুত্রবধূকে চিরদিনের মতো বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতে তপনকে উত্তেজিত করতে থাকেন। ঝর্ণা বাউরির সাক্ষীতে সব প্রমানিত। নিজে একজন মা হয়ে অপর একজন মায়ের কোল থেকে তার শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে পারে, সে একজন নারী হতে পরে না। মানুষ হয়ে পশুর মতো আচররণ। সমস্ত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় গীতা মণ্ডলকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জজ সাহেব পম্পার উদ্দেশ্যে বলেন, 'পম্পা দেবী আইনত আপনি এখন তপন মণ্ডলের স্ত্রী। আপনি কি আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আপনার অধিকার পেতে চান?

পম্পা, কাঠগড়ার সামনে এসে হাত জোড় করে বলে, 'হুজুর, যারা আমাকে ঘেন্না করে কুকুর বেড়ালের মতো মেরে চিরদিনের মতো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সারা জীবনের মতো তাদের আর মুখ দেখতে চাই না। আমার স্বামী আবার একটি বিয়ে করেছে। কোনও মেয়ে কি সতীনের ঘর করতে চায়? হুজুর, আমি ওই স্বামীর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাছাড়া পিঙ্কিও তো আমার মতোই একজন মেয়ে। ও যাতে সুখী হয়, সেটাই আমি চাই। আপনার দয়ায় আমার মেয়ে ফিরে পেয়েছি, এতেই আমি সুখী।'

জজ সাহেব বলেন, 'আমি পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছি, তপন মণ্ডলের ফসলী জমি অধিগ্রহণ করে সেটা বিক্রির ব্যবস্থা করে ওই টাকা পম্পা দাস এবং তার মেয়ের ভরণ-পোষণের জন্য পম্পা দাসের হাতে তুলে দিতে, যাতে সে ভদ্রভাবে সুখী জীবনযাপন করতে পারে।

বিষ্টুপুর থানার বড় দারোগা চক্রপাণি সমাদ্দার তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ভরা এজলাসে কান ধরে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু আইনত তিনি যে অপরাধ করেছেন, তার জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে, তাঁর একবছরের সাসপেনশন এবং তারপর অন্যত্র বদলির প্রস্তাব রাখা হল।

সুচন্দ্রা পম্পাকে জড়িয়ে ধরে। আবেগে দু'জনেরই চোখে জল। পম্পা বলে, 'বউদিদি, তুমি আর মেসোমশাই আমার জন্যে যা করলে আমি কোনওদিন তা শোধ করতে পারব না।'

সুচন্দ্রা বলে, 'বন্ধু হয়ে বন্ধুর জন্য এটুকু যদি না করতে পারলাম তবে কিসের বন্ধু। তাছাড়া আমি তো সমগ্র নারীজাতির অসহায়তার কথা সমাজকে শোনাতে চেয়েছি। আদালত আমার কথার মানাতা দিয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোর্ট থেকে বেরিয়ে পম্পা পরেশবাবু ও লীলা দেবীকে প্রণাম করে। বলে, 'আজ থেকে আর মেসোমশাই-মাসিমা নয়, বাবা আর মা বলে ডাকব।'

পরেশবাবু বলেন, 'ভালোই তো মেয়ে ছিল না, একটা মেয়ে পেলাম।'

এমন সময় মি. রণজয় মিত্র এগিয়ে এলেন, বললেন, 'পরেশদা আপনি একটা অসহায় মেয়ের জন্য যা করলেন এক কথায় তা অভূতপূর্ব।

উত্তরে পরেশবাবু বলেন, যা করেছে আমার এই বউমা সুচন্দ্রা। আমি শুধু সাহায্য করেছি।

রণজয়বাবু, সুচন্দ্রাকে বলেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন, মিসেস গাঙ্গুলি। আদালতে আপনার বয়ান আর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কি জানেন, আমাদের অগোচরে যে এইরকম কত অন্যায় অপরাধ ঘটে চলেছে সবটা আমাদের গোচরে আসে না। আমি স্বীকার করছি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যথেষ্ট গাফিলতি আছে। তাছাড়া পুলিশকেও অনেক সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়।'

সুচন্দ্রা বলে, 'বলুন তো মি. মিত্র অসহায় নারীরা আর কতদিন অত্যাচার অনাচার মুখ বুজে সহ্য করবে?'

রণজয় বলেন, 'আসলে প্রকৃত শিক্ষার অভাব। মানুষ যতদিন না সত্যিকারের মানুষ হচ্ছে ততদিন এটা চলতেই থাকবে।''

সুচন্দ্রা বলে, আপনি শিক্ষার কথা বলছেন, আমরা শহরের লোকেরা নিজেদের শিক্ষিত বলে গর্ববোধ করি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজেও মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতার ভোগে কেন? এই যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে কত আইন হচ্ছে, সত্যিই কি সেটা বন্ধ করা যাচ্ছে? অনেক শিক্ষিত ছেলেরাও সে সময় কোনও আপত্তি করে না। রাস্তা-ঘাটে কত মেয়েকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তাছাড়া ইভটিজিং নামে এক ঘৃণ্য অনাচার চলছে। পুলিশ বন্ধ করতে পেরেছে?—

রণজয় বলে, 'আপনার সমস্ত কথা মেনে নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা এই পাপ কি সহজে মুছে ফেলা যাবে। সময় লাগবে।

হাতমধ্যে হরিহরবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেন, সত্যি বউমা, আর তো এদের জগতটাকে দেখছি। গ্রাম গঞ্জের অবস্থা ভয়াবহ। কত নিরন্ন পরিবারের মেয়েরা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়, বিক্রি হয়ে যায়, স্বামীর অত্যাচারে পালিয়ে এসে দুষ্কৃতির খপ্পড়ে পড়ে, জীবন শেষ হয়ে যায়।

সুচন্দ্রা বলে, 'তবু তো আপনি কত অসহায় মেয়েকে ঠাঁই দিয়ে তাদের দুটো পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করছেন।

হরিহর বলেন, তা যতটুকু পারি করার চেষ্টা করি।

বাসন্তী দেবী এবার পরেশবাবু ও লীলা দেবীকে প্রণাম করে বলেন দাদা এবার আমরা যাই।

আপনারা মানুষ নন দেবতা। আপনাদের জন্য আমার মেয়েটা যে বেঁচে গেল এটাই আমার আনন্দ। দিদিভাই কোনওদিন মায়ের ভালোবাসা পায়নি। তাই ও আপনাদের কাছেই থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেশবাবু বলেন, সে কি আজকেই চলে যাবেন। তা কি করে হয়।

বাসন্তী দেবী বলেন, 'না দাদা, বাড়ি একলা ফেলে কুথাও থাকতে পারি না। তাছাড়া আর একটা মেয়ে আছে। তাকে একলা ফেলে কি করে থাকি। আপনাদের উপকার কখনও ভুলতে পারব না।

পম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'ভালো থাকিস মা। এরমধ্যে একবার বাড়ি আসিস। দিদিভাই লক্ষ্মী হয়ে থেকো কেমন!

বাসন্তী দেবী চলে যান। হরিহরবাবু বলেন, এখন পম্পা তো আপনাদেরই মেয়ে। সুতরাং, ওর ওপর সেন্টারের আর কোনও অধিকার রইল না। ওকে মুক্তি দিলাম। এবার ওর পুনর্জন্ম হল।'

পম্পা দেখে ও বাড়ির কাজের মেয়ে ঝর্ণা এগিয়ে আসছে। এসে সবাইকে প্রণাম করে। বলে, ওই শয়তানরা কি কষ্টই দিয়েছিল গো তোমাকে। এবর সব জেল খাটুক। ভগবান আছেন। তিনি আর বিচার করেন। চলি গো বউদিদিমণি। ভালো থেকো।

পরেশবাবু বলেন, 'ঝর্ণা, তুমি সব সত্যি কথা বলেছ বলে মিষ্টি খেতে দিলাম, বলে, একটা একশো টাকার নোট তার হাতে দেন। সে সঙ্কুচিত হয়ে সেটা নেয়।

পরেশবাবু বলেন, চলো এবার সব যাওয়া যাক। এই কেসে আমার লাভ, একটা মেয়ে ও নাতনিকে পাওয়া। সব ভালো যার শেষ ভালো।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৯ আগষ্ট ১২.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকার আলি বৈদ্য

আবুল বাশার

বাবার কাজ ছিল লাশ বওয়া। ভ্যানে করে বইতেন। সেটাই পেশা। এদিকে দক্ষিণ। দক্ষিণে এলে এই পেশার লোক অদৃষ্টগুণে সহজেই দৃষ্ট হয়। যাঁরা দেখেন নাই, তাঁরা এখনও মাতৃগর্ভেই আছেন ধরে নিতে হবে। কারণ, মানুষের উপজীবিকা সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে বিস্তর পা-বাজি না করে উপায় নেই। জায়গাটার নাম কোল-পাছড়া। এসেছেন কখনও? আসেন নাই। তা হলে মাতৃগর্ভেই আছেন বাবুমশাই।

বাবার নাম ছিল চমৎকার আলি বৈদ্য। বৈদ্যর দুই কন্যে— সোনাভান আর রূপবান। আসলে সোনাভানু বৈদ্য। রূপবানু বৈদ্য। অর্থাৎ সোনা বৈদ্য। রূপা বৈদ্য। চমৎকারের ঘরে পুত্র জন্মে নাই। সোনারূপাই সন্তান। দুই বোন দেখতে কালো; তবে নীল-ঘেঁষা কালো। আস্থা গোড়া থেকেই চকচকে দোহারা। শরীরের গাঁথুনি মজবুত। অত্যন্ত ঝাড়ালো হাত-পা। ৬ ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা; রূপা বৈদ্যর উচ্চতা ৬ ফুটের এক ইঞ্চি বেশি বই কম না। এখনও বাড়বে বই কমবে না। কারণ দুজনের বয়স এখনও আঠারো পুরে নাই। রূপা পনেরো। সোনা সতেরো। মুখের আড়া লম্বাটে। কপাল ছোট এবং সামান্য উঁচু। দুজনেরই থাকাগাল মুখ ছোট। তলার ঠোঁট গুটলি মতোন পুরু। এবং চোয়ালের হাড় অল্প ঠেলে উঠা। গাল দুটি ঈষৎ চাপা। তবে দুজনের চোখ দুটি ভারী সুন্দর; ডাগর আর সুর্মা-কালো; অত্যন্ত মায়াবী আর ভেজা-ভেজা। এদের বিয়ে বাপ দিতে পারেন নাই। বর জোটানো কঠিন। যদিও এক বোন ছিল হরবোলা; কিন্তু ওই গুণের কদর কে করে! মোট কথা, অত চোয়াড়ে কনে লোকে নেয় না। অত লম্বা মেয়ে নিতে লোকে কেমন নাদো-নাদো করে।

এছাড়া চমৎকারের পেশা নিয়ে লোকের মনে চাপা একটি অশ্রদ্ধা রয়েছে। দাশু ডোম সম্বন্ধে যে ধারণা, ঘৃণাযুক্ত অবজ্ঞা দেখা যায়, তেমনি একটি হীন দৃষ্টি চমৎকারের বেলাতেও কিছুটা লোকে বর্ষণ করে—অথচ চমৎকার বৈদ্য ডোম নন মোটে।

চমৎকার অবশ্য কখনও বুঝে পাননি, মরা লোক বইলে, হীন কাজটা কোথায় হয়! মানুষ, বিশেষ করে কোল-পাছড়া এলাকার মানুষ মরবার জন্যই তো তয়ের হয়েছে— একটা কোনও উপলক্ষ পেলেই 'পট' করে এন্তেকাল করে দেয়।

কোল পাছড়ায় দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~ মরে যায় এলেই যা ভাবনা। চমৎকারের এত

কদর। এখানে সর্বক্ষণ একটা হু হু-করা হাওয়া বইছে; হাসরের ময়দানের হাহাকারের মতো। সেই হাহাকারের ভেতর দিয়ে ভ্যানঅলা চলেছেন। যখন তিনি চলতেন, লোকে জানে, তখন তিনি লাশের সঙ্গে বিস্তর কথা বলতেন। সর্বক্ষণ লাশের সঙ্গে থাকলে, কথা না বলে থাকা যায়। চমৎকার তো আর কসাই নন, কিংবা ডোমের মতো পাষাণ! তাঁর অন্তরে খোদার মায়া মুহব্বত, দয়া করুণা ইত্যাদি ঘোলানো জিনিস টইটই করছে। পাঁচবেলা পারেন না, কিন্তু দু'বেলা করে নামাজ দেন। অতি প্রত্যুষে, সূর্য ফাটবার আগে আর মগরিবে, সন্ধ্যায়।

চমৎকারের স্নায়ুতে বিশেষ এক ধরনের গোলযোগ ছিল, আর তা হচ্ছে, তিনি মৃতদেহ থেকে পচা গন্ধ পেতেন না। এক ধরনের খুশবু পেতেন বরং। হতে পারে, যে পথে ভ্যান চালিয়ে লাশ নিয়ে আসতেন-যেতেন সেই পথের দু'ধারে লোক-ঔষধির বনবাদাড় ছিল, নানান বনফুলে তন্ময় ছিল সুবাসিত হাহাকার করা হাওয়া। তা ছাড়া, চট পরা এক ফকির তাঁকে এক ধরনের গন্ধ তেল দিয়ে গিয়েছেন বরাবর; সেটা চাঁদিতে থাবিয়ে নিয়ে তিনি লাশ টানতেন। ফলে প্রতিটি মৃত্যুই ছিল খুশবুদার, গন্ধঘোরে বহতা।

চমৎকারের মেয়েদের বেলায় দেখা গেল, লাশের স্বাভাবিক গন্ধই তারা পাচ্ছে, লাশের সুঘ্রাণ কিছু নেই। বাপ মরলে, পেটের দায়ে উপায়ান্তর না দেখে সোনাভান-রূপবান বাপের ব্যবসায় নেমে গেল। বাপের লাশ বওয়া দিয়েই তারা ব্যবসার বউনি করল। বাপের লাশের সঙ্গে আরও দুটি লাশ তাদের টানতে হয়েছিল। তার একটি লাশ একজন মাস্টারমশাইয়ের; অন্য লাশটি স্কুলের ছাত্র। কোল-পাছড়ার নরসুন্দরের ডিহির বটতলায়, সেখানে খুনে পুকুরের গায়েবি মসজিদ, তার সামনে পির গোরস্তানে অক্কা পেলেন চমৎকার। অদ্ভুত জায়গায় মরলেন বাপ।

—আমাধেরে বাপটি ঠিক করলোনি রূপা। মাগো, তুমি কী কও? বলে উঠল সোনাভান। মা আর বোনের উদ্দেশে সোনার হাহাকার। — আগে নিয়া আনো বাপেরে, তার পর জুবান চাইলে কথা কহিও। গায়েবি মসজিদে তেনার এন্তেকাল; ভাবিও বাপটি সুতরাং আম-আদমি ছিলোনি সোনা।

গলার মথিত বেদনায় গেয়ে উঠলেন মা ফুলতন মুর্শিদাবাদী। ফুলতন হয়ত বা ফুলতনুর অপভ্রংশ কিংবা অন্য কিছু; মুর্শিদাবাদ বাপের ঘর, তাই তিনি মুর্শিদাবাদী দোখনো; মুখভাষে দুই জেলার উপভাষার অনায়াসে মিশেল ঘটে তয়ের হয়েছে আশ্চর্য দিগভাষ; যা শ্রুতিমধুর করেছে ফুলতনুর বয়েত।

সুতরাং সেই ভাষার ধাক্কায় দুই ধিড়িঙ্গে কন্যে পথে নামল। ওরা বাপের কাছে আবদার করে লোকের চোখের আড়ালে ভ্যানের 'প্যাডলারি' শিখেছিল এক প্রকার। প্যাডলারি বলতে প্যাডেলমারি বুঝবেন বাবুমশাই।

বাপ মধ্যেমধ্যে মোক্ষম দুটি বাক্য কইতেন। বলতেন, চটবাবা মনসুর হল্লাজের গন্ধ তেল যতেক দিন সাপ্লাই আছে, লাশে তদ্দিন 'বদবু' নাই মা। মনসুর মরলে, এই বান্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের লাশপচা গন্ধেই মইরে খালাস হবে; শেষের সে দিন কেমন হবে ভাবিও।

— তেলের নাম কী বাপু?

— নামটি কঠিন। 'রুহানি নহর'।

বলা বাহুল্য, সেই তেল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দৈবাৎ। কেউ বলতে পারে না, মনসুর ফকিরের কী হয়েছে! তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কিনা কে জানে!

এ কথা ভাবতে ভাবতে ওরা দুই বোন গায়েবি মসজিদের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছায়। তখন ঘোরতর সন্ধ্যা। এই মসজিদে কখনও নামাজ হয় না। শোনা যায়, এ মসজিদ কোনও এক পিরের নির্দেশে রাতারাতি জিনেরা গড়ে তুলতে তুলতে দিনের আলো ফুটে যায় বলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে যায়; তাই এর ছাদ নেই। শোনা যায়, এই মসজিদ মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়, কেউ কেউ সেই দৃশ্য দেখেছে, তাই এখানে এলে সবারই গা ছমছম করে। বাবা এই জায়গায় এসে মনসুর গন্ধ তেল দিয়ে যেতেন।

সোনভান লক্ষ্য করে, ঘাসের মধ্যে বাবার ডেড বডির পাশে তেলের শিশিটা পড়ে আছে। বাবা, মাস্টার আর ছাত্রের মরদেহ খেজুরপাতার চাটাই আর ঝ্যালঝেলে চট দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে তৈরি হল ভ্যানে করে বয়ে আনার জন্য। কোল-পাছড়া হাইস্কুলে দলীয় দুষ্কৃতীরা ঢুকে ওই মাস্টারমশাইকে গুলি চালিয়ে খুন করে। ছাত্রটিকেও রেহাই দেয়নি। মাস্টারমশাই থাকতেন তাঁর দলের একটি ক্ষুদ্র কমিউনে। তিন-চারজন মিলে। ছাত্রটিও সেখানে থাকত। মাস্টারমশাইয়ের বয়েস চল্লিশ ছুঁয়েছে, অন্য দলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে খতম করল। তাঁর ছাত্রটিকে শেষ করে দিল।

এই অবস্থায় বাবা মসজিদের এখানে এসে লাশ নামিয়ে ফেললেন কেন, বোঝা যাচ্ছে না। বাবা দুটি কমিউনে যাওয়ার কথা। গেল না। এখানে পড়ে রইল। বাবা নিজেই মারা গেলেন।

লাশটা হাত তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে সোনাভান। শিশিটার তলায় রক্তরঙা তেল একটি রেখার মতো জড়িয়ে রয়েছে। এই মাস্টারমশাই সোনারূপারও ফাইভ-সিক্সের মাস্টারমশাই অতুল মাইতি; তাদেরও মাইতি স্যার। ওরা দুই বোন সেভেন-এইটের বেশি লেখাপড়া করেনি। লম্বা হয়ে যাওয়ার লজ্জায় স্কুল বন্ধ করে দেয়। কিছুদিন আগেও দুই বোন মাঝে মাঝে স্কুল গিয়েছে। মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে লাশ বওয়ার কাজে সঙ্গ দিয়েছে। অন্য বাপের সঙ্গে এ কাজ করে শুনে স্কুলের কিছু স্যার ওদের ঘৃণা করত। কোনও ছাত্র বা ছাত্রী ওদের পাশে বসতে চাইত না—দুর্বাদল অধিকারী স্যার তো সোনাভানকে আলাদা করে একখানা বেঞ্চ দিয়ে বসাতেন—রূপাকেও তাই। এইটে সোনা। সেভেনে রূপা। একখানা বেঞ্চে একা আগলে থাকত। কেউ পাশে বসত না। সোনারও না। রূপারও না। শুধু মাস্টার স্যার ওদের কখনও ঘৃণা করেননি।

দুর্বা স্যার এক দিন রূপবানকে বললেন, আসো কেন ইসকুলে। বাপে লাশ বয়, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমন করে বয় বলেই তো এমন করে নেতা-কর্মী নিধন হয়। রুহানি তেল দেয় মাথায়, যেন একটা ফরিস্তা। লজ্জা করে না তোদের!

— কী বইলে এমনটি বলেন স্যার! আমরা কী কইরব! বাপে লাশ টানে, এটি স্যার বলবনি যে নতুন কথা হল! কবে থিকে টানছে বাপজান! টানতে টানতে বাপ থকে গেল· স্যার। বলে ওঠে রূপবান। রূপা তর্ক করছে দেখে খেপে ওঠেন অধিকারী। বলে ওঠেন, চুপ কর বেয়াদপ মেয়ে কোথাকার! তুমি জানো, মানুষ কেন খুন হচ্ছে? মানুষ খুন করে কেন জানো? লাশ বইবার মানুষ না থাকলে মানুষ কি খুন হত? হত না। তোর বাপের শাপে মানুষ মরে বৈদ্য। বাপ যে তোর মাইতিবাবুর ক্যাডার।

— না স্যার! বাপ কারও দলে নেই। মসজিদে উঠতে পায় না। নামাজ-সত্রে জায়গা পায় না। শুধু মাইতিবাবু বাপুরে ঘিনায় না, তাই কি ক্যাডার হলেন বাপু: বাপ কী করতিছে আল্লারসুল জানে।

—যা। চলে যা। বাপ মরলে খাবি কী? মনসুরের তেল মাথায় দিবি আর লাশ বইবি, যা। মনে রাখিস, মনসুরকে খতম করারও লোক আছে! তেল যেদিন বন্ধ হবে, বুঝবি!

তেলের শিশি নাড়তে-চাড়তে দুর্বা স্যারের কথা মনে পড়ে যায় সোনাভানের। রূপা কেমন করে কাঁদতে কাঁদতে স্কুল ছেড়ে এল, মনে পড়ে। শিশির ছিপি খুলে নাকের কাছে ধরল সোনা বৈদ্য। কী সুন্দর সেই গন্ধটা তার নাকের ফুটায় ঢুকে মস্তিষ্কের কোষে গিয়ে কী একটা সুখ দিতে লাগল এবং তার পর তার অদম্য কান্না পেতে লাগল। মনে পড়ল, বাপ কাঁদতে কাঁদতে লাশ টানতেন। তেমনিতের হাহাকারের মতো হত বাপের।

— ছিপি আঁটায়ে দে সোনা। তেলটুকুনি থাক। শিশি থিকা যা গন্ধ পাব, তাই শুঁকে লাশ টানব দুই বহিনে। মনসুরকে খুন করেছে হয়ত। বলে উঠল রূপবান।

— কে খুন করল? করা?

— চ। বাপু রে শুধায়।

চমৎকার বৈদ্য লাশের সঙ্গে কথা বলতেন। লাশ চমৎকারের সঙ্গে কথা বলত। অতএব দুই বোনে ধারণা করল, মৃত বাপ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। এই বিশ্বাসে তারা তাদের বাপু, তাদের স্যার এবং ছাত্র নবান্ন ওরফে নবুকে ভ্যানে তুলল।

মসজিদের দিকে চেয়ে দেখল, মসজিদটা নেই। দুই বোনই তেলের খুশবু নিয়েছে নাসিকায়;তারা সুখের মৌতে অবাক। তারা কাঁদছে। সোনা চালাচ্ছে ভ্যান। রূপা লাশ আগলে হেঁটে চলেছে। কখনও বা ভ্যানে লাশের পাশে বসছে সাবধানে। ভ্যানের তক্তা দৈর্ঘ্যে অস্বাভাবিক; মানুষ প্রমাণ এবং চওড়াও বেশি। ওরা চলেছে কমিউন।

কমিউন ছোট। মাইতি স্যার অবিবাহিত। নবান্ন, যাকে বলে এতিম। বাপ-মা নেই। অন্য জেলার ছেলে। আরও দু-তিনজন থাকেন। দুজন অতিপ্রবীণ—আশির ওপর বয়েস। যে ছেলেটি তরুণ, নাম অশোক মিদ্যা, সে কখনও থাকে, কখনও পার্টির কাজে গ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে চলে যায়; কখনও দেশের বাড়ি বিধবা মায়ের কাছে গিয়ে থাকে।

মাইতি স্যারকে যারা স্কুলে ঢুকে গুলি করে গেল, তারা স্যারের মুখ-চেনা, কিন্তু নাম সবার জানতেন না মাইতি। স্যারকে কেন গুলি করল, কোল-পাছড়ার একটি লোকও বলতে পারছে না। লোকে মনে করত, স্যারের কোনও শত্রু নেই। ফের নবান্নর শত্রু থাকার কথাই ওঠে না। কারণ, বয়েস তার মোটে চৌদ্দ।

যারা মেরে রেখে গেছে, তারা স্কুলের দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেছে; তাতে লিখেছে, 'যে মাস্টারের লাশ তুলবে, সে খতম হবে; আমাদের হায়না স্কোয়াড যতক্ষণ লাশ না তোলে, ততক্ষণ লাশ গন্ধ ছড়াক, লাশের গন্ধ আমাদের প্রচারের হাতিয়ার।' তার পর সংগঠনর নাম, জনগণের রেড-লণ্ঠন কমিটি (খাওবাদী)।

চমৎকার ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর পক্ষে পোস্টার পড়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া লাশ তোলা তাঁর কাজ; তিনি লাশ তুলেছিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, মাইতি স্যারের লাশ এভাবে পড়ে থাকা ঠিক নয়—'রুহানি নহর' নামের ফকিরি তৈলের শেষ তলানি তিনি মাথায় মাখিয়ে নিয়েছিলেন। নবান্ন নামের কিশোরের মুখটি দেখে তাঁর বুকের ভেতরে বয়ে গিয়েছিল কেয়ামতের হাওয়া।

সন্ধ্যার ঘোরতর আঁধারে জোনাকি ভাসছে অন্তত তারা ফুলকি দিয়ে বাতাসে লেপে চলেছে আরও রহস্যময় অন্ধকার—আকাশে অগুণন উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে।

রূপবান কান্নার চেয়ে করুণ গলায় বলল, বাপু, কথা কও!

চমৎকার কথা বললেন না।

বাপু, মনসুর হল্লাজ কি আছেন? রুহানি নহর কি পাবনি বাপু হে? লাশ ক্যামনে টানল বাপজান? গন্ধ তাড়াইব কীসে! কোল-পাছড়ায় তো লাশের শ্যাষ নাই—ফিনা রে জাহান্নামা খালেদিনা ফিহা। আসমানে শয়তানের হল্লা চলতিছে বাপা।

এই বলে আচমকা ডুকরে উঠল রূপবান বৈদ্য। কান্নার দমকা আবেগ সে দাঁতে দাঁত চেপেও থামাতে পারছিল না। সোনাভান বোনকে নানান কথায় দরদ যাচায় বলে, কাঁদিও না। বাপের রুহ্ (আত্মা) কষ্ট পাবে। এত যে মানুষ খুন করছে খাওবাদীরা, সেই লোকসানে কার কী টাটায় রূপবান? শুধু দোষ হয় বৈদ্যের। মুসলমান বদ্যি আমরা; মোমিন মুসলমান; লুকি মনসুরের চেনা। বাপ মৎস্য খাইত না, মাংস খাইত না। জানো তো রূপা, মা আমাধেরে লুকি বংশের মেয়ে।

সোনাভানের কথায় ধীরে ধীরে শান্ত-সৌষ্টব হয় রূপা।

তখন সোনা বললে বাপকে ডাকো।

রূপবান ডাকলে, বাপু গো। কথা কও। খাওবাদী সংসারে কী চোপা কইরে জন্মালাম বাপা।

বাপ কথা কইলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনাভান কী ভেবে বললে, মাস্টারকে ডাকো।

রূপা ডাকলে, স্যার! শুনতাম আপনি অজাতশত্রু কমরেড, তবু মরতে হইল ক্যানে? কোল-পাছড়ায় ক্যানে আসলেন স্যার! কথা কি কইবেন না মাস্টারমশাই!

মাইতি স্যার জবাব দিলেন না।

তখন সোনাভান বললে, নবান্নকে ডাক পাগলি। ছোকরার তো শুদু ভাতরোম গজাইছে উপরকার ঠোঁটে; এখনও কোনও পাপ করে নাই। সংসারে গুনেহগার হয় নাই। ডাকো রূপবান, ডাকো। শুধাও, আমরা কি লাশ বইতে রুহানি নহর পাবনি? মনসুর হল্লাজ কি আসবেনি কোল-পাড়ছায়? গায়েবি মসজিদের চাতালে ফকির কি দেখা দিবেন? লাশের গন্ধ সওয়া তো যায় না রে বহিন! বাপের লাশ কি কবর পাবেনি রূপবান? শুধাও, শুধাও। বাপের গা থিকে সুঘ্রাণ পাও?

— না, সোনা পাই না। বাপের মরা গা থিক্যা শুধু বাপেরই গন্ধ পাই।

— ডাকো, নবাকে ডাকো।

চুপ করে রইল রূপবান।

বোন অনেকক্ষণ চুপ করে আছে দেখে সোনাভান নিজেই ডেকে উঠল, নবান্ন!

হঠাৎ এবার নবান্নর জবাব শোনা গেল, আজ্ঞে দিদি! — বাপ কি কবর পাবেনি? বৈদ্যের নিজের জায়গা তো নাই। বাপ আধ কাঠা জমি পেয়েছে, মাইতিবাবুর চেষ্টায়। সরকারি খাস। উঠানে কবর দিব বাপের, পাকিও?

নবান্ন আর জবাব দিচ্ছে না।

— ভূমিহীন জমি পাইলে অপরাধ হয়?

নবান্ন এবার বলল, ওই আধ কাঠার জন্যি তো খাওবাদীরা গুলি করলে বাপে; বোঝ নাই?

— ক্যানে?

— জমির ব্যবস্থা করেন মাইতিবাবু! বাপটি নিমকহারাম ছেলোনি দিদি। মাইতির সঙ্গে দেখা হলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে লাল সেলাম দিত। এটি অপরাধ সোনাভান দিদি। তা ছাড়া মোল্লাগণ জনগণের কবরে বাপে রে জায়গা দিবেনি। মাতলায় জোয়ার আসুক, ততক্ষণে কমিউনে স্যার আর আমাকে নামায় দাও। মাতলায় বাপকে দিও, উপায় তো নাই!

সোনাভান আজ ভুলেই গিয়েছিল, তার বোন রূপা এক হরবোলা, প্রাণী জগতের নানান কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করতে পারে। এমনকি, মানুষের গলাও সে নকল করে আনন্দ পায়। বাপের গলাও সে নকল করে আনন্দ পেয়েছে।

কিন্তু বাপের জন্য কবরের জায়গা নাই, এ কথা রূপা নবান্নর গলায় বলে উঠেছে দেখে এবং হঠাৎ বুঝতে পেরে প্যাডেল থামিয়ে ভ্যান থেকে নেমে বোনের গালে একটা চটাস করে চড় কষিয়ে দিলে সোনাভান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা বলে উঠল, মাতলার জোয়ারে দিব বাপকে! কেন রে?

রূপবান চড় খেয়ে গালে হাত রেখে বলল, সোনা তুই খামোখা রাগ করছিস। গাঁয়ে চ, বুঝবি।

ঘটনা এই যে, রূপবান হরবোলার গলায় সত্য বলেছিল। জনগণের কবরে বাপকে কবর দিতে গেলে কিছু মাতব্বর বাধা দেয়। লাশ চমৎকার বৈদ্যর জায়গা হয় না। মাঝরাতে দুই বোন বাপকে শোয়াবে বলে কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়তে থাকে। মা লণ্ঠনের আলো ধরে রয়েছেন। কোল-পাছড়ায় এমনটাই হল। হরবোলা কোদাল চালাতে চালাতে হঠাৎ থেমে আকাশে মুখ তুলে বাপের গলায় বলল, ফিনা রে জাহান্নামা খালেদিনা ফিহা। হিংস্র শয়তানকে দূর কর প্রভু!

আজকাল, ১১ জুলাই ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মজীবনীর কাল

আফসার আমেদ

উলুবেড়িয়ায় লেভেল ক্রসিং-এর গেট বিকল হাওয়ায় ট্রেন আটকে ছিল। মিস্তিরি যতক্ষণ না সারিয়ে তুলছে, ততক্ষণ ট্রেন ছাড়বে না। অথচ সুবিদ যাবে কুলগাছিয়া থেকে বাগনান স্টেশন। একটা স্টেশন। স্কুল ফেরতা চৈত্রের শেষের দিকের বিকেলে প্ল্যাটফর্মে সুবিদের এই অপেক্ষমানতা ক্রমশ অসহ হয়ে উঠছিল। তলানিতে থাকা বসন্তও উধাও। হাওয়া নেই। কোকিলের ডাক নেই। যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে। সময়ও ফুরোচ্ছে।একটু পদচারণা করে সুবিদ। তার পর একটু বসার জন্য উন্মুখ হয়। বেঞ্চগুলোতে একটু বসার জায়গা আছে কিনা দেখে। নেই। সহসা চোখে পড়ে একটা বেঞ্চে মাঝখানে এক জনের মতো বসার জায়গা আছে। তিন জন যে বসে আছে তার মধ্যে এক জনই মহিলা, ডান দিক ঘেঁষে তার স্থান। তার পাশেই ফাঁকা জায়গাটা। সুবিদ ভাবে, সে বসবে কি না।

মহিলা বোরখা পরে আছে। মুখও ঢাকা। চোখ দু'টি শুধু দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত এক অনধিকার জাগিয়ে তুলছে সে এই ফাঁকা জায়গাটার প্রতি। সাহস করে কেউ বসছে না। একটু সাহস করে চোখ দু'টি দেখল সুবিদ মহিলার। বেশি বয়স নয়। কিন্তু সুন্দরী না? বোরখার ভেতর বুঝবে কী করে। হাতের আঙুলগুলি প্রকাশ্য হওয়ায়, বোঝা যায় সুন্দরী হলেও হতে পারে। বেশ ফর্সা রং। কম বয়সের লাবণ্যে ভরা হয়তো-বা। এ সব কল্পনা সুবিদের। তাতেও বেশ থাকা যায়। এই অপেক্ষমাণতার স্বেদে আর এক বসন্ত যেন।

সে খানিকটা একগুঁয়ে হল, এই ফাঁকা জায়গাটাতে বসবেই। বোরখা নারীর পাশটিতেই। আরও দু'জন পুরুষ তো বসেই আছে। সে না হয় গায়ের পাশে বসল। কাঁধের ঝোলাটা অসহ হচ্ছে। কখন ট্রেন আসবে ঠিক নেই। একটু বসে নেওয়াই শ্রেয়।

অতএব সুবিদ ধাঁ করে বসে পড়ল বোরখা রমণীর পাশটিতে। যেমন ভাবে কুয়োর ভেতর বালতি নেমে যায়, তেমন সে আবেগ পেল অনুভূতিতে। কোলে ঝোলাটা রাখল। আর অদ্ভুত বোরখা নারী তাকে আরও একটু সুবিধে দেওয়ার জন্য সরে গেল। আর সুবিদ মুখ ফিরিয়ে চাহনি দিয়ে ধন্যবাদ জানাল। এই মানবিক বিনিময়তা তারা রচনা করল। সুবিদ মনে করল তাবত পৃথিবীর জন্য।

কিন্তু এই মহিলার স্বাভাবিক হয়ে তাকানো, কথা বলাতে যাবে না কেন? এই আবরণের ভেতর এক জন মানুষই তো থাকে। তার [illegible] ভোর তাকে কেমন

আমার বই ডট কম www.amarboi.com

অভিসারে রাখে। যা নিজের জন্য। তা কি এই আবরণ নিরুদ্দেশ করে দেয়? নাকি কল্পনার রঙে তার বেঁচে থাকাকে সাজিয়ে যায় শুধু। কিছুই জানে না সুবিদ এই নারীটির সম্বন্ধে। শুধু সে ভাষাহীন বসে আছে। চোখের চাহনি কিছু থাকে তার। হয়তো কিছু ভাষাও পাখিদের দেওয়া দানার মতো ঝরে পড়ে।

অপেক্ষমাণতায় সুবিদ খানিকটা শান্ত হয়ে উঠছিল। বোরখা রমণীর সঙ্গে কিসে কথা বলবে? এমনিতেই পুরুষের দেখার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নারীটি বোরখার ঘেরাটোপে আছে। সেই প্রহরা ভেঙে কথা বলবে কী করে। অথচ নিকট-বন্ধুর মতো পাশে বসে আছে মেয়েটি। একটু একটু করে নিজেকে সাজাতে লাগল সুবিদ। বোরখা রমণীর সঙ্গে কথা বলে উঠবার পরিকল্পনায়। নিজেই আগে জেগে উঠতে চাইল। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার হাঁটাপথে তার স্কুল। একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সে অঙ্কের টিচার। বছর দেড় আগেও সে শুধুই টিউশন করে যেত। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় চাকরিটা পেয়েছে। বিয়ে করেনি। কিন্তু অদ্ভুত প্রেমময়তায় ভোগে। রাতের অনেকটা ইন্টারনেট করে তার কাটে। বছর বত্রিশ বয়েস। মা আছে, বাবা আছে, ভাইবোনও আছে। বাবা ইট-বালির ব্যবসায়ী।

তো এত কিছুর ভেতর দিয়ে কি এই বোরখা নারীর সঙ্গে একটু কথা বলা যায় না? হয়তো যায়। হয়তো যায় না। সত্যিটা তার কাছে এই মুহূর্তে অধরা। তার পর পাশ ফিরে মহিলার চোখে চাহনি দিল। মহিলা একটু নড়ে উঠল। তাকে উদ্দেশ্য করেই বলে উঠল সুবিদ সহসা, 'খুব গুমোট, না?'

মহিলা পাখির মতো ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে দুই হাত দু'দিকে আছড়াল, 'খুব গরম।'

মহিলার মধ্যে আরও কথা বলার অভিব্যক্তি ফুটে বেরচ্ছে। বোরখার আস্তিনে হাতায় গলায় কাঁধে মুখের আবরণে অস্থিরতার ভঙ্গির ভেতর। এত কিছু আগে ছিল না কিন্তু। হয়তো ছিল, গোপন হয়ে। যা প্রকাশ করছিল না। বলল, 'কেন যে ট্রেন আসছে না।'

সুবিদ বলল, 'তার সময়ে আসবে।'

'বাড়ি ফিরব, দেরি হচ্ছে।'

'কোথায় যাবেন?'

'বাগনান।' এ বার মুখের আবরণটা খুলে ফেলে মেয়েটি।

'বাগনানের কোথায়?'

'আদিনান। আপনি কোথায় থাকেন?'

'বাগনানেই, মহাদেবপুরে।'

'আপনাকে দেখেছি।'

'হাঁ পাড়াতে তো আমি পড়াতে যেতাম। রোজিদের বাড়িতে।'

'সাইকেলে তো?'

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোজি তো আমায় চাচাতো ননদ।'

'রোজির ভাল নাম তো নিলুফার।'

'ওর একটা মেয়ে হয়েছে।'

'সে খবর তো পাইনি।'

'ও খুব ভাল। দেড় ঘন্টা বসে আছি দেখুন না ট্রেন নেই। বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম সেই ভোরে উঠে। দুপুর দুপুর বেরোলাম, কিন্তু এতক্ষণ বসে আছি ট্রেনের দেখা নেই। ছেলেটাকে রেখে এসেছি জা-এর কাছে।'

আরও কথা আছে মেয়েটির আবেগে। মুখের প্রকাশ্যতায় অদ্ভুত এক সখ্য আনন্দ ফুটে উঠছে। সম্ভ্রমের কল্পনা আছে মুখ্যবয়বে। পাথরের বুক থেকে কুঁদে ওঠা খুব মানবিক মুখ। যার হাতের ছোঁয়ায় বিছানা বালিশ চাদরের স্পর্শ লেগে আছে। থালা বাটি গেলাস, পুকুরঘাট তৈজসের নানা গড়ন গঠনের মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে যার জন্ম হয়, বেঁচে ওঠা হয়। মরণগুলো সে হয়তো চেনে। ডুব দিয়ে গোসল করার শান্তি তার জানা হয়ে গিয়েছে। ঘরের আলোছায়া নিয়েও হয়তো তার অভিজ্ঞান অনেক।

মেয়েটি বলে যেতে লাগল, 'ট্রেন এত লেট, কেউ কিছু বলছেও না। ট্রেন এলে এত ভিড় হয়ে আসবে যে উঠতে পারা যাবে না।'

'একটাই বাচ্চা তোমার?'

'হ্যাঁ, ছেলে, তিন বছরের। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বিয়ে হল। সায়েন্স ছিল আমার, সায়েন্স পড়তে আমার খুব ভাল লাগত।'

'পড়লে না কেন?'

'আব্বাজি মারা গেল। না হলে খোঁড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।' ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটি। মেয়েটির হাসিটি খুব সুন্দর। আত্মধ্বংসী এক স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

'কে তোমার খোঁড়া বর?'

'ওই যে উলুবেড়ের কোর্টগোড়ায় আতরের দোকান দিয়েছে। খুব ভাল মন তার। দাড়ি রেখেছে, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে।'

'জয়নালদা না? খোঁড়া বাদশা?'

আবার হেসে ফেলে মেয়েটি।

'তোমার নাম কী?'

'নূরজাহান। ডাক নাম আলতা।'

'বেশ নাম। তোমার স্বামীকে তো চিনি। বেশ মানুষ।'

'কারও মনে দুঃখ দিয়ে কথা বলে না। আমাদেরও খুব ভালবাসে।'

'আমাদের বলতে?'

'আমাকে আর ছেলেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানি উনি পরেজগার লোক, উনিই কি তোমাকে বোরখা পরতে বললেন?'

'না, না। না, এটা বিয়েতে কেউ গিফ্‌ট দিয়েছিল। আমি এক দিন পরলাম, আমার স্বামী বলল, খুব ভাল লাগছে। সেই থেকে পরি। আর কিছু জানি না, আর কিছু বুঝি না। এই যেমন এখন খুব কষ্ট হচ্ছে, খুলে ফেলতে চাই।'

'খুলে ফেলছ না কেন?'

'না থাক, এ ওর মতো করে।'

'তোমার খুব সহ্যশক্তি না?'

'জানি না।'

সহসা ঝড়ল এল। কালবৈশাখী। ওলটপালট একটা ঝড়ই চাইছিল সুবিদ। প্রথমে ধুলোর ঝড়। তারপর চার দিক কালো হয়ে ঝড় ও বৃষ্টির তাণ্ডব। প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে এলোমেলো হয়ে পড়ল সকলে। সবাই শেডের তলায় ছুটে আসছে, মাঝখান খুঁজছে। বৃষ্টির ছাঁট আর ঝড় বাঁচিয়ে থাকতে চাইছে। হাঁসফাঁস তুমুল গরমের পর এই কালবৈশাখীর দাপট চড়াও হয়ে এল। সমস্ত কিছু বিপ্রস্ত করে দিল। কিন্তু হাত ধরা নৈকট্যে আলতাকে ধরে রাখতে পারল সুবিদ। তাদের ঘিরেই লোকজনের এই ঘনসন্নিবেশ যে তারা আরও বেশি নিশ্বাস নৈকট্য পেল।

এই ঝড়ের বৃষ্টির দাপটের ভেতর সুবিদ মনে করতে পারল আলতা আরও অনেক বেশি কথা বলে চলেছে, নীরবতায়। যেন তার আত্মজীবনীর কাল কখনও শেষ হবে না।

'আলতা, তুমি ভিজছ?'

'না।'

'চোখ বন্ধ রেখেছ তো, বালি পড়তে পারে।'

'আমি ঠিক আছি। আরাম পাচ্ছি, এই ঝড়পানি আমার ভাল লাগছে।'

'বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?'

'করছে। আবার ভালও লাগছে।'

'কী চাও তুমি?'

'মরে যেতে।'

'কোথায়?'

'এখানে।'

'কেন?'

'জানি না।'

তার পর আর কোনও কথা বলতে পারে না সুবিদ। যেন বলার অধিকার পায় না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। যেন সমাজ ইতিহাসের সেও এক জন। সে কখনও মায়া আয়না খুঁজে দিতে পারেনি। এক জন নিষ্ঠুর অপরাধ মানব সে। কোনও আলোই সে তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাঞ্জলিতে ধরে রাখতে পারে না, অন্ধকারের জন্ম দিয়ে চলে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে মাটিতে পড়ে যায় আলোগুলো।

তার পর ট্রেনে আসছে ঘোষণা হল। আলতা তার খোকার জন্য উন্মুখ হল। এই ট্রেনই ধরবে, ভিড় সত্ত্বেও। অতএব আলতাকে পাশে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুবিদ। নির্বোধ সুবিদ। বলল, 'পারবে?'

আলতা ফিসফিসিয়ে বলল, 'পারব।'

ট্রেন ধরতে তারা বেশ ভিজেও গেল। আর ভিড় ট্রেনের ভেতর কোনও মতে উঠল। এখন তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এখন আলতার ঠোঁটে পারঙ্গমতার মিষ্টি হাসি। যেন কত দিনের চেনা সুবিদের।

'তোমার কি মন খারাপ করছে?'

'হ্যাঁ, খোকার জন্যে। আর জানলাগুলো বন্ধ হল কি না, বিছানা ভিজল কি না, সোহরের ফিরতে অসুবিধে হবে কি না?'

'তুমি যে ভিজলে?'

'আমার ভিজতে ভালই লাগল।'

আলতার কণ্ঠার তিলটা দেখে সুবিদ। আলতাকে খুব রূপময় করে তিলটা। খুব সুন্দর একটা হাসি হাসছে।

ট্রেন চলছে। একটু পরেই গন্তব্য এসে যাবে। বৃষ্টি তেমনই হয়ে চলেছে।

বলতে বলতে বাগনান এসে যায়।

সুবিদের হাত ধরে নামে আলতা। আরও খানিকটা ভেজে। তার পর শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে হচ্ছে। ঝড়ের দাপট তেমনই প্রবল। সন্ধ্যা নেমেছে। চার পাশ ঝাপসা। অন্ধকার। আলোহীনতায় ভুগছে স্টেশন। এলাকায় লোডশেডিং হয়েছে। জনজীবন বেহাল। ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের নাকাল দশা। ঝুপড়ির দোকান লণ্ডভণ্ড। রিকশা অটোরিকশা রিকশা ভ্যান সব বন্ধ। মানুষজন এক ঠায়ে মূর্তির মতো। এই ঝড়ে ছাতা অচল। জনজীবন বিপর্যয়ের চরম দশায়।

সুবিদ ভাবল, বাড়ি ফেরার জন্য আলতার মন খুবই উতলা হয়ে চলেছে। খুব বিনম্র প্রাচীন তার মন। খুবই সে শুদ্ধচারী, অন্ধ। তাকে যে ভাবে ঘর রাখতে চায়, সে ভাবে রেখেছে নিজেকে সেও। ফিরে যাওয়ার জন্য উতলা হয়েছে। কানা ভাঙা হাঁড়িতে তার বার বার হাতে ব্যথা এনে দেওয়ার মতো উতলা ফিরে যাওয়া অনুভব করে সে হয়তো।

'ভিজতে ভিজতে যাবে নাকি? হাঁটতে হাঁটতে?'

'একটু দেখি না।'

'কী দেখবে?'

'এখনই হয়তো বৃষ্টি থেমে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখনই থামবে না।'

'এখনই থামুক চাইছি না। এ ভাবে থাকতে চাইছি। বেশ না?'

'তুমি এ ভাবে থাকতে পছন্দ করছ?'

'ভিজে গিয়েছিল বোরখাটা, আমি তো খুলে ফেলেছি।'

'ওমা, আমি তো দেখিনি। বেশ তো শাড়িখানা?'

হাসে আলতা। এ বার শব্দ করে হাসে। চার পাশে কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আছে, আর তারই পটে আলতা হেসে চলেছে। বৃষ্টিটাও তার হাসির মতো আরও আরও বেড়ে চলেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুলাই ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোনটা বাজছে

উল্লাস মল্লিক

তারপর লিখি যে, বড় থাকা আমাকে একখানা ফোন কিনিয়া দিয়েছে। তার লাগানো ফোন নয়। মোবাইল ফোন। কী সুন্দর দেখিতে, তো কী বলবি! ছোট ছোট বোতাম। অন্ধর হইলে আলো জ্বলে। আমাকে নিজেদের বড় ভাবনা। বলে, তুমি হুটহাট বেরিয়ে যাও, হেথাসেথা চলে যাও—ফোন থাকা তোমার খোঁজ করতে পারব। আমি এখনও সব বোতাম বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। নাতনিটা দিনরাত আমাকে নিয়ে পড়িয়া আছে। বলিয়াছে, তোমাকে পনেরো দিনের মধ্যে সব শিখিয়ে দেব। তোরকাছে একখানা এমন ফোন থাকিলে সে হত। যখন খুশি কথা বলিতে পারিতাম আর অধিক কী লিখিব? তোর সংবাদ জানাস। আমি এখনও কোনও প্রকারে তছি। বাতের কথাটা বাড়াবাড়ির দিকে। সকালে উঠিতে বড় কষ্ট হয়। ইদানীং পায়ের পাতাগুলো আবার অমাবস্যা-পূর্ণিমার ফুলিয়ে ওঠে। ও সর্বনিম্ন আর ভাবাভাবি করি না। এ বার ভালয় ভালয় ওপরে যেতে পারিলে হয়। আমার দুলির একটা বাছুর হইয়াছে। এঁড়ে বাছুর। যা হোক, দেখিতে বেশ হয়েছে। এ মাসে শেষের দিকে কুমতুলপোতা যাব মন করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি হবে না। মায়ের হুট বলতে কামাই। ওর ওপর কোনও ভরসা নাই। মুঙ্গুলির বাচ্চা আর একটু বড় হইলে যাইব।

করুণাময় ঈশ্বরের কাছে তোর মঙ্গল কামনা করি। তুই আমার ভালবাসা জানবি। বাড়ির সবাইকে আমার আশীর্বাদ জানাবি।

ইতি তোর গঙ্গাজল,
কালীমতী

চিঠিখানা শেষ করে হাতের কলমটা নিয়ে খানিক খোঁচাখুঁচি করলেন কালীমতী। এই এক অনাসৃষ্টি কলম। এতটুকু মাত্র নিব বেরিয়ে থাকে। কলার মধ্যেই আবার টর্চ। সারা গায়ে গণ্ডাখানেক বোতাম। কোনটা টিপলে নিব বেরুনোর কোনটা টিপলে ঢুকে যাবে, বোঝাভার। বিস্তর টেপাটেপি করেও নিবটা যখন ঢোকাতে পারলেন না তখন নাতনিকে করলেন কালীমতী। টুসি, ও টুসি, শুনো এক বার তাড়াতাড়ি।

ছোট স্টিলেবাটিতে শশা থেঁতো মধু আর দুধের একমিশ্রণ নিয়ে মুখে লাগাচ্ছিল মৌটুসি। ঠাকুমার ডাক শুনে ঘরে এল। মৌটুসি ক্লাস ইলেভেন। মাধ্যমিক তিন নম্বরের জন্য স্টার পায়নি। দুনিয়ার [illegible] উপড় হয়ে ফের

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

সে কী হাপুসুটি কান্না। বাড়িতেও শোকের ছায়া। চৌদ্দ দিনের মাথায় উঠে মুখে-চোখে জল দিল মেয়ে তখন এক্কেবারে আধখানা। কালীমতী ভেবেছিলে ফেল করেছে বুঝি। ছোট বউমাকে বলেন, ফেল করেছে, তাতে তো আর সৃষ্টি যায়নি বাপু। আসছে বারে ভাল করে পরীক্ষা দিলেই হল। ওর পিসি তো তিনবারে ম্যাট্রিক পাস করেছিল।

ছোটবউমা চোখ কপালে তুলে বললেন, ফেল করছে আপনাকে কে বলল?

— দিনরাত পড়ে পড়ে কাঁদে যে!

— সে তো স্টার পায়নি বলে।

— সে জিনিসটা আবার কেমন ধারা রে বাপু?

স্টার মানে অনেক নম্বর। ভাল ছেলেমেয়েরা পায়।

কালীমতী বললেন, যাক বাবা, পাস তো করছে, এই ঢের! মেয়েছেলে বেশি নম্বর নিয়ে করবে কী!

— কিন্তু স্টার না পেলে সাইন্স পাবে না, সাইন্স না পেলে চাকরি পাবে না, আর চাকরি না পেলে ভালো বিয়ে হবে না, আর বিয়ে ভালো না হলে ...। কথাটা শেষ করতে পারল না ছোট বউমা; গলা ধরে এল।

তা সেই মৌটুসি আর্টস নিয়ে এখন উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ছে। মেয়েটাকে দেখলেই বুকটা শুকিয়ে যায় কালীমতীর। আহা! মেয়েটার কপালে ভালো বর জুটবে না। যে দিনকাল পড়ল ছাই!

মনমরা মৌটুসিকে চাঙ্গা করতেই বোধহয় ওর বাবা একটা মোবাইল কিনে দিয়েছে। সেটা নিয়েই এখন দিনরাত খুটুস খুটুস করে মৌটুসি। কালীমতী ভাবেন, যাক বাবা, ফোন পেয়ে মেয়েটা যদি শোক-দুঃখ ভুলে যায় তো ভালো। মনের মতো স্বামী না পাওয়া যে কত বড় অভিশাপ!

বাটি থেকে খানিকটা লেই নিয়ে কপালে থেবড়ে দিতে দিতে মৌটুসি বলল, ডাকছ কেন ঠাম্মু?

— তোর কলমটা নিয়ে যা। কী যে ছিরির কল, আমি বাপু বন্ধ করতে পারিনি।

— তুমি সামান্য একটা পেন বন্ধ করতে পারছ না, মোবাইল শিখবে কী করে!

— শিখতে কে চায়? তোরাই তো জবরদস্তি করিস!

— তা বললে হয় ঠাম্মু। থেকে থেকে তুমি উধাও হয়ে যাও! সবাই চিন্তা করে। এই তো সে দিন বিকেলে বেরিয়ে ছিলে, কত রাত করে ফিরলে।

— কবে আবার রাত করে ফিরলুম?

— সেই সে দিন পোদ্দারদের বাড়ি হরিনাম হচ্ছিল, সেখানে জমে গেলে তুমি। জেঠু গিয়ে নিয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালীমতী ভাবেন, বড় আজব যন্ত্র একটা। চোখের আড়াল হলেও সুতোর বাঁধন ঠিক থেকে যায়।

ফোনটা রাখবেন কোথায় তাই নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছিলেন কালীমতী। প্রথমে ক'দিন আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন। তার পর বড় বউমা ছোট একখানা ব্যাগ কিনে দিয়েছে। ব্যাগটা গলায় ঝুলিয়ে তার মধ্যে ফোনটা রাখেন। কালীমতী বলেন, তোরা আমাকে মহা পাপের ভাগী করলি। এই বয়েসে কোথায় জপের থলি নিয়ে ঘুরব, তা নয়, ম্লেচ্ছ একখানা জিনিস বুঝে নিয়ে ঘুরছি।

উমা নম্বর দিতে বলেছে। কিন্তু নিজের ফোনের নম্বর তো জানেন না কালীমতী। মৌটুসিকে ধরলেন, হ্যাঁরে, আমার ফোনের নম্বর কত?

মৌটুসি তো হেসে কুটোপাটি। তোমার ফোনের নম্বর তুমি জান না।

— দুর মুখপুড়ি, জানব কী করে, তোরা কোনও দিন বলেছিস আমাকে!

নিজের মোবাইলটা বের করে কী সব টেপাটেপি করল মৌটুসি। তার পর গড়গড় করে বলে গেল নাইন সেভেন থ্রি টু ফাইভ ফোর ...

— ওরে মুখপুড়ি, থাম থাম। এত নামতা মুখস্থ করার ক্ষমতা কী আর আছে র‍্যা। তুই লিখে দে বাপু।

মৌটুসি বলে, কাকে নম্বর দেবে গো ঠাম্মু?

কালীমতী বলে, কত কে চায়—জানা নেই বলে দিতে পারি না।

মৌটুসি বলে, ঠাম্মু তোমার কী গান পছন্দ?

— কেন রে?

— তোর রিং-টোনে সেট করে দেব। কার গান দেব বল, সনু না হিমেশ?

— কি মেশ! কালীমতী অবাক হন।

— আচ্ছা ও সব বাদ দাও। রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ, না বাংলা আধুনিক?

রিং-টোন ব্যাপারটা বুঝে নিলেন কালীমতী। তার পর বললেন, এই বয়েসে কী আর এ সব গান-বাজনা মানায়! তার চেয়ে ওই গানটা দিতে পারিস, ওই যে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে ...।'

পর দিনই উমাকে চিঠি লিখলেন কালীমতী। নিজের নম্বরটা লিখে দিলেন চিঠিতে। সতীশদার নম্বরটা চাইবেন বলে ভেবেছিলেন। তার পর ভাবলেন থাক, কী মনে করবে।

এখন আর বাইরে বেরোবার সময় মোবাইল নিতে ভুল হয় না কালীমতীর। বাড়িতে থাকলেও কাছ ছাড়া করেন না। চার্জ কমে গেলে ঠিক মনে করে চার্জে বসিয়ে দেন। ঠাকুরঘরে ঢুকলেও কালীমতীর সঙ্গে মোবাইল। না জানি কখন কার ফোন আসে। বেজে বেজে হয়তো থেমে যাবে। ফোনটার এক কোণে ছোট্ট একটা সিঁদুরের টিপ এঁকে দিয়েছেন কালীমতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে দিন নাতি বিন্টু কলেজে যাবার সময় মোবাইলটা চাইল। ওর ফোনে কী সব গণ্ডগোল। কালীমতী বললেন, তোকে ফোনটা দিয়ে দিলে আমার চলবে কী করে! বিন্টু বলল, আমি বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব। এর মধ্যে তো তুমি কোথাও যাচ্ছ না। কালীমতী তবুও কিন্তু কিন্তু করেন। বউমাদের সে কী মুখ টেপা হাসি। মৌটুসি বলে, তুমি তো হেবি মড হয়ে গেছ দেখছি। মোবাইল ছাড়া থাকতে পারছ না। এ বার ইন্টারনেটে চাট করবে না কি?

বয়েসকালে এই এক জ্বালা। ঘুম আসতে আসতেই রাত ভোর হয়ে আসে। যাও বা আসে, তা ছেঁড়া ছেঁড়া। সেই ফাটা-ছেঁড়া ঘুমে ঢুকে যায় ইকড়ি-মিকড়ি স্বপ্ন। আজও বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছেন কালীমতী। ঘরে নাইট ল্যাম্পের হালকা নীল আলো। পাশে মৌটুসি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শুয়ে শুয়ে কেবলই কুমড়ুলপোতার কথা মনে পড়ছে। ছোটদার ছেলে ফোন করেছিল বিকেলে; উমাশশী আর নেই! তিন-চার দিন আগে ফের বাড়াবাড়ি হয়েছিল উমার; এ বার আর হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পাওয়া যায়নি।

কুমড়ুলপোতার উমাশশী নেই। শানের ঘাটে বড় আমগাছটাও উপড়ে গেছে। আমগাছটার কালো ছায়ায় উমাকে দেখতে পেলেন কালীমতী। কলাপাতায় কুলের আচার মুড়ে নিয়ে এসেছে। নুন লঙ্কা দিয়ে কয়েতবেল মাখছে উমা। চকাস চকাস শব্দ তুলে খাচ্ছে দু'জনে। দু'জনে এক্কাদোক্কা খেলছে শিবতলার মাঠে। লুকোচুরি খেলার সময় ফ্রক বদলা-বদলি করে নিচ্ছে দু'জনে। চোর কালীমতীকে দেখে বলছে, উমা একপ্যাচ!

শেষ চিঠিটা উমা পেয়েছে কি না জানা হল। না ওটাতে কালীমতী ফোন নম্বর লিখে দিয়েছিল। বিয়ের পর সতীশদার সঙ্গে এক বার মাত্র দেখা হয়েছিল। তার পর চাকরি নিয়ে পাটনায় চলে গেল সতীশদা। রিটায়ার করে ফের কুমড়ুলপোতায় ফিরে এসেছে। কালীমতি ভাবেন নম্বর পেলে সতীশদা কী ফোন করবে! করলে কী বলবে? সেই চারের কথা কি মনে আছে সতীশদার? সেই চারের কথা কি মনে আছে সতীশদা? আর পান সাজার কথা? ছিপ ফেলতে বসে দাদা পানের হুকুম করত। সতীশদা বলত, আমারটায় এক কুঁচি সুপুরি দিবি। পান নিয়ে ঘাটে এসে দেখতে সতীশদা একদৃষ্টে ফাতনার দিকে তাকিয়ে। পেছনে দাঁড়িয়ে জলে সতীশদার ছায়া দেখত কালীমতী। চোঁ করে ফাতনা ডুবে গেছে, দাদা চেঁচাচ্ছে—অ্যাই সতে, কী ভাবছিস, খ্যাঁচ মার। কালীমতী বলত, তোমার দ্বারা হবে না। সতীশদা বোকার মতো হাসত। পান দেবার সময় সতীশদার আঙুলে আঙুলে ঠেকে গেলে কেমন যেন হত কালীমতীর।

হঠাৎ চমকে উঠলেন কালীমতী। ফোনটা বাজছে। ভুল শুনছেন না তো! না কি স্বপ্ন! ধড়মড় করে উঠে বসেন কালীমতী। বালিশের পাশে রাখা ফোনটা বাজছে—হরি দিন তো গেল ...। আলো জ্বলে উঠেছে ফোনের। কিন্তু এত রাতে কার ফোন। বাড়ির সবাই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমোচ্ছে। তা হলে কি ...।

কেটে গেল ফোনটা। কালীমতী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ফোনটার দিকে। বাজনা থেমে গেছে। একটু পরেই নিয়ে যায় আলো। কালীমতীর মনে হল, এ নিশ্চয়ই সতীশদা। মরার আগে উমা তা হলে চিঠিটা পেয়েছে। সতীশদারও তো বয়েস হল। তারও নিশ্চয়ই রাতে ঘুম হয় না। কালীমতীকে মনে পড়েছে।

ফের বেজে ওঠে ফোনটা। ওই সবুজ বোতামটা টিপে দিলেই সতীশদার গলা শোনা যাবে। ফোনটা তুলে নিলেন কালীমতী। দেওয়ার ঘড়ির বাজনা বেজে উঠল। ঘড়িটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে ছবিটা। ঘড়ির পাশ থেকে কর্তা একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। কালীমতীর বড় লজ্জা করে। সবার সামনে কি সব কথা বলা যায়।

বেজেই যাচ্ছে ফোনটা। ফোন হাতে বসে থাকেন কালীমতী। হাতের তালুতে গরম বোধ হয়। মনে হয় আর এক জনের হাতের তালু। সেই হাতের আঙুলগুলো কালীমতীর আঙুলে বেড় দিচ্ছে। হাতটা টানছে কালীমতীকে। মৌটুসির মতো চুপি চুপি ছাদে গিয়ে সবুজ বোতামটা টিপে দিতে বলছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুন ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়রার আকাশ

উৎপলকুমার গুপ্ত

সকাল থেকেই মেঘ। ছায়া ছায়া অন্ধকার। অথচ গতকাল সারাদিন আলো ছিল। সূর্য ছিল গনগনে। শম্ভু প্রতিদিনের মতো পায়রাগুলো উড়িয়েছিল। আর প্রতিদিন যা হয় তাই হয়েছিল। পায়রাগুলো তার ঘরখানাকে ঘিরে আকাশে পাক খেতে খেতে আরও ওপরের আকাশে উড়ে গিয়েছিল। প্রথমে বড় বড় পাক, সঙ্গে ডিগবাজি খাওয়া, তারপর ছোটো হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গিয়েছিল। শেষে এমন হল যে খালি চোখে আর দেখা যাচ্ছিল না।

শম্ভু ক্লাস সেভেনের বইতে পড়েছে, আকাশের ওপরে আরও বড় আকাশ আছে। তারও ওপরে বড় হতে হতে বিশাল শূন্যতায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

শম্ভু আকাশে তাকায়। ভাবে অত উঁচু থেকে পায়রাগুলো বাড়ি চেনে কী করে। পাঁচ-সাত ঘণ্টা পরে সবাই ঠিকঠাক নেমে আসে ঘরের চালে। আশেপাশে আরও দু'তিন জনের পায়রা আছে। তার পায়রা অবশ্য কোনওদিনই ওই পায়রাদের সঙ্গে মিশে ওদের বাড়ির ছাদে নামেনি। বরং ওদের পায়রা বার দু'য়েক এসেছি, ও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অচেনা পায়রাবাজদের পায়রা সে দেয়নি। কেউ দেয় না।

গতকাল আকাশ শেষের দিকে কালো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ঝড় উঠল। আর তার উড়ন্ত পায়রাগুলো সেই মেঘ আর ঝড়ের কবলে পড়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। অন্যদিন বেশ কয়েকটা ফিরে আসে। এবার আসেনি।

হঠাৎ শম্ভু দেখে তার উড়ে যাওয়া পায়রাদের মধ্যে একে একে পাঁচটা পায়রা নেমে এল। কিন্তু বাকিগুলো? শম্ভুর মন তাই ভালো না। ভালো না বিমলার না আসার জন্যও। দু'দিনের জন্য মায়ের কাছে যাচ্ছি বলে আজ সাতদিন হয়ে গেল, কোনও খবর নেই। দুঃখে ও অভিমানে শম্ভুর বুক মুচড়ে ওঠে। শুধু ভাবে, যাকে ভালোবাসল, মাথায় করে রাখল, সে এমন করল? তার তরফ থেকে তো কোনও ত্রুটি ছিল না। সে কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারে না। তাহলে কি না জেনে বুঝে ওকে ঘরে নিয়ে ভালো করেনি? সবাই বারণ করেছিল? বলেছিল, ভালো করে খবর নাও। সে নেয়নি।

তিনমাস আগে তার ঘরের কাছে গাছতলায় বসে কাঁদছিল। ভাই তাড়িয়ে দিয়েছে, মাকে মেরেছে। তার ফলে যেদিকে দু'চোখ যায় এই ভেবে বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই শুনছিল। নিজে [illegible] করছিল, 'আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

এখন কোথায় যাই গো'। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল গাল। শম্ভু এসে দাঁড়াল তার সামনে। বলল, 'আমি আজকের দিনটা তোমাকে থাকতে দিতে পারি। কাল চলে যাবে।'

মেয়েটা স্পষ্ট করে তাকাল শম্ভুর দিকে। ভালো মানুষের মতো চেহারা শম্ভুর। তাছাড়া তার বাবা কাকারা তো রীতিমতো শিক্ষিত। অফিসে চাকরি করেছেন। সে যখন কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবছে, তখন বাবার মৃত্যু হয়। কাকারা খড়দহে। আর দাদার মতিগতি দিনদিন পালটে যেতে থাকায় সে চলে যায় দুবরাজপুর। সেখানে যার কাছে ছিল, তাকে খাওয়াখরচ দিত। তার ছিল পায়রার নেশা, একই সঙ্গে ব্যবসা। শম্ভুর মনে ধরে ব্যবসাটা। তাই লোকটা মারা যেতেই গ্যারেজের কাজ, হিসেবের খাতা লেখা ছেড়ে দিয়ে বহরমপুর ব্রিজের পাশে, জমানো টাকা দিয়ে টালির ঘর বানায়। আর আসারসময় দুটি খাঁচাভর্তি পায়রা নিয়ে আসে। মালিকের স্ত্রীই তাকে দেয়। কারণ কে দেখাশুনো করবে? তাছাড়া মালিকের স্ত্রী তাকে ছেলের মতো দেখত। ওখানে থাকতে থাকতেই শম্ভু সব শিখে নিয়েছিল। শেষের দিকে সে-ই পায়রাদের দেখাশুনো করত। খাওয়াত, উড়াত, নতুন পায়রা এলে ধরতেও পারত।

অবশ্য, মালিকের স্ত্রী তাকে ওখানেই থাকতে বলেছিল। কিন্তু সে একলা থাকতে চাইছিল। তাই আসার সময় সে বলেছিল, যখন দরকার পড়বে, তখনই ডেকে পাঠাবেন। তাছাড়া আমি মাঝে মাঝে আসব। এখানকার এক হোটেলের মালিকের ফোন নম্বরও দিয়ে এসেছিল। একবার ফোন করেছিলেন মাসিমা। সে কেমন আছে, তা জানার জন্য। ...

পাশাপাশি ঘরের কয়েকজনকে সে বিমলাকে থাকতে দেওয়ার কথা জানিয়ে এসেছিল। যাতে তার বদনাম না হয়। বলেছিল, বড় মায়া হল, তাই থাকতে দিলাম। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে শম্ভু অবাক। বিমলা উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করেছে। উঠোনে নিকিয়েছে। জলও তুলে এনেছে।

শম্ভু পাশের বাড়ির বারান্দায় শুয়েছিল। ফিরে এসে এইসব দেখে তার মুখে কথা সরে না। সে জানে, বিমলা আজ চলে যাবে। কোথায় যাবে, তা তার জানার কথা নয়। বিমলার চোখ পড়ে তার দিকে। কিছু বলতে পারে না। শম্ভু বলে ওঠে, তোমার এসব করার কী দরকার ছিল? বিমলা উত্তর দেয় না।

রান্নাঘরে অর্থাৎ বারান্দার একটা ঢাকা দেওয়া কোণের দিকে যায়। আর গরমজলে রেখে দেওয়া এক কাপ চা শম্ভুর হাতে দেয়। শম্ভু নেবে কী, গতকাল সকাল থেকে আজ সকালের মধ্যে বিমলাকে নিয়ে চলেছে তার টানাপোড়েন। কেন সে দয়া দেখাতে গেল? এখন বিমলা কোথায় যাবে? আর সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, বিমলার প্রতি সম্ভবত তার একটা মায়া পড়ে গেছে। এই সবের মধ্যে বিমলার ঘরদোর পরিষ্কার করা, জল তোলা, চা-করা, বিমলাকে তার দৃষ্টির এক নতুন মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন তো মন চাইছে না, বিমলা আজ চলে যাক। বিমলা চোখ নামিয়ে পাশের ঘরটিতে ঢুকে যায়। তারপর, কাপড়ের একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে আসে। বলে, আমি চললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে বলে বটে, কিন্তু দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কী যেন হয়ে যায় শম্ভুর মধ্যে। সে বিমলাকে হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। তারপর চৌকির ওপর বসিয়ে বলে, আজ থাকো।

বিমলা বলে, কেন? কাল তো যেতেই হবে।

শম্ভু বলে, সে দেখা যাবে।

তার মানে? বিমলা বলে।

শম্ভু একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, কোথায় যাবে? যাওয়ার কথা কোথায় তা জানা সত্ত্বেও গতকাল কেন গেলে না?

বিমলা চুপ করে থাকে। মুখ নীচু করে নখ খুঁটতে থাকে।

শম্ভুই বলে, শোনো, পরিষ্কার কথা। তোমার যদি আমাকে পছন্দ হয়, তাহলে তোমাকে. আমি ...

বাকিটা উচ্চারণ করতে পারে না। তারপর অন্য প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে বলতে থাকে। আমি এখানে একলা থাকি। রাগ করে বাড়ি ছেড়েছি। লেখাপড়াও জানি। কিন্তু কে চাকরি দেবে? তাই এই ব্যবসা। নেশাও। পায়রা উড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করি। ...

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে শম্ভু। চোখ ছোট হয়ে আসে।

বিমলা তার দিকে ঘুরে তাকায়। তারপর বলে, আমাকে চেনেন না, জানেন না, তবু—

হ্যাঁ, তোমার মুখের কথাই সব। বলো, যদি কিছু জানানোর থাকে।

শম্ভুর কথার উত্তরে বিমলা বলে, মালদার সেজপুরে আমাদের ঘর। সেখানে মা আছেন। দাদার মতিগতি ভালো না। তাই—

তাহলে আমার মতোই সব। কথা বলতে বলতে বিমলার হাত ধরে। বলে, তাহলে এস আমার সংসার পাতি। কালীবাড়ি গিয়ে—

বিমলা সোজাসুজি তাকায়। বলে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

একশো ভাগ। আনন্দে শম্ভু বিমলার ঘনিষ্ঠ হয়।

শম্ভু তার আর বিমলার কথা পড়শিদের বলে। তারা সায় দেয়। তারপর শম্ভুর তড়িঘড়ি কিনে আনা নতুন ছাপা শাড়িতে বিমলা সেজেগুজে নেয়। কালীবাড়ির কাজগুলো শেষ হয়।

হ্যাঁ, তিনমাস। তাদের নতুন-পাতা এই সংসার। সুখেই কেটে যায় দিনগুলো। কিন্তু কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারে না শম্ভু। এমনকী একটা খবর পর্যন্ত যাওয়ার সময় দেয়নি। তার হোটেলের ফোন নম্বরও দিয়ে দিয়েছিল। বিমলা যে কোন ঠিকানায় থাকে, তা কোনওদিন বলেনি। হ্যাঁ, মিথ্যে বলবে না, বিমলা উজাড় করে দিয়েছিল। নিজেকে। সংসারে মন দিয়ে কাজ করত। অল্প আয়ের সংসার, তা-ও মানিয়ে নিয়েছিল। শম্ভু দেখত আর ভাবত, কী সুন্দর গুছিয়ে রাখে বিমলা। যেখানটার যে জিনিসটা থাকা দরকার সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া অন্য কোথাও রাখলে তাকেও বকত। কৃত্রিম রাগ দেখাত। এমনকী শম্ভু বাজারে বা অন্য কোথও গেলে, কয়েক ঘন্টা পায়রাদের তদারকি পর্যন্ত করত। শম্ভু তাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল। অন্য কারও পায়রা তাদের পায়রাদের সঙ্গে মিশে নীচে নেমে এসে সে শম্ভুর শেখানো কায়দায় ধরে ফেলত। তারপর শম্ভু এলে সব বলত। আর শম্ভুও তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর করত।

এইভাবে চলছিল সবকিছু। এই সাতটা দিন এলোমেলো করে দিল সাজানো সংসার। তার রোজকার জীবন। ...

শম্ভু আকাশে তাকায়। না, গতকাল মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পায়রাদের মধ্যে এখনও চারটে পায়রা আসেনি। ... হঠাৎ দেখে, হ্যাঁ, ওই তো বড় বড় পাক খেয়ে উড়ছে তার তিনটে পায়রা। সে ছাদে বসে থাকা পায়রাগুলোকে উসকে দেয়। ওরা ফরফর করে ওড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভ দিয়ে ক্লান্ত পায়রা তিনটে ঘরের চালে নেমে আসে। কিন্তু লাল পিলভটা? না, আসেনি।

মনটা খারাপ হয়। এর মধ্যেই দেখে, ফিরে আসা পায়রা তিনটে জলের জায়গাটার ওপর দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে পেট ভরে জল খায়। বোঝাই যায়, গতকাল থেকে জল, দানা কিছুই পেটে পড়েনি। শম্ভু নতুন করে চাল-সরষে-ছোলার পাত্র থেকে দু'মুঠো দানা ছড়িয়ে দেয়। ওরা খেতে থাকে? এমন পায়রার বৈশিষ্ট্য হল নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও নামে না। যথাসম্ভব খুঁজে বের করার চেষ্টা করে নিজের বাড়ি। তার জন্য চারদিকেই লম্বা পাড়ি দিয়ে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে পরিচিত আকাশ। নীচের ঘরবাড়ি।

শম্ভুর মন খারাপ হয়। লাল পিলভটার ডিম দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। ভেবেছে, এইবার বাচ্চা তুলবে। দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে। শীতের বাচ্চা ভালো হয়। গরমে বা বর্ষায় হয় না। খোপের বিষ্ঠায় বৃষ্টির জল পড়ে অনেকসময় বাচ্চাগুলো বিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে যায়। গায়ে ঘা হয়। ঠোঁটে ফোঁড়ার মতো তোকমা দেখা দেয়।

সনতের মা শম্ভুর কাছে এগিয়ে আসে। বলে, বাবা, এখুনও আসেনি বিমলা? তুমি ছেলার মতো? বলি কী, একবার যাও, খবর লাও।

শম্ভু সনতের মায়ের দিকে তাকায়। আলগা হাসে। বলে, দেখি, আজকের দিনটা। তোমরা তো দেখেছ মাসি, সংসারের ওপর বিমলার টান। নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে। ...

সনতের মা চলে যায়। শম্ভু কিছুতেই বলতে পারে না, কোথায় থাকে বিমলারা, তা সে জানে না। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাড়া জেনে যাবে। আর সমস্বরে আড়ালে আবডালে বলতে থাকবে, একী কান্ডগো! বাবার জন্মেও তো শুনিনি। ... তুমি কিছুই না জেনে বিয়া কইরা বইসে আছ?

কথাটা একশ ভাগ ঠিক। কিন্তু এদেরকে কে বলবে, ওর বাড়ির কোনও নম্বর নেই। এমন জায়গাটার নাম দিয়ে কাউকে খুঁজে আনা যায়? অত বড় টাউন মালদা। তাছাড়া সনতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা তো জানে, এখানে যারা ঘর বেঁধে ব্রিজের পাশে সংসার পেতেছে, চালে লতিয়ে দিয়েছে লাউ বা চাল কুমড়ো, তাদের নিজেদেরও তো ঠিকঠিকানা নেই। রিকশা প্যাডলার, ভ্যানচালক, ট্রাক-ড্রাইভার—এই ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি। একে ছেড়ে ওকে বিয়ে করছে। ঝগড়া, মারামারি তো লেগেই আছে। ... তার ওপর সন্ধে হলেই দেশি মদের গন্ধে বাজার এলাকার বাতাস ভারী হয়ে যায়। আশেপাশে মাতালের প্রলাপে পরিবেশ বলতে কিছুই থাকে না। শম্ভু যখন প্রথম এখানে এল, তখন ভাবেনি এখানে ঘর করে থাকবে। শুধু এক বাসের ড্রাইভারের কথাবার্তা, আন্তরিকতা সে আগে থেকেই জানত। সে-ই তাকে বলে, আমি তোমাকে জায়গা দিচ্ছি। সরকারি জমি, যে যেমন পেরেছে, বেড়া দিয়ে নিজের করে নিয়েছে। আমিও প্রথম দিকে নিয়েছিলাম। তোমাকে সেটাই দিতে পারি। একটা খড়ের চালের ঘরও আছে। তুমি থাকতে পার।

তাই অশান্তিতে পূর্ণ বাড়ি ফিরে যেতে মন চাইল না। তাছাড়া বাবা-মা দু'জনেই গত হওয়ার পরে দাদাদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। সে যে ঘরখানায় থাকত, সেখান থেকে তার মালপত্র পাশের ছোট্ট একটা ঘরে রেখে দেয়। বলে, তুই এটাতে থাকবি। আর এখন থেকে নিজের ভাবনা ভাবতে শেখ।

মাধ্যমিক পাশ করেছিল কোনওমতে। ভালো ছেলে ছিল না কোনওদিন কিন্তু নিজের লোকেরা যে এরকম হতে পারে, তা তার জানা ছিল না। একদিন দেখল, তার খাবার বন্ধ হয়ে গেছে। সেদিনই এক বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল দুবরাজপুরে। যদি কোনও কাজ পায়। তারপর —

হ্যাঁ তারপর তো তার ভাগ্য যেভাবে চালাচ্ছে, সে চলছে। এইভাবেই বিমলা চলে এল। একটা দুটো পায়রা রোজই বিক্রি হয়। দু'জোড়া পায়রায় সত্তর-আশি টাকা তার থাকে। আর অন্যের ধরা পায়রা হলে সবটাই তার লাভ। এইভাবেই কিছু টাকা রেখে রেখে কষ্টেসৃষ্টে ভাত-ডাল ফুটিয়ে এতদিন চালিয়েছে। বিমলার হাতে পড়ে তার ছন্নছাড়া সংসার সেজে উঠেছে। আয় বাড়াবার জন্য সে রিকশা চালিয়েছে। কিন্তু বিমলার অসম্মতিতে সে ছেড়েছে। বিমলা বলেছে, এতেই চলবে, যেমন এতদিন চলেছে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানো, তুমি রিকশা চালাবে না।

শম্ভুর খুব ভালো লেগেছে এই কথা। সে-ও মেনে নিতে পারছিল না অতটা নীচে নামতে। রিকশাওয়ালাদের তো দেখেছে, ওদের জীবন বলতে কিছু নেই। বিশ্রী সব কথাবার্তা, আজেবাজে নেশা—এদের জীবনযাপনের অঙ্গ। তবে সে ভেবেছে, পায়রার পাশাপাশি তরিতরকারি বিক্রি করবে বা তৈরি চায়ের দোকান খুলবে। রাস্তার পাশে ঘর-বারান্দা হওয়ায় খরিদ্দারের অভাব হবে না। সে আর বিমলা দু'জনেই নতুন করে গড়ে তুলবে ঘর-সংসার।

বিকেল শেষ হয়ে এল। সন্ধে নামল বলে। পাখিদের ঘরে ফেরা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল একটা সাদা পায়রা নীচু দিয়ে উড়ে আসছে। ও ওর পায়রাগুলোকে একটু উসকে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে নেমে আসে পায়রাটা। পায়রাটা ওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে মুহূর্তে বুঝে ফেলে, হ্যাঁ মাদী লাল পিলভটাই। ফিরে এসেছে। ... পায়রাগুলো খোপে-ঢোকার জন্য চেষ্টা করছে। লাল পিলভটাও নেমে আসে। শম্ভু ঘরে গিয়ে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। দানা দেয়। লাল পিলভটা গোগ্রাসে খায়। জল খায়। তারপর নিজের খোপে গিয়ে ঢোকে।

শম্ভুর মনটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু কাঁটার মতো বিঁধে থাকে, বিমলার না ফিরে আসা।

শম্ভু খোপ বন্ধ করে। ভালো করে দেখে। এ অঞ্চলে খাটাসের উপদ্রব খুব। প্রথম দিকে একটা পুরনো খোপ ভেঙে একটা পায়রা মুখে নিয়ে পালিয়েছে। ছুটে এসেও বাঁচাতে পারেনি। তাই বন্ধ খোপ ভাল করে পলিথিনের চাদর দিয়ে মুড়ে দেয়। তারপর তো তারের জালের শক্তপোক্ত খোপ পেয়ে গেছে।

উঠোনে বসে থাকে শম্ভু। ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস-ট্রাকের আসা-যাওয়ার শব্দ শোনে। দূরে মাতালের অসংলগ্ন গান ভেসে আসে। দু'দিন সে ঘর ছেড়ে বাইরে যায়নি। খিদে মেটাবার জন্য সিদ্ধভাত আলুসিদ্ধ দিয়ে খেয়েছে। আর তাকিয়ে থেকেছে পথের দিকে। যদি বিমলা আসে।

হঠাৎ চোখ পড়ে মোড়ের মাথায় একটি মেয়ে রিকশা থেকে নামছে। অন্ধকারে ভালো করে বুঝতে পারে না। কিন্তু এদিকেই তো আসছে। হ্যাঁ, মাথার ঘোমটা দেওয়া বউ একজন। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে। আরে, এতো বিমলাই।

সে উঠে দাঁড়ায়। লণ্ঠনের আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দেয়। আর সে মুহূর্তে দেখে, বিমলা কাছে চলে এসেছে। মিটি মিটি হাসছে। সে হাত ধরে বিমলাকে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, তুমি কী। জান না, আমার চিন্তা হয়? একটা খবর পর্যন্ত দিলে না?

শম্ভু অভিমান ভরে কাঠের চৌকিটায় বসে। বিমলা এগিয়ে যায়, বলে, খবর দেব কী করে? তোমার লিখে দেওয়া ফোন নম্বরের কাগজটা হারিয়ে ফেলেছি। কত খুঁজেছি, পাইনি। রাগ করো না গো। আমি কি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি?

শম্ভু বিমলাকে বুকে টেনে নেয়। বলে, আর কোনওদিন তোমাকে একা ছাড়ব না।

বেশ! বিমলা মিষ্টি হাসে। বলে, এবার থেকে তুমি আসার সঙ্গে যাবে। আসলে কী জানো, শরীরটাও খারাপ হয়েছিল। মাথা ঘোরাচ্ছিল। তাই— তবে দাদা-বৌদি-মা খুব যত্ন করেছে। ওরা তো ভেবেছিল আমি হারিয়ে গিয়েছি। বিমলা হাসতে থাকে।

শম্ভু ফুরফুরে মনে ভাবে, তার লাল পিলভটা খুব পয়া। যেন সে-ই খুঁজে খুঁজে বিমলাকে ডেকে এনেছে। আরও ভাবে, তারাও বুঝি একজোড়া পায়রা। এক খোপে দু'জনে থাকে। তাই তো বিমলার আকাশ চিনতে ভুল হয়নি। ঠিক চলে এসেছে। সত্যিই তো এখন তাদের দু'জনের উড়ে বেড়াবার সময়। আকাশও চেনা, কেউ এই আকাশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৯ আগস্ট ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশের গ্র্যানি অশোকা

কণা বসু মিশ্র

শাশুড়িকে নিয়েই যত সমস্যা।

স্কারবারোর অ্যাপার্টমেন্টটা চমৎকারভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিল সৌরভ, পাপিয়া। কিন্তু উনি দেশ থেকে হঠাৎ

চলে আসায় সব গোলমাল। তারপর আবার সৌরভের মা হবার অপরাধটাই যেন বেশি। হতেন যদি উনি পাপিয়ার মা তাহলে তো কথাই ছিল না। পাপিয়া খুশি হলেও সৌরভ হয়তো নানা সমস্যায় ভুগত। পাপিয়ার মায়ের অভিভাবকত্ব সৌরভ হয়ত সহ্য করতে পারত না। তবু মেনে নিতেই হত। নইলেই খাঁচাখটি। বউকে আনন্দে রাখার জন্যে সৌরভ ওর মায়ের ফিফটি ফিফটি দায়িত্ব নিতে বাধ্য হত। নিজেদের যতই অসুবিধে হোক, তবু। পাপিয়া প্রায়ই অশান্তি করছে শাশুড়ি অশোকাকে নিয়ে।

— বেশ তো উনি ছিলেন কলকাতায়। তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে জায়গার তো অভাব নেই। এখানে আবার নিয়ে এলে কেন?

— কেউ দেখার ছিল না। মায়ের বয়স হয়েছে। উপায় কী?

— উপায় কেন থাকবে না? দেশে কি আয়ার অভাব রয়েছে? এ বেলা ওবেলা আয়া সেন্টার থেকে আয়া পাওয়া যায়।

— ওই খালি বাড়িতে মা একা। আয়াকে বিশ্বাস কি?

— তাতে কি একতলায় তো তোমাদের ভাড়াটে রয়েছে।

— বেশ তাহলেই হল মায়ের সিকিওরিটি?

ওঁরা তো নীচের তলায় থাকেন। ওপরে কে এল না গেল ওঁদের খোঁজ রাখতে বয়েই গেছে। তাছাড়া খোঁজ রাখবার সময়ই বা কোথায়? প্রত্যেকেই তো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

— তাই বলে কলকাতায় আর কারও মা একলা থাকেন না যেন।

— যাঁরা থাকেন, থাকেন। আমার মা থাকবেন না। রোজই তো ইন্টারনেট খুলে কলকাতার কাগজ পড়ছি। ফ্ল্যাটে ডাকাতি, খুন খারাপি তো লেগেই আছে।

— আমার মাও তো নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে একা থাকেন।

তোমার মা তো একা থাকেন না। তোমার ভাই থাকে পাশের ফ্ল্যাটে। আমি ছাড়া আমার মায়ের নিকট আত্মীয় কেউ নেই।

~ www.amarboi.com ~

— আহা, ভাই কত মায়ের খোঁজ রাখে? সে তো তার বউ নিয়েই ব্যস্ত।

কী মুশকিল সে তো তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার। তাতে আমার কি? আমার মা এখানেই থাকবেন। সাফ কথা। মাকে একলা ফেলে রাখব না কলকাতায়।

পাপিয়া গজর গজর করতে থাকে। ওদেশে উনি একলা। আর এদেশে বুঝি নন? কে ওঁকে পাহারা দেবে শুনি? অফিস করব না তোমার মাকে দেখব?

— কে তোমায় আমার মাকে দেখতে বলেছে? উনি ওঁর মত থাকবেন। তুমি তোমার মতই থাকবে। আমিই তো রয়েছি। তোমায় তো আমার মাকে দেখতে বলিনি।

— অফিস যাবে না? বাড়িতে বসে থাকবে?

— উইল ইউ স্টপ? প্লিজ ইউ ডোন্ট ডিসটার্ব মি।

পাপিয়া থামল না। বক্ বক্ করতে লাগল। পুরুষ শাসিত সমাজ ...। তুমি যেমন তোমার মাকে এনে রাখছ, আমি ও আমার মাকে এনে রাখতে পারি। আমিও চাকরি করি।

— বেশ রাখ না। আরেকটা ফ্ল্যাট দেখতে হবে তাহলে। এই কনডোমিনিয়াম যথেষ্ট নয়।

পাপিয়া তখন উল্টে বলল, আমার মা তোমার মায়ের মত নন। উনি কখনও তোমার ঘাড়ে চাপবেন না। ওঁর একটা আভিজাত্য রয়েছে।

— আর আমার মায়ের আভিজাত্য নেই? ছেলের কাছে থাকলেই আভিজাত্য গেল?

— উহ আর বলো না, আর বলো না ...।

ঠামি আসায় সোহং আর তিন্নি যেজায় খুশি। অলোকার এত বুক ভরা আদর। কত রকম খাবারদাবার বানিয়ে খাওয়ান নাতি, নাতনিকে। ওদের পছন্দ মত কেক টেক তো রয়েইছে। সেই সঙ্গে কমলালেবুর পায়েস, লাউয়ের পায়েস, চালের পায়েস। অশোকার উৎসাহের শেষ নেই। সোহং, তিন্নির ছুটির দিনের ব্রেক ফাস্টের মেনুই বদলে গেল। কিন্তু পাপিয়ার মুখে কিছুতেই হাসি ফোটাতে পারলেন না তিনি।

দুটি বাচ্চা আর স্বামী, স্ত্রী মিলে তিনটে ঘর থাকাতেও খুব অসুবিধে ছিল ওদের। পাড়ার ঘর, শোবার ঘর, দু'জনের আলাদা। সৌরভ, পাপিয়ার শোবার ঘর একটি। সেই ঘরেই সৌরভের কম্পিউটার। পাপিয়া ড্রইং রুমে বসেই ল্যাপটপ এ কাজ করে যায়।

শাশুড়ি আসায় বাধ্য হয়েই তিন্নির ঘরে ওঁকে ঢুকিয়ে দিতে হল। ড্রইং রুমের একটি কোণেও একটি ব' ডিভান পাততে হল। সারাদিন ফ্ল্যাট যখন খালি, তখন উনি ওখানেই থাকবেন। রাতে তিন্নির সঙ্গে ঘুমোতে পারেন। তবে বাড়িতে যেদিন পার্টি থাকবে। সেদিন তিন্নির ঘর থেকে নট নড়ন চড়ন। একালের পরিবারে সেকালের বাবা, মা নট অ্যালাউড। তিন্নির লেখাপড়ার অসুবিধে হয় খুব। সোহংয়ের সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি হয়। লেগে যায় দু'জনে গোলমাল। ঘরের আসবাবপত্র, টেবিল চেয়ার সবতেই ভাগ। প্রায়ই মারপিট। ওদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনিং কাম ড্রইং রুমে পার্টি চলছে। সভ্যতা, শালিনতা বোধের দায়ে পাপিয়া ছুটে এসে লড়াই থামায়। অশোকা তো তিন্নির ঘরে। সে ঘরের দরজা বন্ধ। পাপিয়ার ওরকমই নির্দেশ। তবু অশোকা লুকিয়ে দরজা খুলে নাতি, তিন্নির ঘরে ঢুকে পড়েন অনেকদিন। ওদের ঝগড়া থামিয়ে তিন্নিকে তার ঘর ফেরত দেন। উনি নিজে এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন। পাপিয়ার তাতে ভয়ানক আপত্তি। তিন্নির অসুবিধে হয়, ঠামি ঘরে থাকলে। অশোকা শ্যামবাজারের বাড়ির স্বপ্ন দেখেন মাঝে মাঝে। ঘুম ভেঙে গেল টুকরো টাক্‌রা স্মৃতির জাবর কাটেন। বাড়িটার অনেকগুলো ভাগ হয়েছে। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো মিলে। কিন্তু সবার ছেলে মেয়েই প্রায় বিদেশে। কেউ কেউ কলকাতায় থেকেও আলাদা ফ্ল্যাট কিনেছে। পুরনো বাড়ির লোনা ধরা দেওয়ালের কড়ি কাঠ, ইটের হিসেব নিতে তাদের ভারি দায়। অশোকাদের চার পুরুষের বাড়ি। আগে ছিল জুড়ি গাড়ি। সেকাল চলে গেল। তারপর যখন শ্বশুরমশাইয়ের কাল এল। তখন হুড্ খোলা গাড়িতে চেপে শাশুড়িমা গঙ্গা স্নানে যেতেন। অশোকাকেও হাওয়া খেয়ে নিয়ে যেতেন সন্ধেবেলা। শ্বশুরমশাই কোর্ট থেকে ফেরার পর।

সৌরভের বাবার ছিল বেহিসেবি মেজাজ। অতবড় ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু দান, ধ্যানের হাত ছিল খুব। কিছু গোছাতে জানতেন না। নার্সিংহোমটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি ভাঙিয়েও চলত অন্যের জন্য খরচ। কার মেয়ের বিয়ের টাকা দরকার। কার ছেলের পড়া হচ্ছে না, কোন ক্যানসার রোগীর জন্য টাকার দরকার, কার জন্য একটা কিডনি দরকার, হাসপাতালের বেড ... সব ব্যাপারেই উনি দরাজ। পরে ব্যাংক প্রায় শূন্য করে রেখে গেলেন। যদিও একেবারে শূন্য নয়। অশোকার জন্য ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

কলকাতার জীবনে অশোকার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ মোটামুটি ছিল ভালোই। আসা যাওয়া থাকলেও কারই বা এত সময় আছে, যে সেভাবে আসবে। সেই এক রোববার। মাসি, পিসির বাড়িতে খোঁজ খবর নেবে, না যার যার সংসার সামলাবে? সিনেমা, থিয়েটার, সপিং মল সবই তো রয়েছে। বাচ্চাদের জন্য চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, তো এখন পুরনো তবু নতুনকালের বাচ্চাদের কাছে নতুন। ওই নিকো পার্ক ও তো আনকোরা হয়েও পুরনো।

কলকাতার হাল চাল এখন প্রায় বিদেশের মানসিকতায় এসে ঠেকেছে। কলকাতাও তো আর সেই কলকাতা নেই। পাতাল রেল হল, সপিং মল হল, কত ফ্লাইওভার হল। একেবারেই ভোল পাল্টে গেল, বহুতল বাড়ির আকাশছোঁওয়া ঝিলমিলিতে। বাইপাশ হল, যেখানে আগে ছিল অশোকাদের মাছের ভেড়ি। সেখানে সব কালো পীচের চওড়া রাস্তা। এইসব অদল বদলের মধ্যে ভালোবাসার আকাশটা ক্রমেই ছোট হয়ে গেল। পাড়ার লাইব্রেরির ছেলেরা এখন আর বইটই এনে দেয় না। সময় কারই বা আছে?

অশোকা তবু আয়ার সঙ্গে প্রায়ই হাঁটতে বেরতেন ভোরবেলা। মোটা শরীর। কোমরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাত। হাঁটতে কষ্ট হত। তবু ...। সোমেশ ড্রাইভার ছেলেটা ভালোই ছিল। কিন্তু অশোকার বাড়তে দক্ষযজ্ঞ লাগিয়ে দিত। আয়াকে দিয়ে লুচি ভাজানো। ভাড়ার থেকে জিনিস বের করে নেওয়া ...। বাড়িতে মহা হট্টগোল। যেন ওদেরই রাজত্ব। কাঁহাতক ভালো লাগে? অশোকাকেই ওদের অতিথির মতো থাকতে হত। প্রথম প্রথম ভালোই লাগত। পরে আর নয়। অসম্ভব বাড়তি খরচ। আলমারী খুলছে আয়া। ড্রাইভার প্রচুর পেট্রোল সরাচ্ছে। টেলিভিশনের আর বিশ্রাম নেই। সারা দিন রাত চলছে তো চলছেই। টিভি'র পর্দায় ওদের পছন্দমত মারপিটের ছবি—টিসুং ঢাসুং আর প্রেমই চলবে। বোমাবাজি, খুন খারাপী, হিংসের বলি খবরের কাগজেও যা, টিভি'র পর্দাতেও তাই। দেখতে দেখতে অশোকার বুক ধড়ফড় করত। বন্ধ করতে বললে ওরা শুনবে না-দিদা! আরেকটু আরেকটু ...।

অশোকার পছন্দমত কোন চ্যানেল, সিনেমা, টিভি, সিরিয়াল, রবীন্দ্র সংগীত চলবে না। সৌরভ তো সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল। ভাল ভাল পুরনো ছবির সিডি ছাড়াও একালের কত সুন্দর সব আর্ট ফিল্ম। রবীন্দ্র সংগীতের অসংখ্য সিডি। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল কেউ বাদ নেই। কাচের শো-কেস-এ গাদা ক্যাসেট সিডি। বিছানার পাশেই টেলিফোন। ইচ্ছে করলেই যার সঙ্গে খুশি কথা বলা যায়। একটুখানি ভালোবাসা। তবু বুকের মধ্যে আটকে থাকে কল্পনার দুরন্ত ঢেউ। নকসী কাঁথার ফোঁড় তোলার যন্ত্রণা। তখন ইচ্ছে করে নাতি, নাতনিদের মুখ মনে করতে।

কিন্তু এখানে এসে অশোকা দেখছেন আরেক সমস্যা ভিজে উঠে মনটা ফের সেই কলকাতার জন্যই। কিন্তু সৌরভ তো যেতে দেবে না। ইচ্ছেও তো করে না ওঁর ওদের ছেড়ে যেতে।

সারাদিন একলা থাকাটা ভালোই অভ্যেস হয়ে গেছে। সেদিন সৌরভ নিয়ে গিয়েছিল এখানকারই একটা ক্লাবে। বাঙালি প্রধান ক্লাব। যুবক যুবতীর ভিড়। মধ্য চল্লিশেরও অনেকেই রয়েছেন। সৌরভ সবার সঙ্গে নিজের মাকে পরিচয় করিয়ে দিল। এক ভদ্রমহিলা নাক কুঁচকে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, — আমার মেয়ে বলেছে, আমি একজন আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করব। অথবা ক্যানাডিয়ান, কিংবা অস্ট্রেলিয়ান অথবা ইওরোপীয়ান। কিন্তু বাঙালি, ইণ্ডিয়ান ছেলে কখনই নয়। পাশের মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

— ইণ্ডিয়ান ছেলেগুলো বড্ড ম্যা ম্যা করে।

— ভালোই তো। এরপর ব্যাউ ব্যাউ করবে।

শুনে সবাই হেসে উঠল।

মহিলাটি তাতেও থামবার পাত্রী নন। বললেন, বউ বউ করলে কি আছে! মায়ের সঙ্গ কি ছাড়বে? ক্লাব, পার্টিতে পর্যন্ত এনে হাজির করবে।

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। অশোকা ঘামতে লাগলেন। রুমালে কপালের ঘাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুছলেন। ভাবলেন সত্যিই তো উনি যে একেবারেই বেমানান। সৌরভ কিন্তু পাত্তাই দিল না ওই মহিলাকে। বলল, ইয়েস, আই অ্যাম ক্রাউড অফ মাই মম। সী ইজ সো স্মার্ট। মাকে সব সোসাইটিতেই নিয়ে যাওয়া যায়। আর ভারতীয় সংস্কৃতি মা, বাবাকে বাদ দিয়ে নয়।

এ ব্যাপারে পাপিয়াও কিন্তু সায় দিয়েছিল ওকে। তখন সবাই এগিয়ে এসেছিল অশোকার দিকে।—অ্যান্টি! কেমন লাগছে কানাডা? থাইজে' আইল্যা' দেখতে গিয়েছিলেন? নায়েগ্রা ফসল? মান্ট্রিয়াল? কিউবেক সিটি? ...

আজকাল ভোরবেলা পাওয়ারের সাদা জুতো, প্যান্ট সার্ট পরে প্রাতঃভ্রমণে বেরোন অশোকা। এক সময় কলেজে পড়াতেন। সৌরভের জন্মের পরই চাকরিটা ছাড়তে হয়েছিল কত্তার ইচ্ছেয়। ঘরে বসে থেকেই মোটা হয়ে গেলেন। তারপরই আর্থারাইটিস ...। এখানে এসে ওঁর কোমরের বাত হওয়া। কোথায় গেল পায়ের ব্যথা! মিসিসাগা থেকে ব্র্যামটন। উনি দিব্যি হাঁটতে পারেন। স্কোয়ারওয়ান মল-য়েও একাই ঘুরে বেড়ান। চারদিকে সাহেব, সুবোর ভিড়। কালো, সাদা সবার ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে উনি ভালোবাসার পায়রা উড়িয়ে দেন। মুখে হাসি নিয়ে সাহেব, মেম সাহেবদের হ্যালো, হাই-য়ের জবাব দেন। কাঁহাতক আর ঘরে বসে শূন্যতার জবাব কাটবেন? আর কলকাতার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন? বর্তমানটাই ওর এখন হাতের বটুয়া।

সৌরভ খুশি। বলে, ভেরি গুড, আমার সুইট মম।

অশোকা হেসে বলেন, থ্যাঙ্ক ইউ মাই সান।

ওদিকে মিসেস নাগকে দেখলে কষ্ট হয়। বাতের ব্যথায় উনি পড়ে রয়েছেন বিছানায়। ছেলের বউ, ছেলে অফিস চলে গেলে, ডাইনিং টেবলে বসে খাবারটা খেতেও ওঁর কষ্ট হয়। লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে উনি বেডরুম থেকে পৌঁছোন খাবার টেবলে। এর ভেতরে একদিন পড়ে গিয়ে ডান পা-টি ভেঙে বসেছেন। এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। মিসেস নাগ টেলিফোন হাউ মাউ করে খুব কাঁদলেন একদিন।—বলুন তো আমি কি কোনদিন দেশে ফিরতে পারব না? এদেশে হাসপাতালের ফাউলারস্ বেডয়েই আমায় বাকি জীবন কাটাতে হবে?

অশোকা সাহস দিলেন, তা কেন? সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। হাসিটি মুখে কিন্তু বজায় রাখবেন। হাসির মধ্যে দিয়েই আপনি আবার আগের মতো জীবন ফিরে পাবেন। পায়ের প্লাস্টার তো কেটে দিয়েছে কবেই। ...

— ফিজিও থেরাপিষ্ট চেষ্টা করেও আমায় হাঁটাতে পারছে না। আমার ছেলে এদেশের নাগরিক। ও যে কোনদিনও দেশে ফিরবে না।

বুকের মধ্যে ধাক্কা খান অশোকা। সৌরভ পাপিয়া, নাতি, নাতনি সবাই তো তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউই তো আর কোনদিন দেশে ফিরবে না ...। ওরা সবাই এদেশের নাগরিক। দেশের মাটির টান আর রইল কোথায়?

তবু নিজেকে ঠিকঠাক্ করে নেন অশোক বাকি জীবন ওঁকেও তো এখানেই কাটাতে হবে। ব্র্যানটন্-এ বিশাল বাড়ি কিনছে সৌরভ। আদর করে বলেছে, মা। তোমারও এদেশেই থাকতে হবে কিন্তু। তখন এদেশের মতোই তৈরি হতে হবে। যখন যেমন, তখন তেমন। অশোকা, সোহং, তিন্নির মর্ডান গ্র্যানি হতে থাকেন। ছুটির দিনের সকালে নায়েগ্রা ফলস্-এ যেতে যেতে বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ের গল্প বদলে ফেলেন। সোহং, তিন্নির জন্য একালের গল্প ফেঁদে বসেন। সেলফিস জয়েন্ট, কিংবা স্নো হোয়াইট ... ওসব তো পুরনো। উনি সব ঠামি, দিদু, গ্র্যানিদের একটি দলে কেবল মহাকাশযানে পাড়ি জমান। গল্প জমে ওঠে। গাড়ি চালাতে চালাতে সৌরভ হাসে। পাপিয়াও হাসতে থাকে। কিন্তু ভালোবাসার মহাকাশযানটি তখন সাঁই করে উড়ে গেছে মঙ্গল গ্রহে। সেখান থেকে চাঁদে। তারপর আরও কতসব গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। একেক দেশের গ্র্যানি, ঠামি, দিদুরা একেক রকম গল্প শোনাতে থাকেন। সোহং, তিন্নি অবাক হয়ে সেই গল্প শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের কথাই বলতে থাকেন, কি করে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মার গল্প চলে গিয়েছিল সুদূর পারস্যে। পারস্যের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প চলে এসেছিল এদেশে। পৃথিবীর সব বণিকরা বাণিজ্যে বেরিয়ে যখন একসঙ্গে বিশ্রামে বসতেন, তখন তাঁরা এমন এক ধরনের ভাষা তৈরি করেছিলেন, যা সবাই বুঝতেন। এক দেশের গল্প আরেক দেশে এভাবেই ছড়িয়ে পড়ত।

তিন্নি গো-গ্রাসে গিলতে থাকে ওঁর কথা। সোহং অপলকে তাকায়। বলে, তারপর?

কিন্তু অশোকা বলেন, মহাকাশ যানের প্রচ' শব্দ, গল্পটা বলবে কী করে? দাঁড়াও আগে একটা গ্রহে পৌছক ...! মহাকাশযানের শব্দ শুনতে পাচ্ছো!

আজকের গ্র্যানিদের গল্প যে এক মুহূর্তের গল্প দাদুভাই!

আজকাল বাড়িতে পার্টি থাকলে ছোটদেরও ডাকা হয়। অশোকার খাতির বেড়ে যায় পাপিয়ার কাছে।

— মামনি! বাচ্চারা এলে তুমি সোহং, তিন্নির ঘরে ওদের নিয়ে গিয়ে গল্প শোনাবে?. ওরা এনজয় করবে। সৌরভ ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আমার মা কি শুধু ছোটদের সঙ্গেই গল্প করবে? বড়দের সঙ্গি নয়! আর ওদের লেখাপড়া? পাপিয়ার গলায় অনুরোধ। — প্লিজ। সৌরভ। ওটুকু ওদের রিক্রিয়েশন। বাধা দিও না। মামনি কি তোমার একার?

অশোকা মুচকি হেসে চলে যান নাতির ঘরে। কার্পেটের ওপরে বসেন। ওঁকে ঘিরে তিন্নি, সোহং, আর ওমর সদ্য নতুন এদেশের রেডিমেড্ নাতি, নাতনিরা।

প্রথম মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং থেকে শুরু করে কত যে মহাকাশচারীর গল্প চলতে থাকে। কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়াম পা', কে নেই সেই গল্পে? যারা গ্র্যানি, ঠামিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে উড়ছেন মহাকাশে। গ্র্যানি, দিদু, ঠামিরা সব পরী হয়ে গেছেন। তাঁদের ফোকলা মাড়ির হাসিতে যেন ঠাকুরমার ঝুলি। ...

ব্রামটনের বাড়ির বাগানে প্রজাপতির মতো উড়তে থাকেন মহাকাশের গ্র্যানিরা। চাঁদের পাহাড় থেকে যখন নেমে আসেন নীচে। প্রচুর হাততালি শুরু হয় নাতি, নাতনিদের। অশোকা আনন্দের দ্বীপ তৈরি করেন।

সোমেশ ড্রাইভার প্রায়ই ফোন করে,—আন্টি, কবে আসছেন?

অশোকা আগে বলতেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আজকাল আর সেটা বলেন না। বলেন, এই তো সবে এলুম।

— কেমন আছেন আন্টি?

— খুব ভালো।

অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে অশোকার চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় মনে পড়ে। কলকাতার অসংখ্য অলি-গলি। কতদিন যে কলকাতার রাস্তায় হাঁটেননি!

বর্তমান, ৯ নভেম্বর ২০০৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষলতা

কিন্নর রায়

জ্যোৎস্নায়—চাঁদ গলে-যাওয়া কুলপি হয়ে নিচে নামতে থাকলে একদম অন্য রকম হয়ে যায় মাগুরমারি, বিশেষ করে এই বর্ষণ ঋতুতে, যখন কিনা পাল পাল মেঘ তাদের বৃষ্টিবন্দনার মন্ত্র নিয়ে উড়ে এসেছে উত্তরবঙ্গের মাথায়। এই সব জলদ গম্ভীর মেঘেরা শুধু ভেসেই আসেনি, তারা ঝমঝমিয়ে যখন-তখন ভেঙেও পড়ছে পৃথিবীর গায়ে। ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্সের ভেতর নদী থাকলে, তো সেই জলধারা যতই রোগা হোক না কেন, তার একটা অন্য রকম ব্যাপার থাকে। শীতে, গরমে মাগুরমারি রোগাস্য রোগা হয়ে গেলেও বর্ষায় তা জলবতী, স্রোতময়ী। তখন তার গভীরে জেগে থাকা নানা মাপের পাথরেরা নিজের নিজের ভূমিকায় একেবারেই চুপ করে সিঁটিয়ে থাকে। বরিষণ ঋতুকালে মেঘ-চোঁয়ানো জল-লাগা চাঁদ কখনও কখনও বহুজাতিকের বিজ্ঞাপন-বেলুন হয়ে উঁকি মারে আকাশে। সেই ফুলো ফুলো, টাবটুব চন্দ্রশোভার দিকে তাকালে চোখে বিঁধে যায় এক ধরনের ছায়া-ছায়া আলোকঝারি। তখন মাগুরমারির জলে সেই চাঁদই কোনও বাতিল চীনে খেলনা হয়ে ভেসে যেতে থাকে। নদী জল পেরিয়ে পাথরেও ছায়া পড়ে চাঁদের। চাঁদেরই ছায়া।

যখন দক্ষিণবঙ্গ প্রায় বৃষ্টিহীনতায় জিভ বার করে প্রবলভাবে হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা করছে, কখনও কখনও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বড়জোর করুণার এক-আধ ফোঁটা পেয়ে সার্থক মনে করছে নিজেদের, তখন উত্তরবঙ্গ তো দিব্যি বৃষ্টি-টইটম্বুর।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি বড়ই সুন্দর। বিশেষ করে বর্ষায়। এ সময়টাতেই সবুজের আশ্চর্য মায়ালাপে জেগে থাকে চারপাশ—প্রাচীন ও নবীন, নবীনতর বৃক্ষরা। সেই সঙ্গে লতা-গুল্মময় অন্ধকার, আলো। অজস্র ফার্ন এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর জুড়ে। বর্ষা পেয়ে তারা দ্বিগুণ, তিন, গুণ, চার গুণ সবুজতর হয়ে ওঠে। তখন কদমের কালচে গা বেয়ে আকাশজলের ধারা। বর্ষার শুরুতে সেখানে কুঁড়ির আভাস। নতুন নতুন সবুজাভ পাতার আবডালে নবীনতম কুঁড়ি। আরও বৃষ্টি পেলে তারা শোভাময় পুষ্পবাহার হয়ে জেগে উঠবে।

ভোর ভোর—নাহ, সকাল ছ'টাকে তো কিছুতেই ভোর বলা যাবে না, তবুও এই মেঘ থই-থই হালকা অন্ধকারের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে সত্যেন রায়ের মনে পড়ল তার দেশের বাড়ি বারোভিসার কথা। কোচবিহারের সেই গ্রাম; মেঘেরা কখন যেন থাক দিয়ে শুয়ে পড়ে সেই গ্রামের বাড়ির চালের গায়ে গায়ে। তখন কোয়াশলতায়, কচু ঝোপে, ঢেঁকিশাকের ফার্নদুনিয়ায় পাখিরা [illegible] ঝম ঝম ঝম ঝম। এ কি

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

বারোভিসারই ছবি কেবল? নাকি গোটা কোচবিহার, উত্তর বাংলাও একই বর্ষণাকাশের নিচে। বিহারের মোতিহারির তামাক, দিনহাটা আর মেখলিগঞ্জের পাট। প্রাচীনকালে—সেই কবেকার কাল। আদ্যিকালের রেডিওসম্প্রচারে সন্ধ্যেবেলা সাড়ে সাতটার খবরের আগে মোতিহারির তামাক আর মেখলিগঞ্জের পাটের দর। তিতা পাট, মিঠা পাট। তখনই কাছে-দূরে কারা যেন সত্যেনের ডাকনাম ধরে ডাকে—'সামলু-সামলু-সামলু-রে—।'

ট্রানজিস্টারের মোহন মহিমায় ষাটের দশকের কোনও মেঘলা-ভেজা সন্ধ্যায় পাট আর তামাকের দর, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র—কলকাতা ক থেকে। ভোর হওয়ার খানিক আগেই নিবিড় অন্ধকারের ভেতর ঘরপালা গরুটি ডেকে ওঠে। হাম্বা দেয় বলদ জোড়া। ওরা জানে না দিনহাটা, মেখলিগঞ্জের পাট, তামাকের দরদাম। হলদিবাড়ির সবজি, কাঁচালঙ্কা, জলপাই আলু, মানুষের সভ্যতার গায়ে লেগে থাকা সহবতের আঁশ ঠিক কোন রঙের।

কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে চত্বরের ভেতর দ্রুত পায়ে হাঁটলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'নম্বর গেট। তার পর পিচঢালা বড় রাস্তা। খর পায়ে হাঁটলেও মিনিট তিরিশ বড়জোর। পথে রামমোহন পায়ের মূর্তি পড়ে, তেমন বড় নয়। তবে পা থেকে পাগড়ি পর্যন্ত, যাকে কিনা এক কথায় পূর্ণাবয়ব বলা চলে। সকলেই বেশ জোরে হাঁটছে। পায়ে স্পোর্টস শু। ট্র্যাক স্যুট। ওপরে টি-শার্ট। মেয়েরাও এই ভোর-হাঁটুনিতে পিছিয়ে নেই। কদিন ধরেই কাজের অসম্ভব চাপ। ক্ষেত্র সমীক্ষা নামের একটা নতুন বাহারি কথার আমদানি হয়েছে বেশ কয়েক দশক। ফিল্ড স্টাডি বা ক্ষেত্র সমীক্ষা—এই শিরোনামের আড়ালে চাপিয়ে দেওয়া যায় অনেক, অনেক কিছু। নইলে ভাল করে ফারাক জানে না সারিন্দা আর দোতারার মধ্যে, সেই ভাওয়াইয়া নিয়ে বড় বড় মন্তব্য করে থাকে। এখন ইন্টারনেট হওয়াতে অনেক অনেক সুবিধা হয়েছে না। অন্তর্জাল। অন্তর্জাল। মাউস ক্লিক করলেই হাতের তেলোয় পৃথিবীর যাবতীয় উপচে-ওঠা জ্ঞান ভান্ডার। তার ভুল, ঠিক চেক করার লোকজনই বা কোথায় এখন তেমন করে। এ সব আলগা আলগা কথা শুনলেই খুবই রাগ হয় সত্যেন রায়ের। সকলেই গবেষক, ক্ষেত্র সমীক্ষক। মুখে মুখে ভাওয়াইয়া, চটকা, হালুয়া-হালুয়াইনের গপ্পো। আদিকে সারিন্দা আর দোতারার ফারাক জানে না। আর এই যে না-জানার পর্দা, তা নিয়ে তেমন কোনও লজ্জাও নেই। চারদিকেই এখন ক্ষেত্র সমীক্ষক, গবেষক। ফিল্ড ওয়ার্ক, বাস্তব জীবন নিয়ে স্টাডি। লোকায়ত জীবন, খুব খায়, এখন খায়। আগেও খেত। ফোক। ফোক। ফোক। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা প্রায়। ফোক পুতুল, ফোক সং, ফোকলোর। আমাদের পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, মাশান, ভাওয়াইয়া, গিদাল—সব কিছু নিয়ে বাবুভায়াদের কারবার। সেমিনার, পেপার পড়া, পি এইচ ডি। থিসিস সাবমিট করে বা না-করে বিদেশযাত্রা। সেখানেও সিম্পোসিয়াম, হাততালি, ইন্টারভিউ, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। অথচ প্রাণের গভীরে জেগে থাকা সারিন্দা-ধ্বনি, দোতারার তান বুকের ভেতর মাঝে মাঝেই খামচে ধরে। পোড়া মাটির ঘোড়া নাচে। পুড়িয়ে নেওয়া মাটির হাতি থান ছেড়ে গুটি পায়ে এগোয় জঙ্গলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনের ডাকনাম 'সামলু সামলু সামলু' বলে কারা যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাডাকি করে। মাশানের আলোছায়া, গিদালের আশ্চর্য ধ্বনিমাধুরী, ভাওয়াইয়ার বিষাদ, সব কিছু নতুন করে ফুল এঁকে দেয় আকাশের গায়ে গায়ে। যে রকম শীত, বর্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতার ভেতর রাতের অন্ধকার নেমে এলে টিপ টিপ জোনাকিদের অপরূপ রূপমাধুরী। ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই লক্ষ টুনি বালব হয়ে জ্বলছে, নিভছে অজস্র আলোপোকা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এই নৈঃশব্দের কান্নাকাটির ভেতর আলোক-পতঙ্গদের নিজস্ব রাগালাপ। এত এত জুনি পোকা কোথা থেকে আসে, যায়ই বা কোথায়? ঘাসের ওপর, প্রাচীন সব বৃক্ষদের ডালে-পাতায় তাদের অবিরাম আলোবাহার। সত্যেন ভাবে, সারিন্দা আর দোতারা একই সঙ্গে যদি বেজে ওঠে চাঁদ-ভালবাসা অন্ধকারে, তখন তো নিস্তব্ধতারই উৎসব কেবল। আর কিছু নয়? আর কিছুই না।

এই বৃষ্টিদিনের সকালে মেঘলা মাথায় নিয়ে ঘুম থেকে উঠে পায়ে কেডস দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্যে যে জড়তা আর আলসেমি ভাঙানোর ধাক্কাধাক্কি থাকে, যে রকম কিনা সামান্য বয়স্ক হয়ে যাওয়া চার চাকাকে শীত ভোরে একটু বেশি বেশি করে গুঁতিয়ে ছোটার জন্য তৈরি করতে হয়, তেমনই তো এই শরীর। যত পুরনো হয় তত কলকব্জায় শ্রান্তি আসে। হাই তোলা ক্লান্তি। — বাবারে বাবা, মা গো, আর তো পারি না। তবু তো পারতেই হয়। পারতে তোমাকে হবেই। নইলে তো চলবেই না কিছুতে।

কদমেরা এখনও ফুটে উঠতে পারেনি। হয়ত দু-চার দিন পরেই ফুটবে। তখন সেই রোমাঞ্চিত পুষ্পবাহারে, কদম্ব-রোঁয়া আর রেণু সমেত কী রূপ কী রূপ। সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন আশ্চর্য, অলৌকিক এক সুগন্ধ সমস্ত ক্যাম্পাস জুড়ে। সেই সব কৃষ্ণপ্রিয় ফুলেরা এখনও ফোটেনি। কিন্তু তাদের নিশ্বাস—সুরভী মেশানো বাতাসে টের পাচ্ছে সত্যেন। পঁয়তাল্লিশ পার করার পর নিজেকে একটু যেন বয়স্ক, বুড়োটে লাগে এস রায়ের। আগে যেমন হত প্রায়ই কেশর ফোলানো বুনো ঘোড়া হয়ে কাজের আগে আগে এগিয়ে যাওয়া যেত, এখন আর তেমন হয় না। বক্সা, গরুমারা, জয়ন্তী—কোথায় কোথায় কোন জঙ্গলের ভেতর অবিরাম দিন-রাত্রি যাপন। মাথার ওপর চাঁদ তখন মেঘে-আলোয় মাখামাখি হতে হতে সত্যি সত্যি আস্ত একটা দোতারা হয়ে গেছে। সেই জ্যোৎস্না-মাখানো তার বাজনায় অনায়াসে রবি ঠাকুরের গানও বাজানো যায়। ওই যে শিবমন্দিরে—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দশ-বারো কিলোমিটার বাইক চালিয়ে আসা নগেন রায় কত সহজেই না তারের ছন্দে বাজিয়ে যেতে থাকে—'বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও।' নগেন বড় মজার মানুষ। নিজে গান বাঁধে। নিজেই গায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে গান লেখে, গেয়ে যায়। পাঁঠা, খাসি কিনে খাওয়ার ক্ষমতা আর রইল না সাধারণজনের। সেই সঙ্গে সমস্ত জিনিসের দাম একেবারে আগুন। নগেনের গলায় ভাওয়াইয়ার সুর যেন একেবারে বসানো। নগেনের আঙুলে আঙুলে দোতারার তার হেসে ওঠে। মানুষটি বড় রসিক। হয়ত সমান সমানই বয়স হবে। মনে মনে হিসেব করে সত্যেন। নগেনের মাথা-ভর্তি গাজান চুল, সামান্য কোঁকড়া। এখনও মাঠে নেমে খেতের কাজ করে জলে, কাদায়। মই দেয়। হাল-টানা বলদদের সঙ্গে কথা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান শোনায় তাদের। সত্যেনের মনে পড়ল নগেন বলে, আমজাদ আলি খাঁ সাহেব যেমন সরোদে রবীন্দ্রনাথের গান তুললেন, তেমনই আমিও রবি ঠাকুরের গান তুলে নিলাম দোতারায়। স্টেজে বাজালামও। এটাই বোধহয় দোতারায় প্রথম রবি ঠাকুর।

এ সব শুনে সত্যেন হাসে। নগেনের দিকে তাকায়। ভূমিপুত্র এই মানুষটি কত কী জানে। কিন্তু ক্ষেত্র সমীক্ষক, গবেষক হয়ে ওঠার বারফট্টাই নেই কোনও। সত্যেন এই বয়সে এসেই যেন কেমন একটু বুড়িয়ে গেল। কাজ। কাজ আর কাজ। ওয়ার্ক লোড। নতুন নতুন ভার-বোঝা। ঘাড়েরওপর কাজেরই সাতকাহন, সব সময় চেপে আছে। অথচ নগেন দিব্যি আছে। যখন এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকত ছাত্র হিসেবে, তখনও তো এমনই কদমফুল বাহার, রাতের জোনাকিমালা, মাগুরমারির জলে ছায়া অন্ধকার। চাঁদ সূর্যের ছায়া দর্শন। তখন তো স্বপ্ন ছিল অধ্যাপক হওয়ার। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পড়ানোর। দোতারায় সব মায়া তখন তো জীবনকে আরও সবর্স করে রেখেছিল সত্যেন ভাবে। তখন তো ঘুমের মধ্যে কদম ফুটে ওঠে, অজস্র কদম্ব পুষ্প। তার রেণুবাহারে অন্য রকম হয়ে ওঠে পৃথিবী। বারোণ্ডিসায়—দেশের বাড়িতে এই বর্ষায় শরীর, হা-হাত ম্যাজ ম্যাজ করলে মা কাকিমারা সুরমালি ফুল এনে তেলে ভেজে দিতেন। নয়ত তরকারি করে। সামান্য তিতকুটে স্বাদ। ভাতের সঙ্গে সেটি মেখে খাওয়ার পর বিষাদ, অবসাদ—সবই তো মুহূর্তে উধাও। ভ্যানিশ।

অফ হোয়াইট রঙের, অনেকটা যেন মাছের চোঙা, পাপড়িরা একটু মোটা, খসখসে। মা কাকিরা কোথা থেকে যেন নিয়ে আসতেন। হয়ত কুড়িয়েই এনেছেন। এই ক্যাম্পাসেও সুরমালি ফুলের গাছ আছে। ভোর ভোর, ঘন বর্ষাদিনে সবুজ ঘাস আর ফার্নের ওপর তারা বোঁটা খসে, চুপচাপ পড়ে থাকে মুখ থুবড়ে। যে মেয়েরা, বউয়েরা এখনও নানা রকমের শাক তুলতে আসে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দির ভেতর, তারাও গরু-বাছুরের নাদ বাঁচিয়ে সব সময় পৌঁছতে পারে না এই সব ফুলেদের কাছে। নিয়ম আছে, বোর্ড দেওয়া রয়েছে গরু বাছুর, ছাগল-ভেড়া চরানো যাবে না ইউনিভার্সিটির হাতার ভেতর, কিন্তু ও সব আপ্তবাক্য কেউ শুনলে তো। রোজই গরু-বাছুর ঘুরে বেড়ায়। ছাগল-ভেড়াও। তাদের পেট পরিষ্কারের চিহ্ন বৃষ্টির জলে বেশি বেশি ছেতরে গিয়ে আরও এক মহাকিরিচ্ছিরি তৈরি করে।

সুরমালি ফুল কি কোনও প্রাচীন জাদু-পুষ্প! সুরমালির ভেতর কি লুকিয়ে আছে কোনও স্টেরয়েড অনুপান? না হলে এমনভাবে চনমনে হয়ে ওঠে কী করে শরীর। কেডস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে আসে সত্যেন। সুরমালি ফুলেরা তাদের অফ হোয়াইট বেগুন নিয়ে চুম্বন করছে সবুজ ঘাস আর ফার্নদের। আমার ছেলে সুরমালি ফুল জানে না। তার স্কুলের ব্যাগ অসম্ভব ভারী। নন্দিতা কলকাতাপ মেয়ে। সুরমালির বৈভব জানার কথা তার নয়।

ক্লাস টু র সারিন্দা—ছেলের নাম তো সারিন্দাই রেখেছে সত্যেন, সুরমালি ফুল ভাজা পাতে নেয় না। ওদের খাদ্যাভ্যাস অন্য রকম। কাজের চাপে ছাপ পড়ে মুখের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার চুল রুগণ, কমজোরি, বিবর্ণ, পাতলা হতে থাকে। বয়সের ছাপ আড়াল করতে সেখানে হেনা দিতে হয়। বালকবেলা, কৈশোর, প্রথম যৌবনের মুখ ক্রমশ ফ্যাকাসে, হতশ্রী, মার-খাওয়া, প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই স্ট্রেস, স্ট্রেসের অবসাদ, বিষাদ, টানাপোড়েন কি কেটে যাবে সুরমালি ফুলের ব্যঞ্জনে? যাবে কি। ভোর ভোর, নয়ত শেষরাতে বোঁটা-ছুট ফুলেরা গাছেদের ডাল থেকে নেমে আসে ঘাসেদের গায়ে, ফার্নের জঙ্গলে। যে ঝিঁঝিরা রাতভর জেগেছে সবুজের আড়ালে, গান গেয়েছে, তারাও তো দল বেঁধে সরে যায় তখন। সেই সব ফুলেদের কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য সেই যে সত্যেন রায়, যাকে কিনা আদর করে সামলু বলে ডাকে বারোভিসার অনেকেই, মা তো বটেই, সেই 'সামলু, সামলু, সামলু'—এই ডাকটি জড়ের গর্জনে ঢেকে-যাওয়া শুকনো পাতা খসে পড়ার শব্দ হতে হতে এক সময় যেন নতুন করে ছুঁয়ে ফেলে সত্যেনকে। সত্যেন দেখতে পায় ক্যাম্পাসের ঘাসমোড়া ভিজে। মাটির ওপর সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে। যার নাম সামলু। সামলুর দু'চোখে ঝকঝকে আলোর ভেতর ফুটে আছে সুরমালি ফুল।

স্যার, ছাতা নিয়ে বেরোননি! এখনই তো বৃষ্টি আসবে। সাইকেলে পথ ভাঙতে ভাঙতে কে যেন সেই বহু চেনা বাক্য ছুঁড়ে দিয়ে যায় বাতাসে। এমন তো প্রায়ই হয়। প্রায় প্রতিদিন। যখন-তখন। ভোরের ঝকঝকে বাতাসে শরীরের কল-কব্জা রিপেয়ার করতে করতে এমন কথা তো প্রায়ই শোনা যায়। সত্যেন বুঝতেও পারে না ঠিক কে, কখন, কীভাবে এই অতিচেনা কথাটা তার নিজস্ব আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। সত্যেন এদিক-ওদিক তাকিয়েও সাইকেল চালককে খুঁজে পায় না। আর তখনও শিবমন্দিরের দিক থেকে উড়ে-আসা বাদলা মেঘ বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দির গায়ে।

এমন বৃষ্টি-ঝাঁপানে কখনও কখনও অলৌকিকতা, অতি-লৌকিকতা থাকে। সেই প্রবল ধারাপাতে উবুশ্রান্ত ভিজে যেতে যেতে সত্যেন সুরমালি ফুল গাছের নিচে একটা আবছায়া ঘোরের ভেতর এক জোড়া রোগা রোগা পা দেখতে পায়। সেই নগ্ন পায়ের পাতায় বৃষ্টিবিন্দুরা একই সঙ্গে ড্রপ খেতে থাকে। এক দুই তিন। এক দুই তিন। সত্যেন রায় গোনে। সেই মুখ-মুছে যাওয়া বালক, তার হাঁটুর নিচে নেমে-আসা বেগুনি হাফ প্যান্ট, হয়ত তা মাথাভাঙা বাজার থেকে কেনা, একটাই বোতাম-দেওয়া ইংলিশ কাটিং প্যান্ট তখন, সেই ভায়োলেটের গায়েও আকাশের জলধারা অজস্র ফুল ফুটিয়ে দিতে থাকে।

'সামলু-সামলু-সামলু'—গভীর অন্ধকার থেকে ডাকে সত্যেন রায়। তখনই চরাচর ঝলসে বাজ পড়লে সত্যেনের মনে পড়ল, একবার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে এন জে পি থেকে কলকাতা যেতে গিয়ে বারসুই স্টেশনের পর কী ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! ফাঁকা মাঠের মধ্যে নীলচে আলো-ছড়ানো বাজ পড়লে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। কালো আকাশের গায়ে লম্বাটে, অনেক পাওলা তেঁতুলে বিছে, এঁকেবেঁকে হঠাৎই নেমে গেল কোনও এক বয়স্ক, অচেনা দিঘির ধারে। তার পর তো ভয়ঙ্কর কড়কড়ানি—আকাশের দাঁত কিড়িমিড়ি। বারসুইয়ের বৃষ্টি রামপুরহাটে এসেও ফুরোল না। বরং আরও জোরেই নামল। এই তো সেদিনের স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন। বৃষ্টিতে ভেজার একটা আলাদা মেজাজ আছে। ছোটবেলাকার সবুজ গন্ধ বুঝি বা ফিরে ফিরে আসে সেই ভিজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

ঘন বর্ষার চিকের আড়ালে প্রায় সাদা-হয়ে যাওয়া সমস্ত চরাচর, সেখানে সেই দুটি রোগা রোগা পা। তার হাঁটুর নিচে বেগুনি হাফ প্যান্টের আভাস। বাকিটুকু সবই মুছে গেছে বৃষ্টির গভীর স্বরালাপে। ফাঁকা মাঠে ধারাপাতের সময় গাছের নিচে দাঁড়াবে না, বজ্রপাতের ভয় থাকবে। তার ওপর এখন যেভাবে বজ্রাঘাতে মৃত্যু বেড়েছে, এ সব চেতাবনি ভাবনার বেতরই সত্যেন রায় আবারও শুনতে পেল 'সামলু-সামলু-সামলু' ডাক। জবরদস্ত বারিধারায় আবছা-হয়ে-আসা জোড়া পায়ের গোছা বেয়ে একটা য-দুটো, একটা-দুটো ঘেসো পোকা, লাল পিঁপড়ে, গঙ্গাফড়িং উঠে আসতে চাইছে। এ সব দেখতে দেখতে এস রায়ের মনে পড়ল, পতঙ্গরা তো এভাবেই বৃক্ষ, লতা বায়। বাইতে থাকে।

'সামলু-সামলু-সামলু'।

সেই জোড়া রোগা রোগা শালিক-পা ঘিরে একটি, দুটি, তিনটি শালিক। শালিকদের পাশাপাশি গাঙশালিক, হয়ত কোচ বকেরাও থেকে গেছে এই ঘেরাবন্দী খেলায়।

'সামলু-সামলু-সামলু'।

গভীর বৃষ্টি-আড়ালে থেকে-যাওয়া বেগুনি হাফ প্যান্টের আভাস-ছোঁয়া দুটি পা এবার নেচে উঠবে দোতারার টুং-টাং আনন্দের সঙ্গে, সত্যেন বুঝতে পারল। পায়েদের ঘিরে জমে-ওটা জলের বুকে কারা যেন ভাসিয়ে দিয়েছে সাদাসাদা কাগজের নৌকো—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—অনেক।

AMARBOI.COM

আজকাল, ২ সেপ্টেম্বর, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশোধ

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

'মেমসাব এক সাব আয়া, আপকে সাথ বাত করনা চাহতা হ্যায়।'

সামনে এসে দাঁড়াল দরোয়ান লছমন, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা কাগজে কলেজের কিছু জরুরি কাজের ব্যাপারে লেখালেখি করছিল ইশিতা। কথাটা শুনে লছমনের দিকে তাকিয়ে বলল—আসতে বলো। সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল লছমন।

একটু পরেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল দেবাংশু। সামনের চেয়ারে বসে থাকা ইশিতাকে দেখে কেমন যেন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। ঈশিতা তখনও একমনে লেখালেখি করছে। তাই আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে চোখ না তুলেই বলল—বসুন।

সামান্য ইতস্তত করে সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে একদৃষ্টে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল দেবাংশু। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির শব্দ শুনতে পেল ও।

হঠাৎ কাগজ থেকে চোখ তুলে দেবাংশুর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেল ঈশিতা। কিন্তু ওর মুখের কথা বেরল না, মুখটা বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জীবনে আর কোনদিনই যার মুখ দেখবে না বলে ধরে নিয়েছিল ঈশিতা, সেই লোকটাই কিনা ওর সামনে বসে আছে! মুখের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। কোনওমতে অস্পষ্টভাবে বলল—তুমি! এতবছর পরে!

—হ্যাঁ ঈশিতা। আমি একটা বিশেষ দরকারে এভাবে ছুটে এসেছি। গলায় অপরাধীর সুর মিশিয়ে জবাব দিল দেবাংশু।

—তাই নাকি? আঠেরো বছর পরে কী এমন দরকারে আমার কাছে ছুটে এসেছ তুমি? কথাটা ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বললেও মাথার মধ্যেটা কেমন যেন অবশ অবশ লাগল ঈশিতার। যে ঠগবাজ মানুষটা একটা বাইশ বছরের মেয়ের চার বছরের ভালবাসাকে পায়ের তলায় মিশিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়ে চলে গিয়েছিল একদিন, চাকরির পদোন্নতির জন্যে বিয়ে করেছিল অফিসের বড়সাহেবের মেয়েকে, সে আজ কিসের প্রয়োজনে ছুটে এসেছে সামান্য এক কলেজ প্রিন্সিপ্যালের কাছে?

—আমি, আমি জানতাম না ঈশিতা, এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস ব্যানার্জি হচ্ছো তুমিই। সামান্য আমতা আমতা করে উত্তর দিল দেবাংশু।

—জানালে কী করতে? চলে যেতে নাকি প্রয়োজন না মিটিয়ে? বাঁকা হাসি ফুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল ঈশিতার ঠোঁটে।

—যেতে পারলাম কই ঈশিতা, শুকনো ঠোঁটদুটো সামান্য চেটে নিল দেবাংশু।

—যদিও তোমার সামনে দাঁড়াবার মুখ আজ আমার নেই। আমি জানি, তোমার জীবনটা আমি...। বলতে বলতে দেবাংশুর গলার স্বর বুজে এল।

—যাক ভণিতা করার দরকার নেই। ও সব ভালবাসি না আমি, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। ঈশিতা গম্ভীর হল।

দেবাংশু দরদর করে ঘামছে, মাথার ওপর বনবন করে পাখা চলছে যদিও। তবু যেন সারা শরীরের সমস্ত জল বেরিয়ে যেতে চাইছে এই মুহূর্তে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে ঈশিতার তাকিয়ে থাকা অবাক চোখে চোখ রাখল ও।

ওর দীঘল কালো সুন্দর চোখদুটোর দিকে এই মুহূর্তে তাকাতে ইচ্ছে করছে না ঈশিতার। ওই চোখ দিয়েই একদিন দেবাংশু ঈশিতার সব ভালবাসা জিতে নিয়েছিল, করেছিল ওর চরম সর্বনাশ। চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে নিজের চোখদুটো রুমালে চেপে ধরল ঈশিতা।

—তোমাদের কলেজেই আমার মেয়ে সুকন্যা পড়ে। কথাগুলো থেমে থেমে বলল দেবাংশু।

—এখানে? তুমি তো দিল্লিতে পোস্টেড শুনেছিলাম!

—ছিলাম, তবে দু'বছর হল কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়ে চলে এসেছি।

—ও...। নিষ্ক্রিয় উত্তর ঈশিতার।

গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে নিল দেবাংশু। আবার বলতে শুরু করল ও।—আমার মেয়ে বরাবরই পড়াশোনায় ভাল, স্কুলেও প্রত্যেকবার স্ট্যান্ড করত। আজ ওদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার বাংলা পেপার ছিল। ও যখন একমনে পরীক্ষার খাতায় লিখছে, সেই সময় ওরই এক বান্ধবী পেছনের সিট থেকে প্রায় জোর করেই ওর খাতাটা টেনে নিয়ে টুকতে আরম্ভ করে। আমার মেয়ে কিছু বলার আগেই প্রফেসার পি সেন ওদের দু'জনের খাতাই নিয়ে নেন। সুকন্যার কোনও কথা উনি শোনেননি। সুকন্যাকে অপমান করে অন্য ছাত্রীদের সামনে ক্লাস থেকে বের করে দেন মিস্টার সেন। ওর বন্ধু তো সত্যিই দোষী। কিন্তু আমার মেয়ের কী অপরাধ বলো? এমনকী এ বছর আর ও পরীক্ষাই দিতে পারবে না—একথাও বলেছেন পি সেন। মেয়েটা বাইরেই বসে আছে, খুব কান্নাকাটি করছে। তুমি তো সবই পারো ঈশিতা। তুমি ওকে বাঁচাও। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে হাঁপাতে লাগল দেবাংশু।

—জানি, মিস্টার সেন আমাকে ব্যাপারটা বলেছেন। কিন্তু আমি কী করতে পারি। কঠিন হয়ে উঠল ঈশিতা। তাছাড়া তোমার মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেস্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু ও চুপ করে থেকেছে। সেক্ষেত্রে তো সেও দোষী। একজন প্রিন্সিপাল হিসেবে আমি এটাই বলব যে, উনি এক্ষেত্রে যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। কথাগুলো বলতে বলতে ভেতরে একটা অদ্ভুত আনন্দ উপলব্ধি করে ঈশিতা। হঠাৎ সামান্য অন্যমনস্কও হয়ে পড়ে

নির্বাচিত রবিবারের গল্প দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও। সেদিন তো কেউ এসে ওকে বাঁচায়নি যেদিন স্বাগতা ওর বাড়ি এসে বলেছিল—জানিস ঈশিতা, দাদার মুখে শুনলাম দেবাংশু হঠাৎ কাল দিল্লি চলে গিয়েছে। ওখানে নাকি ও অফিসের বসের মেয়েকে বিয়েও করবে। শুধুমাত্র প্রফেশনের লোভে কেউ এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে বিশ্বাস করতে চায়নি ঈশিতা সেদিন। ছুটে গিয়েছিল স্বাগতাদের বাড়ি। স্বাগতার দাদার ইচ্ছেতেই দেবাংশু আর ঈশিতার ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। নিজের কানে শেখরদার কাছে ওর ছোটবেলার বন্ধুর এই কীর্তি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ঈশিতা। আত্মহত্যা করতেও চেয়েছিল, পারেনি। শুধুমাত্র ফ্যামিলির মুখ চেয়ে। বাবা তখন সদ্য রিটায়ার করেছেন। বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে ওর একটা রেসপন্সিবিলিটি ছিল। এই কলেজে চাকরি পেয়েছিল ও। তারপর ধাপে ধাপে উন্নতি করে এই পোস্টে উঠে এসেছে আজ। ওর সামান্য একটা সইয়ের দামও আজ অনেকখানি, যার জোরে আবার হয়তো পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যায়। প্রতিশোধ আজ ওর হাতের মুঠোয়। এই প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে। কী ভাবছ ঈশিতা? টেবিলে পড়ে থাকা ঈশিতার হাত দুটো চেপে ধরে দেবাংশু। আমায় ফিরিয়ে নিও না প্লিজ, ও তো তোমার মেয়েরই মতো।

তোমার মেয়েকে বরং অন্য কোথাও ভর্তি করে দাও। আমায় ক্ষমা করো তুমি। হাত দুটো জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করে ও। তারপর একরকম জোর করেই নিজের টেবিলের জমে থাকা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকে। ওর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দেবাংশু। আর কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আজ আনন্দে ভরে গেল ঈশিতার মন। দেবাংশুর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আজ ঘা দিতে পেরেছে ও। আঠেরো বছরের প্রতিশোধ আজ নিতে পেরেছে ও। আঠেরো বছরের প্রতিশোধ আজ নিতে পেরেছে ঈশিতা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ও। কিন্তু দশ মিনিটও গেল না। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে এল ষোল সতেরোর এক কিশোরী। কান্নায় ভেজা নিষ্পাপ দীঘল চোখ দুটো ঈশিতাকে বুঝিয়ে দিল ও কার মেয়ে। সোজা হয়ে উঠে বসল ঈশিতা।

—কে তুমি, কাকে চাই? না চেনার ভান করল ও।

—আমি সুকন্যা। দিদি আমি আপনার কাছেই এসেছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সে। ওকে দেখে বড় মায়া হল ঈশিতার। তবু সে নিজেকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলল—কেন এসেছ তুমি, তোমার বাবাকে তো আমি যা বলার বলেছি। শুনেও মেয়েটা বেরিয়ে গেল না। ছুটে এসে পা দুটো জড়িয়ে ধরল ঈশিতার কাঁদতে কাঁদতে বলে যেতে লাগল—আমি তো দোষ করিনি দিদি। আমার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। আর একবার আমায় পরীক্ষায় বসতে দিন, দিদি...।

হঠাৎ বুকের কাছটার মোচড় দিয়ে উঠল ঈশিতার। সত্যি তো। মেয়েটা তো কোনও অন্যায় করেনি। একজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একটা নিরপরাধ মেয়ের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত বড় অন্যায় কেমন করে করবে সে! একদিন ঈশিতাও তো মা হতে চেয়েছিল। হতে পারেনি। ঠিকসময় বিয়ে হলে এরকমই ফুটফুটে একটা মেয়ে হতো তার। পায়ের তলায় পড়ে থাকা মেয়েটার জন্যে মমতায় ওর বুকটা ভরে উঠল। ও বেশ বুঝতে পারছে বুকের ওপর জমে থাকা পাথরটা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে। আর পারল না ঈশিতা। সুকন্যাকে পা থেকে উঠিয়ে বুকে টেনে নিল ও। নোনা জলে ভেসে গেল বুক। বিহ্বল হয়ে থাকা মেয়েটার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে মনে মনে বলতে লাগল—আবার আমি হেরে গেলাম দেবাংশু। পারলাম না প্রতিশোধ নিতে, পারলাম না।

NEWZ বাংলা, ১২ আগস্ট ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই বোন

জয়ন্ত দে

দিয়া। তুই জ্বলছিস? কত দিন পর তোকে পেলাম।

—হ্যাঁ রে। আমিও তো রোজ খুঁজি তোকে। যখনই নেটে বসি, দেখি তুই আছিস কি না।

—আমিও গেম খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে ঢুকি, দেখি আমার দিয়া এখন আছে না কি। আজ গেম খেলতে খেলতে হঠাৎ মনে হল একটু সার্ফিং করি। দেখি তুই। আমার দিয়া। আমার দিদি।

—এখন তুই গেম খেলছিস কেন, ছোট ভাই আমার তোর কি পড়াশোনা নেই?

—আজ স্যার পড়াতে আসেননি। বাবার ফিরতে রাত্রি হবে। মম গেছে শপিং করতে। অনেকক্ষণ। এই তো সুযোগ তাই গেম খেলতে বসেছি।

—বাবা কেমন আছে?

—ভালো।

—আর তোর মম?

—ভালো। মা কেমন আছে?

—ভালো।

—আর তোর ড্যাড?

—ভালো। হ্যাঁ রে বাবা আমার কথা বলে? মা কিন্তু খুব তোর কথা বলে। আমি আর মা যখন একা থাকি তখনই মা তোর কথা বলে। আমরা তোকে খুব মিস করি।

—বাবা আর আমি কোনও সময় একা থাকি না। সব সময় মম থাকে কাছে। হয়তো একা থাকলে তোর কথা বলত। জানিস তো সেদিন মমকে হেনা আন্টি টুইন বেবিদের নিয়ে কথা বলছিল। হেনা আন্টি তো জানে না আমি আর তুই টুইন। মম কেমন চুপ করে ছিল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল বলে দিই, আমি আর দিয়া টুইন। দিয়া মায়ের সঙ্গে থাকে বাঙ্গালুরুতে।

—তোর মমটা কেমন রে, আমার নাম শুনলে, মায়ের নাম শুনলে কি রেগে যায়?

—আমি কোনও দিন মমের কাছে তোদের নাম বলিনি। বাবা বারণ করে দিয়েছে। বাবা যেদিন মমকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এল, সেদিন ব্যাককনিতে সিগারেট খেতে খেতে

AMARBOI.COM

আমাকে বলে দিয়েছিল মমের সামনে আমি মা বা দিয়ার কথা যেন না বলি, মম লাইক করে না।

—ড্যাড কিন্তু তোকে লাইক করে।

—রাঘব আঙ্কেল তো আমায় আগেও লাইক করত। তোর বেশ ভালো দিয়া, রাঘব আঙ্কেল তোর ড্যাড হয়ে গেছে। কিন্তু মম তো আমায় বা তোকে আগে থেকে চিনত না, চিনলে তোকেও লাইক করত। হ্যাঁরে দিয়া, তোর রাঘব আঙ্কেলকে ড্যাড বলতে গিয়ে হাসি পেত না?

—হাসি পাবে কেন? আঙ্কেল না বলে ড্যাড বলি। তবে ফার্স্ট টাইম রাঘল আঙ্কেল আমাকে বলেছিল এবার থেকে আমাকে বাবা বলবে দিয়া। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমি মরে গেলেও তোমাকে বাবা বলতে পারব না। তখন মা বলল, দিয়া বাবা বলবে না ড্যাড বলবে। নো প্রবলেম।

—ঠিক বলেছিস বাবা ছাড়া কাউকে বাবা বলা যায় না। বাবা তো ড্যাড বলা পছন্দ করত না। সেই জন্যেই তো ড্যাড না বলে বাবা বলতাম। আমিও তো সেইজন্যে নতুন মাকে মা বলি না মম বলি।

—হ্যাঁ রে তোর মম এখনও ফিরল না?

—বললাম তো মম শপিং করতে গেছে। মম এলেই আমি কিন্তু চলে যাব। মম যদি দেখে আমি চ্যাট করছি তবে বহুত কোয়েশ্চেন করবে। নানা কথা জানতে চাইবে। আমার আনসারে স্যাটিসফায়েড না হলে বাবার কাছে কমপ্লেন করবে। তবে বাবা জানে আমি তোর সঙ্গেই চ্যাট করি। তবু আমি চাই না আমাকে নিয়ে ওদের কোনও প্রবলেম হোক।

ড্যাড কিন্তু এতটা রিজিড নয়। ড্যাড জানে আমার সঙ্গে তোর নেটে কথা হয়। ড্যাডই আমাদের আইডি খুলে দিয়েছিল তোর মনে নেই।

—তখন তো রাঘব আঙ্কেল তোর ড্যাড ছিল না।

তোর মম খুব শপিং করে না রে?

—এখন তো সবাই শপিং করছে দুর্গা পুজো আসছে না।

—দুর্গা পুজো! তোদের ওখানে দুর্গাপুজো! আবার পুজো এসে গেল।

কেন মা তোর জন্যে শপিং করছে না।

কি জানি, মায়ের হয়তো মনে নেই, দুর্গা পুজো আসছে। মনে থাকলে সিওর কিছু নিউ ড্রেস এনে দিত।

—কেন মনে থাকবে না, তোদের ওখানে প্যান্ডেল হচ্ছে না?

—না। জানিস আমার পুজোর কথা শুনলেই বুকের ভেতর কেমন একটা করে। খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্না পায়। মনে হয় এক ছুটে অন্য কোথাও পালিয়ে যাই। বাঙ্গালুরুতে পুজো হয়। তবে সেটা বেশ অনেকটা দূরে। গত বছর মা আমি গিয়েছিলাম। সেদিন অষ্টমী ছিল।

—তুই অঞ্জলি দিয়েছিলি? আমি আর পাশের ফ্ল্যাটের মুন্নিদিদি এক সঙ্গে সিংহী পার্কে গিয়েছিলাম। আমি বুঝিনি অঞ্জলির ফুল দুর্গা ঠাকুরের সিংহের গায়ে ছুঁড়েছি। পরে মুন্নিদিদি বলল সিংহের গায়ে পড়েছে বলে আমার অঞ্জলি ভ্যালিড হয়নি। সব ক্যানসেল হয়ে গেছে। দুর্গাঠাকুরের কাছে যা চেয়েছিলাম তা ফলবে না।

—তুই কী চেয়েছিলি ভাই দুর্গা ঠাকুরের কাছে?

—বলব না। বলতে নেই।

—বল না, তোর অঞ্জলি তো ক্যানসেল হয়ে গেছে, এখন বললে কিছু হবে না।

—আবার সবার এক হয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সিংহের গায়ে ফুল দিয়ে সব গোলমাল করে ফেললাম। অথচ জানিস অঞ্জলিটা সাকসেস করার জন্য আমি সকাল থেকে না খেয়েছিলাম। কিন্তু কেন যে সিংহের গায়ে ফুল দিলাম।

—তুই না খেয়ে অঞ্জলি দিয়েছিলি। আমি তো আগেই খেয়ে নিয়েছিলাম। সবাই বলল এখানে খেয়ে নিয়েও অঞ্জলি দেওয়া যায়। তাহলে আমার অঞ্জলিটাও বুঝি ক্যানসেল হয়ে গেছে।

—তুই কী চেয়েছিলি দিয়া ঠাকুরের কাছে? ভালো রেজাল্ট?

—না রে তোরটাই চেয়েছিলাম, সবাই একসঙ্গে থাকতে।

—একসঙ্গে থাকলে বাঙ্গালুরুতেই থাকতে হবে বুঝলি। মা বাবা যখন শাউটিং করবে, ঝগড়া করবে আমাদের কোনও লজ্জা লাগবে না, কেন না ওখানে কেউ বাংলা বুঝবে না।

—না রে কলকাতায় থাকব। ঠাকুরের কাছে বলেছিলাম, ঝগড়ার আগের মতো সময়ে ফিরিয়ে দাও। তখন তো ঝগড়া ছিল না, কত মজা ছিল।

—সেই ভালো কলকাতাই ভালো। আমার ওই বাঙ্গালুরু নামটা শুনলেই হাসি পায়। এর থেকে ব্যাঙ্গালোরটা অনেক ভালো।

—তুই তো 'ক্যালকাটা' 'কলকাতা' হওয়ার সময়ও 'কলকাতা'কে পচা পচা বলতিস। আমি আর মা তোকে কত করে শিখিয়েছি ক্যালকাটা নয় কলকাতা, তবু তুই বলতে চাইতি না।

—... ... ...!

—কী রে কিছু লিখছিস না যে? তোর মম কি শপিং করে ফিরে এল?

—না, আমার সেই, কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবে তুই কিন্তু কোথাও পালিয়ে যাস না দিয়া। তাহলে মা রাঘব আঙ্কেল খুব প্রবলেমে পড়ে যাবে। থানা পুলিশ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। আমাদের অপজিট বিল্ডিং-এর ঋষভ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সবাই বলছিল ঋষভ মুম্বই যেতে পারে। ঋষভ জন আব্রাহামের ফ্যান। ও জনের মুভি দেখে পাগলের মতো। বাড়ির লোকজন ঋষভের নতুন বাবা টিভিতে এ সব কথাই বলল। কিন্তু লাস্টলি ঋষভকে দিল্লি থেকে পাওয়া গেল। ও দিল্লি স্টেশনে নেমে ঘুরছিল। ঋষভ ওর মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল। যেতে পারেনি দিল্লিতে বাজে লোকদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল।

—না আমি পালাব না। আর কটা বছর—বড় হয়ে যাব। তখন একা একা যেখানে খুশি যেতে পারব। আমি কাউকে প্রবলেমে ফেলব না।

-সেই ভালো। আমাদের এখন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতে হবে। জানিস দিয়া, আমার আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল। লাস্ট ইয়ারে কালীপুজোর পর ভাইফোঁটা। মমকে মুন্নিদিদি বলল আমাকে ভাইফোঁটা দেবে। আমি বললাম, না আমি মুন্নিদিদির কাছ থেকে ফোঁটা নেব না। মম বলল, মুন্নি তোমার থেকে অনেক বড়, তোমার ফোঁটা নিতে অসুবিধা কী আছে? মুন্নি তো তোমার গালফ্রেন্ড নয়। বাবা বলল, ওকে ছেড়ে দাও। ও যখন চাইছে না ওকে জোর করো না।

কেন নিলি না তুই, তোর মুন্নিদিদি হয়তো কষ্ট পেল।

-আমার খুব তোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল মুন্নিদিদি যেই আমার কপালের কাছে ফোঁটা দিতে আঙুল নিয়ে আসবে, আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলব। আমি কাঁদতে চাই না দিয়া।

—... ... ...।

-কি রে কিছু লিখছিস না কেন দিয়া?

—... ... ...।

—দিয়া তোর কি চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে? এখনও মম আসেনি আর একটু থাক না।

—... ... ...।

—দিয়া, এই দিয়া প্লিজ।

—আমি আছি ঋভু। ছোট ভাই আমার। বাবা সেদিন ঠিক বলেছিল তোর মমকে। কেন তোকে জোর করবে?

-আমি বাবাকে স্ট্রেট বলে দিয়েছি আমি মমকে কোনও প্রবলেম দিচ্ছি না। মমও যেন আমায় কোনও প্রবলেম না দেয়।

—হ্যাঁ, আমরা আলাদা হওয়ার আগে যখন কাউন্সেলিং চলছিল তখন সাইকোলজিস্ট এমন কথা আমাদের বলেছিল। বড়দেরও বলেছিল। আমরা শুনছি, তবে বড়রা শুনবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? তুই ভালোই করেছিস বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিস।

—জানিস দিয়া পরে বাবা যখন সিগারেট খাচ্ছিল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তখন আমাকে বলল, তোমার পিসিমণিরাও তো আমাকে ফোঁটা দিতে পারে না। আমারও কষ্ট হয়। তোমার পিরিমণিরাও কষ্ট পায়। কিন্তু সব কিছুকে মেনে নিতে হয়। টেক ইট ইজি।

—আমি জানি বড় পিসিমণি, ছোটপিসিমণি আগে বাবাকে ফোঁটা দিত। কিন্তু একবার কী হল মা ওদের আর বাড়িতে অ্যালাও করল না। ওরা এলে এমন শাউটিং করল, ওরা ফিরে গেল। বাবাকেও আর যেতে দিল না। বাবার খুব কষ্ট হত। একবার ফোনে বড়পিসিমণির সঙ্গে মায়ের খুব হটটক হল। তারপর বাবা ফিরতে মা বলল, তুমি যাবে না শুনে তোমার বোনরা বলল এবার থেকে ওরা দরজায় ফোঁটা দেবে। তোমার যমের দুয়ারে কাঁটা দেবে।

—পিসিমণিরা কি ফুলরে দিদি। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা না দিয়ে ওরা দরজায় দেবে।

—হ্যাঁ ওভাবেও হয়। আমি তখন আমাদের বাড়ির মন্টুরমাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মন্টুরমা বলল, তোমার পিসিরা ঠিক কথাই বলেছে ভাইকে কাছে না পেলে দিদিরা ভাইফোঁটা দেয় সদর দরজার গায়ে। কোনও বোন তো আর ফোঁটা না দিয়ে থাকতে পারে না।

—সদর দরজা কী রে দিয়া?

—মেনগেট।

—দিয়া তোদের মেনগেট আছে?

AMARBOI.COM

প্রিয় পাঠক, গল্পটি শেষ হয়ে গেছে। গল্প শেষ করে আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে নেটে কি এমন করে কথা বলা যায়। কি জানি, হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আমি জানি না এ গল্পের আগে বা পরে এমন করে অনর্গল আঙুলের ছোঁয়ায় কোনও দিয়া বা ঋভুর কথা হয়েছে কি না? কিংবা মনে করুন কোনও এক অদৃশ্য টেলিফোনে হঠাৎ দু ভাই বোন জুড়ে গিয়েছিল। কিংবা কোনও কথাই কেউ কাউকে বলেনি, শুধু একা একা আলাদা শহরের আলাদা বাড়িতে একই ধরনের কোনও একরাতে দু ভাই বোন নিজেদের মনে মনে এই কথাগুলো সাজিয়ে চলেছিল আদরের টেডি কিংবা শক্ত বালিশে মুখ ঢেকে।

তবে এ গল্পের অনেক অনেক দিন আগে এক অষ্টমীর সকালে বছর এগারো বারোর এক ছেলেকে সিংহীপার্ক সর্বজনীনের মণ্ডপে অঞ্জলি দিতে দেখেছিলাম। যার সব ফুল উড়ে যাচ্ছিল মা দুর্গার সিংহের দিকে।

অঞ্জলি শেষে যে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করছিল হাত জোড় করে।

আমি তাকে মজা করে বলেছিলাম, দুর্গা ঠাকুরের কাছে তো অনেক কিছু চাইলে, কিন্তু সব ফুল যে দিলে সিংহের গায়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথায় ছেলেটা হকচকিয়ে গেল, তারপর ধরা গলায় বলল, তাহলে কি মা আর বোনকে নিয়ে আমাদের বাড়ি ফিরে আসবে না?

তার কথায় উত্তর না দিয়ে আমি পালিয়ে বেঁচেছিলাম। এ তো গেল ঋভুর কথা।

এবার দিয়ার কথা বলি। দিয়া মানে উমাপিসি। আমাদের কালীঘাটের পাশের বাড়িতে ছিল উমাপিসি।

বাল্যবিধবা! কতগুলো বিড়াল আর একটা কুকুর নিয়ে একাই থাকত। খুব পাতলা, ছোট আর নিটোল গোল রুটি করত। সেই উমাপিসির বাড়ি থেকে কয়েক পা গেলেই মহিম হালদার স্ট্রিটে তার ভাইয়ের বিশাল বাড়ি। উমাপিসি সে বাড়িতে ৩৬৪ দিনের পরে ভাইফোঁটার দিনেও ঢুকতে পেত না। কিন্তু তাবলে কি উমাপিসি যমকে ছেড়ে দিত? না, বরং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে তিথিক্ষণ মিলিয়ে যথাচারে ঠিক কাঁটা দিয়ে রাখত যমের দুয়ারে। সেই ছেলেবেলায় ভাইফোঁটার দিন উমাপিসিকে দেখে হাসতাম।

তবে এখন আর হাসি না।

বর্তমান, ২১ অক্টোবর ২০০৭

AMARBOI.COM

নির্বাচিত রবিবারের গল্প ~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণলক্ষ্মী

তারাপদ রায়

ক্রিস্টাইন মনরো, নাম শুনে মনে হতে পারে পরমা সুন্দরী। মেরিলিন মনরোর আত্মীয়া।

কিন্তু তা নয়। সে একটি কলহ পরায়ণা অথচ নরম মনের কালো মেয়ে। কালো তা সে যতই কালো হোক, তার থেকেও সে অনেক বেশি কালো। চেহারায় চরিত্রে। অকালমৃতা চিত্রতারকা স্বপ্নসুন্দরী মেরিলিন মনরোর সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না।

ক্রিস্টাইন মনরোকে পাড়ার আট-দশ জনের মতো আমরাও ডাকতাম ক্রিষ বলে। এই 'ক্রিষ' বানানে ' ফলা দিয়ে 'ক', তার পরে 'শ' ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার চেহারার সঙ্গে মিল দিতে গেলে হাস্যকর হবে। তবে আমার অভ্যাস উচ্চারণে বোধহয় 'ক্রিষ' আর 'কৃশ' এই দুই শব্দের বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকে না।

সে যা হোক, ক্রিষ এ দেশের মেয়ে হয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মার্কিন দেশের পশ্চিম উপকূলে এক বিখ্যাত উপনগরীতে। সে বাড়ি বাড়ি কাজ করে বেড়াত। ঘর ঝাড়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা—ঠিক এখানে ঠিকে ঝি-রা বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেমন কাজ করে। ও দেশে সবই প্রায় মেশিনে হয়—কাপড় কাচার মেশিন, বাসন মাজার মেশিন, ঘর ঝাড়ার ভ্যাকুয়াম মেশিন, এমনকী মশলা গুঁড়ো করার মেশিন, তরকারি কোটার মেশিন। কাজের মেয়েরা মেশিনে এই সব কাজ সারতে একটা বাড়িতে আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি সময় নিত না। প্রত্যেক দিন আসত না। এক দিন অন্তর কিংবা সপ্তাহে দু'দিন। তাতেই তাদের মাস মাইনে ভারতীয় টাকার অঙ্কে বহু হাজার টাকা দাঁড়াত।

আমরা তখন থাকতাম একটা কাঠের বাড়িতে, একতলায়। কাঠের বারান্দাওলা বাড়ি। সামনে কাঠের রেলিং। মাটি থেকে প্রায় আট ফুট উঁচু। নড়বড়ে রেলিং, বেশি ভর দিতে নেই। তবে পুরনো দিনের বারান্দাটা খুব আরামদায়ক। সারা দিন রোদ আসে। হালকা শীতের দেশে খুব ভাল লাগে। সকালে, দুপুরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে কখনও চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ি।

ক্রিষের একটা পুরোনো শিভ্রোলে গাড়ি আছে। বিশেষ চলে না। মাঝে মাঝে দেখি রাস্তা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের মহিলা সুযোগ পেলেই তাকে ধমকে দেন। সে কিন্তু গাড়ি ছাড়ে না। এটাতেই যাতায়াত বা ঠেলাঠেলি করে। মাঝে মাঝে তার গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে। পাড়ার লোকেরা তার গাড়িটাকে চিনে ফেলেছে। হর্ন-এর বাজনা সংকেতে একাধিক দাবি [illegible] করে।

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

ক্রিষেরা থাকে আমাদের অঞ্চল থেকে অদূরে, সমুদ্রের কাছে। একটা পুরনো পাড়ায়। তারা বহু পুরুষ ধরে এ শহরে থাকে। লোকের মুখে মুখে তাদের জায়গার নাম ওল্ড টাউন। পৃথিবীর সব জায়গাতেই এ রকম হয়। আদি শহর গড়ে ওঠে জলা-জঙ্গলের মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে নতুন শহর আসে। পুরোনো শহরে প্রথম দিকে লোকেরা ঘিঞ্জি বাড়িতে সংকীর্ণ গলির মধ্যে বসবাস করে। অদূরে নতুন আধুনিক শহর গড়ে ওঠে।

এই পুরোনো শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একেবারে ঘিঞ্জি পাড়ায় ক্রিষেরা থাকে। ক্রিষদের বাড়িতে ছোটবড় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ভাইবোন মিলে দশ-বারো জন হবে। ক্রিষের বাবা গুণ্ডা ধরনের লোক। কথায় কথায় রাস্তাঘাটে, ফুটবল মাঠে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। আজ কিছু দিন জেলে আছে। এ বার সহজে ছাড়া পাবে না।

এ দিকে ক্রিষের মা যে কোথায়, তা কেউ জানে না। তার ছোট বোন দু'বছর হল নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মেয়েদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া বেশ সাধারণ ব্যাপার। অনেক সংসার উচ্ছন্নে চলে যায়। তবে ক্রিষ সংসারের হাল ধরেছে। ভাইবোনদের শাসন করে ভালবেসে, কোলেপিঠে করে বড় করছে। তবে সবাই মানুষ হয়নি। মানুষ হয়ও না। এক দিন ক্রিষ আমার কাছে অভিযোগ করেছিল তার পরের যে ভাই, তার থেকে মাত্র বছর তিনেকের ছোট, সেই তাকে গড়েপিটে মানুষ করার চেষ্টা করছে। সে সন্ধ্যাবেলা মদ খেয়ে এসে ক্রিষকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল।

এ সব ঘটনা বলায় ক্রিষের তেমন কোনও দ্বিধা ছিল না। পরের দিন কাজ করতে এসে আমাকে বলেছিল, জানো ড্যাড, ও আমাকে রেপ করার চেষ্টা করেছিল। এ সব আমার জানার কথা নয়, শোনার কথা নয়। কিন্তু ক্রিষ আমাকে বলত।

ক্রিষের কাজ ছিল আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে তিন দিন—সোম, বুধ, শুক্রবার। এ সব দিন সাতসকালে সে তার ভাঙা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তার হাতের কাজ ছিল যেমন ক্ষিপ্র, তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার স্ত্রী মিনতি অবশ্য তাকে খুব পছন্দ করত না। বড় বেশি মাথা গলাত মিনতির রান্নাবান্নায়। কোনও মহিলাই রান্নার কাজে অন্যের মাথা গলানো মোটেই পছন্দ করে না। তার কাজ ভাল ছিল এবং সে বিশ্বাসী ছিল। এ ছাড়া সে অনেক রকম খুটখাট কাজ জানত। ওখানেও বাড়িতে বিদ্যুৎ হঠাৎ হঠাৎ অফ হয়ে যেত। আমাদের এখানকার মতোই অনেক দিনের পুরনো লাইন বেশ খারাপ হয়। এ ছাড়া প্রেশার কুকারের ঢাকনি আটকে গেলে সেটা খোলা, ছুঁচের মধ্যে সুতো পরানো, সিলিং-এর ইলেকট্রিক বাল্ব ফিউজ হলে সেটা বদলানো মিনতির সাধ্য ছিল না। আমারও আয়ত্ত নেই, চেষ্টাও করিনি। সেই সেই সময়ে ক্রিষের খোঁজ পড়ত।

এই রকম খোঁজ করতে গিয়ে রীতিমত গোলমালে পড়েছিলাম। এক দিন সন্ধেবেলা মিনতির সুটকেসের ডালাটা খুলছিল না। আমরা দু'জনেই জানি ক্রিষের এই ডালা খুলতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। তার হাতে নানা রকম কায়দা। জোরও সাংঘাতিক।

ক্রিষের ঠিকানা ও ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল। তার বাড়ি যদিও চিনি না, তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের এলাকায় গিয়ে তাকে খোঁজ করতে পারতাম। কিন্তু ক্রিষ আমাকে বারবার নিষেধ করেছে তাদের বাড়িতে, পাড়ায় যেতে। বলেছে, ড্যাড তুমি ওখানে যেও না। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে যাবে না। ওরা দুর্দান্ত। সব নাইফার। তখন নাইফার মানে জানতাম না। পরে জেনেছি, নাইফার হল তারা, যারা নাইফ নিয়ে অর্থাৎ ছুরি নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি করে।

আমার যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে ক্রিষকে ফোন করতে হল। ফোন করে ভয়ানক ভুল করেছিলাম। ফোনটা প্রথমে কিছুক্ষণ বাজল। তার পর ঘটাং করে কেটে গেল। যেন কেউ তুলে রেখে দিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে দারুণ হইচই, চিৎকার চেঁচামেচি, গালাগাল কানে এসে পৌঁছল। এ দিকে আবার ফোন করব কি না ভাবছি, ফোনটা নিজেই বেজে উঠল। আমি ফোন ধরতেই আবার সেই চিৎকার চেঁচামেচি, হইহল্লা। হইহল্লা ছাপিয়ে ক্রিষের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত কণ্ঠ। সে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করছে। বুঝতে পারলাম আমাকেই। নিশ্চয়ই টেলিফোনের ডায়ালে আমার ফোন নম্বর দেখেছে। কিন্তু আমার ওপর রাগটা কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না। বিশেষত, তার বিজাতীয় ভাষায় তাড়াতাড়ি যা বলছিল এবং তার ঘরের মধ্যে যে পরিমাণ গোলমাল চলছিল তার মধ্যে কিছু বোঝা কঠিন। আমি ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। মিনতির সুটকেসের তালা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হল।

পর দিন সকালবেলা ক্রিষ এসে হাজির। এক মাথা না আঁচড়ানো কোঁকড়া চুল, চোখ ছলোছলো। সে এসে গতকাল রাতে ফোনে অসভ্যতা করার কথা স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। একটু পরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আগের দিন রাতে কেনই বা অমন আচরণ করেছিল কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু এটুকু অনুমান করতে পারলাম, আগের রাতের ঘটনার জন্য অনুশোচনা করছে। চুপ করে রইলাম। সত্যি, কিছু বলার ছিল না। এবার কান্না থামিয়ে চোখের জল মুছে সে আমাকে বলল, ড্যাড, সত্যি তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ? দু-তিন বার এ রকম বলার পরে আমি তখন বললাম, তুমি এমন কী করেছ, তোমাকে ক্ষমা করতে হবে? ক্রিষ কবুল করল, আমি খুব খারাপ মেয়ে, মদ খাই, হাসিস খাই, বন্ধুদের নিয়ে হল্লা করি। একটু থেমে সে বলল, হাসিস খেলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। তা ছাড়া কাল রাত্রে তোমার ফোনটা যখন এল, ফোনটা ধরে আমার হাতে দিয়ে বলল, এই নে, তোকে কোনও এক খদ্দের খুঁজছে। আমার সেই বন্ধু জর্জ, তাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি মেরেছি। এই ঘটনার পর ক্রিষের সঙ্গে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সপ্তাহে তিন দিন এমনিতে সে আমাদের বাড়ির কাজে আসত। আধ ঘণ্টাখানেক সময় সে বাড়ির মধ্যে ঝড় তুলে কাজ করত। তার পর সময় বাঁচলে আমাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করত।

প্রত্যেক বার কলকাতা থেকে ফেরার সময় মিনতি মুড়ির মোয়া, নারকেল নাড়ু এ সব নিয়ে যেত। সেগুলো দু-একটা টুকটাক সে ক্রিষকে দিয়েছে।

ক্রিষের জন্যে মায়া হত। অনেক এলেবেলে উল্টোপাল্টা কথা বলত। দুপুরবেলা যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ সেরে নিজের ডেরায় ফিরত আমাদের বাড়ির বারান্দায় আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোতাম কিংবা খবরের কাগজ পড়তাম। কোনও কোনও দিন হাতে সময় থাকলে ফুটপাথের পাশে গাড়ি থামিয়ে রাস্তা থেকে আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলত—ড্যাড, ও ড্যাড, দরজা খুলে রেখে বাইরের বারান্দায় ঘুমিও না। মা এখন ঘুমোবে। বাইরের দরজা খোলা রেখো না। যাও, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

এক এক দিন হাত ভর্তি পামফল কিংবা ছোট ছোট কাঁচা টোম্যাটো নিয়ে আসত। বুড়ি ঠাকুমার মতো সেগুলো রান্নাঘরে তরকারির আলমারিতে গুছিয়ে রাখত। ছোট টোম্যাটো, কাঁচা পামফল এই সব তরকারির মধ্যে দিতে বলত। বলত, বেশি মাংস খাবে না।

দরজা খোলা দেখে এক এক দিন রাগারাগি করত, এটা কি তোমাদের দেশ ইন্ডিয়া নাকি? এখানে কত চোর, ডাকাত জানো? ওকে অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করিনি, আমাদের কলকাতাতেও চোর ডাকাতের কোনও অভাব নেই। বস্তি এলাকাগুলো মার্কিনি কৃষ্ণাঙ্গপল্লির চেয়ে নিরাপদ নয়।

এর মধ্যে এক দিন একটা ঘটনা ঘটল। আমি স্বচক্ষে এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি।

তন্দ্রাঘোরে যেমন অন্যান্য দিন দুপুরে বারান্দার চেয়ারে শুয়ে থাকি সেদিনও তাই হয়েছিল। হঠাৎ দ্রুত গুলির শব্দ। এক জন লোক, অল্পবয়সী যুবক, দেখলেই মনে হয় গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব, রাস্তা দিয়ে উদ্যত রিভলভার নিয়ে আমাদের বাড়ির পিছন দিকে ছুটে গেল। গাড়িঘোড়া থমকে গেছে। পথচারীরা ত্রস্ত ভাবে এদিক-ওদিক লুকনোর চেষ্টা করছে। কেউই জানে না, কী ব্যাপার। এক নিমেষের মধ্যে পুলিশের গাড়ি ছুটে এল। সশস্ত্র পুলিশ গাড়ি থেকে লাফিয়ে আমাদের পাশের গলিতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। তাদের মাথার ওপরে পাহারা দিতে লাগল বন্দুকধারীরা। একটু পরে গুলির লড়াই, অত্যন্ত অসম লড়াই এবং কিছু ক্ষণের মধ্যেই একটি অ্যাম্বুলেন্স এল, স্ট্রেচারে করে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে একটি দেহ নিয়ে পুলিশের গাড়ি চলে গেল। তখনও চার দিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে গুলিযুদ্ধ দেখার জন্য। আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা। পুলিশ আমাদের বারান্দায় এসে বলে গেল, তোমার তো সাহস খুব। গুলি চলার সময় ঘরে চলে যাওনি কেন? আমি পুলিশের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলাম। মিনতি ভয়ে সাদা। 'এখন অবশ্য তোমরা নিরাপদ', বলে পুলিশ চলে গেল।

যা জানতে পারলাম স্যাম বলে এক সদ্য যুবক ধীরে ধীরে দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠছিল। সে বড় রাস্তায় একটি ব্যাঙ্ক লুঠ করে আমাদের গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এ রকম তো কতই হয়। বিকেলের মধ্যে আমরা ঘটনাটা প্রায় ভুলে গেলাম। ঘুরে এসে দেখি, বন্ধ ঘরের সামনে বারান্দায় সিঁড়ির ওপর বসে ক্রিস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখটোখ মুছে সে বলল, তার বন্ধু স্যাম আজ দুপুরে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আমি বললাম, সে তো আমাদের বাড়ির পিছনেই। তখন ক্রিসের খেয়াল হল। হ্যাঁ, ও যে গলির কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছে, সেটা ঠিক আমাদের পিছনেই। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জানাল, স্যাম তার বাল্যবন্ধু, আজ বছর দুয়েক হল সে সাংঘাতিক বখে গিয়েছে। আজকে সে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়েছিল এটাই বোধহয় তার প্রথম চেষ্টা। স্যামের মতো ভাল ছেলে যাতে খুব কিছু অন্যায় না করে, তাই ভগবান তাকে কাছে টেনে নিলেন।

ক্রিষের কাহিনি শুনে আমার স্ত্রী মিনতির চোখ ছলছল করছিল। তার পর ক্রিষকে ডেকে তুলে নিয়ে ভিতরের ঘরে গেল। যেখানে মিনতির পুজোর জায়গা আছে।

সারা পৃথিবীর যে কোনও জায়গাতেই যাক, তার সঙ্গে একটা সুটকেস থাকে ঘরের কোনায় অল্প একটু জায়গায়। সুটকেস থেকে জিনিসগুলো বের করে সাজায়। সেগুলো পুজোর জিনিস—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কালী এই সব ছবি। পিতলের মূর্তি থাকে। পুজো হয়, আবার যেগুলো বেশি আছে, যেমন ছোট ছোট পিতলের লক্ষ্মী বা গণেশ মূর্তি, তার দু'একটা মিনতি ভালবেসে কাউকে কাউকে উপহার দেয়। কালীঘাট মন্দিরের পাশে ফুটপাথের অনেক দোকানে এই সব ঢেলে পাইকারি দরে বিক্রি হয়। ওর থেকে একটা পিতলের লক্ষ্মী খুব ছোট বা হাতব্যাগে রাখা যায়, ক্রিষকে মিনতি উপহার দিল। তাকে বোঝানো হল, তুমি হলে কালোলক্ষ্মী আর এ হল সোনালক্ষ্মী।

আমাদের প্রবাসের দিন শেষ হয়ে এল। ক্রিষ আমাদের বাড়ির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিশে গেছে। দুপুরে কাজ সেরে ফেরার পথে অনেকক্ষণ বসে যেত। আমাদের খাওয়ার সময় থাকলে একটা বাটিতে ডালভাত নিয়ে আমাদের মতোই মেখে খেত। মিনতির কাছ থেকে বেসন দিয়ে বেগুনভাজা এমনকী সর্ষে বাটা দিয়ে স্যামন মাছের ঝোল রান্না করা সে শিখেছিল। চমৎকার হাত ছিল রান্নার। আমরা ভালবেসে খেয়েছি।

আমাদের পল্লিগাঁয়ে পুরনো দিনের পুকুরঘাটের মতো বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে সে কত রকম যে গল্প করত। এক বার বলেছিল, আমার গায়ের রং কালো হলে কী হবে, আমার গায়ে খাঁটি বিলিতি সাহেবের রক্ত আছে। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সে কিন্তু মাতা মেরীর নামে শপথ করে বলল, ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবে। এর পরে যা বলল, তার ঠাকুমা-ঠাকুরদা এক পর্যটক সাহেবকে কেটে খেয়েছিল।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে এই কাহিনি। এ রকম আরও অনেক কাহিনী কৃষ্ণলক্ষ্মী আমাদের বলেছে। বার্কল ডয়েট রোডে হালকা শীতে দূর থেকে প্রশান্ত সাগরের খাঁড়ির বাতাস আসছে ধেয়ে ধেয়ে। কয়েকটা সমুদ্র চিল আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। এক সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা কৃষ্ণবালিকা অতীত ভবিষ্যৎ কত কী নিয়ে কত রকম কথা বলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাতব্যাগ থেকে পিতলের লক্ষ্মীটা বার করে তাকে চুমু খাচ্ছে। এই লক্ষ্মীর পরে মিনতি তাকে একটা রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছিল। সেটা সব সময় গলায় পরা থাকত। আমাকে বলেছিল, ওর ছেলে বন্ধুরা এমনকী মেয়ে বন্ধুরাও চেষ্টা করে মালাটা নিয়ে নিতে।

আমাদের ফিরে আসার দু'দিন আগে থেকেই কৃষ্ণলক্ষ্মী নিরুদ্দেশ। যাওয়ার আগে সে আর দেখা করতে আসেনি। আশা করেছিলাম, অন্তত এক বার মুখ দেখিয়ে যাবে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কিছু করার ছিল না। সানফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে প্লেন রাত এগারোটায়। আজকাল সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য তিন ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছতে হয়। পৌঁছে শুল্ক, অভিবাসন, নিরাপত্তা এ সব মিটিয়ে বিমানের দিকে এগোচ্ছি, এত ক্ষণ ব্যস্ততায় ও উত্তেজনায় খেয়াল করিনি বিমানঘাটের প্রবেশপথ দিয়ে সামুদ্রিক বাতাস আসছে, হঠাৎ ক্রিষের গলা শুনতে পেলাম। কৃষ্ণলক্ষ্মী মিনতিকে 'মম, মম' করে ডাকছে। মিনতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রিষকে দেখতে পেল। আমারও চোখে পড়ল। ক্রিষ হাত নাড়ছে। কিন্তু আমাদের আর কিছু করার নেই। বিমান থেকে ডাক পড়েছে। ধীরে ধীরে বিমানের দিকে এগোলাম। কৃষ্ণলক্ষ্মী বিলীয়মান হতে লাগল। সে তার হাত লম্বা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কত আর লম্বা হবে! ড্যাড ড্যাড, মম মম—চিৎকার আর কানে আসছে না। আমরা উড়োজাহাজের গহ্বরে ঢুকে গেছি।

মিনতি ক্রিষের জন্যে লুকিয়ে চারটে নারকেলের নাড়ু এনেছিল। এ নিয়ে প্লেনে ওঠাও বে-আইনি। তবু বিমানের লোকদের চোখ এড়িয়ে এনেছিল। কৃষ্ণলক্ষ্মী যে সত্যিই দেখা করবে না ভাবিনি। এখন তার ডাক শুনে আর নাড়ুগুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মিনতি হাত জোর করে বিড়বিড় করে ব্যাগ থেকে সোনার লক্ষ্মীকে বার করে বলল, সোনালক্ষ্মী আমার কালোলক্ষ্মীকে ভাল রেখো।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালব-কৌশিক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা দ্বিপ্রহর পার করে সূর্যদেব যখন মধ্যগগনের সামান্য পশ্চিমে, পুরন্দর বেরিয়ে পড়ে রাজবাড়ির উদ্দেশে। তার গৃহ থেকে মাত্র চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত রাজবাড়ি। অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই রাজবাড়ি এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট এক অতীব বিস্ময়। রাজবাড়ির চতুস্পার্শে যে বিশাল প্রাচীর তার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কারুকার্য সহ দূর থেকে দৃশ্যমান অংশ যথেষ্ট সমীহ উদ্রেককারী। শহরের লোকালয়ে বেশ কয়েকবার পদার্পণ করলেও রাজবাড়ির অভ্যন্তরে কখনও প্রবেশ করার সুযোগ ঘটেনি বড়জুর।

চার ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে তার সময় লাগবে এক প্রহরের কিছু বেশি। আজ যে উদ্দেশ্যে তার রাজবাড়ি গমন, তা এতখানি উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর যে, পদক্ষেপ দ্রুততর হচ্ছে তার অজান্তেই। ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হবে বহু পথ, যা তার অতিচেনা।

হঠাৎই এক ঘন কুরুবক ঝোপে তার একটি পা জড়িয়ে যেতেই পুরন্দরের গতিপথে সামান্য যতি। শরীর বঙ্কিম করে সেই কুরুবক ঝোপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার সময় অকস্মাৎ সে অনুধাবন করে কুরুবক পাতাগুলি তার শরীর স্পর্শ করে কিছু উচ্চারণ করতে চাইছে যেন। সবুজ পাতারা তাদের নরম স্পর্শ দিয়ে তাকে আবিষ্ট করে বলছে, পুরন্দর, তুমি আজকের সভায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। তোমার সংগীত আজ সম্মোহিত করে রাখবে উপস্থিত গুণীজনদের।

একগুচ্ছ কুরুবক পাতার এমন নির্বাক উচ্চারণ শুনে শিহরিত হয়ে ওঠে পুরন্দরের স্নায়ুতন্ত্র। পরবর্তী পদক্ষেপ শুরুর আগে সে এক দন্ড থামে, তার মনের গহনে এই ধারণা জন্মে চতুর্দিকে এত এত মহীরূহ, এত এত ঝোপ ও লতার সমাহার, তারা সবাই যেন আজ সমীহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার গতিপথের দিকে।

ওই তো কোবিদার বৃক্ষ, তার শাখায় শাখায় চম্পার সমাহার। তারা সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত করছে অরণ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সুবাসের সেই বিন্যাস যেন পুরন্দরের উদ্দেশ্যেই। যেন তারাও উচ্চারণ করছে, এ রকমই সুবাসিত হয়ে তুমি ফিরে আসবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মস্তকে পরিধান করে।

ওই তো বিশাল পিপ্পলবৃক্ষ, তার সুদীর্ঘ ও বিপুলাকার ঝুরিগুলি স্পর্শ করেছে মৃত্তিকা, তার অযুত পত্রসমষ্টি পুঞ্জীভূত হয়ে ছায়া বিস্তার করেছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, তার নীচ

AMARBOI.COM

দিয়ে যাওয়ার সময় পুরন্দরের মনে হল তাদের সুশীতল ছায়া স্নিগ্ধ করে তুলছে তার মানসপট। সেই স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে এগোনোর মুহূর্তে হঠাৎ যেন কোথাও তম্বুরার শব্দ কর্ণগোচর হলতার। তম্বুরার শব্দ।

রজ্জু বিস্মিত হয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করে এই গহন অরণ্যমধ্যে অকস্মাৎ তম্বুরার শব্দ কোন দিক থেকে এসে পৌঁছচ্ছে তার কর্ণকুহরে। শব্দটির রেশ তখনও তার স্নায়ুকেন্দ্রে স্পর্শ করে আছে, তার মধ্যেই দ্বিতীয় বার তম্বুরার শব্দ আন্দোলিত হয় সেই অরণ্যের পটভূমিকায়।

শাল্মলীবৃক্ষের শাখায় রক্তবর্ণ পুষ্পের অজস্র সমাহার। তারা উদ্বেলিত হয়ে বলছে, যাও, গায়ক, তোমার কণ্ঠে আজ প্রস্ফুটিত হবে আমাদের রঙের বিস্ফার।

শিংশপা বৃক্ষ শিহরিত হয়ে বলছে, তুমি আজ সংগীতসভায় আমার মতো কলেবর ধারণ করবে।

তমালবৃক্ষেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তোমার ললাটে আজ জয়টিকা অনিবার্য।

কিন্তু সেই তম্বুরার শব্দের উৎস সন্ধান করতে সে ব্যর্থ হয় বারবার।

পুরন্দর তার পদক্ষেপের গতি বৃদ্ধি করে, দ্বিপ্রহরের সূর্য অতিক্রম করছে বিশাল নীল আকাশ, পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে রাজবাড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তে তম্বুরার উচ্চকিত শব্দে সচকিত হয়ে উঠল পুরন্দর, কেন না এ বার শব্দটি স্বনিত হচ্ছে ঠিক তার পশ্চাতেই। তার দ্রুতগতির চলন স্থগিত রেখে পশ্চাতে দৃষ্টি ফেলতেই অপার বিস্ময়ে স্থানু হয়ে গেল এক মুহূর্তে। ঠিক তার অব্যবহিত পশ্চাতে তার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহুবর্ণ পদব্রজে আসছে যে তরুণী, তার গাত্রবর্ণ গৌর, অঙ্গে সবুজ চোলি ও রক্তবর্ণ শাড়ি। তার রূপলাবণ্যের দিকে এক বার চক্ষুস্থাপন করলে যে কোনও পুরুষকে বাধ্য হতে হয় দ্বিতীয়বার চক্ষুস্থাপন করতে। তার মুখাবয়বে উজ্জ্বল হয়ে আছে খুশির লাবণ্য। তার দুই কপোল জুড়ে উদ্ভাসিত অপর্যাপ্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। তার অঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ ভাবে রূপচর্চার চিহ্ন। ললাটের মধ্যস্থলে জ্বলজ্বল করছে গাঢ় চন্দনবিন্দু। তার কণ্ঠ থেকে যে সুরলাবণ্য প্রকাশিত হচ্ছে, তা শ্রবণ করেই রজ্জু অনুধাবন করে, এই তরুণী খম্বাবতী।

পুরন্দর তার স্থানু ভাব পরিহার করে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে, তুমি এখানে কেন, খম্বাবতী?

খম্বাবতীর উদয় হওয়ার কথা দিবা দ্বিপ্রহরের পরে, হিসেব মতো ঠিক সময়েই এসেছে, কিন্তু তার প্রকৃত সময় শিশির ঋতুতে, এখন বসন্তকাল। তবে অরণ্যপথে অজস্র গগনচুম্বী মহীরূপের মধ্যে বিরাজ করছে প্রাণসঞ্চারী স্নিগ্ধতা, বাতাসে সুশীতল স্পর্শ, রাগিণী খম্বাবতীর আবির্ভাব ঘটতেই পারে এ সময়।

খম্বাবতীর যা স্বভাব, সর্বক্ষণই উচ্ছল আর প্রাণবন্ত, সংগীতের আমোদে উৎফুল্ল তার মুখমণ্ডল, পুরন্দরের প্রশ্নে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তার শরীরের তরঙ্গ, অতি সুরেলা কণ্ঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, তুমি চলেছ বিজয়মুকুট পরিধান করতে। আমার অভিলাষ তোমার কণ্ঠে কিছুক্ষণ সুরযোজনা করার।

পুরন্দরের দুই চোখে ঘনিয়ে আসে অন্যমনস্কতা, তার কণ্ঠে ভর করে ধৈবত, কেন না খম্বাবতীর গ্রহস্বর ধৈবত, সে পঞ্চমবর্জিত।

পুরন্দরের কণ্ঠে ভর করতে থাকে খম্বাবতীর রূপলাবণ্য, কোমল ধৈবতে গুঞ্জরিত হয় সুরের লালিত্য। অজস্র মহীরূহর ছায়ায় অবগাহন করতে করতে তার পদক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, তৃণলতাগুলি তার পায়ে মথিত হয়ে বন্যগন্ধে উদ্বেলিত করে বাতাসতরঙ্গ। তার স্নায়ুতন্ত্রে ঘূর্ণি তুলতে থাকে সুরের মহিমা। খম্বাবতী এক বার কণ্ঠে ভর করলে শরীরে ও মনে বয়েযায় খুশির হিল্লোল, রোমাঞ্চিত হতে থাকে হৃদয়ের গহন অন্দর, সংগীতের আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে পূর্ণ অস্তিত্ব।

খম্বাবতীর মুখাবয়বে যেমন উল্লাসের চিহ্ন, তার দৃষ্টিতে তেমনই এক সুদূরগামী চাহনি। সেই চাহনিতে বিচিত্র সব চিত্র উদ্ভাসিত হতে থাকে একের পর এক। সেই চিত্রাবলি বড় নয়নাভিরাম, তাতে কখনও বিস্তৃত থাকে আদিগন্ত চরাচরের ব্যাপ্তি, কখনও ঘননীল আকাশের গভীরতা। কখনও সে চিত্রার্পিতের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুভব করে পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের সৃজনশীলতা। আকাশে এক খণ্ড শুভ্র মেঘও কী নিপুণতায় অবয়ব বৃদ্ধি করে, এই একটু আগেই যা ছিল কাঁকরি-কাটা রেকাবের আকৃতি, এখন তাতে তরঙ্গ দুলে রূপান্তরিত হচ্ছে পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় রক্ষিত বরফের নদীর মতো। সেই স্রোতস্বিনী অকস্মাৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে ধারণ করছে জটাজুটধারী মহেশ্বরের অবয়ব।

পুরন্দর পদক্ষেপ ফেলে তখন পার হয়ে যাচ্ছে গভীর অরণ্যপথ। তিন ক্রোশ পথ এমন অরণ্যপথ অতিক্রম করলে তবে দেখা যাবে রাজবাড়ির চূড়া। পুরন্দর এক জন সুগায়ক, তাকে সম্মান জানিয়ে স্বয়ং দেশের রাজা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সংগীত পরিবেশনের জন্য।

ক্রমে অরণ্যপথ শেষ হয়ে আসে, খম্বাবতী তার স্বরের অদৃশ্য শ্রুতিগুলি অতিক্রম করছে দ্রুত লয়ে। পুরন্দর ক্রমে আরও আরও উৎফুল্ল হচ্ছে আসন্ন সংগীতসভার কথা ভেবে, উল্লাসে পূর্ণ হচ্ছে তার চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি। সূর্যদেব মধ্যগগন অতিক্রম করে পৌঁছেছেন পশ্চিমের আকাশে। খম্বাবতী তার পালা সমাপ্ত করে আদেশ প্রার্থনা করল গায়কের কাছে, তবে আমি যাই?

পুরন্দর বহুক্ষণ নিমজ্জিত ছিল খম্বাবতীর রূপলাবণ্যের গভীরে, অকস্মাৎ সংবিৎ ভেঙে দৃষ্টিপাত করল সম্মুখের পথের দিকে, মৃদু হেসে বললেন, যাবে?

— হ্যাঁ, বেলা শেষ হয়ে আসছে, এ বার আমার যাওয়ার পালা।

— কিন্তু তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না যে।

খম্বাবতীর উচ্ছল কণ্ঠে লাস্যের স্পর্শ, বলল, তোমাকে ছেড়ে যেতে কি আমারও ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার সময় অতিক্রান্ত।

পুরন্দর সেই অপরূপা তরুণীর শরীর থেকে তুলে নিচ্ছিল এক একটি শ্রুতি, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরিয়ে দিচ্ছিল সুরের মূর্ছনায়, এখন লয়ের শেষে পৌঁছে থামল কণ্ঠে টঙ্কার তুলে। বলল, তবে তাই হোক।

সুন্দরী খম্বাবতী স্থানু হয়ে যায় এক সময়, বলল, মনে রেখো তুমি এ দেশের শ্রেষ্ঠ গায়ক। আজ রাজসভায় তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব।

খম্বাবতী তার সময় মেনে কখন যেন বিদায় নিয়েছে পুরন্দরের কণ্ঠ থেকে, কিন্তু তার রেশ রয়ে গেছে তার অনুভূতির গহন গভীরে, শরীরে ও মনে রেখে গেছে এক অভূতপূর্ব উল্লাস, যা তাকে এই মুহূর্তে উন্নীত করেছে আত্মবিশ্বাসের শীর্ষে। খম্বাবতী মালবকৌশিকের রাগিণী, তাই তার লাস্য উজ্জীবিত করে তুলছে গায়কের উচ্ছ্বসন ও প্রক্ষোভ।

সূর্যদেব পশ্চিমদিগন্ত স্পর্শ করার আগেই পুরন্দর পৌঁছে গেল শহরের প্রান্তে। বহু দূর থেকে শুরু হয়েছে একটি-দু'টি করে পর্ণকুটির। পথের দু'পাশে কখনও তিন্দুকবৃক্ষ, কখনও কতিপয় দেবদারু, কখনও খর্জুর ও তালবৃক্ষ।

পর্ণকুটিরের বাইরে স্থানীয় অধিবাসীরা যে যার কাজকর্মে ব্যস্ত, তাদের কেউ কেউ বিস্মিত চোখে দৃষ্টিপাত করছে সুরেশ সুপুরুষ পুরন্দরের চলনভঙ্গিমার দিকে। তারা কেউ পুরন্দরকে চেনে না, চেনার কথাও নয়, পুরন্দর কালেভদ্রে এ শহর এসেছে কোনও সংগীতসভায়, নচেৎ তার তো শহরে আসার প্রয়োজন হয় না কখনও। তার সংসার বলতে রাগ ও রাগিণীরা বা তাদের পুত্ররা, তার কালক্ষেপ মানে সংগীতের গহনে অবগাহন করা, তার সঙ্গীসাথী বলতে কখনও দীপক, কখনও শ্রী, কখনও ভৈরব, কখনও ...

হ্যাঁ, পুরন্দরের সংসার ঠিক এ রকমটাই। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো উপলব্ধি করতে পারে না সম্বৎসর সুরের গহনে বসবাস করেও কণ্ঠের সুরে কোথাও যেন অপ্রাপণীয়তা, কোথাও যেন অতৃপ্তির হাহাকার। একমাত্র তন্নিষ্ঠ সংগীতজ্ঞই জানে কোনও শিল্পীই সারাজীবনেও স্পর্শ করতে পারে না কাঙ্খিত লক্ষ্য।

শহরের লোকালয় ক্রমে ঘনবসতি, পর্ণকুটিরের পাশাপাশি প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা, তার মধ্য দিয়ে ক্রমে উপনীত হওয়া রাজবাড়ির দিকে। হঠাৎ অশ্বচালনা করে তার পাশ দিয়ে শব্দ তুলে চলে গেল এক রাজপুরুষ, তিনি নিশ্চয় পুরন্দরকে চিনবেন না, চিনলে হয়তো অভিবাদন করে বলতেন, আসুন, সংগীতজ্ঞ, আপনার অপেক্ষায় রয়েছে রাজবাড়ি।

কিন্তু তার চিন্তায় ছেদ ঘটাল রাজবাড়ির আশ্চর্য গঠন। বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত রাজবাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে পার হতে হয় অনেকগুলি ফটক। প্রতি ফটকেই সশস্ত্র রক্ষীরা সতর্কভাবে মোতায়েন। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দু'পাশে দুই সুবেশা যুবতী তাকে অভ্যর্থনা জানায় একগুচ্ছ পুষ্পস্তবক উপহার দিয়ে। দুই যুবতীর এক জন পরমাসুন্দরী, গাত্রবর্ণ গৌর, দীর্ঘাঙ্গী অথচ ক্ষীণতনু, সে নিজেকে পরিচয় দিল অনঙ্গপ্রভা নামে। অন্য জন সামান্য পৃথুলা, মধ্যম উচ্চতার, কিন্তু তার দেহসৌষ্ঠব অতীব সুন্দর, সামান্য স্থূল পয়োধর। তার নাম দূর্বামঞ্জরী। তারা দু'জনে পুরন্দরের পথপ্রদর্শক হয়ে নিয়ে গেল সংগীতসভাকক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভাকক্ষে উপস্থিত এত এত সংগীতবোদ্ধা মানুষদের উপস্থিতি দেখে পুরন্দর খুবই আহ্লাদিত। সভাকক্ষে শ্রোতারা যত রসজ্ঞ হবেন, গায়কের সৃজনও হবে তেমনই উচ্চ স্তরের।

শুধু সংগীতই তা নয়, যে কোনও শিল্পই হবে স্রষ্টা ও রসজ্ঞের দ্বৈত আদানপ্রদান। স্রষ্টা তাঁর সৃজনকর্ম নিয়ে যত নিকটবর্তী হতে পারবেন রসজ্ঞের, সৃষ্টিও হবে তত উচ্চমার্গের।

ক্রমে শুরু হয় সংগীতের আরাধনা। পুরন্দরকে আহ্বান করা হলে সে স্থান গ্রহণ করে সংগীতাসনে। নিমগ্ন হয় নিজের ভিতর। সৃজন এমনই এক অজ্ঞেয় অনুভূতি, যার মধ্যে অবগাহন করতে হলে পৌঁছতে হয় চেতনার গভীরে, নিরন্তর প্রস্তুতি নিতে হয়, নিজের ভিতর চলে এক অবিরাম খনন। পুরন্দরের দুই চক্ষু নিমীলিত, চেতনার গভীরে তার যাত্রা শুরু, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি স্থাপিত তম্বুরার তন্ত্রীতে, অঙ্গুলির প্রথম ঘর্ষণে সমস্ত সভাকক্ষ শিহরিত করে ব্যাপ্ত হয়ে গেল এক আশ্চর্য সুর। তার পর আরও এক বার, তার পর আরও এক বার। তার পাশে ও পশ্চাতে উপবিষ্ট বাদ্যযন্ত্রীরাও শুরু করেছে তাদের সঙ্গত। কিছুক্ষণ বাদ্যযন্ত্রের এমনই লীলাময় ধ্বনি, সেই সুর সৃষ্টি করে এক সম্মোহনের আবেশ, যা সভাকক্ষে সঞ্চারিত করে ঘোর নিবিষ্টতা।

পুরন্দর ক্রমে সেই আবেশে নিয়োগ করে তার কণ্ঠ। সেই স্বর যেন প্রবাহিত হয়ে আসছে বহু দূরের এক স্বপ্নের অন্তঃস্থল থেকে, ক্রমে সেই স্বপ্ন ধারণ করে নীল বর্ণ, আকাশের ঘন নীল রেণু রেণু হয়ে নেমে আসতে শুরু করে কক্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। নীল রঙে আচ্ছন্ন করে ফেলে শ্রোতার চতুষ্পার্শ, সেই নীল ক্রমে সঞ্চারিত হতে শুরু করে শ্রোতার মানসজগতের গভীর গহন দেশে।

সেই নীলের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হন এক রূপবান যুবক, তিনি মালব-কৌশিক, তাঁর বেশ নানা রঙে রঙিন, সেই রঙের মধ্যে নীলের প্রাধান্যই অধিক, ফলত কক্ষের স্বপ্ননীলের সঙ্গে তাঁর পরিধেয় বাস মিলেমিশে তাঁকে করে তুলেছে স্বপ্নাচ্ছন্ন। তিনি অতিশান্ত, গম্ভীর, অথচ তাঁর অভিব্যক্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে প্রেমসিক্ত রস।

পুরন্দর তখন একাত্ম হচ্ছে মালব-কৌশিকের সঙ্গে, মধ্যমাশ্রিত গান্ধার মধ্যম ব্যবহার করে মধ্যমে স্থিত হলে তবেই সৃষ্ট হয় হয় মানব-কৌশিকের গান্ধার। মধ্যম থেকেই আরোহণ, মধ্যম থেকেই ষড়্জে বিশ্রাম। মালব-কৌশিক তখন তার সম্মোহন প্রসারিত করছে এক স্বর থেকে আর এক স্বরে, স্পর্শ করছে এক একটি শ্রুতি, সম্মুখীন হচ্ছে সেই প্রেয়সীর যার আকর্ষণে মত্ত হয়ে উঠেছে তার অন্তঃস্থল।

পুরন্দর ক্রমশ আলাপের ভিতর দিয়ে অহগাহন করছে রসের সমুদ্রে। তার প্রেমিকা রয়েছে অপেক্ষায়, সেই সুন্দরী যৌবনবতী তরুণীর সঙ্গে সে ক্রমে মেতে ওঠে রসালাপে, হাস্য-পরিহাসে, রসক্রীড়ায়। এক সুন্দরীর মধুর সাহচর্যে মালব-কৌশিকের অনুভবে তখন এক নান্দনিক দৃশ্যপট। তার হস্তে পাত্রভর্তি মধু। সেই মধু পান করতে থাকে তার ওষ্ঠাধর। সেই মধু তার কণ্ঠনালী বেয়ে প্রবেশ করতে থাকে অনুভূতির নানা স্তরে। তা অর্জন করে নান্দনিক চরিত্র। শিল্পীর যা অভীষ্ট, শিল্পী যা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাতে নিশ্চিতভাবে থাকবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু অভিনবত্ব। মালব কৌশিক সেই মধুসুধা পান করে মত্ত হবেন নতুন সৃষ্টির আকাঙ্খায়। পুরুষের সেই কর্মে শক্তি জোগাবে প্রকৃতি।

পুরন্দর তার আলাপের মধ্যে সহসা সন্ধান পেল সেই খম্বাবতীর, যে তার হাস্যে লাস্যে আপ্লুত করেছিল আজ মধ্যাহ্নে। সেই সুন্দরী তাকে সাহচর্য দিয়েছিল দীর্ঘ অরণ্যপথ। খম্বাবতী মালব-কৌশিকের রাগিণী, তার প্রিয় নারী। সেই নারীর উষ্ণ সঙ্গ তার অনুভূতিতে পূর্ণ হতে শুরু করল এক একটি শ্রুতি পার হওয়ার মুহূর্তে। সহসা সেই লাস্যময়ীর দেহের স্পর্শও যেন অনুভব করল এক অনির্বচনীয় মুহূর্তে। পুরন্দরের কণ্ঠে তখন কামনার টঙ্কার। সে মথিত করছে, মথিত করছে এক অপরূপ লাবণ্য, আর সৃষ্টি করছে এক একটি অভিনব গীত, এক একটি গমকে সে উত্তীর্ণ হচ্ছে সেই রূপলাবণ্যের উচ্চাবচ শরীর। সেই অসমতলতায় তার গতিপথ ব্যাহত হয়, কিন্তু সেই অনুকূলতার মধ্যেই নিহিত থাকে এক আশ্চর্য উল্লাস, সেই উল্লাস পরিপূর্ণ করে তুলছে সভাকক্ষ, শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে শ্রবণ করছে এক সংগীতশিল্পীর অপরূপ শিল্পনির্মাণ, শিল্পীর সঙ্গে তারাও অতিক্রম করছে এক গহন বনপথ, তারাও সাহচর্য অনুভব করছে সেই লাস্যময়ীর, যে কিনা তার রূপে, রসে, রঙে, উচ্ছ্বাসে, উত্তাপনায় তৃপ্ত করছে তার প্রিয় পুরুষ মালব-কৌশিককে।

শিল্পী তখন বিলম্বিত থেকে প্রবেশ করছে দ্রুতিতে, প্রবেশ করছে সেই রূপ লাবণ্যের গভীরে, স্পর্শ করতে চাইছে সেই গভীরসত্তা, যা উজ্জীবিত করে তোলে সুষুম্নার সেই অননুভবনীয় আনন্দ, যাকে জড়িয়ে রেখেছে বাম ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, যাকে গভীর থেকে গভীরতায় আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে এক অনিবার্য টান, তখনই আরও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে ওঠে অনুভূতির বিস্তীর্ণ জগৎ, আরও মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মনের সেই অদৃশ্য পট, লালিত্যে পূর্ণ হয় গতিসৌন্দর্য।

শিল্পীর কণ্ঠে তখন ভর করেছে এক অনির্বচনীয় লীলাময়তা, এক অনন্যসুন্দর সুখৈশ্বর্য, তার স্বর চলনে যে গতির সঞ্চার হচ্ছে তাতে আন্দোলিত হচ্ছে প্রকৃতির অবারিত অয়বয়, সৃষ্টি হচ্ছে একটি পরম রূপময় মুক্তা। গায়নভঙ্গিতে যে চঞ্চলতা, চপলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তাতে গায়কের অঙ্গসঞ্চালনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে শ্রোতার অভিনিবেশ। সভাকক্ষে একই সঙ্গে বহু শরীরে সৃষ্টি হচ্ছে এক আশ্চর্য উন্মাদনা, যা হয়তো সারাজীবনে এক বারই হয়, উদ্ধৃত কণ্ঠস্বরে গায়ক সম্মোহিত করছে শ্রোতার বাহ্যিক চেতনা, তাকে নিয়ে চলেছে এক অনন্ত যাত্রাপথে, যেখানে শুধু উল্লাস আর উল্লাস।

গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই তখন একযোগে গভীর অরণ্যপথ অতিক্রম করার মুহূর্তে শুনতে পায় তার প্রিয় নারীর শীৎকার। সে এক অদ্ভুত আলোড়ন সভাকক্ষে, যেন এই সংগীত শেষ হয়েও শেষ হবে না, চলবে অনন্তকাল, কেউই সেই সম্মোহনের মায়াজাল ছিঁড়ে বেরোতে পারছে, কিংবা বেরোতে চাইছেও না, যেন এই শরীরমুগ্ধতা, এই শৃঙ্গারের মুহূর্ত শরীরে ও মনে সংলগ্ন হয়ে থাকুক বহুগুণিত সময়কাল।

পুরন্দরের তম্বুরায় শেষ টঙ্কারটি স্থানিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎকাল সভাকক্ষ প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশব্দ। রাজা নিজেও বহুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন সংগীতের মূর্ছনায় মাহমাহিত হয়ে। সংগীতের রেশ তখন আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্নায়ুকেন্দ্র। অজস্র প্রশংসাবাণীর মধ্যে পুরন্দর তার সংগীতাসন ত্যাগ করে ফিরে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু তার আসনে উপবিষ্ট হওয়ার আগেই সে অনুভব করল, তার পৃষ্ঠদেশে কার করস্পর্শ। ঘুরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য সে দেখল, তা যেন প্রত্যয় হল না তার, দেখল স্বয়ং রাজা তাঁর সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসেছেন তার আসনের দিকে, পুরন্দরের দুই কর নিজের করতলে নিয়ে বললেন, আমার রাজ্য সৌভাগ্যবান যে, আপনার মতো এক জন গুণী সংগীতজ্ঞ এখানে বসবাস করেন।

পুরন্দরের কণ্ঠে ও সারা অঙ্গে তখনও লিপ্ত হয়ে আছে মালব-কৌশিকের বিভিন্ন শ্রুতি ও স্বর। মধ্যরাত্রির প্রিয় রাগের আশ্লেষ তখনও জুড়ে আছে তার চেতনাবিশ্ব, হঠাৎ রাজাকে তার আসনের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে দেখে সে হতচকিত ও আপ্লুত। কোনও উচ্চারণই তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল না।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালি বুদ্‌বুদ

কৃষ্ণাঙ্গম গঙ্গোপাধ্যায়

চোখে চশমা লাগিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে প্রথম পাতা, তারপর পরের পাতা, তার পরের পাতা এইভাবে পরপর হেডলাইন দেখতে দেখতে এগিয়ে যায়। তারপর খবরের শরীরে অর্থাৎ বিশদে চোকে দীপান্বিতা। আজও সেইভাবে এগোনোর স্বাভাবিক ইচ্ছেটাই তার অবচেতনে ছিল। আর সেটা গভীরভাবে থাকার কারণ হচ্ছে তার ভালো ঘুম। আর এই ভালো ঘুমের কারণ হল গতদিন পনেরো সে রোমাঞ্চকরভাবে জীবন কাটিয়েছে। এই মুহূর্তে হেডলাইনে চোখ বোলাতে গিয়ে যদি ছবিটায় চোখ পড়ে না যেত তা হলে দীপান্বিতা কাটিয়েছে না ফেলে ভাবত কাটাচ্ছে। কারণ এই ছবির সঙ্গেই তো গত পরশু সন্ধ্যায় সে জলের ওপরে ভাসমান এক রেস্তোরাঁয় সুন্দর একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছে। যাকে রোমাঞ্চ বলে আক্ষরিক সেই রোমাঞ্চ পেয়েছে গত পরশু এই ছবির কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন এই ছবির পাশে এরকম কোনও খবর ছিল না। ছবির পাশে ও নীচে ছাপা খবরের ভেতর ডুবছিল দীপান্বিতা। আর তার বুকের ভেতরে নদীপাড়ের মাটি জলের ঢেউতে শুধু ভেঙে যাচ্ছে। সরু দাড়ি জুলপির নীচে থেকে নেমে এসেছে লম্বাটে মুখে। সুন্দর ইউ হয়ে থুতনি থেকে ছুঁয়েছে ঠোঁটের গোড়া। ইউয়ের মাঝখানটা শুধু চেড়া। কমলাভ ঠোঁটের ওপর থেকে সরু গোঁফ এসে মিশেছে দাড়িতে। দাড়ি, গোঁফ পুরো কালো নয়। হাল্কা বাদামি। যদিও ছবিতে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দীপান্বিতা এই ছবি শুধু গত পরশুই নয়, গত দিন পনেরো যাবৎ সল্ট লেক সিটি সেন্টারে, চিড়িয়াখানায়, মিলেনিয়াম পার্কে এবং গত পরশু জলের ওপরে ভাসমান রেস্তোরাঁয় খুব কাছ থেকে, খুব নিবিড় করে দেখেছে। তাই সে জানে। কিন্তু সেই জানাটা পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে এখন।

খবরের এক একটা লাইন শেষ করছে দীপান্বিতা আর ডুবে যাচ্ছে নদীর অতল থেকে অতলে। হাওড়া স্টেশনের ক্লোজড্ সার্কিট টিভিতে লোকটাকে অর্থাৎ ছবির মুখকে প্রথম শনাক্ত করা হয়। অন্যান্য সাধারণ যাত্রীর মতোই লাগেজ নিয়ে সে প্লাটফর্মে ঢোকে। কিন্তু ক্যামেরায় পাঠানো ছবি যে মনিটরে আসছিল, সেখানে চোখ দিয়ে বসেছিলেন যে কর্মী, তার দৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে আকর্ষণ করে লোকটির লং কোটটা। খবর পড়তে পড়তে এই অংশে থেমে গেল দীপান্বিতা। চোখের ওপরে ভেসে উঠল শাহনওয়াজের অবয়ব। সত্যি দেখার মতোই উচ্চাতা। সত্যি কথা বলতে গেলে ওর উচ্চতাই প্রথমে নজর কেড়েছিল দীপান্বিতার। তখন সেদিন পার্কস্ট্রিটের ফুটপাতে দীপান্বিতা। উইন্ডো শপিং করছে। এই একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে শুধু চোখ ব্যথা করে না। লেডি ব্র্যাবোর্ন ইংলিশ অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সে। ক্লাশে নোট নিতে নিতে মাঝেমধ্যে চোখ ব্যথা করে তার। মায়ের নির্দেশ মাঝে মাঝে যে জপ করতে বসে। চোখ বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে চোখ ব্যথা করে। কম্পিউটারে অনেকক্ষণ কাজ করলে এটা হয়। কিন্তু উইন্ডো শপিং চোখ মেলে ড্যাবড্যাবে চোখে শোকেসে ঝোলানো পোশাক-আশাক দেখতে একটুও চোখ ব্যথা করে না দীপান্বিতার। সে লক্ষ করেনি, তারই মতো নিবিড় চোখে আরেকজন দেখছে শেরওয়ানিটা। শেরওয়ানিটা পুরুষের না মহিলাদের জন্য বানানো হয়েছে সেটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু যেই পরুক, তাকে অনুপম লাগবেই, গলার কাছ থেকে কালচে হলুদ জমিতে মেরুন সুতোর ছুঁচের কাজ নেমে এসেছে বুক ছাড়িয়ে অনেকটা নীচে। সে মনে মনে বাঃ বলেছিল। কিন্তু তার অলক্ষ্যে তারই মতো নিবিড় চোখে যে শেরওয়ানিটা দেখছিল সে খুব মিহি গলায় গালিবের শায়েরি আউড়েছিল। না তাকিয়ে পারেনি দীপান্বিতা। এই শায়েরি সে তো পার্কসার্কাস ময়দানে ঘাসের ওপরে বসে শুনেছে। তার ক্লাসমেট পরভিনের প্রেমিক ফিরদৌসের মুখে কলেজ ফেরতা তারা সবাই মিলে যখন ময়দানে গিয়ে বসেছে, শুনেছে। এখনও পর্যন্ত তাদের বন্ধুবান্ধবী মহলে ফিরদৌস সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরুষ। সে একটা স্কুলে উর্দু পড়ায়। পিয়ানো বাজাতে পারে। প্রশংসা হোক কী বিরাগ—শায়েরি বলে প্রকাশ করে। ওর ইউক্যালিপটাসের পাতার মতো সরু লম্বা ফর্সা আঙুলে একটা চুনি। ওই চুনি সমেত যখন আঙুল দিয়ে গালের দাড়ি হাল্কা করে চুলকোয়, দীপান্বিতার মনে হয় পরভীন সত্যি ভাগ্যবতী। ও যেন রোমান্টিকতার রক্ত মাংসটাকে পেয়েছে। কিন্তু সেও যে ওইরকম একটা কিছু পেয়ে যেতে পারে সেদিনের উইন্ডো শপিং-এর আগে জানত না।

গালিবের শায়েরির শব্দগুলো দীপান্বিতার খুব গভীরে ফেঁঙশুই বেলের মতো টুংটাং শব্দ হচ্ছিল, পার্কস্ট্রিটের ফুটপাত ধরে শাহনওয়াজের সঙ্গে হাঁটছিল, গায়ে পড়েই আলাপ, কিন্তু গায়ে পড়ে বলতে পারবে না, শাহনওয়াজের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারছিল না, টুকটাক কথা বলছিল, যতটুকু না জানালে নয় জানাচ্ছিল দীপান্বিতা। আর লক্ষ করছিল শাহনওয়াজের হাত নাড়া, পা ফেলা, হাল্কা হাসি সবকিছুর মধ্যে একটা আভিজাত্য ভেসে উঠছে। আভিজাত্য তো শুধু পয়সা নয়, একটা রুচি, পরভিনের ভাষায় আদায়ে। সেটা যেন সেদিন শাহনওয়াজের উপস্থিতির প্রতিটি বিন্দুতে খুঁজে পেয়েছিল।

বিছানার ওপর বসে আছে দীপান্বিতা। সামনের খোলা খবরের কাগজের ওপরে বাইরের রোদ এসে পড়েছে। রোদ, খবর কিছুই টানতে পারছে না দীপান্বিতাকে। কীরকম একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে এই মুহূর্তে। আচ্ছা, পুলিশ কোনও ভুল করছে না তো? প্রায় একই রকম দেখতে দু'জন লোক তো কতই আছে। আর এই ধরনের ঘটনায় আসল অপরাধীকে ধরতে না পেরে নিরাপরাধকে ধরে পুলিশের বাহবা নেওয়ার তো অনেক নজিরই আছে। যেন সেইরকমই কিছু হয়। মনে মনে বিড়বিড় করল দীপান্বিতা। আর ওই বুঝল,

AMARBOI.COM

বাসি বিছানায় খবরের কাগজ এলোমেলো করে থম মেরে বসে থাকলে মার কাছে ধরা পড়ে যাবেই।

দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাথরুমের আয়নার নিজের চোখ দেখে নিজেই বুঝল কাগজের খবর তার ওপরে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছে। যেভাবেই হোক স্বাভাবিক হতে হবে। আর সে ব্যাপারে মা সাহায্য করল। সাধারণ কথাও মা এমন চেঁচিয়ে বলছে যে পাশের বাড়ি থেকে মনে হবে ঝগড়া হচ্ছে। দীপান্বিতা শুনল, বিকেলে কোথাও বেরোবি না ...

চাপটা চলে গিয়েও ফিরে এল। বিকেলে তো এই বাড়িতে তেমন কিছু নেই। অবচেতনে বিকেলটা তো সে নিজের জন্য রেখে দিয়েছিল। বিকেলে সে বেরোবে। শাহনওয়াজের সঙ্গে যেখানে যেখানে মিট করেছে, সেখানে যদি শাহনওয়াজকে কেউ চেনে খবর নেবে। কারণ ফোন তো করা যাবে না। আর খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে তো শাহনওয়াজের মোবাইলের রিসভড্ লিস্ট থেকে তার নম্বর পঁচিশ এতক্ষণে পেয়ে গেছে। সেরকম হলে তো তার জন্য ভয়ঙ্কর সমস্যা অপেক্ষা করছে। মুখ ধোওয়া শেষ করতে করতে দীপান্বিতা মনে মনে বলল, বিকেলে তাকে বেরোতেই হচ্ছে।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দীপান্বিতা মাকে বেশ ঝাঁজিয়ে বলল, বিকেলে কী আছে।

— ও মা ভুলে গেলি, সেদিন তোর ছোটমাসির সঙ্গে ফোনে অতক্ষণ কথা হল।

— তো?

— তো মানে! তোর ছোটমাসির দেবরের ছেলে শুভজিৎ ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে ও তো আইটি সেক্টরে, বিশেষ ছুটি পায় না।

— তো?

— ওই একটাই শিখেছিস, তো ও আমাদের বাড়ি দেখবে, তোকে দেখবে ...

— কেন!

— তোর বাবার আমার শুভজিৎকে খুব ভালো লাগে, দেখবি তোরও খুব ভালো লাগবে, আর ফর্ম্যাল মেয়ে দেখা তো তোর পছন্দ নয়, ও জাস্ট বেড়াতে আসবে আর তোকে দেখবে। আর তোকে যদি ভালো লেগে যায় তবে তো ... মা আর কথা শেষ করতে পারল না, কুঁচিকুঁচি হাসিতে ভরে গেল মুখ।

দীপান্বিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বিকেলে তাকে যে বেরোতেই হবে। তাকে যে তদন্ত করতেই হবে খবরের শাহনওয়াজ আর গত দিন পনেরো যে শাহনওয়াজের সঙ্গে সে মিশেছে সে একই কিনা। এখন সে বিকেলে এই বাড়িতে থাকে কী করে। কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল দীপান্বিতা।

— তুমি কিন্তু একদম খাচ্ছ না

— না, না কই, আমি তো নিচ্ছি

নির্বাচিত রবিবারের গল্প দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজুবাদামের ঢঙে তৈরি বিস্কুটের একটা আলতো করে ঠোঁট খুলে মুখে দিল শুভজিৎ। ওর ঠোঁট খুলে মুখে দিল শুভজিৎ। ওর ঠোঁট শাহনওয়াজের মতো কমলাভ নয়, একটু কালোর দিকে। বেশ পুরুষ্ঠ, পুরুষালি। শুভজিৎ বিস্কুট চেবাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওর চোয়াল তেমনভাবে নড়ছে না। গালের চামড়ায় মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে শুধু। ওদিক থেকে ফিরে মা এমন চোখে দীপান্বিতার দিকে তাকাল যেন দেখ্, ম্যানারস্ কাকে বলে একবার দেখ শুধু।

মাকে দীপান্বিতা কী বলবে। সে তো দেখেছে এরকম আভিজত্য। সে লক্ষ করেছে শাহনওয়াজ যখন কাপে বা কাগজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চা বা কফি খায় সামান্যও শব্দ হয় না। ওর কমলাভ ঠোঁট পাত্রের তরলের ওপর পড়েই পালকের মতো উড়ে যায়। জিরো সাউন্ড।

শুভজিৎ বলল, আমরা কীরকম গম্ভীর হয়ে বসে আছি না, একটু গান হোক ...

ছোটমাসি একগাল হেসে বলল, শুভ আইটি ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে, খুব রসিক ছেলে। ওর স্কুলিং তো শান্তিনিকেতনে ...

— তাই।

বাবা এতক্ষণ রিমোট টিপে দেয়ালের বুকে ঝোলানো এলসিডি টিভিতে চ্যানের পাল্টাচ্ছিল। যেন এই ঘরের আড্ডাতে বিন্দুমাত্র ইনভলবড্ নয়। কিন্তু দীপান্বিতা জানে বাবার শরীরের যাবতীয় স্নায়ু শুভজিতের প্রতি রাডার হয়ে আছে। 'তাই'-টা এমন প্রগল্‌ভভাবে বলল, যে শুভজিৎও বুঝে পেল।

ছোটমাসি শুভজিদের দিকে খুব আদুরে ঢঙে তাকিয়ে বলল, একটা গান শোনা না, তোর কী গানের গলা ওরা তো জানেই না ...

শুভজিতের স্মার্ট মুখে শুধু চোখটা সলজ্জ হল। তাকাল দীপান্বিতার দিকে। দীপান্বিতা তাকাল অন্যদিকে। সেটা অবশ্য বিন্দুমাত্র রেখাপাত ঘটাতে পারল না শুভজিতের মধ্যে। বেশ ভরাট গলায় বলল, আপনারা যখন কেউ কিছু করবেন না, আমিই একটা গান গাই

— তুমি বাবা খুব মিশুকে, খুব ভালো ...। মা কথাটা বলল শুভজিতের উদ্দেশে, কিন্তু তাকাল দীপান্বিতার দিকে।

দীপান্বিতার হাসি পেল, মা মেশার কতটুকু জানে। শুভজিৎ ছোটমাসির ননদের ছেলে। ওর তো একটা পরিচিতি এ বাড়িতে আছে। কিন্তু শাহনওয়াজ, সে তো একটা অন্য দেশের মানুষ। পাকিস্তানে ওর লেদার জ্যাকেটের ব্যবসা, পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ও ঘুরতে আসে, সেখানকার হালফিলের স্টাইল পর্যবেক্ষণ করতে। এই শহর, এই দীপান্বিতা তো শাহনওয়াজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ কী সাবলীলভাবে তার মধ্যে মিশে গেছে শাহনওয়াজ। মিশতে মিশতে মনে হয়েছে শাহনওয়াজ তার কতদিনের চেনা যেন। শুভজিৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান গাইছে, 'আমারও পরাণও যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।' ওর ক্লিন সেভড গালে দুটি ঠোঁট কত উচ্ছ্বাস নিয়ে উঠছে নামছে। আইটি ইঞ্জিনিয়ারি, সুপুরুষ, সুন্দর গানের গলা, আচরণ অভিজাত, মার্জিত। দীপান্বিতা দেখল গানের মধ্য, শুভজিতের মধ্যে বাবা, মা গলে গিয়ে মিশে গেছে। কিন্তু শাহনওয়াজের গজল গাওয়া তো ওরা শোনেনি। শুনেছে দীপান্বিতা। গঙ্গার ওপরে ভাসমান এক রেস্তোরাঁয় শাহনওয়াজ তাকে নিয়ে গিয়েছিল। ওর সামনে রাখা পানীয়র তরলে নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে উঠছিল সোনালি বুদবুদ। ওর ভরাট গলায় মৃদু স্বরে গাইছিল, চুপকে চুপকে রাতও দিন ...'। সোনালি বুদবুদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'দিজ্ বাবেলস্ আর নাথিং বাট গোল্ডেন মোমেন্টস্ অফ্ লাইফ, হোয়াট উই আর চেরিশিং অ্যাট দি মোমেন্ট।' সোনালি বুদবুদের এমন রোমান্টিক ব্যাখ্যা এ জীবনে আর কখনও শোনেনি দীপান্বিতা।

চা, স্ন্যাকস্ মিষ্টির পর্ব শেষ হয়েছে। গান শেষ হয়েছে। এখন এসেছে কোল্ডড্রিঙ্কস্। কাচের গ্লাসে তরলের মধ্যে থেকে বুদবুদ উঠছে ওপর দিকে। সোনালি না হলেও আলো পড়ে সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে শুভজিৎ বলল, এগুলো আমাদের জীবনের সুখমুহূর্ত।

ভেতরে ভীষণ চমকে গেল দীপান্বিতা। দুটো মানুষের দেখা-ভাবা-বলা একই হয় কী করে! আসলে শুভজিৎ আর শাহনওয়াজ কি একই লোক। তাই যদি হয় তবে শুভজিতের সম্পর্কে, কাগজে শাহনওয়াজ সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে তা বেরোল না কেন! তাহলে নিশ্চয়ই খবরটা ভুল। কাগজে বেরিয়েছে এক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী চক্রের সদস্য শাহনয়াজ। মাসখানেক হল কলকাতায় এসেছে। ওর লক্ষ্য ছিল হাওড়া ব্রিজে বিস্ফোরণ ঘটানো। খবরটা নিশ্চয়ই ভুল, না হলে শুভজিতের সঙ্গে শাহনওয়াজের এত মিল থাকতে পারে। দীপান্বিতা কিছুক্ষণের জন্যে যেন খবরের নাগপাশ থেকে বেরোতে পেরেছিল। আবার আটকে যাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর খবরে।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কাকে বলে ইমাজিনেশান দেখো ...

বাবাও শুভজিতের দিকে তাকিয়ে প্রগল্‌ভ হাসল।

মা বলল, তুমি কি কবিতা লেখো।

— না, না, ভরাট গলায় হেসে উঠল শুভজিৎ।

দীপান্বিতা শুধু চমকে গেল ভেতরে। মায়ের প্রশ্নটা সেও যে করেছিল শাহনওয়াজকে।

যাওয়ার সময়ে এক ধরনের নিশ্চয়তা নিয়ে গেল ছোটমাসি আর শুভজিৎ। বাবা আর মা বেশ আলো নিয়ে তাকাল দীপান্বিতার দিকে। দীপান্বিতা নিজের খুব গভীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। শুভজিতের মধ্যে ইউনিক কিছু তো সে দেখল না। সে তো খুব কাছ থেকে গত কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপারগুলো দেখেছে। শুধু সেটার গায়ে একটা ভয়ঙ্কর খবর আটকে গেছে। সেটা তাকে অদৃশ্যে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। তাকে যে করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক সত্যিটা জানতেই হবে।

আচ্ছা, চায়ের দোকানের ওই বুড়ো লোকটার সঙ্গে শাহনওয়াজ প্রয়োজনের বেশি কথা বলত না। চক্ররেলের লাইন পেরিয়ে বাবুঘাটের গঙ্গার ধারে তারা বার কয়েক এসেছে। এই চায়ের দোকান থেকে মাটির ভাঁড়ে চায়ে শব্দহীন চুমুক দিতে দিতে শাহনওয়াজ বলত এথনিক টেস্ট। মাটির ভাঁড় চায়ে যুক্ত করেছে এক দুর্দান্ত স্বাদ। লোকটার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা বলত। লোকটাও মজেছিল শাহনওয়াজে। আজ কলেজের জন্য বেরিয়ে কলেজে যায়নি দীপান্বিতা। চলে এসেছে বাবুঘাটের এই চায়ের দোকানের সামনে। কিন্তু এখনও দোকানটায় ঢোকেনি। কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। আড়ষ্ট পায়ে একেবারে সামনে আসতে বুড়ো লোকটা দীপান্বিতার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল। দীপান্বিতা বুঝল, লোকটা কিছু জানে না।

দীপান্বিতা বেঞ্চে বসতে বসতে একটা চা বানানোর কথা বলল। বুড়ো লোকটা কেটলি থেকে ভাঁড়ে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আজ একা?

দীপান্বিতা হাসলম, শাহনওয়াজের কথা বলছ, ও আসবে।

— বড় ভালো ছেলে। চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিল বুড়ো লোকটা। চায়ে চুমুক দিয়ে দীপান্বিতা মৃদু হেসে বলল, কী করে বুঝলে শাহনওয়াজ ভালো ছেলে?

— ও বাবা! একদিন বাঁ হাতে পয়সা দিয়ে দিয়েছিল, ফেরত নিয়ে আবার ডান হাতে দিল।

— কবে?

— আপনাকে ছাড়াও তো দু'তিনদিন এখানে এসেছে তারই একদিনে।

— আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি গঙ্গার ধারে আসেন কেন? বলল, ওর যেখানে জন্ম, যেখানে বড় হয়েছে, সেখানে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, খুব ঠাণ্ডা, খাড়ে তবে জলের কোনও চিহ্ন নেই। খুব শীতের দিনে জলের অভাবে মানুষ ভেড়ার রক্ত খায়।

চায়ে চুমুক দিতে পারল না দীপান্বিতা। গা গুলিয়ে উঠল। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে, পারছে না।

লোকটা বুঝতে পারছে না দীপান্বিতার ভেতরের অবস্থা। বকবক করে বলার বেশ উৎসাহ পেয়েছে। বলল, নানান কথা বলত আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত হাওড়া ব্রিজের দিকে।

চমকে উঠল দীপান্বিতা। খবরে বেরিয়েছে, হাওড়া ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল শাহনওয়াজ। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, হাওড়া ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকত কেন?

— ও কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না, শুধু মুচকি মুচকি হাসত।

দীপান্বিতা কিছু বলতে পারছে না। ওর চা খাওয়া থেমে গেছে। বুড়ো লোকটা বলল, আমার দোকানে কত লোক আসে, কিন্তু দাদার মতো সহবত কারুর মধ্যে দেখিনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ পরে চায়ে চুমুক দিল দীপান্বিতা। বুড়োলোকটা বলল, দাদার ছোটবেলা খুব কষ্টে কেটেছে, ওদের তো বাড়ি ছিল না, পাহাড়ের খাঁজে ডেরা বানিয়ে থাকত, রোজ খাওয়া হত না ...

দীপান্বিতার ভেতরে নদীর পাড় শুধু ভাঙছে। কাল সন্ধেবেলায় যে শুভজিৎ তাদের বাড়িতে এসেছিল, সে প্রপার স্কুলিং পেয়েছে, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার মধ্যে পড়ো হয়েছে। অথচ পাহাড়ের খাঁজে বেড়ে ওঠা শাহনওয়াজের মধ্যে শুভজিতের আভিজাত্য ডানা মেলেছে। একী কম বড়ো ব্যাপার। হাওড়া ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য এই শহরে শাহনওয়াজ এসেছে কি না তা দীপান্বিতার কাছে একমাত্র স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটা জিনিস যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ও সোনালি বুদবুদ, অসীম অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সোনালি বুদবুদ। মাকে বা বাবাকে এটা যে কোনওদিনও বোঝানো যাবে না। দীপান্বিতার ক্লান্ত ঠোঁট চায়ে চুমুক দিতে থাকল।

খবর ৩৬৫ দিন, ২৭ মে ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফক্কাবাদ

তিলোত্তমা মজুমদার

দেশ জুড়ে দশদিনব্যাপী উৎসব হতে চলেছে। আণবিক, পারমাণবিক ইত্যাদি যত রকম মারণাস্ত্র পৃথিবীর মহাশক্তিধর দেশগুলির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, তার সেরাটির সফল প্রয়োগ করেছে এই দেশ। এশিয়া মহাদেশের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের এক ক্ষুদ্র দেশ।

উৎসবের জন্য কোনও ফরমান জারি করতে হয়নি। এমন বুরবাক কে আছে যে, এমন দিনেও খুশি নয়? তবে কিনা, সব দেশেই থাকে কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল। ভালমন্দের সরবরাহ সেখানে যথানিয়মে পৌঁছয় না। তা সে খবরই হোক, কী সুযোগসুবিধা। ওই ক্ষুদ্র দেশে সেই রকমই এক রুক্ষ পাহাড়ি গ্রাম ফক্কাবাদ। বড় দুর্দশা সে গ্রামের। পথঘাট প্রায় নেই। শীতে বরফ। গরমে খরা। এক-এক বছর বর্ষা প্রলয় নিয়ে আসে। তখন বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে। জীবনধারণই সেখানে কঠিনতম কাজ।

এই ফক্কাবাদেই বসবাস করে রতু আর চন্দা। আরও অনেক দম্পতির মতো তারাও ঘর বেঁধেছে সন্তান-সন্ততিসহ এক সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। অল্প দিন হল বিয়ে হয়েছে এখনও বাচ্চা আসেনি।

রতুর ছেলেবেলায় অসুখ করেছিল। কী অসুখ সে জানে না। গ্রামের বৈদ্য জড়িবুটি খাইয়েছিল, কাজ হয়নি। একটি পা শুকনো কাঠি। কোনও মতে লেংচে চলতে সাহায্য করে। বাকি সব অঙ্গ, এই যুবা বয়সে যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম পুষ্ট। তাই নিয়েই সে পাথুরে জমিতে চাষ দেয়। অন্তত এক বেলার আহার্য শস্য জোটাবার চেষ্টা করে। ওই সব কম পুষ্ট শরীর মাধ্যমেই সে চন্দার প্রেম পায়। চন্দা তাকে চাষের কাজে সাহায্য করে। ছাগল প্রতিপালন করে। সজীব বুনোলতার মতো তার প্রাণশক্তি। দু'বেলা পেটভরা খাবার সে-ও পায় না। তবে ঈশ্বর অল্প দিয়েই তার শরীরকে ভরাট করেছেন। রতু আর চন্দা, ফক্কাবাদ গ্রামের অন্যদের মতো, যা পেয়েছে, যতটুকু পেয়েছে, তাকেই সুখ-শান্তি বলে জানে।

এক হিমেল সকালে যখন কুয়াশা কেটে গেছে, আরমাদায়ক রোদ্দুর ভরা খেতে কাজ করতে এল রতু আর চন্দা। হঠাৎ তাদের অবাক করে দিয়ে একটি ঝোপের আড়াল থেকে দাঁতন করতে করতে বেরিয়ে এল জোলন। হেসে বলল, 'কী রে চন্দা, কেমন আছিস। ল্যাংড়া রতুকে বিয়ে করেছিস দেখছি। রতু তোর কী কপাল রে! চন্দার মতো মেয়ের জন্য যে কেউ বসতবাটী বাজি রাখবে।'

AMARBOI.COM

সে একদলা থুতু ফেলল। ফের দাঁতনকাঠি চিবোচ্ছে। রতু শুকনো হাসল। ল্যাংড়া বলে সে চিরকাল উপহাসের পাত্র, তবু তার লজ্জা ফুরোয়নি। চন্দাকে বিয়ে করেছে বলে অন্য বন্ধুরাও টিটকিরি মেরেছে। জোলন তার সমবয়সী বন্ধু, সেও ব্যঙ্গোক্তি করবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সে বলল, 'আরে জোলন, কবে এলি?'

'এই তো। কাল বিকেলে।'

ফক্কাবাদ যতই দরিদ্র এবং সংগ্রামী হোক, সচরাচর গাঁ ছেড়ে কেউ যায় না। রতুর বাবার যখন যুবক বয়স ছিল, তখন এক জন রাজধানীর উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। তার কী হয়েছে কেউ জানে না। তাদের যাওয়া বলতে গ্রামের নিকটতম বাজার। মাসে এক বার বসে। ছাগল, ভেড়া, খচ্চর, ঘোড়া, গাধা থেকে নুন, আলু, মুরগি, ওষুধপত্র, মদ, শুখা বা কাঁচা মাংস সবই বিকোয়। ফক্কাবাদ থেকে বাজার পর্যন্ত নেমে আসতে লাগে একবেলা। উঠতে পুরো একটি দিন। বিকিকিনির পসরা নিয়ে মাসে ওই একটি বার গ্রামছাড়া হয় লোকজন। বাজারের দিনে আসে। ছাউনিতে রাত্রিবাস করে। পরের দিন ফিরে যায়।

এই সব লোকজনের মধ্যে জোলন ব্যতিক্রম। বাজারের এক সওদাগরের সঙ্গে সে রাজধানী চলে যায় দশ বছর আগে। ক'বছর খোঁজ ছিল না। লোকে ভেবেছিল সেই রতুর বাবার আমালের মানুষটির মতো জোলন নামের ছেলেরাও বেখবর হয়ে গেল। কিন্তু তাদের ধারণা মেলেনি। অবশেষে যখন সে গ্রামে এল, তার তাগড়াই ঘোড়া, জেল্লাদার পোশাক-আশাক, কথা বলার কায়দা-তরিবত দেখে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সবাই বুঝেছিল জোলন ভাল আছে। রতু এবং অন্যান্য তরুণদের মধ্যে স্পষ্টত ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল এই মতদ্বৈধে যে জোলনের মতো রাজধানীতে চলে যাওয়াই ভাল, না গ্রামে থেকে যাওয়া। জোলনের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেকেই তদ্বির করেছিল। শেষ পর্যন্ত জোলন সঙ্গে নেয় কেবল মন্তা আর লাজুকে। উঠতি যুবকুলে তারাই তখন দম্পতি।

সেই যে গিয়েছিল, আর এই এল। মন্তা ও লাজু আর আসেনি।

জোলন রতুকে ব্যঙ্গ করছে দেখে চন্দার কষ্ট হল। সে বলল, 'তোর কি খাবার জুটছিল না জোলন? ভিক্ষে দিচ্ছিল না কেউ রাজধানীতে?' রতু ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে বলল, 'কাকে কী বলছ চন্দা? জোলন এখন আমির জনাব। মস্ত লোক। দেখছ না চেহারাটা কী চিকনা! ও কি আমাদের মতো? জোয়ার-বাজরা খেয়ে দিন কাটায়?'

'তো কী খায়? আপেল খেজুর মাংস? খেলই বা! আমাদের কী? আমাদের তো আর নেমন্তন্ন করছে না! গরিবকে চেকনাই দেখাতে এসেছে নাকি?' চন্দা চিড়বিড় করে। জোলন দাঁতনকাঠি ছুড়ে দিয়ে কোমরে বাঁধা জলপাত্র থেকে জল ঢেলে মুখ ধোয়। রতু বলে, 'কিছু মনে করিস না জোলন। চন্দা কোনও কারণে রেগে আছে।'

'আরে আমি কি বুরবাক যে, সুন্দরী চন্দার কথায় রাগ করতে থাকব? তা ছাড়া চন্দা কি আমার পর?' জোলন কান ছোঁয়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলে। বলে, 'এত দিন পর ফক্কবাদ এলাম, তোরা বিয়ে করেছিস, দাওয়াত তো তোরাই দিবি আমাকে। কী রে রতু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতু তাড়াতাড়ি বলে, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আজ রাতেই আমাদের ঘরে চলে আয়। তবে কি জোলন, আমাদের গরিবের সংসার। তোর উপযুক্ত সমাদর কি আমরা করতে পারব?'

জোলন বলে, 'উপযুক্ত সমাদর আবার কী? বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু প্রাণ খুলে সুখদুঃখের গল্প করবে, বন্ধুনির হাতে যা হোক কিছু পেট পুরে খাবে। সেই তো মহা ভোজ।'

পুরনো বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা তার স্বরে ও সুরে। রতু খুশি হল। বড়লোক হয়েও জোলন রতুকে আগের চোখেই দেখে। একটু আধটু ব্যঙ্গ-পরিহাস আর কোন বন্ধু করে না। জোলন ছাড়া বাকি সবার অবস্থাই তো তারই মতো। সেজন্য কি কেউ বেশি বন্ধু হয়ে গেছে, না কম?

জোলন ফিরে যাচ্ছে। রতু কাজে মন দিল। সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বলে তার গতি ধীর। চন্দা মুখ গোমড়া করে বলল, 'কথা নেই বার্তা নেই নেমন্তন্ন দিয়ে বসলে!' রতু বলে, 'দিলাম কোথায়? ও তো চেয়ে নিল।'

'চাইলেই দিতে হবে? বড়লোক বন্ধুকে খাওয়াবে কী শুনি?'

'আমরা যা খাব ও-ও তাই খাবে চন্দা।'

'তা বললে হয়? তোমার একটা মানসম্মান নেই?'

'তা হলে কী করবে?'

'খয়েরি মোরগটা রেখেছিলাম আর একটু মোটা করে পরের হাটে বেচে কিছু জিনিস কিনব, সেটাই কাটি।'

'কালকের হাটে যাব না তো আমরা?'

'কী করতে যাব? না আছে কেনার পয়সা, না আছে বেচার জিনিস।'

সন্ধ্যায় মোরগের ঝোল পেয়ে জোলন খুব খুশি। বলল, 'জানতাম বন্ধুনি আমায় শুধু মুখে বিদায় করবে না। এর সঙ্গে সুরা একটু পেলে জমত খুব। যাকগে, চন্দাকেদেখে এমনিতেই তো নেশা লেগে যাচ্ছে। সত্যি রতু, তোকে দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আবার দুঃখও হচ্ছে।'

চন্দা বলল, 'ঈর্ষার কারণ তো সকালে বুঝেছি, দুঃখের কারণ কি রতুর পা? তা যদি হয় তো শুনে রাখ জোলন, ওই রোগা পুরনো পায়ের জন্য আর দুঃখের প্রয়োজন নেই।'

জোলন বলে, 'আরে না না। সেকথা না। চন্দা, তুই আমাকে শত্তুর ঠাউরাচ্ছিস কেন বল তো?'

অনেকদিন পরে মোরগের ঝোল পেয়ে রতু বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছিল। এ তো শুধু মাংস ভোজন নয়, তা চেয়েও বেশি কিছু। কারণ, শুধু মোরগ পেলেই ঝোল হয় না। একটু তেল মশলা রসুন পেঁয়াজ লাগে ঘরে কিছুই ছিল না। চন্দা চেয়েচিন্তে সংগ্রহ করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সবই ছিল অপ্রতুল, তবু রান্নায় কী স্বাদ! সুস্বাদে রতু ডুবে ছিল। চন্দা ও জোলনের ঝগড়া বাধে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'তা জোলন, মন্তা আর লাজুর খবর কী? সেই যে গেল, আর তো এল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন আসবে? এই ফকাবাদে কেন পচে মরতে আসবে?'

'না-না। মরতে আসবে কেন? বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিটান বলেও তো একটা কথা আছে। এই যে তুই এত বছর পর পর আসিস, কেন? না টান আছে বলেই তো?'

'আরে টান কি ওদের নেই? আছে। সময় পায় না। রাজধানীতে মানুষের জীবন হল চোখের পলক। এই শুরু, এই শেষ।'

'মানে?'

'এত কাজ, এত কাজ যে দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় কেউ টাহর করতেই পারে না।'

'এই যে তুই এলি, ওরা পারে না কেন?'

'আসবে আসবে। এই তো গেল মাসে মন্তা একটা মস্ত ঘোড়া কিনল। তা একটা ঘোড়ায় পুরো পরিবার আসে কী করে? বালবাচ্চা হয়েছে। পরিবার বেড়েছে, এ কি কম কথা?'

'তোর পরিবারের কী খবর?'

'হা হা! আমি কি বিয়ে করেছি নাকি? আমার সময় কোথায়। গ্রামে আসি কারণ এটা আমার কর্তব্য। মন্তা ও লাজুর মতো আরও যদি কাউকে নিয়ে সুখী জীবন দিতে পারি। কী জানিস, যেতে অনেকেই চায়। কিন্তু সবাইকে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর যাবই বা কেন? যে দুর্বল তার পাশে আগে দাঁড়াতে হয়। তুই বলবি মন্তা ও লাজু কীসে দুর্বল? আমি বলব, সে ভাবে দুর্বল না। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ও-ই প্রথম বিয়ে-শাদি করল। একটু সুখে থাকবে, আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাবে, দেখতে ভাল লাগে না? এই যেমন তোর জন্য আমার দুঃখ হয় বললাম আর চন্দা চটে উঠল। কেন হয় আগে শোন। তুই রতু ভাল মানুষ। রাজধানীতে তোর কত কাজের সুযোগ।'

'কীভাবে?' চন্দা জানতে চায়। জোলন বলে, 'ওখানকার ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। ওখানে অন্ধ কানা ল্যাংড়া নুলো—এদের আগে কাজ দেয়। তার পর মেয়েদের।'

'মেয়েদের জন্যও ওখানে কাজ আছে?'

'থাকবে না? এখন কি আর সেই যুগ আছে যে মেয়েরা শুধু ঘর মুছবে, খানা বানাবে, বাচ্চা পয়দা করবে আর ছাগল চরাবে?'

'লাজু কাজ করে?'

'করে বই কী। আরে দুর্বল মানুষের পাশে আগে দাঁড়াতে হয়, সেই শিক্ষা তো ওখানেই পেয়েছি। গ্রামে লোকে অক্ষম হলে তার মজাক ওড়ায়, শহরে তার জন্য চোখের জল ফেলে।'

'মজাক তো তুই কিছু কম ওড়াচ্ছিলি না সকালে রতুকে নিয়ে।' চন্দা বলে। জোলন বলে, 'সত্যি চন্দা, বলিহারি তোর প্রেম। সেই সকাল থেকে এক জিনিস নিয়ে পড়ে আছিস। আচ্ছা, রতু তো আমার ইয়ার, না কী! ইয়ারের সঙ্গে ইয়ারকি করব না? আচ্ছা বাবা মাফি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছি। হল?'

'আরে ছি ছি! চন্দার কথা রাখ। মাফি চেয়ে দোস্তিকে ছোট করিস না জোলন। তুই বরং বল, আমার মতো লোক সত্যি রাজধানীতে গিয়ে ভাল রোজগার করতে পারবে?'

'আলবাত।' জোলন উত্তর দেয়। চন্দা বলে, 'তা অতই যদি সহজ, এই ফক্কাবাদ গ্রাম ছাড়া আশেপাশে আরও তো গ্রাম আছে, সব গ্রামের সব লোক উজাড় করে রাজধানীতে চলে যাচ্ছে কেন?'

'ভয়ে। স্রেফ ভয়ে। নতুন জায়গা, নতুন লোক, নতুন কাজ। এ সব ভয় পায়। তা ছাড়া সবার কি জোলন বন্ধু আছে যে জান লড়িয়ে বন্ধুর উপকার করতে লাগবে?'

তাও বটে। রতু ও চন্দা ভাবল। মন্তা ও লাজুকে আমির বানানোর মুলে তো জোলনই। ভাবা যায়, তারা ঘোড়া কিনছে! ক'জনের ভাগ্যে এমন বন্ধু জোটে? দু'জনকে নীরব দেখে জোলন বলল, 'তাই বলছিলাম, আমি যখন এসে পড়েছি, তোরা আমার সঙ্গে চল। ভাগ্য ফিরে যাবে। তা ছাড়া রাজধানীতে এখন দারুণ সব ব্যাপার ঘটতে চলেছে। এখন কাজ পাওয়া খুব সহজ।'

'তুই আছিস ক'দিন?'

'দু-চার দিন থাকতাম। কিন্তু তোদের জন্য কালই রওনা দিতে পারি। কাল তো বাজার বসবে। ওখান থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে নিলে। আর চিন্তা নেই। চাই কী একটা ঘোড়া আমি কিনেও নিতে পারি।'

চন্দা বলে, 'বলিস কী, এই ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়ে কালই চলে যাব? গ্রামে কাউকে বলব না? আলাপ-আলাচনা করব না?'

'কর। আমি তো বারণ করিনি। তবে কাল বাজারের দিনে যে সুবিধা, তা পেতে আরও এক মাস। তখন আবার আমি থাকব না। ভেবে দ্যাখ।'

'ওখানে গিয়ে থাকব কোথায়?'

'কোথায় আবার? মানুষ যেখানে থাকে। লক্ষ লক্ষ ঘর। কোনও একটায় ঢুকে পড়লেই হল। রোজগার করবি, ভাড়া দিবি, থাকবি। কে কী বলবে?'

রতু বলে, 'দু'বেলাই খেতে পাব রে জোলন।'

'দু'বেলা কী রে! চারবেলা পাবি। খেতে পাবি। শুতে পাবি। মজা পাবি। কত আনন্দ উৎসব হই হট্টগোল! চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। অসুখ করলেই হাসপাতাল পাবি।'

'হাসপাতালে রতুর পায়ের চিকিৎসা করানো যায় না?' চন্দা সাগ্রহে বলে। জোলন বলে, 'যায় না আবার? খুব যায়। আরে ওখানে কুকুর-বেড়ালের পর্যন্ত চিকিচ্ছে হয় তো মানুষ। হাসপাতালে এত খাবার যে বেড়ালগুলো খেয়েদেয়ে নড়তে পারে না। ইঁদুরগুলো ইঁয়া মোটা। ইঁদুর-বেড়ালে ঝগড়া পর্যন্ত ভুলে গেছে। বেহেস্ত রতু বেহেস্ত। যদি কাল যাস, জেনে রাখ, স্বর্গের পথে যাচ্ছিস। আরে ভাল না লাগলে চলে আসবি আবার। যেমন ছিলি তেমন থাকবি। তোদের জমিবাড়ি তো কেড়ে নিতে যাচ্ছে না কেউ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়াই যাক। ভাবল রতু আর চন্দা। ওদের চোখে সমৃদ্ধ সুচিক্কণ জীবনের ঘোর লাগল। আধফলন্ত ক্ষেত্র, আধভাঙা কুটির, আধখাওয়া রুটির টুকরো ফেলে রেখে সেই কাকভোরে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল জোলনের সঙ্গে। বাজারের দিন বলে বেশীর ভাগ লোক পথে নেমে পড়েছে। জোলন ল্যাংড়া রতু আর সুন্দরী চন্দাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিজে হেঁটে চলেছে। পায়ের জন্য রতু বাজারে কমই আসে। লোকে ভাবল, বন্ধুর ঘোড়ার সুবিধা পেয়েছে বলে ল্যাংড়া রতু বাজারে চলেছে। কিন্তু তারা যখন শুনল, রতু আর চন্দাকে জোলন রাজধানীতে নিয়ে যাচ্ছে সুখের জীবন দিতে, তখন কেউ কেউ ভারী ঈর্ষা বোধ করল। কেউ কেউ ভয় পেল। কেউ কেউ সন্দেহাকুল হয়ে পড়ল। আর বাজারে পৌঁছে জোলন একটি ঘোড়া কিনে তাতে চেপে বসল।

তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর শ্রান্ত ক্লান্ত অভিভূত রতু আর চন্দাকে নিয়ে জোলন উপস্থিত হল রাজধানীর প্রান্তে এক সরাইখানায়। উৎসব শুরু হতে চলেছে। চার দিক আলোয় আলো। রাতের বেলা এত আলোও জ্বলে? রতু ও চন্দা হাঁ করে দেখছে। জোলন তাড়া দিল, 'চল্ চল্। ও-সব দেখে দেখে পরে চোখ পচে যাবে। এখন স্নান-টান সেরে নে। ভাল পোশাকটোশাক পর।' চন্দা বলল, 'আমি ক্লান্ত। একটু ঘুমোই ভাল করে।'

'ঘুমোবি। আগে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর।'

চন্দা ও রতুর আর সব পোশাক জরাজীর্ণ। টুকরো-টাকরা। একমাত্র বিয়ের পোশাকটাই ছিল পরিষ্কার ও ঝলমলে। স্নান করে ওরা সেই পোশাকই পরল। উৎসবমুখর রাতে পোশাকগুলি ভারী মানানসই। সরাইয়ের বিরাট ভোজনালয়ে তারা আহারে বসল। শিকে গাঁথা কত রকম মাংস! কত রকম চাপাটি! কী সুগন্ধ! কত লোক! হাঁক-ডাক। রতু ও চন্দার বিস্ময় ফুরোয় না। তারা জোলনকে খুবই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ দিতে লাগল। জোলন কান ছোঁয়া হাসি হাসছে, দলবল নিয়ে এক সেনাকর্তা ঢুকল। জোলন ছুটে গিয়ে তার কাছে আভূমি প্রণত অভিবাদন জানাল। সেনাকর্তা বলল, "আরে জোলন যে! ভাল খবর আছে নাকি?'

কথা বলতে বলতে জোলন রতু ও চন্দার কাছে নিয়ে এল কর্তাকে। বলল, 'একটা নতুন ঘোড়ি কিনেছি। ভাল জাত। নেবেন নাকি?

কর্তা রতু ও চন্দাকে ভাল করে দেখল। জোলন বলল, 'এই, কর্তাকে সালাম কর?'

রতু ও চন্দা উঠে অভিবাদন করল ঠিক তেমনি করে যেমন করেছিল জোলন। আর জোলন তো সত্যি একটি ঘোড়া কিনেছে। তা হলে ঘোড়ি বলছে কেন? চন্দা বলে বসল, 'জোলন, কিনলি ঘোড়া, সাহেবকে ঘোড়ি বলে চালাতে চাইছিস কেন?'

চন্দার কথা শুনে কর্তা হা হা করে হেসে উঠল। কেয়াবাত কেয়াবাত করল কিছুক্ষণ। অতঃপর বলল, 'তা হলে জোলন, আমার ঘরে আয়। দাম-টাম ঠিক হয়ে যাক।' কর্তা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে খেতে বসল। আর খাওয়া সেরে রতু আর চন্দা এমন ঘুমোল যে তাদের আর জ্ঞান রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল রতুর। দেখে পাশে চন্দা নেই। ভাবল, বোধ হয় বাইরে ঘুরছে ফিরছে। কিন্তু কোথায় সে? চন্দা নেই, জোলন নেই, এমনকী সাগপাগসহ সেনাকর্তাও উধাও। বরবেশে ল্যাংড়া রতু হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে লোক জুটে গেল এবং বউ হারিয়েছে শুনে তারা সহানুভূতিও দেখাল বটে। তবে কিনা উৎসব শুরু হয়ে গেছে, কান্নাকাটি শোনার সময় নেই লোকের। কেউ বলল শহরে যাও, খুঁজে পাবে। কেউ বলল, দু-চার দিন থাকো, ফিরে আসবে। কিন্তু টাকাকড়ি নেই, আঙুলে একটা দামি আংটিও নেই যে বেচে নেবে, সরাইমালিক রতুকে গলাধাক্কা দিল। দিন নেই রাত নেই ল্যাংড়া রতু পথ চলে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই চন্দাকে খুঁজে খুঁজে পাগলপ্রায় চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো। পোশাক ধুলিমলিন। গালে ক'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে অসহায় যন্ত্রণার ছাপ, রতু এসে পৌঁছল রাজধানীর প্রধান অঞ্চলে। উৎসবের উল্লাসে, হাজার হাজার লোকের মাঝে কোথাকার কোন ককাবাদের রতু আর রতু রইল না। একটা লোক মাত্র হয়ে গেল। জনগণ পথে নেমে নাচাগানা করছে। হাজার হাজার জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে। বাচ্চারা হাতে কাগজের পতাকা নিয়ে ছুটছে। এর মধ্যে লোকটাকে পেড়ে ফেলল শোকের মধ্যে সেরা শোক ক্ষুধা। এক রোগা। তায় ক'দিন খায়নি। গ্রামে যাহোক কিছু খেত। লজ্জায় হাত পাতবেই বা কী করে। কিন্তু আর যে পারে না। ভুল করে খাবার চেয়ে বসল এক সেনাকর্তার কাছে। সেনারা টহল দিচ্ছিল রাস্তায়, যাতে এই আনন্দের দিনে প্রতিবেশী কিন্তু শত্রু দেশ কোনও চক্রান্ত করতে না পারে। লোকটি শুকনো মুখে খাবার চাওয়ায় সেনাকর্তা বলল—এত খাই খাই কীসের? নাচ।

—আমি যে খোঁড়া লোক সাহেব।

—তবু নাচবি। যেমন করে পারিস।

—নাচব?

—হ্যাঁ নাচবি। আজ আনন্দের দিন। উৎসবের প্রধান দিন আজ। দেখতে পাচ্ছিস, সবাই কেমন নাচতে নাচতে বেহুঁশ? আজ যে যত খুশি সুরা পান করবে, খরচ দেবে সরকার।

—সুরা না সাহেব। একটু খাবার চাই। খাব, খেয়ে বউকে খুঁজব। আমার বউ হারিয়ে গেছে।

লোকটা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। সেনাকর্তা ঠাস করে চড় কষিয়ে বলল—আনন্দের দিনে কাঁদিস? ল্যাংড়া কোথাকার। দ্যাখ বউ মজা লুটতে কার সঙ্গে ভেগেছে।

—না না সাহেব। তা হতে পারে না।

—চোপ্। আনন্দ কর।

—কীসের আনন্দ সাহেব?

—দেশ নিউক্লীয় বোমা ফাটিয়েছে, জানিস না উজবুক? হা হা হা। আমরা এখন শক্তিমান।

—সাহেব ক'দিন ভুখা আছি। একটা দানা পড়েনি পেটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তো কি হয়েছে? ভুখপেট থেকে রোজা রাখতে পারো, পূজা করতে পারো, ভুখ হরতাল করতে পারো, আর আনন্দে নাচতে পারো না স্রেফ ক'দিন খাওনি বলে? কেন? তোর আনন্দ হচ্ছে না?

—না সাহেব!

—হচ্ছে না?

—না সাহেব!

—দেশদ্রোহী!

কি চচনী চ্যাচ দীতি

বান চক্কাণি

এক ব্যক্তি সরল লোকটার ভুখপেটে। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল। বমি করার উপক্রম হল। কিন্তু বেরোল না। কর্তা সুতাতালি দিল। দু'জন সৈনিক ছুটে এল। কর্তা বলল, 'নিউরীয় বোমার নামে শপথ। এ দেশদ্রোহী। বিদেশি গুপ্তচরও হতে পারে। একে নিয়ে যাও। বন্দি করো।'

বলা মাত্র সৈনিকরা লোকটাকে বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। বাঁধবার কাটবার ছিন্নভিন্ন করবার অমোঘ দাই মজুত সঙ্গে। এ বার তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল কোথায় কে জানে। সন্ত্রাসবাদী দুর্বল লোকটার মাথার ভেতর নানা রঙের ভোজবাজি চলছিল। দলবদ্ধ উন্মাদিত চিৎকারে সে আকাশের দিকে তাকাল। সবিস্ময়ে দেখল তার মাথার ভোজবাজি এখন আকাশভরা আলোর খেলা। সৈনিকদ্বয় সেদিকে তাকিয়ে স্যালুট করল। এক জন হাতঘড়ি দেখে বলল, 'এই সেই ক্ষণ।'

অপরজন বলল, 'মহান বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হলেন...'

'তাঁরা আজ সামরিক পোশাকে সজ্জিত...'

'আজ বড় আনন্দের দিন। দেশ সারাবক হল।'

হঠাৎ একখানা জাতীয় পতাকা উড়ে এসে পড়ল লোকটার মুখ থুবড়ে পড়ল তার উপর। তার ওপর।

এক জন সৈনিক বলল, 'দেখ, এই মহাক্ষণে লোকটা জাতীয় পতাকা চুম্বন করছে।'

অপরজন বলল, 'তা হলে বোধ হয় দেশদ্রোহী নয়।'

জাতীয় পতাকা ভিজে উঠল।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ নভেম্বর ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ঘরে ফিরব না

দীপঙ্কর দাস

দ্বিজেনবাবু কোথায় বসেন? অত্যন্ত বিনীত স্বরে প্রশ্নটা উচ্চারণ করল প্রবীর। উচ্চারণ করার পরে টের পেল তার উচ্চারিত প্রশ্নের শব্দগুলি যে ভদ্রলোকের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে, তার ওপর কোনওরকম প্রভাব সৃষ্টি, করল না। ফলে বিপন্ন দৃষ্টি মেলে প্রবীর দাঁড়িয়ে রইল ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের বিপরীত দিকে। যদি তার উপস্থিতি নজর পড়ে!

মস্ত বড় টানা হলঘর। হলঘর জুড়ে সারি বাঁধা টেবিল। টেবিলের সঙ্গে চেয়ার। কড়ি-বরগার ছাদের বিম থেকে ঝুলছে অসংখ্য সিলিং ফ্যান। এতগুলি ফ্যান একসঙ্গে পূর্ণগতি নিয়ে ছোটার কারণে ঘরের ভেতর ঝড়ের আবহ সৃষ্টি করেছিল। অন্তত প্রবীরের তো সেই রকমই মনে হচ্ছিল।

প্রতিটি টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে ফাইল। এক নজরেই বোঝা যায় ওই ফাইলগুলির টেবিলে অবস্থানের সময় সীমা পূর্ব একটা হ্রস্ব নয়। ফলে ফাইলের স্তূপের ওপর স্বাভাবিক কারণেই পাতলা ধুলোর সর পড়েছে। খালি চোখেও দেখা যায় ধুলোর সর।

প্রতিটি টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসে আছে এক একজন কর্মী। তারা, যেহেতু টেবিলে স্তূপাকার হয়ে থাকা ফাইলগুলি কথা বলতে পারে না, অথচ মানুষ একেবারে বোবা হয়েও থাকতে পারে না, চারিদিকে কত কথা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে কত ঘটনা ঘটে চলেছে অবিরাম— ঘরের ভেতর, ঘর ছাড়িয়ে পাড়ার ভেতর, পাড়া ছাড়িয়ে শহরের ভেতর, শহর ছাড়িয়ে দেশ, দেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব — সর্বত্র কথার যে মহামারি লেগেছে — সেই প্রেক্ষিতে বসে কে আর নীরব থাকতে পারে। ফলে প্রতিটি কর্মীই ধুলোজমা বোবা ফাইলে হাত ছোঁয়ানোর পরিবর্তে হাত গুটিয়ে নিজের চেয়ারটিকে কিঞ্চিৎ টেনে পাশের কর্মীবন্ধুটির নিকটতর করে পরস্পরের সঙ্গে কথার বিনিময় প্রক্রিয়ায় মনোযোগী হয়ে আছে। আমেরিকার সঙ্গে পরমাণুচুক্তির বিপদ, ওয়ান-টু-থ্রি চুক্তির ভয়াবহতা, পাকিস্তানে মুশারফের জরুরি অবস্থা ঘোষণা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাঁচা সবজির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পিছনে কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব কতখানি — এই নিয়ে কথার বিনিময় যদি চলতে না পারে, তাহলে বাক্‌স্বাধীনতা বাঁচবে কেমন করে।

প্রবীর যে ভদ্রলোকটিকে দ্বিজেনবাবুর হদিশ জিজ্ঞেস করল, সেই ভদ্রলোকটিও তার পাশের কর্মীটির সঙ্গে কলকাতা শহরে ঠিক কোথায় অতিশয় উৎকৃষ্ট চিলি চিকেন পাওয়াযায়, সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাতের কাজে এতটাই মগ্ন ছিল যে প্রবীরের উপস্থিতিটুকুও

AMARBOI.COM

প্রথমবার টের পেল না।

আচ্ছা, বলতে পারেন, দ্বিজেনবাবু কোথায় বসেন? কোনওরকমে সাহস সঞ্চয় করে প্রবীর পুনরায় প্রশ্নটাকে মরিয়া হয়েই উচ্চারণ করল।

কোন দ্বিজেনবাবু? কলকাতা শহরের কোনও এক দুর্গম গলির ভেতর কোন দোকানে সর্বোৎকৃষ্ট চিলি চিকেন আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জনকারী ভদ্রলোকটি এবার সত্যি প্রবীরকে চোখ তুলে আবিষ্কার করল।

দ্বিজেনবাবু, মান গ্রুপ সি'র ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বিজেনবাবু ...। শুকনো জিভ দিয়ে আরও শুকনো দুই ঠোঁট চেটে নিয়ে কোনওরকমে কথা শেষ করল প্রবীর।

আমিই ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বিজেন ঘোষ। দ্বিজেন নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল,—বলুন, আপনার কী প্রয়োজন।

আমার সার্ভিসবুক সহ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের ফাইলটা আপনার কাছে এসেছে। সে ব্যাপারে ...। এবারও প্রবীরের কথা সম্পূর্ণ হল না। চাপা আশঙ্কায় প্রবীরের কথা মাঝপথে থেমে গেল।

আপনি কে? কোথা থেকেই বা এসেছেন সেটুকু বলবেন তো! দ্বিজেনবাবু একরাশ বিরক্তি ছুঁড়ে দিয়ে পাশের সহকর্মীটির উদ্দেশ্যে বলল,— কিছু পাবলিকের আজকাল এমন বাড় বেড়েছে যে কথাবার্তা শুনলে মনে হয় আমরা ওদের চাকর।

এর জন্যই তো আমার সঙ্গে ইউনিট সেক্রেটারির ঝগড়া লেগে যায়। দ্বিজেনবাবুর পাশের সহকর্মীটি জবাব দিল। — পাবলিককে এতটা লিবার্টি দিলে ওর মাথায় উঠবেই। এই কারণেই তো ফুয়েরার ...।

জার্মানির নিন্দিত একনায়ক হিটলারের গুণগান শোনার আশঙ্কাতেই হোক, আর নিজের বিপন্নতা কাটানোর উদ্দেশ্যেই হোক, প্রবীর কালবিলম্ব না করেই নিজের পরিচয় দিল। — আমার নাম প্রবীর মিত্র। আমি জনস্বাস্থ্য কারিগরি ডিপার্টমেন্টের একজন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার।

ফাইলটা যে আমার কাছেই আছে, আপনি জানলেন কেমন করে? দ্বিজেনবাবু প্রবীরের পরিচয় পেয়েও যে সামান্য প্রভাবিত হল না, তা দ্বিজেনবাবুর অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা গেল।

তিনকড়িবাবু বললেন উনি চারমাস আগে — তেইশ, সাত, দু'হাজার সাত-এ ফাইলটা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাই ...। প্রবীর থেমে থেমে জানাল।

কোন তিনকড়িবাবু?

ওই যে, তিনকড়ি হালদার, আপনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। উনি নিজেই রেজিস্টার খুলে দেখালেন চারমাস আগে উনি ফাইলটা রেডি করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এই দেখুন, ফাইল নম্বর আর তারিখ সব লেখা আছে। বলতে বলতে ফাইল নম্বর লেখা কাগজের টুকরোটা প্রবীর দ্বিজেনবাবুর দিকে এগিয়ে ধরামাত্র দ্বিজেনবাবু তার ডান হাত দিয়ে প্রবীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ানো হাত সরিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল, — তখন থেকে বার বার চারমাস, চারমাস করছেন যে বড়ু। আপনি কি আমাকে থ্রেট করতে এসেছেন?

দ্বিজেনবাবুর গর্জন শুনে কাছে পিঠের আরও পাঁচ-দশটা টেবিল ঘিরে বসে পরস্পরের সঙ্গে গল্পে মজে থাকা কর্মীবন্ধুরা যার যার চেয়ার ছেড়ে প্রবীরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রবীর শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে একবার দ্বিজেনবাবুর মুখের দিকে একবার তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা জটলার কর্মীদের মুখের দিকে তাকাল। দেখল সকলের মুখ পাথুরে হয়ে উঠেছে। দুই চোখে ফুটে উঠেছে প্রতিহিংসার আস্ফালন। একজন কর্মী তার পাশের কর্মীবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে ফিসফিস করে বলল, বলেছিলাম না, মার্কিন মদতপুষ্ট মাওবাদীরা এখন সরকারি কর্মীদেরও টার্গেট করেছে।

দ্বিজেনবাবুর পাশের সিটে বসা কর্মীটি ডানহাতের স্টিলের বালা পরিহিত কবজিটাকে প্রবীরের মুখের সামনে নাড়িয়ে নিয়ে বলল,—কে আপনি? অ্যাঁ, কাজের সময় আপনি ডিপার্টমেন্টে ঢুকে আমাদের একজন সিনিয়র সহকর্মীকে থ্রেট করতে এসেছেন? জানেন আপনি, স্বয়ং হেনরি কিসিঙ্গার পর্যন্ত স্টেটের ওয়ার্ক কালচার দেখে প্রশংসা করে গেছেন। সেখানে আপনি কোন হরিদাস যে বলতে এসেছেন আপনার ফাইল দ্বিজেনদার কাছে চারমাস হল পড়ে আছে।

আমি মোটেই সে কথা বলিনি। মানে বলতে চাইনি। আপনাদের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে যে কথা বলেছেন, আমি কেবল ... । প্রবীরের আকুতি শেষ হল না। তার আগেই জটলার মধ্যে থেকে অপেক্ষাকৃত এক তরুণ কর্মী পিছন থেকে প্রবীরের জামার কলার টেনে ধরে বলল,—শালা কায়দা করে আমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে এসেছে। এখন তিনকড়িদার ওপর দোষ চাপাতে চাইছে। শালাকে ধরে ফিরিয়ে দেব এবার।

বেরিয়ে যান এখুনি। বেরিয়ে যান। ডান কবজিতে স্টিলের বালা পরিহিত ভদ্রলোকটি বীতিমতো শাসিয়ে উঠল। — আর একটি কথা বললেই কিন্তু আমরা দমদম দাওয়াই ...।

এই অলক! এবার স্বয়ং দ্বিজেনবাবু বলে উঠল। — আমাদের নেত্রীর কথা এভাবে যেখানে সেখানে বোলোনা। নেত্রীর সম্মান নষ্ট হবে। তার চেয়ে অশোক যা বলেছে, সেটাই কর। ওকে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দাও। ও তো এগারো মাস ঘর ছাড়া।

যা শালা, ঘরে যা। দীপাবলির মোমবাতি জ্বালগে। দেখি শালা তোর সার্ভিস বুক কতদিনে তোর ডিপার্টমেন্টে যায়।

বছর আড়াই আগে হৃদযন্ত্রের ধমনীতে অতিমাত্রায় অবরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রবীরকে বহু ব্যয়সাপেক্ষ হৃদযন্ত্রের বাইপাস সার্জারি করাতে হয়েছে। তারপর থেকে কার্ডিওলজিস্টের পরামর্শ মতো প্রবীরকে যেমন নিয়মিত একাধিক ওষুধ খেতে হয়, তেমনি এড়িয়ে চলতে হয় যাবতীয় উত্তেজনা। ন্যায্য ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা প্রবীর অর্জন করেছিল সাত বছর আগে। তখনই প্রবীর তার ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছে লিখিত দরখাস্ত দিয়েছিল এই সুযোগ পাওয়ার জন্য। কিন্তু তারপর দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। মাস গেছে। বছরও। যখনই প্রবীর এই বিষয়ে তার ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়েছে, ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে তারফাইল এবং সার্ভিসবুক অর্থদপ্তরে গেছে। এদিকে প্রবীরের বয়সও বসে থাকেনি। দেখতে দেখতে সাত সাতটা বছর যেমন কেটে গেছে, তেমনি প্রবীরের চাকরি জীবনের আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে। যেহেতু আর মাত্র চারমাস পরেই প্রবীরের কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। চাকরি থেকে অবসর নেবে, তাই অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে প্রবীর আজ এসেছিল ফাইলটির হদিশ করতে। উদ্দেশ্য ছিল তার বিপন্ন অবস্থা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মনে সহানুভূতি জাগিয়ে সার্ভিসবুক সহ ফাইলটিকে অর্থদপ্তর থেকে তার দপ্তরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। সার্ভিসবুকের অভাবে প্রবীরের নিজস্ব দপ্তর প্রবীরের অবসরকালীন পেনশন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে পারছে না।

প্রবীর শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য কাতর গলায় বলতে চাইল, — সে মাওবাদী তো দূরের কথা, জীবনে কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শেই আসেনি। সে কেবল এসেছে তার ফাইল এবং সার্ভিসবুকের খোঁজে। কিন্তু বলতে চাইলেও বলা হল না। কারণ ততক্ষণে সারা হলঘরেই সমবেত ধ্বনি উঠে গেছে — ঘরছাড়ারা ঘরে ফিরেছে। এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার সময়। মাওবাদীরা দূর হঠো, হঠো। সেই সংঘবদ্ধ গর্জনের নিচে প্রবীরের কাতর নিবেদন এবং চোখের জল চাপা পড়ে গেল।

যেখানে সাত বছর সময়সীমার নাগাল ধরতে পারেনি প্রবীর, সেখানে চারমাসের সীমাটা তো অতি সামান্য। প্রবীরের কর্মজীবনের শেষ মাসটাও একদিন ক্যালেন্ডারের পাতায় আত্মপ্রকাশ করল। সকালে ক্যালেন্ডারে সদ্য ফুরোনো মাসের পাতা উল্টিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতে দিতে অণিমা বিপন্ন দৃষ্টি মেলে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া মাসটির দিকে তাকিয়ে কান্না জমা গলায় প্রবীরকে বলল — আর মাত্র একমাস।

— হ্যাঁ, মাত্র তিরিশটা দিন। প্রবীর ঠোঁট নাড়ল।

— তুমি আর একবার দ্বিজেনবাবুর কাছে যাও না। বল না গিয়ে তোমার কাজের জন্য তুমি অনুতপ্ত। নানা দুশ্চিন্তায় তোমার মাথা তখন ঠিক ছিল না। তাই কী বলতে, কী বলে ফেলেছ। এবারের মতো ক্ষমা করে দেয় যেন।

— তার মানে তুমি বলতে চাও আমি পাগল। আমি কী বলি আর না বলি, তার ঠিক নেই। উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে প্রবীরের গোটা শরীর।

— এছাড়া উপায় কী। অণিমা ধরা গলায় বলল, — তোমার পেনশন চালু না হলে সংসারটা চলবে কেমন করে? অনির্বাণ আর সুকন্যায় লেখাপড়াই বা চালু থাকবে কেমন করে? বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল অণিমা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, — ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কিছু একটা কর। হাতে মাত্র একমাস সময় আছে। এর মধ্যে কিছু একটা না করলে সংসারটা যে ভেসে যাবে।

অণিমার আর্তির যথার্থতা প্রবীরের অজানা নেই। নিজে দীর্ঘদিন উচ্চপদের ইঞ্জিনিয়ার হলেও নানা পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন করে, এবং সততাকে একটু বাড়াবাড়ি রকমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকড়ে ধরে থাকার ফলস্বরূপ প্রবীরের সঞ্চয়ের ঘরে সামান্য কিছুও জমা পড়েনি। তার ওপর নিজেদের জন্য একটি তিন-কামরার বাসগৃহ নির্মাণ করে এবং বাইপাস সার্জারি করিয়ে প্রবীর প্রভিডেন্ট ফা'কেও শেষ করে বসে আছে। অথচ প্রবীরের ছেলেমেয়ে — উভয়েরই এখনও কলেজ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। অনির্বাণ ভিন্ন রাজ্যে এক বেসরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তৃতীয় বছর। আর সুকন্যার ইংরেজি অনার্স। আগামীবছর পার্টওয়ান দেবে। আর একমাস পরে নিত্যন্ত আর্থিক কারণেই ওদের উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখতে হবে।

এখন প্রবীরের সকাল হয় নলবনে ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া সদ্য উদিত সূর্যের লাল টকটকে গোলাকার অবয়ব দেখে। ই. এম. বাইপাসের এদিকটা এখনও যথেষ্ট খোলামেলা। পুবের দিকে ছড়ানো জলাজমি। নলবন। বাতাস দিলে নলবনে ঢেউ ওঠে। মনে হয় সবুজ সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রবীরের সারা দুপুর কেটে যায়। মানসিক হাসপাতাল বাড়ির ছায়াটা কাছের মাদার গাছের গোড়া ছুঁয়ে ফেললে প্রবীর টের পায় এখন অণিমা আসবে।

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার দিনেও যখন প্রবীরের সার্ভিসবুক সহ বহু আকাঙ্খিত ফাইলটি তার দপ্তরে ফিরে আসেনি, তখন নাকি প্রবীর তার রিলিভারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল — না, আমি ঘরে ফিরব না। আমি আর ঘরে ফিরে যেতে চাই না। ঘর এখন শ্মশান।

অফিস থেকেই সহকর্মীরা প্রবীরকে ই. এম. বাইপাসের ধারে এই মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে অণিমাকে খবর দিয়েছিল।

না, অনির্বাণ এবং সুকন্যার লেখাপড়া মাঝপথে থেমে যায়নি। কারণ অণিমা প্রবীরের এক বন্ধুর পরামর্শে নিজেই অর্থদপ্তরের দ্বিজেনবাবুর কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে এসেছে। লিখেছে — তার স্বামী আগে পাগল ছিলেন। এখন সুস্থ। আর কোনওদিন অবাধ্য হবেন না।

অতি দ্রুত প্রবীরের সার্ভিসবুক ফিরে এসেছে যথাস্থানে। পেনশনও চালু হয়েছে। অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু অনিশ্চয়তা নেই।

তবু অণিমা রোজ সন্ধ্যায় মানসিক হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে ঠাকুর আসনে সন্ধ্যা দিতে বসে কিছুক্ষণ কেঁদে নেয়। কে যে ওর কান্না শোনে, কে জানে!

দৈনিক স্টেটসম্যান, ২ ডিসেম্বর ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘদীপের গার্ল ফ্রেন্ডরা

নবনীতা দেবসেন

আজকালকার দিদিমা ঠাকুমারা তো আগেকার মতো সহজে পরের প্রজন্মকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিয়ে পুজোর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন না? তাঁরাও সেজেগুজে সন্ধ্যেবেলায় পার্টি করতে বেরোন, রবীন্দ্রসদনে, নন্দনে, আইসিসিআর-এর মঞ্চে তাদের নৃত্যগীত প্রদর্শন করতেও দেখা যায়। শুধু দর্শকদের আসনেই নয়। তা'বলে তাঁরা তো বয়েস লুকোচ্ছেন না? একবার নাতি নাতনির প্রসঙ্গ তুলেই দ্যাখো না? যে যার অতুলনীয় নাতি নাতনির গল্পের ঝুলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তক্ষুণি। আমি তো হিয়ামনের কথা মাঝে মাঝেই যত্র তত্র বলে ফেলি। আমি একা নই, অনেকেই বলেন। তবে পুরুষমানুষেরা চেষ্টা করেন এসব তুচ্ছ সাংসারিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে। (নাতি? হ্যাঁ, আছে, আছে। আহা, ভালো থাক। তাকে নিয়ে অত গপ্পো জোড়বার কী আছে? সব বাচ্চাই ছোটোবেলায় সব মা বাপের চোখেই ঐ রকম আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।)

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় দিব্বি মনের সুখে আড্ডা দিচ্ছিলুম। মনের সুখের কারণ এই, যে আজকাল আমি লক্ষ্য করেছি আমরা যারা দিদিমা ঠাকুমা হয়েছি তাদের আড্ডার মধ্যে নাতি নাতনিদের গুণপণা সবার অজান্তে ঢুকে পড়বেই পড়বে, আর যাদের সে সৌভাগ্য হয়নি অর্থাৎ যারা নাতিসুখ পায়নি, বেচারা তাদের নিদারুন ভাবে বোর করে দেবেই দেবে। আমার দিব্বি মনে আছে আমিও একদা ওই শেষের দলেই ছিলুম। সেই সন্ধ্যেটির বৈশিষ্ট্য এই, যে সেখানে বিমিশ্র উপস্থিতি নয়, অবিমিশ্র দাদু ঠাকুমাদেরই জমজমাট আড্ডা বসেছিল।

সেদিন আমরা টুসির কাছে তার নাতির গপ্পো শুনছিলুম, টুসিরা সদ্য ফিরেছে কিনা মেয়ের বাড়ি থেকে? আমাদের অনেক বন্ধুর বার্ষিক সফরসূচিতে একবার করে সাত সাগর পেরোনো থাকে আজকাল। বিদেশদর্শনের জন্যে নয়, নাতি নাতনির টানে বিদেশযাত্রা। সুনীল-স্বাতী, টুসি-আশিস, সীমা-পি-কে, নন্দিতা-ডঃ বাগচী, উমা, টুনু, কত বলবো? এদের কথা তো না ভেবেই মনে এলো, খুঁজলে আরো অনেক নাম পাবো। আমি এখন বসেছি মেঘদীপের গল্প বলতে।

টুসির নাতি মেঘু থাকে ইংলন্ডে, তার ব্যস্ত মা বাবার কাছে।

সেবারে টুসি যেতে, একটু যেন অন্যরকম লাগলো মেঘদীপকে।

তাদের অতি আদরের নাতিবাবুটি দাদু দিদুকে দেখলেই অহ্লাদেপনা শুরু করে, এইবারে সে যেন একটু গম্ভীর গম্ভীর একটু দূর দূর? বলি, ব্যাপারটা কী? শরীর টরীর ঠিক আছে তো? ইশকুলের রেজাল্ট ঠিক ঠাক? খেলাধুলোর ক্ষেত্রে হারজিৎ এর আকস্মিক কিছু নয়? একটু কেমন কেমন লাগছে যেন ছেলেটাকে? অনেকটা বেড়েছে মাথায় কিন্তু বয়েস তো সবে এগারো হোলো। ব্যাপার কী? হাবভাব তো ভালো ঠেকছে না?

মেয়ে বুলা বললে,

"হ্যাঁ, মেঘুর মনটা বড়ো খারাপ, মা।"

"কেন? কেন?"

"কেন আবার? ওর গার্ল ফ্রেন্ড হয়নি একটাও, এদিকে ওর বন্ধুদের গার্ল ফ্রেন্ড হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে ইশকুলে সবাই ক্ষ্যাপায় বোধ হয়। সবটা তো খুলে বলে না।"

"গার্ল ফ্রেন্ড হয়নি বলে ক্ষ্যাপায়? সে কি রে? আমাদের সময়ে তো গার্লফ্রেন্ড হলেই বন্ধুরা ছেলেদের ক্ষ্যাপাতো"- -

"এখানে আলাদা হিসেব মা। মুখ গুঁজে পড়লেই তো হবে না, ইসকুলেও তোমার সামাজিক সফলতা চাই, তাই গার্লফ্রেন্ড বয় ফ্রেন্ড হওয়া না-হওয়াটা ছেলে মেয়েদের প্রেস্টিজের পক্ষে জরুরী। পীয়ার প্রেশার থাকে প্রচুর।"

"কিন্তু বুলা, ওর তো মোটে এগারো- প্রি-টীন-"

"তাতে কি? ঐ বয়েসেই ওসব হওয়া কথা এদেশে।"

"এ নিয়ে মেঘুর সঙ্গে কথা বলার দরকার।"

দিদিমা চেপে ধরলেন, মেঘুকে।"

"কেন দাদাভাই তোমার মন খারাপ? গার্ল ফ্রেন্ড হয়নি বলে? সময় হলেই হবে।"

"সময় তো হয়েছে দিদা।"

"তবে কেন তোমার গার্ল ফ্রেন্ড হচ্ছে না? কারণটা কী মনে হয় তোমার? সেটা বদলে ফেললেই হোলো? তুমি এমন টল, ডার্ক হ্যান্ডসাম, এত সুন্দর চুল তোমার,. খেলাধুলোতে এই প্রাইজ পাও, পড়াশুনোতে সবার চেয়ে ভালো করো"- - "ঐ খানেই তো আমার দোষ, দিদা। আমার চশমার লেন্স খুব পুরু তো, বেজায় স্টুডিয়াস দেখায়। স্টুডিয়াস ছেলেদের মেয়েরা পছন্দ করে না। আর তা ছাড়া, আমি তো ম্যাথসে বেস্ট বয়।

খারাপ- -"

"দূর দূর, চশমার পাওয়ার খুব হাই, পুরু কাচ, সেটা আবার একটা কারণ হতে পারে? আর অংকে ক্লাসের বেস্ট বয়, সেটাও একটা কারণ হতে পারে? কক্ষণো না।" "কিন্তু আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, জুনিয়র, সে খুব চালাক, আর সব কিছু জানে, বোঝে, দিদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুনিয়র আমাকে বলেছে গার্লস হেট ম্যাথস অ্যান্ড দোজ হু আর গুড অ্যাট ইট। ও বলেছে, তুই একটু খারাপ করে দ্যাখ না অংকে? দেখবি এফেক্ট হবে। চশমার তো কিছু করা যাবে না? পরে বাবাকে বলে চোখে কনট্যাক্ট লেন্স পরে নিস।"

"অংকে খারাপ করতে বলে দিলো? আচ্ছা ছেলে তো? ওর সঙ্গে আর মিশতে হবে না।" মনে মনে টুসি এই কথাগুলো বললেও মুখে বেরিয়ে এলো স্কুলশিক্ষিকা দিদিমার আকুল জিজ্ঞাসা।

"অংকে খারাপ করো বললেই হোলো? কেমন করে খারাপ করবি?"

"নো প্রবলেম। খারাপ করা সহজ তো, দিদু। ইচ্ছে করে দুটো অংক ছেড়ে দিলেই রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে।" মেঘদীপের মুখে হাসি ফুটেছে। "লেটস সী?" দিদু স্তম্ভিত।

এই অবস্থায় দাদু দিদু চলে গেলেন ইউরোপে। ফিরে এসেই প্রশ্ন,

"হ্যাঁরে মেঘুর অংকের টেস্ট হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"অংক টংক ছাড়েনি তো?"

"হ্যাঁ, ভদ্দরলোকের এক কথা। দুটো অংক ছেড়েছে।"

"সে কি রে বুলা?" সাউথ পয়েন্টের দিদিমণিটির শ্বাস আটকে গেল।

"মেঘুদাদা ইচ্ছে করে দু দুটো জানা অংক ছেড়ে এলো?"

"এলো তো।"

"তাতে গার্লফ্রেন্ড হোলো?"

"হোলো তো।"

আরো আশ্চর্য এবারে দিদিমণি।

"সত্যি? 'অংকে খারাপ করলে প্রেমিকা হয়? আমরা তো জানি ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদেরই পছন্দ করে মেয়েরা। অন্তত আমাদের সময়ে তো তাই ছিলো।" কণ্ঠস্বর কঠোর হচ্ছে।

"আমাদের সময়েও দেশে তাই ই ছিলো, মা। ইংলন্ডে হয়তো অন্যরকম?"

"গালফ্রেন্ড কি ওরই ক্লাসে পড়ে? নাম কী তার?"

"একসঙ্গেই পড়ে, বাবা ইংরেজ, মা পাঞ্জাবী মেয়ে। ওর নাম মিনি।"

"তুই দেখেছিস?"

"বেশ দেখতে, বাচ্চা প্রীতি জিন্টার মত।"

"তো গার্লফ্রেন্ড কী বলেন দাদুভাইকে?"

"বলেছেন তো এই ৫ নভেম্বর, গায় ফক'স ডে-তে ময়দানে যেতে, সেখানে তিনি থাকবেন, দুজনে মিলে বাজি পোড়ানো দেখবেন।"

"সে তো পরশুদিন!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ মা, পরশু সন্ধ্যেবেলায় মেঘুকে নিয়ে যেতে হবে ওর প্রথম 'ডেট' এ।" বুলা মুখ টিপে হেসেই অস্থির। যেন খেলা খেলা, পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

"কার সঙ্গে যাবে?"

"আমার সঙ্গে, আবার কার সঙ্গে? বাবার কি সময় আছে নাকি? ডাক্তার মানুষ?" দিদিমা একটু হতচকিত, মা নিজেই ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে তার জীবনের প্রথম ডেট-এ? কোথায় মা বাবাকে লুকিয়ে ছেলে মেয়েরা গোপনে ডেটিং করবে, নিত্যি নতুন মিথ্যে কথা তৈরি করতে প্রাণান্ত হবে, তা নয়, এখানে দেখি উল্টো? বুলারও কি মাথা খারাপ হোলো? যাকগে যে দেশের যে নিয়ম তাতেই তো চলতে হবে? মেঘুর বান্ধবী যখন বলেছে তাকে মীট করবে ঐ ময়দানে, বাপ-মা সেখানে সময়মতো না নিয়ে গেলে ছেলেরই মান সম্মান নষ্ট।

৫ তারিখ সেজেগুজে মায়েতে ছেলেতে রওনা হোলো, মেঘদীপ খুব খুশি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নার সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে। সুন্দর পোশাকে স্মার্টলি সেজেছে মায়ের উপদেশ মত। নাচতে নাচতে বেরুলো সে। বুলার মুখে তেমন টেনশন দেখতো পেলো না টুসি। "বা-ই!" - - "সী-য়ু!!" হেসে হেসে গাড়ি স্টার্ট দিলো। এদিকে দিদিমা তো দাদুর সঙ্গে পাশাপাশি বসে নিবিষ্ট চিত্তে ভুরু কুঁচকে টিভি-তে গায় ফর্ক'স ডে উদ্‌যাপনের উৎসব দেখছেন। ভীড়ের মধ্যে মেঘু বা তার গার্ল ফ্রেন্ডের চিহ্ন যদি দেখা যায়? বাচ্ছা প্রীতি জিন্টার মতন কেউ?

AMARBOI.COM

রাত হতে বুলা ফিরলো সপুত্রক। ফিরেই যে যার নিজের ঘরে চলে গেল, দাদু দিদিমাকে কেউ দেখতে পেল বলে মনে হোলো না। দিদিমা চেঁচিয়ে ফেললেন, "কি রে? হোলো তোদের ডেট করা?"

"মা গো, একদম ঐ নিয়ে কথা নয়। পরে বলবো সব।" ফিস ফিস গলায় বুলা বললো তার মাকে।

পরে মানে মেঘু ঘুমিয়ে পড়তেই বুলা জানালো তারা গিয়ে দ্যাখে সেখানে লোকে লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় মেঘদীপ, কোথায় বা তার গার্লফ্রেন্ড! নিজের হাতটাই খুঁজে পাওয়া যায়না। মিনি কে মোটে খুঁজেই পাওয়া যায়নি, সে বেচারীও তার মায়ের হাত ধরে ভীড়ের মাঝখানে কোথায় যে দাঁড়িয়েছিলো কে জানে? ওরা বাজি পোড়ানো দেখে চলে এসেছে। মেঘুর খুব মন খারাপ, তার মায়ের মেজাজ খারাপ তার চেয়ে বেশি। রাতে শুয়ে দিদিমা দাদুকে বললেন,

"সত্যি বলতে কী আমি তো মেঘুর ডেটিং চাইনি এত অল্প বয়েসে, কিন্তু আমারও মনটা এমন খারাপ খারাপ করছে কেন?"

"তা করবে না? আহা বাচ্চাটা একটা আশা করে বেরিয়েছিলো?" দাদুর সোজা উত্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন আর এ বিষয়ে কিছু শোনা গেলনা। তার পরে ছেলে বাড়ি এসে জানান দিলে, আবার সে অংকে ১০০ তে ১০০ পাচ্ছে। আর একটাও অংক ছেড়ে আসে না। অংকের টীচার ধরে ফেলেছেন যে মেঘু ইচ্ছে করে উত্তর দেয়না। দারুন বকুনি দিয়েছেন, আর ওরকম করা চলবে না, তাতে গার্লফেন্ড হোক আর না হোক।

পরের বছরে দাদু দিদিমা গিয়ে দ্যাখেন নাতির ইশ্‌কুল বদল হয়েছে সে এখন দারুন এক নাক উঁচু ইশকুলের ছাত্র। সেখানে অনেক নিয়মকানুনে কড়াক্কড়ি। একদিন নাতি ইশকুল থেকে ফিরে ব্যাগ নামাতে নামাতেই মাকে বললে, "মা, আমাকে কাল ইশকুলের পরে ডিটেন করবে বলেছে। দেরি হবে, ভাবনা কোরো না।"

"কেন? কেন? কেন তোকে ডিটেন করবে? অমন বললেই হোলো?"

"বাঃ পানিশ করবে না? রুল ব্রেক করেছিলুম যে।" মেঘদীপ মায়ের অজ্ঞতায় আশ্চর্য।

এবারে মায়ের আরো বিস্ময়ের পালা। এবং ক্রোধের।

'কেন? কোন রুল তুই ব্রেক করেছিলি? কেনই বা?"

"আমি এস এম এস করছিলুম।"

"ক্লাসের মধ্যে?"

এবারে মেঘু চুপ।

"কী? এস এম এস করেছিলি? ক্লাসের মধ্যে?"

এবারে দিদিমণি দিদার আধ্‌খানা বুজে যাওয়া গলা শোনা গেল।

"ক্লাসের মধ্যে তোদের মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকতে দিলো কেন? বলেছিলো না বারন? লকারে রেখে যাওয়ার কথা নয়?" মায়ের কিন্তু তীক্ষ্ন কণ্ঠ।

"বারণই তো? আমি তো ভুলে ভুলে নিয়ে ফেলেছিলুম ভিতরে।"

"ভুলে ভুলে? আর এস এম এস টাও কি ভুলে ভুলে করে ফেলেছিলি? দুষ্টুমি করবে শাস্তি তো পাবেই।"

"আশ্চর্য। আমি কি কমপ্লেন করেছি? আমি তো বলেইছি, রুল ব্রেক করেছি, পানিশমেন্ট হবে, তাই বলিনি? আর কোনোদিনও মোবাইল নিয়ে যাবো না ক্লাসের মধ্যে। এস এম এস করার চান্সও থাকবে না তা হলে। ফোনটা থাকলেই লোভ হয়। শুধু একঘন্টা কাল ডিটেনড হবো স্কুলের পরে। তোমরা ভাবনা কোরো না, আই'ল বি ফাইন।"

কতো বড়ো হয়ে গিয়েছে এই কিছুদিনের মধ্যেই, মেঘুর এখন বারো পূর্ণ।

হপ্তা দুয়েক পরেই আবার একদিন ইশকুল থেকে এসে মেঘু ঘোষণা করলে "আবার আমি কাল ইশকুলে ডিট্‌েনড হচ্ছি, মা। আমিও, জেনিও।"

"এবারে তোমার অপরাধ কী?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা দুজনের ক্লাসের মধ্যে কাগজের টুকরোয় কমেন্টস এক্সচেনজ করছিলুম তো, তাই। টীচার ধরে ফেলেছেন।"

"ফোন নেই, তাও তোমাদের রক্ষে নেই? এবারে টুকরো কাগজ?"

"আমি কী করবো, আমি তো আগে লিখিনি, জেনি লিখেছিলো।"

"কী লিখেছিলো মেয়েটা তোকে?"

"আমাকে আই লাভ ইউ নোটস পাঠাচ্ছিলো। বারন করলে শুনছিলো না। আমি তার উত্তর দেবো না?"

টীচারেরা সেসব দেখলেন?"

"হ্যাঁ, দেখলেন তো।"

"বে- -শ।" মায়ের ক্ষোভ এবারে ফোঁস করে ওঠে।

"তুমি কী লিখেছিলে দাদুভাই? খারাপ কিছু লেখোনি তো?"

"আমি? না, খারাপ কেন হবে? ওঃ মেয়েটা আমাকে যা জ্বালায় না দিদা? ভীষণ বিরক্ত করে। কিছুতেই আমার কথা শুনবে না, আমি ওকে ডেট করতে চাইনা, ও ব্লন্ড, পাকাচুলের মত দেখায়, কিন্তু ও আমাকে ডেট করবেই করবে। খালি খালি 'আই লাভ ইউ' ঐ সমস্ত কথা লিখে নোট পাঠাচ্ছে ক্লাসের মধ্যে, ভ্যালেন্তাইনস ডে নয় কিছু না। তাই আমি একটাতে লিখেছিলাম, 'বাট আই ডোন্ট!' তার পরেরটায় লিখলাম, 'জাস্ট ড্রপ ডেড!' আর শেষেরটাতে লিখেছিলাম, 'জাম্প ফ্রম আ ক্লিফ!' এই তো কেবল? কী এমন খারাপ কথা? পিছনে লাগলে যে কেউ ই বলবে। জেনি বলতোনা, যদি আমি ওকে এইরকমভাবে বিরক্ত করতাম?"

পরের দিন বিকেল। দুজনকেই ডিটেন করেছে ইশকুলে। বিচার সভা বসছে হেড মাস্টারের ঘরে। ফিরতে দেরি হবে।

বাড়িতে সবাই প্রস্তুত: "কি জানি কী হয়। কত রাতে ফেরে?"

ডোরবেল বাজলো খানিক পরেই।

"কি রে? ডিটেনশন পিছিয়ে দিলো?"

"না," স্কুলব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে শ্রীমান মেঘদীপের একগাল হাসি। ছেড়ে দিলেন।"

আরাম করে সফ্‌টী আইস্‌ক্রীম আর চকোলেট কেক খেতে খেতে মেঘু বললে, "হেড মাস্টার বললেন, - - 'এক তো রুল ভেঙ্গে ক্লাসের মধ্যে চিঠি চালাচালি করেছো। দুই, একটি মেয়েকে এত বিশ্রী বিশ্রী কথা কেন লিখেছো? জেনি বলছে সে তোমাকে শুধু 'আই লাভ ইউ' লিখেছিলো, তার উত্তরে তুমি - -' আমি দেখি জেনির মুখ ভয়ে এতটুকু। কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তখন বললুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, স্যার, কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিলো ও, আমারই অতটা রেগে যাওয়া ঠিক হয়নি, সব দোষ আমার, জেনিকে পানিশ করবেন না, ওকে আপনি ছেড়ে দিন, ও বেচারীর কোনো দোষ নেই। আমাকে পানিশ করুন আমি রুল ভেঙ্গেছি। হঠাৎ অত রেগে গিয়ে ক্লাসের মধ্যে বিশ্রী বিশ্রী করে চিঠি লেখালিখি আমার উচিত হয়নি। ওকে ছেড়ে দিন স্যার।'

সব শুনে, দু'জনেরই সব চিঠিগুলো পড়ে, আমাকে "শিভালরাস জেন্টলম্যান" বলে খুব আদর করে ছেড়ে দিলেন স্যার। জেনিকেও একটু বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলেন। কী ভালো, না দিদা, আমাদের হেড মাস্টার? অথচ সবাই তাঁকে ভয় পায় খুব।"

"সত্যি খুব চমৎকার মানুষ। কিন্তু তুমি তার মুখ রাখবে তো দাদুভাই? এই যে মোবাইলের পরে চিঠি চালাচালি, সব ক্ষমা করে দিলেন, আবার কিছু বাধিয়ে বোসো না যেন। এর পরে আর ছেড়ে দিতে পারবেন না উনি।"

"ধ্যেৎ, তা কখনো হয়? আমি না শিভালরাস জেন্টলম্যান হয়ে গেছি? আর নিয়ম ভাঙ্গা মানায়?"

দিদু তখন শিভালরাস জেন্টলম্যানকে কোলে জড়িয়ে একটা চুমু খেলেন।

প্রতিদিন, ১৫ এপ্রিল ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবালকের পত্র

নবকুমার বসু

আমাকে লইয়া আপনার কোনও প্রত্যাশা পূরণ হইল না, এই অনুধাবন আমার স্বতোৎসারিত। জন্মাবধি আপনার ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সঙ্গলাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে, আপনার ইচ্ছা আগ্রহ লক্ষ্যগুলিকে, যতটা চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতেই আমার উপরোক্ত অনুধাবন, বলা যায়, মতামত এবং সিদ্ধান্তও।

কিন্তু আপনার প্রতাশ্যা পূরণ না-হওয়ার কারণে আমি খুব দুঃখিত, এমন ভাবিবার কোনও কারণ নেই।

আমি অবশ্যই অসুখী ছিলাম। কিন্তু তাহা আপনার অপূর্ণ মনোবাঞ্ছার জন্য নহে। আমারই দুর্বলতা, বোধোদয়ের বিলম্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের দোলাচল ইত্যাদির কারণে। যদিও এ জাতীয় সব নেতিবাচক মানসিকতার জন্য আমি নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী করিতে পারি না, যেহেতু পিতা হিসেবে আপনি আমাকে অনেকাংশে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং সেই হেতু আমার অসুখী বোধ করিবার পিছনে আপনারও অবদান এবং ভূমিকা আছে। তাহা আপনি কতটা উপলব্ধি করেন, অথবা আদৌ স্বীকার করেন কি না জানি না, কিন্তু আমার উপলব্ধি সম্পর্কে মনে কোনও সংশয় নাই।

আপনার জবরদস্তি অথবা নীরব প্রভাব এবং আমার দৃঢ়তর অভাব, দুইয়ের মিলনে আজ আমার জীবদ্দশা একটি প্রান্তিক সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উদ্ধার পাওয়া এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে এখনওবধি আমার সম্যক ধারণা নেই। এবং নাই বলিয়াই এই পত্ররচনার উদ্যোগ। লিখিতে-লিখিতে মনের ভিতর ভাবনাসকলের যে যাতায়াত চলিতে থাকে, তাহা যেন নিজের মধ্যেই এক নীরব বিতর্কসভার আয়োজন করে। ভাবনা ও যুক্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে নিরন্তর কথাবার্তা চলিতে থাকে-যতক্ষণ পর্যন্ত পত্ররচনাটি স্থায়ী হয়। কতক্ষণ হইতে পারে কিংবা হইবে, বলা যায় না। কিন্তু লিখিবার এবং, অথবা, বিতর্কে লিপ্ত থাকিবার কালে, একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতিও চলিতে থাকে, তাহা বেশ অনুভব করা যায়।

দেখা যাক, পত্ররচনা সমাপ্ত হইতে-হইতে পরিত্রাণ বিষয়েও কোনও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব কি না! কিন্তু হইলেও সেটি আমার ব্যাপার। তৎপূর্বে আপনার আমার ভিতর একটি বোঝাপড়া আবশ্যক। আপনার মনে হইতে পারে, পত্ররচনার মাধ্যমে পিতাপুত্রের মধ্যে এমন নাটকীয় বোঝাপড়া কিঞ্চিৎ অভিনব, এমনকী অনাবশ্যক এবং একপেশে। কিন্তু আমি নাচার। এটি আমাকে করিতে হইবে।

তা ছাড়া ভাবিয়া দেখিলাম, এখনও আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচবশত, আপনার প্রায় অর্ধশতাব্দী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের জীবনযাপন, কর্তৃত্ব পিতৃত্ব মানসিকতা দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে, আমার ত্রিবিংশতি বৎসর বয়সের মূল্যায়ন ও মনোভাব, আপনার মুখোমুখি বসিয়া ব্যক্ত করার অসুবিধা যেমন আছে, তেমন আপনারও শোনা, শুনিয়া হজম ও সহ্য করিবার অসুবিধা থাকিতে পারে। আপনার-আমার মধ্যে মনপ্রাণ উন্মুক্ত করিয়া বাক্যালাপের মতো পরিস্থিতি কখনও রচিত হয় না। আমাদের সংস্কৃতিতে তা কখনওই সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। মনের দিক হইতে আমরা ভারতীয় পিতা-পুত্রেরা কখনওই পরস্পরের সম্মুখে সকল জড়তা, বাধা অতিক্রম করিতে পারি না। একত্র বসিয়া গল্প, আলাপ-আলোচনা এমনকী ধূমপান-মদ্যপান করিলেও, বাধার অস্তিত্ব ঘুচিয়া যায় না। আধুনিক পরিবারে এ জাতীয় লোকদেখানো সপ্রতিভ আচরণের মাধ্যমে উভয়পক্ষের মনেই একটা সুখ ও তৃপ্তির বাতাবরণ রচিত হইতে পারে। আমরা কত সহজ, কত আধুনিক-উদার-গোঁড়ামি বর্জিত শিক্ষিত ভাবধারায় পুষ্ট, মনে করিয়া তুষ্ট এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু আসলে এসবই আবার এক ধরনের হিপোক্রিসিরই নামান্তর। মনের কথা মনে থাকিয়া যায়, সামনাসামনি তোষণ চলে। আপনি-আমি সকলে তাই করি। নিজেদের সংস্কারবিহীন সত্যকে গ্রহণ করিবার খোলা মনের অধিকারী ভাবিয়া এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের পিঠ চুলকোনোর গোপন এবং অব্যক্ত মানসিকতা চরিতার্থ হয় বলিয়াই আমার মনে হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে, আমরা পিতা-পুত্র কতই না বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারিয়াছি, স্বোপার্জিত এই বোধের দ্বারা, আমরা শিক্ষিত মহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইতে চাই। অনেক সময় অন্যদের সম্মুখে দেখাইতে এবং স্বাক্ষরিত হইতেও কসুর করি না। ভাবখানা, দেখো, আমরা বাপ-ছেলে কী বন্ধু, কত সহজ আমাদের সম্পর্ক!

ধান্দাবাজি এবং স্বার্থপরতার এ-ও আর এক রূপ। সচ্ছল, তথাকথিত শিক্ষিত আধুনিক পরিবারে এ-ও আর এক ধরনের ন্যাকামি। শুধু পিতা-পুত্রের মধ্যেই এমনতর ন্যাকামি সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। শ্বশুর-জামাই, বধূ-শাশুড়ির মধ্যেও ঢপবাজির মোড়কে এমন খোলা মন উদার ন্যাকামির উদাহরণ যথেষ্ট দেখা যায়। সকলেই যেন প্রমাণ করিতে ব্যস্ত, আমি কত সংস্কারহীন, আমি কত ওপেন-মাইন্ডেড আমি কত গণতান্ত্রিক এবং মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী..... যে কারণে এমনকী যাহাদের উপর অধিকার আছে, পুত্র-কন্যা-বধূ-জামাতা—তাহাদের ব্যাপারেও সম্পর্কের অধিক মনুষ্যধর্ম পালনেই, বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেই যেন আগ্রহী।

আসলে এসবের অনেকটা, অনেকের ক্ষেত্রেই, পারস্পরিক লোভ-ধান্দা-ইচ্ছা-গোপন ক্ষুধা, বাসনা.....ইত্যাদি চরিতার্থ করিবার উপায় এবং ছল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনকী সচেতনভাবে না হইলেও, অবচেতন মনেও ধান্দাবাজি সক্রিয় থাকে। শিক্ষা-উদারতা-আধুনিকতার দোহাই দিয়া বহু মানুষ দিব্য সামাজিকভাবেই লোভ-লালসা-বসনায় তৃপ্ত হন। সুখাদ্যভক্ষণ, উৎকৃষ্ট সুরাপান, সুন্দর নরনারীর সাহচর্য....ইত্যাদি সব বয়সের সকল মানুষেরই কাম্য তা অস্বীকার করিবার কিছু নাই। একজনের আর একজনকে এক্সপ্লয়েট করিবার প্রবণতাও মানুষের অবচেতন মনেই স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, উপরে একটি পেলব সৌজন্যের আবরণসহ।

তো সেসব যাক। চাপা হিপোক্রিসির কথা আসিয়া যাওয়াতেই উপরোক্ত কিছু মন্তব্যের অবতারণা করিয়া ফেলিলাম। আপনার-আমার সম্পর্ক-প্রত্যাশা-পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে পত্ররচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে কথা বলিতে গিয়া, পরোক্ষভাবে ওসব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। প্রত্যক্ষভাবে উক্ত বিষয়সকল কতখানি রেলিভ্যান্ট, তা এখনই নিরূপণের সময় হয় নাই। তবে অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। ত্রিবিংশতি বৎসরে উপনীত হইয়া, আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে আমার যে বোধোদয়, বক্তব্য সেসব কথাই বলা যাক।....

আপনি কৃতী মানুষ। অমি শৈশব, বাল্যকাল অতিক্রম করিতে করিতে, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইতে হইতে এই ধারণাটি লালন করিয়া আসিয়াছি এবং কালক্রমে ধারণাটি বিশ্বাসে পরিণত ও উত্তরণের অবকাশ পাইয়ছে।

আপনি স্কুলজীবন হইতেই লেখাপড়া বিষয়ে মেধাবী। বর্ধমান জিলার মফস্‌সলি খ্যাতনামা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আপনাদের (আমারও বটে) মেমারি শহরতলির পাড়ায়, প্রতিবেশী হইতে শুরু করিয়া, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের কাছেও আপনি ছাত্রদের মধ্যে একটি উদাহরণের মতো বলিয়া বরাবর উল্লিখিত হইয়াছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র বর্ধমান জিলার মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আপনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে অনায়াসেই ভর্তি হন। যথারীতি মেডিক্যাল কলেজেও আপনার মেধার ব্যুৎপত্তি ও প্রকাশ ক্রমশ পরীক্ষার ফলাফলের মধ্য দিয়া নির্ধারিত হইতে থাকে, এবং বৎসরপূর্তির সঙ্গে ই 'ভালো ছেলে' নামের বিশেষণ আপনাকে চিহ্নিত করিয়া দেয়। আপনি কলেজের হস্টেলে থাকিতেন। মাসে একবার অথবা দুইবার মেমারির বাড়িতে যাতায়াত করেন। পিতামহ-মাতামহের আর্থিক সঙ্গতি ভালো, আপনিই ওঁদের একমাত্র সন্তান এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব দেশের বাড়িতে ছিল না, এখনও নাই। আপনার খ্যাতিতেই বাড়িটি এলাকার মধ্যে পরিচিত ছিল। শহর কলিকাতায় এবং হস্টেলের পরিবেশে মফস্‌সলি ছেলে হিসাবে আপনার কিঞ্চিৎ হীনম্মন্যতা ছিল কি না আমি জানি না শহুরেয়ানার একটি চটক থাকে, তাহা অমি অনুমান করিতে পারি। শহরের ছেলেদের সাজপোশাক, কথাবার্তা সব কিছুতেই একটি সপ্রতিভ ওপরচাল বোঝা যায়। নিজেদের উহারা কিঞ্চিৎ উচ্চগোত্রের মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বিশেষ করিয়া মেয়েদের সহিত মেশামিশি, কথাবার্তায় শহুরে ছেলেরা মফস্‌সলিদের পিছনে ফেলিয়া দেয়; আচার-আচরণে শহুরে ছেলেদের স্মার্টনেস, জেলার এবং শহরতলির ছেলেদের মনে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়। দিতে পারে। হয়তো আপনার ক্ষেত্রেও দিয়াছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওসব কোনওকিছুই গুরুত্ব পায় না। কৃতীই সম্মাননীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে, এমনকী মেয়েদের কাছেও। মেয়েরা এমনিতেও প্রাণীজগতে স্বীকৃত উচ্চগোত্রের। বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় অধিকতর বাস্তব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসল-নকল চিনিতে পারে। যাহাই হউক, কালক্রমে যাহাকে বলা হয় 'ফ্লায়িং কালার', আপনি সেভাবেই কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারি পাশ করিয়া বাহির হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্নাতকোত্তর পাঠক্রমেও সুযোগ পান এবং এমবিবিএস-এর পরে এমডি পরীক্ষাতেও পাশ করেন। আপনার বয়ঃক্রম ততদিনে সপ্তবিংশতি অতিক্রম করিয়াছে। ঠাকুরমা-ঠাকুরদা বিবাহের ভাবনা তো ভাবিবেন বটেই। কারণও ছিল।

না, প্রেম এবং নারীঘটিত কোনও দুর্বলতার ব্যাপার আপনার ছিল না। পড়াশুনা এবং কেরিয়ার চিন্তা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আরও উচ্চারোহণের ভাবনা আপনার মনোজগৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনও স্বাভাবিক আকর্ষণবোধও কি আপনার ছিল না! প্রেম-ভালোবাসা নহে, যৌনক্ষুধা যাহা প্রাকৃতিক। মানুষের বয়ঃসন্ধি এবং যৌবনের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ নেকনজরে দেখার মানসিকতা আছে। তাহার উপর বিশেষ করিয়া আবার যেসব ছেলের পরিচয়ে 'ভালো ছেলে'র তকমা আছে, তাহাদের ক্ষেত্রে তো মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাতের অর্থই একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়া। গোল্লায় যাওয়া। ভালোছেলেরা বড়দের এই মানসিকতা, মনোভাব টের পায়, এবং নিজের ভাবমূর্তি ধরিয়া রাখার কারণেই মেয়েদের সম্পর্কে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সত্যিই থাকে, নাকি উদাসীনতার ভান করে, সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন না, যে কৌতূহল এবং আকর্ষণ স্বাভাবিক মনের বিকাশকে চিহ্নিত করে, অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান, মেধাবী ছেলেকে তা আরও বেশি করিয়াই আকৃষ্ট করিবে, সেটিই তো প্রত্যাশিত। করে, তাও জানা।

কিন্তু আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি সংযমের দোহাই দিয়া এই ব্যাপারে এমন একটি লক্ষণরেখার মতো সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যেন উহা অতিক্রম করিলেই সর্বনাশ, অধঃপাত সুনিশ্চিত। অর্থাৎ ভালো ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকাইবে না। তাহাদের রূপলাবণ্যের তারিফ করিতে পারিবে না। আর প্রেম! ভালো ছেলেরা ওই শব্দ যেন মুখ উচ্চারণ করিলেই তাহার তকমা চলিয়া যাইবে, তাহার ভালোত্বের যাবতীয় গুণ যেন মুহূর্তে মুছিয়া যাইবে। আর প্রেম করিলে এবং প্রেমে পড়িলে তো কথাই নাই। ছেলেটি সম্পূর্ণ উচ্ছন্নে গিয়াছে বলিয়াই সাব্যস্ত হইবে। ইহকাল-পরকাল, তাহার প্রতি আশাভরসা সব চলিয়া যাইবে। সুতরং ভালোছেলেরা চিরকালই ওইসব ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলে। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে যাহা স্বাভাবিক, সুস্থ মনের বিকাশ, একবার ভালোছেলে নামের ছাপ পড়িয়া গেলে, লেখাপড়ায় ভালো ছেলেগুলি সেই স্বাভাবিকতা হইতে নিজেদের জোর করিয়া দূরে সরাইয়া রাখার প্রয়াস পায়। কতটা সত্যই পারে, তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। কেননা, প্রকৃতিকে অস্বীকার করা বড় সহজ কর্ম নহে। কিন্তু একদিকে এই স্বাভাবিকতা, অপরদিকে জোর করিয় তাহার বিরুদ্ধাচারণ, এই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়িয়া একটি গোল বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। কিছু কিছু মেধাবী ছেলে এই গন্ডগোলে পড়িয়া সংসারে অনর্থ ডাকিয়া আনিতে পারে। এমনকী স্বাভাবিকতা চাপিয়া রাখার ফলস্বরূপ কখনও নিজের এবং পরিবারের মুখে চুনকালিও মাখাইয়া দিতে পারে। বাড়ির শান্তশিষ্ট লেখাপড়ায় ভালো ছেলেটি, যুবতী কাজের মেয়েটির গর্ভসঞ্চারের কারণ হইয়াছে—এমন ঘটনা শোনা যায়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, অবদমিত স্বাভাবিক ইচ্ছা ও আগ্রহ তলে তলে বিস্ফোরিত হইবার সুলুকসন্ধান করে। সামনাসামনি তাহারা, পড়াশুনা ব্যতীত আর কিছু বুঝে না, বাধ্য হইয়া এমন ভাব ও ভান করিয়া থাকে। কিন্তু উপযোগী এবং উপযুক্ত সুযোগ ও সন্ধান জুটিয়া গেলে, তখন আরও নিজেকে সামলাইতে পারে না। মানমর্যাদা, রুচিজ্ঞান থাকে না।

আমি এমন একটি ঘটনার বিষয় অবগত আছি। শুনিয়া আমার একইসঙ্গে বেদনা ও করুণা অনুভূত হইয়াছিল। পরে আরও নিবিড় চিত্তে, গভীরভাবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছিলাম যে, ওইক্ষেত্রে উক্ত ভালো ছেলেটি হয়তো একদিক হইতে আমাদের দেশীয় সিস্টেম এবং হিপোক্রিসিরই শিকার। দেখিতে দেখিতে সে নিজেও হিপোক্রিট হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেটি সেই গত শতাব্দীর আটের দশকে, কলেজের তৃতীয় বর্ষে পড়িত। একুশ-বাইশ বছর বয়স। কলিকাতা হইতে ছুটির সময় দেশের বাড়িতে আসিয়া বসবাস করিতেছিল। চিলেকোঠার ঘরটি নিরিবিলিতে তাহার অধ্যয়নের ঘর। দিনের অনেকটা সময় আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছেলেটি ওখানেই অতিবাহিত করে। বাড়িতে লোকজন এমনিতেই কম। কেহ তাহাকে বিব্রত করে না, মনঃসযোগ ব্যাহত হয় না। সন্ধ্যা নামের বাড়ির অষ্টাদশী কাজের মেয়েটি তাহাকে চা-জলখাবার দিয়া আসে, আবার দরজা ঢাকিয়া সংলগ্ন ছাদ পার হইয়া নীচে নামিয়া আসে।

কাজের হউক, অথবা অকাজের, মেয়েটি অষ্টাদশী ইহাই তাহার আসল পরিচয়।

সন্ধ্যা আবার খুব বোকা-হাঁদা মেয়েও নহে। সাধারণত পোড়খাওয়া এ জাতীয় মেয়েরা কিঞ্চিৎ চৌখসই হইয়া থাকে। রাস্তাঘাটে, গৃহে, সর্বত্রই মানুষের নজর দেখিতে দেখিতে ইহারা নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হইবে, তাহাই স্বাভাবিক। এবং বাড়ির ভালোছেলেটিও যে চোরাদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া থাকে, সন্ধ্যা আপন প্রকৃতি দিয়াই তাহা অনুমান করে।

ছোটখাটো ইশারা-ইঙ্গিত সম্ভবত আপনা হইতেই তাহার শরীরের ভাষায় ফুটিয়া উঠে।

ভালো ছেলেটি ভালো হইলেও যৌবনপ্রাপ্ত। আর যৌবনের দৃষ্টিতে কুক্কুরীও সুন্দরী—কথাতেই আছে। আর সন্ধ্যা তো ডগডগে যুবতী নারী। নিরিবিলি চিলেকোঠার ঘরে তাহার অবাধ যাতায়াত। ছুতোনাতায় তাহা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক বর্ষার দ্বিপ্রহরে ভালোছেলেটি, অষ্টাদশী সন্ধ্যার যুবতী শরীরে আত্মসমর্পণ করিল। সন্ধ্যাও তো প্রস্তুতই ছিল। অতঃপর করিতেই থাকিল। এবং আড়াল ও গোপনীয়তা থাকার ফলেই শরীরের ক্ষুধা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ইহার পরবর্তী ঘটনায় বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। ধনী পরিবার ও জাতীয়পরিস্থিতি হইতে কি ভাবে আমাদের দেশে পরিত্রাণ পায়, তাহা আপনি তো ভালভাবেই অবগত আছেন মনে হয়। উদ্বেগ-অশান্তি-অর্থদণ্ড.....ইত্যাদি। অবশেষে নিষ্কৃতি। যাক্ বীরভূম জিলার সুরুল গ্রামের ধনী পরিবার, কশ্যপ গোত্রের উনবিংশ বর্ষীয়া সুরূপা পাত্রীটির সহিত আপনার বিবাহ হইয়া গেল। যাহাকে 'মোস্ট এলিজিব্‌ল ব্যাচেলর' বলা হয়, আপনার পরিচয় তাহাই ছিল। চেহারা কিঞ্চিৎ ছোটখাটোর দিকে হইলেও, আপনার গাত্রবর্ণ পরিষ্কার। চিকিৎসক, রোজগেরে, ভালোছেলে বলিয়া খ্যাত। আমার মাতুলালয় বিবাহের আয়োজনে-উপহারে-উপঢৌকনে কোনও কার্পণ্য করেন নাই বলিয়া শুনিয়াছিলম। তাঁহাদের মন এবং ধন উভয়ই ছিল এবং আছে। বংশানুক্রমেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত পরিবার, অর্থবান। তদুপরি আমার দাদামশায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ রোজগার ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক পুত্র ব্যতীত একটিই মাত্র কন্যা। শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী, সুরূপা যুবতী। উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করিতে তাঁহার ত্রুটি রখিবেন না, এ কথা বলাই বহুল্য।

আপনারও পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সদ্বংশীয় বলিয়া খ্যাত। আপনাদের বিবাহকে সকলে 'রাজযোটক' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। আদর-আপ্যায়ন, দেওয়া-যাওয়া-ভোজ-সাজসজ্জা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ম্বর.... কোনওকিছুতেই অপূর্ণতা রাখা হয় নাই।

কিন্তু পরবর্তিকালে আমি একটি ঘটনা জানিতে পারিয়া রীতিমতো বিভ্রান্ত বোধ করিয়াছিলাম।

আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারও, ঘুরাইয়া নাক দেখাইবার ছলে, সেই নয়ের দশকের একেবারে গোড়ায়, বিবাহোপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ আলাদা করিয়া আদায় করিয়াছিলেন। না, আপনারা পণ গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া কিছু স্বীকার করেন নাই, অর্থাৎ পণ নেন নাই। যতদূর জানি, আপনাদের পরিবার হইতে, বিশেষ করিয়া আপনার জননী, আমার ঠাকুমা, বউভাতে ভোজ আয়োজনার্থে, দাদামশায়ের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন।

পণ না বলিয়া, অন্য নামে বিবাহোপলক্ষে কন্যাগৃহ হইতে টাকা আদায় করাকে আর কী বলে আমি জানি না। কিন্তু এটুকু অবশ্যই জানি, নামে কিছু আসে যায় না। এই ঘটনায় পণগ্রহণের মানসিকতারই স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। সুপাত্র হিসাবে আপনাকে সামনে রাখিয়া, আপনার পরিবার সেই একই সনাতন, নিকৃষ্ট পন্থায় কন্যাপক্ষ হইতে টাকা লইয়াছে। কিন্তু আমি অধিকতর বিস্মিত বোধ করিয়াছি, যখন জানিতে পারি, উক্ত ঘটনা আপনার অজানা ছিল না। অর্থাৎ অর্থগ্রহণের ব্যাপারে আপনারাও অসম্মতি ছিল না। আপনি সৎ-উদার-আধুনিক-শিক্ষিত....ইত্যাদি বিশেষে ভূষিত ভালোছেলে বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তলেতলে লোভ পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা হিপোক্র্যাসির বড় উদাহরণ আর কী হইতে পারে!

টাকা লইয়া বিবাহ করায়, আপনি যে বিক্রি হইয়া গেলেন, এ ভাবনা কি আপনার মনে আসিয়াছিল?

আপনার নিশ্চয়ই কোনও বিবেকের দংশন, আত্মসম্মান বিসর্জিত হওয়ার ভাবনা, ছোট মন, ভিক্ষাবৃত্তির কথা কখনও মাথায় আসে নাই। কেননা পরবর্তীকালেও মাতুলালয় হইতে বিভিন্ন সামগ্রী আপনি উপহার হিসাবে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন নাই।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইত্যাকার সংবাদগুলির প্রতিক্রিয়া আপনার সম্পর্কে আমার মনে একটি স্থায়ী ধারণা গড়িয়া দিতে থাকে। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু মনে মনে অনুভব করিতাম, আপনাকে উপর হইতে দেখিয়া যেরকম উদার কৃতী-সভা-সচেতন-ভাবুক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাহা নন। উপরের চকচকে, ঝকঝকে আবরণটি নীচে আপনি মানুষটি লোভী, ধান্দাবাজ, চতুর এবং আত্মসম্মানবোধরহিত অথচ দাম্ভিক।

আর একটি বিশেষণও উপরোক্তগুলির সহিত যুক্ত করা যায়। কিন্তু তাহাতে এখনও আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচবোধ হইতে রেহাই পাই না। কেন না আপনার ওই বিশেষ স্বভাব চরিতার্থ করিবার ফলেই, যেহেতু আপনার বিবাহের মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই আমার জন্ম হইয়াছিল এবং নিজের জন্মটিকে আমি কখনওই অশুভ ঘটনা মনে করিতে পারি না। এখন অবশ্য আমি জানি যে প্রাথমিকভাবে আমার মা অত শীঘ্র সন্তানসম্ভাবা হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার পড়াশুনার জন্য; কিন্তু আপনার অত্যুগ্র কামনা মায়ের পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিকে বানচাল করিয়া দিয়াছিল। বিশেষ করিয়া মা পিল সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া, জন্ম নিরোধনের পন্থাটি আপনার উপরেই প্রযোজ্য হইত এবং আপনি স্ত্রী-সহবাসের সুখ পূর্ণরূপে উপভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঞ্চিত হইতেন বলিয়া, পদ্ধাটি পরিহার করিয়াছিলেন। মা অবশ্য শেষ পর্যন্ত গর্ভধারণ এবং আমার জন্মকে স্বাগতই জানাইয়াছিলেন। পরে পড়শুনাও সম্পূর্ণ করেন।

তো সে যাক। আপনার এবং আপনার স্ত্রী (আমার জননী হইলেন)-র ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যৌবনধর্ম পালন সিদ্ধান্ত বিষয়ে কাহারও মন্তব্য করা সমীচীন নহে। ওই একটি ব্যাপারের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা, সীমাবদ্ধতা, আচরণ, সিদ্ধান্ত আপনাদের দুইজনের। আমি দৈবক্রমে তাহা একটি ফল হিসাবে ফলিয়াছি। সবটাই প্রাকৃতিক। অতিরিক্ত কৃতিত্বের দাবিদার কেহই নহে।

কৃতিত্বের প্রশ্ন ওঠে পরবর্তী পর্বে—সন্তনের জন্মগ্রহণের পরে মানুষ হইয়া উঠিবার কালে। এবং সেই কৃতিত্বের দাবিদার পুত্রকন্যা যেমন, তাহাদের অভিভাবকরাও বটে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু কৃতিত্ব নহে, ব্যর্থতরও দায় আছে। এবং পুত্রকন্যার সহিত সেই দায়ও আংশিকভাবে পিতামাতার উপর বর্তায়। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক স্তরে, সন্তানের কম বয়স এবং অপরিপক্ক মানসিকতার কালে, অধিকাংশ দায় যে অভিভাবকেরই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কেননা, সন্তানটির তখন অবলম্বন প্রয়োজন হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের পরে চারাগাছের পুষ্ট হইয়া উঠিবার যত্নের সহিত সন্তান প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত তুলনা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সন্তান মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যে দায়িত্ব ও টেকনিক, শিক্ষা-বুদ্ধি-উদারতা-মমত্ববোধ-তাহা আরও বহুগুণ কঠিন ও জটিল শিশু প্রতিপালন আরও অনেক বেশি মনস্কতাও দাবি করে।

শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত, সন্তানের মনের বিকাশ এবং বিভিন্ন প্রবণতার দিকেও পিতামাতাকে লক্ষ্য দিতে হয়। তাঁহাদের নিজস্ব শিক্ষা-বুদ্ধি-সংস্কৃতির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে নিজের মতো গড়িয়া তুলিবার আবেগ ও ইচ্ছা প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত পিতামাতারই থাকে। কেন না সব শিক্ষিত সফল অভিভাবক তাঁহাদের সাফল্যের প্রতিফলনই দেখিতে চান সন্তানদের ভিতর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মাথায় রাখিবার প্রয়োজন।

প্রথমত, নিজের সাফল্যের বিষয়টি একটি সামগ্রিকভাবে প্রেক্ষাপটে বিচার করা আবশ্যক। নিজের সাফল্য ও কৃতিত্বকে কিঞ্চিৎ সমালোচনারও প্রয়োজন। আত্মসমলোচনা ব্যাতীত নিজের শিক্ষাদীক্ষা-কোয়ালিটি সব কিছুরই ধারণা এবং মূল্যায়ন একপেশে এবং স্বতঃসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু তথাকথিত সফল মানুষ কি প্রকৃত অর্থে আত্মসমালোচনা করিতে পারেন? করেন কি? যে জীবনযাপন, সফলতা ইত্যাদির নিরিখে একটি মানুষ আজ তুষ্ট, তিনি কি সত্যই অতীতের দিকে চাহিয়া নিজের শ্রম, মানসিকতা আজকের ভূমিকায় পৌঁছানোর পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে চুলচেরা আত্মসমালোচনা করেন?

অর্থাৎ যে কথাটি আমি বলিতে চাই, পিতা হিসাবে আমাকে অবলম্বন দেওয়া এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য, আপনি কি নিজের শিক্ষাযোগ্যতা মানসিকতা মূল্যবোধ....ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত? আপনি কি আমাকে আপনার মতো গড়িয়া তুলিবার নিবিড় আগ্রহ পোষণ করিবার কালে, কখনও আত্মসমালোচনার অবকাশ পাইয়াছেন! ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, আপনার সীমাবদ্ধতা, আপনার ঘাটতি, মানুষ হিসাবে আপনার অপূর্ণতা, আপনার নেতিবাচকতা...ইত্যাদি বিষয়গুলি? যে শিক্ষা-সাফল্য-ধনমানের স্ফীতগর্বে আপনি তখন মহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃকর্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছেন, তাহার তলদেশে আপনারও যেসব প্রবণতাসঞ্জাত ক্ষুদ্রতা, কাম লোভ শয়তানি-তঞ্চকতা ছিল এবং আছে, আপনি কি সেগুলো সম্পর্কেও সচেতন?

আমার মনে হয়, পিতা হিসাবে নিজেকে একেবারে ঈশ্বরতুল্য মালিন্যহীন, সৎ-উদার ভাবিয়া ও ধরিয়া লইবার যে আবেগ আপনার মধ্যে অহরহ ক্রিয়াশীল, তাহার মধ্যে অনেক ভড়ং আছে। মিথ্যা আছে। সন্তানকে মানুষ করিবার সময় পিতারা তাহা মনে রাখেন না। কেননা, পিতা হিসাবে আত্মসমালোচনার গুরুত্ব তাঁহারা আর স্বীকার করিতে চান না। নিজেদের ঘাটতি চাপিয়া রাখিয়া পুত্রকন্যার সম্মুখে নিষ্কলুষ প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন।

অথচ কালক্রমে সন্তানরা পিতা নামের ছদ্ম ঈশ্বর সাজিতে চাওয়া মানুষটিরও দোষঘাট সবই টের পায়।

সুতরাং আপনাকে মহান প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিতে করিতে, সন্তান প্রতিপালনের কর্তব্যসাধনের কোনও অর্থই হয় না। সবই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া যায়। আত্মসমালোচনা এবং স্বমূল্যায়নের মাধ্যমে বরং আপন ভূমিকায়। স্থিতধী থাকিয়া দায়িত্বপালনই শ্রেয় এবং ভালো। শুধু নিজের গুণ এবং কৃতিত্ব নহে, দোষ-ব্যর্থতা সীমাবদ্ধতা সব কিছু লইয়াই যে স্বাভাবিকতা মানুষকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করে, স্বীকৃতি দেয়, সেই মানুষিক আবেদন হইতেই সন্তানকেও স্বাভাবিকভাবেই মানুষ করিয়া তোলা সম্ভব। দেবতা সাজাইবার প্রবণতা পিতার ভূমিকাকে শেষ পর্যন্ত হাস্যকরই করিয়া তোলে। ব্যর্থতাও অনিবার্য। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সব পিতামাতা বা অভিভাবকেরই পুত্রকন্যার স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক প্রবণতার প্রতি শুধু লক্ষ দেওয়া নহে, সেটিকে গুরুত্ব সহকারে লালন এবং সম্মান করিবার ভাবনাও মাথায় রাখা প্রয়োজন। এটি আমার নিজস্ব উপলব্ধি।

সব মানুষ এ রকম হইবে না। সব সন্তান পিতামাতার মতো হইবে না। জেনেটিক্যালি মানুষ একটি বিশেষ প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে—এই সহজ কথাটা বিশেষ করিয়া কৃতী ও শিক্ষিত অভিভাবকরাই বিস্মৃত হন, আমি দেখিয়াছি। অনেক সময় না জানিয়া বুঝিয়াও অভিভাবকরা নিজেদের সাধ ও ইচ্ছার দায় চাপাইয়া দেন সন্তানের উপর। তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। যাহার যা স্বাভাবিক প্রবণতা, যে বিষয়ের প্রতি স্বাভাবকি আগ্রহ, সেদিকেই তাহার মেধা ও মননকে আরও অধিক উজ্জীবিত করিয়া দিলে, মানুষের জীবন আনন্দময় হওয়ার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

যে মানুষটির শৈশব, বাল্যকাল হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, গাছ-ফুল-আকাশ-বৃষ্টি যাহাকে নিরন্তর মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে যুক্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে গণিত শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া তোলার চেষ্টা অভিভাবকরা করিতেই পারেন। হয়তো সে চেষ্টায় সন্তানটি পরীক্ষাও পাশ করে, ডিগ্রি পায়, কিন্তু আনন্দময়তা অধরা হইয়া থাকে। যাহার পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণ, তাহাকে ভূবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ও পড়িবার জন্য উৎসাহিত করা যায়, কিন্তু কম্পিউটর ইঞ্জিনিয়ার বানাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা অনুচিত। ক্ষুদ্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, তাহার মনের স্বাভাবিক বিস্তার সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

আমি বুঝিতে পারি, আমাদের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার গোলমাল, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। অভিভাবকগণ নিরন্তর উদ্বেগে থাকেন পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ লইয়া। কেন না, সব পিতামাতা চান, তাঁহার সন্তান যেন সুখী, স্বাবলম্বী হয়, স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। যে কারণে, মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেন, এমন একটি জীবিকা যেন তাহারা অবলম্বন করে, যাহাতে 'করিয়া খাওয়ার' ব্যাঘাত অন্তত না ঘটে। এই মানসিকতা হইতেই মাত্র গুটিকয়েক জীবিকার দিকে লক্ষ রাখিয়াই পিতামাতা সন্তানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং, চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্সি ওকালতি.....এইরকম কয়েকটি জীবিকা। সব অভিভাবক চান পুত্রকন্যা এর মধ্য হইতেই একটি জীবিকা নির্বাচন করুক।

কিন্তু এ অতি স্বাভাবিক ঘটনা, যে বাস্তব জীবনে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটে না। সমাজ-দেশ জীবনধারণে ভারসাম্য রাখিবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজনেই এবং নিয়মে, আরও বহু পেশায়, জীবিকায় বহু মানুষ চলিয়া যায়। এবং যায় বলিয়াই সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি...সব মিলিয়া দেশ চলিতে থাকে। অচল হইয়া যায় না। অভিভাবকগণ আহত হইতে পারেন, তথাপি এই স্বাভবিকতায় জগৎ চলমান থাকে। কিন্তু গোল বাধে, আপনাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করা মধ্যবিত্ত মানুষদের লইয়া। আপনারা সম্ভবত অবচেতন মনেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন এই ভাবনায় যে, আপনার পছন্দ করা বৃত্তি বা জীবিকাই আপনার সন্তানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাকে সেই জীবিকাই অবলম্বন করিতে হইবে। আপনাদের সাধ্যও থাকে সন্তানকে সেই বৃত্তি অবলম্বন করানোর। সন্তানটির মানসিকতা, মানসিক প্রবণতা, স্বাভাবিক আকর্ষণ... ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে নেহাত আবেগ। এমনকী ওসব অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বলিয়া মনে করেন। আপনারা বাস্তব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-রোজগার, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদির কথা ভাবেন। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সিএ ব্যতীত জীবিকার কথা ভাবিতে পারেন না। সামর্থ থাকে বলিয়া বিকল্পের ভাবনাকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু মনে রাখেন না, সন্তানটিকে ঘোড়ার বদলে গাধা বানাইতেছেন, এবং সে নষ্ট ও হতাশ হইয়া যাইতেছে।

কালক্রমে সন্তানটিরও আর মানসিক ব্যাপারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা মনে থাকে না। সে একটি মেশিনে পরিণত হয়। যে মেশিন বাস্তব জীবনে যুঝিয়া থাকিবার ও চলিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু মানসিক আনন্দময়তার জগৎ হইতে চিরনির্বাসিত হয়। এবং সেটিও ঘটিয়া যায় তাহার নিজের অলক্ষ্যে। একটি সম্ভাবনাময় সুখী মনুষ্যে পরিণত হইবার বদলে, আপনাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত, দায়িত্বশীল, আদর্শবান অভিভাবকগণের জেদ, একগুঁয়েমি এবং সঙ্কীর্ণ দর্শকের দৌরাত্ম্যে পুত্রকন্যাও দিনে দিনে একটি শিক্ষিত মূর্খে পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হয়। স্কুল প্রাপ্তির পিঠ চাপড়ানি খাইতে খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ভুলিয়া যায়, তাহার কোনও একটি স্বাভাবিক প্রবণতা, কৌতূহল, আগ্রহের ব্যাপার ছিল। মুগ্ধতা ছিল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমিও সেই গড্ডলিকাপ্রবাহের অনিবার্য শিকার হওয়া সত্ত্বেও, একটি প্রায় আকস্মিক বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায় লুপ্তপ্রায় আমার স্বাভাবিক প্রবণতা, ভালোলাগাকেই অবলম্বন করিবার জন্য স্থিতধী হইয়াছি। সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখের পূর্বে, দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি, এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ধারাবিবরণীর মতো কিংবা ভাষণের মতো যা কিছু আমি লিখিয়াছি, বলিয়াছি, তাহাতে আপনি যারপরনাই বিব্রত, ক্ষুব্ধ, এমনকী কিঞ্চিৎ বিচলিতও বোধ করিতে পারেন। জ্ঞান দিতে চাহিয়াছি মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইতেও পারেন।

কিন্তু আমি অতি নিবিড় প্রত্যয়ে আশা রাখি, আপনি আপনার মনের, ভাবনার, ইতিবাচক উদারতার দিক দিয়া যদি আমার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন, তাহা হইলে অবশ্যই বিরূপতার বেদনায় বিদ্ধ হইবেন না। হ্যাঁ, এ কথা সত্য, আমার এতক্ষণের বক্তব্য হইতে আপনার এই ধারণা করা খুবই সম্ভব যে, আমি দুর্বিনীতের ন্যায় আপনার কঠোর এবং শুধুমাত্র নেতিবাচক সমালেচনা করিয়াছি, যেন আপনি মানুষটি নেহাতই পাষণ্ড, চরিত্রহীন, আত্মকেন্দ্রিক। আমি শুধুই আপনার দোষহীনতা-ক্ষুদ্রতা-অনুদারতার সন্ধান করিয়াছি; কোনও প্রীতিময় স্নেহ-উদারতা-ভালোবাসার মিশ্রণে অপ্লুত পিতৃহৃদয়ের অনুসন্ধান করি নাই। আপনার কোনও আদর-উদ্বেগ-মমত্ববোধ অনুভব করিয়া শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি নাই।

না, এই ধারণায় কিন্তু আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। আমাকে ভুল বোঝা হইবে।

বরং নিজের সাধ্যমতো ভাবনার গভীরতা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া টের পাইয়াছি, প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-কৃতজ্ঞতা-নির্ভরশীলতায়, জন্মাবধি আমি এতখানিই নিমজ্জিত হইয়াছিলাম যে,, এমনকী নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন হইবার কথা মনে আসে নাই। আপনার সার্বিক ভূমিকাকে ধ্রুব সত্য জ্ঞান করিয়া, বিংশতি বৎসর যাবৎ আমি জীবন অতিবাহিত করিয়াছি এবং কোনও অবিশ্বাস- অশ্রদ্ধা-তিক্ততাবোধের কালিন্য আমার মধ্যে আপনার সম্পর্কে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে নাই। এবং আপনার একটি অমলিন পিতৃসত্তা অদ্যাবধি আমার মস্তিষ্কে এবং অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতেও না থাকিবার কোনও কারণ নাই, যদি না আপনি মানুষটিকে, মানুষ হিসাবেই বিচার না করিয়া আমি দেবতার আসনে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি।

আমাদের ভাবনাচিন্তা, বোধের মধ্যে একটি ধারাবাহিক গোল বাধাইয়া দিবার সামাজিক এবং পারিবারিক চক্রান্ত চলে, এবং তাহার বশবর্তী হইয়া এই অনিবার্য বিশ্বাস আমাদের বহন করিতে হয় যে, পিতা ঈশ্বর বা দেবতা ব্যতীত আর কিছু না। এই বিশ্বাসের বীজ বপন করাটা যে কত বড় প্রমাদ বা অতিশয্য, তাহা উপলব্ধি করিতে করিতে সময় এবং বয়সও যেমন বহিয়া যায়, একটি অন্তর-বাহিরের ধাক্কাও হঠাৎ আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে। আর তখনই মানুষ ও দেবতার ভূমিকার পার্থক্যবোধ এক বিষম টানাপোড়েন ও চাপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কেননা, পিতাকে তো এতকাল মানুষ বলিয়া জানি নাই। তাঁহার ক্ষেত্রে মানুষি আবেগ-আবদ্ধতা, ভালোমন্দের সহজাত প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতার হিসাব করি নাই। আমাকে/ আমাদের শেখানো হইয়াছে, একেবারে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পিতা নামটিই সকল বিতর্ক, সমালোচনার উর্ধ্বে। অথচ এই ভণ্ডামির অধিক ক্ষতিকর আর কী হইতে পারে। পিতাকে মনুষ্যপদবাচ্যের পরিচিত হইতে উর্ধ্বে স্থাপন করিয়া, আমাদের মধ্যে যে বিভেদ রচনা করা হয়, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। বিভেদের প্রাচীর একদিন ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। তখন আমদের ঘোর কাটিয়া যায়। চক্ষুষ্মান হই। বোধে উপনীত হই। এবং দেবতা ও মনুষ্যের অস্তিত্ব, পরিচয়

AMARBOI.COM

সম্পর্কে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়িয়া সুবিচার-অবিচার কোনওটিই যেন সুষ্ঠুরূপে করিতে পারি না।

অথচ পিতা, দেবতা নহেন, কোনও একটি ঝাঁকানির মধ্যে পড়িয়া, তাঁহার এই মনুষ্য পরিচয় জানিয়াই আমাদের স্থিতধী হইতে হয়। মানুষ হিসেবেই তাঁহার ভূমিকা পর্যালোচনা করিয়া, ইতিনেতির স্বাভাবিক মূল্যায়ন করা ব্যতীত উপায় থাকে না। আমিও তাহাই করিয়াছি। আপনার শ্রদ্ধেয় ভূমিকাকে সম্মান করিয়াছি, আবার দেবতা সাজিয়া থাকিবার কিংবা সাজাইয়া রাখিবার ভণ্ডামিগুলিকে ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

বিশ্বাস করিবেন, নিজের নিকট স্বাক্ষরিত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি বলিয়াই, আপনার সমালোচনা করিয়াছি, পূর্ণ মানুষ হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছি, তাই আপনার দোষঘাটের কথা অকপটে বলিয়াছি এই প্রথম, কেন না ইতিপূর্বে কখনওই তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ, সৎ সাহস হয় নাই। এই উদ্যোগে কোনও অশ্রদ্ধা, অসম্মান নাই। কিন্তু উদ্যোগের পূর্বে একটি বিলক্ষণ ঝাঁকানি খাইতে হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা জানাইয়া, আমার একটি সিদ্ধান্তের কথা নিবেদন করিব।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই আমার মনের মধ্যে জীবন-জগৎ-সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নানান প্রশ্ন এবং ভাবনার তোলপাড় চলিতে থাকে। সদ্য যুবাবস্থায় উপনীত হইবার কালে সব ছেলের মনের অবস্থা অমন হয় কি না, আমি জানি না। সম্ভবত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু ছেলে এবং অল্প কিছু মেয়ের মধ্যেও যে ভাবনাগত পরিবর্তনের বাতাস বইতে থাকে, তাহা আমি অনুভব করিয়াছি। নিজেকে পূর্ণরূপ মনুষ্যের কল্পনায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের বহু আবেগ, স্বপ্ন যেমন অবাস্তব এবং ছেলেমানুষি বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমনই অনেক নূতন প্রশ্ন-কৌতূহল জিজ্ঞাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদয় হয়। চরিত্রগতভাবে এ জাতীয় অনুসন্ধিৎসার সহিত কিশোর বয়সের অগভীর কৌতূহলের প্রভূত পার্থক্য ঘটিয়া যায়, আমি টের পাইয়াছি।

কৈশোরকাল যেন জীবদ্দশার একটি আলো-আঁধারি অধ্যায়। বোঝা, না-বোঝায় মেশা, এলোমেলো। কোনও চিন্তা বা দর্শনই যেন তখন স্থায়ী হয় না। সদা অস্থিরচিত্ত। অথচ সম্ভবত অবচেতন মনে তখন হইতেই কিছু ছেলেমেয়ের মধ্যে আগামী দিনের বোধ, উপলব্ধি জারিত হইতে থাকে। ক্রমশ স্থিতধী মনে তাহার স্বরূপ ও গভীরতা অনুসন্ধানের প্রয়াস পায়। আমি লক্ষ করিয়াছি, এই সময় হইতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, নির্বাচন আড্ডা-আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসে। কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রীদের দল ভাঙিয়া নূতন দল গড়িয়া উঠে। মেলামেশার মধ্যে ভিন্ন ধরনের নূতন-পুরাতনের যোগ-বিয়োগ যেমন ঘটে, দক্ষতার মাত্রাও যেন পরিবর্তিত হয়। একই বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারমুটেশন-কম্বিনেশনের মাধ্যমে আবার কিছু গোষ্ঠী তৈয়ারি হয়।

আবারও ইহাও সত্য যে কিছু ছাত্রছাত্রী একেবারে সেই প্রথম বর্ষ হইতেই যেন নিজেদের একটি দুর্ভেদ্য বন্ধুসমাজ নির্মাণ করিয়া লয়। উহারা যেন নিজেদের স্টেটাস-রুচি-সংস্কৃতির কঠিন খোলস হইতে আর বাহির হইতে চায় না, পারেও না। নূতন কোনও বন্ধুত্বস্থাপন, যোগাযোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারা যেন উৎসাহও বোধ করে না। কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন থাকিতেই ভালোবাসে। অন্যরা কে কী করিতেছে, তাহাতে উহাদের মাথাব্যথা নাই। অন্যদেরও উহাদের ব্যাপারে আগ্রহ থাকে না। আমার ধারণা এই দলটি কূপমণ্ডুক ধরনের।

আমার ক্ষেত্রে, কলেজে তৃতীয় বর্ষের সূচনাক্ষণ হইতেই মেলামেশা, বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে আপনা-আপনি কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। মন কষাকষি অথবা ঝগড়াঝাঁটি নহে। যে যার মতো সকলেই রহিল, আবার একটি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিল, যাহারা কাছাকাছি থাকে, একত্র গল্প করে, আড্ডা দেয়। সকলেই সচেতন না হইয়াও অনুভব করি, আমাদের ভাবনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, রুচি-সংস্কৃতি....ইত্যাদির সাযুজ্যই আমাদের কয়েকজনের কাছে টানিয়া আনিয়াছে। বলা বাহুল্য, কয়েকটি মেয়েও আমাদের গোষ্ঠীবদ্ধ হইল।

ইতিমধ্যে একবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছি।

আমি অনুভব করি, আমার ভাবনাচিন্তা, মূল্যায়ন, মূল্যবোধে নানান পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছিল। জগৎ সময় সংসার সম্পর্ক....বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের আলোড়ন আমার মধ্যে চলিতেছিল। আমি যেন নিজের প্রবণতা, ভাবজগৎ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এই সময় হইতে সচেতনতায় বিদ্ধ হই। মনে হয় যেন এই প্রথম অন্য কাহারও প্রভাব ব্যতীত, আমি একক একটি মানুষ হিসাবে নিজের কাছে নিজে স্বাক্ষরিত হইতেছিলাম। আমি কে, আমি কী, আমার ইচ্ছা সুখ দুঃখ, আনন্দবেদনা সম্পর্কে সচেতন হইতেছিলাম।

তখনই আমার মনে হয়, এই যে আমি আজ একটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসক হইয়া সমাজে সংসারে পরিচিত হইব, এবং অতঃপর একটি সম্ভাব্য এবং প্রত্যাশিত জীবনধারায় বহিয়া যাইব, এইইব আয়োজন পরিকল্পনা-সিদ্ধান্ত- কোনোওটাই আমার নিজের নহে। বস্তুত আমার ইচ্ছা আবেগ ভাবনাচিন্তা প্রবণতা কোনওকিছুই আমার আজকের এই ভূমিকায় পৌঁছোনোর জন্য কাজে লাগে নাই। কেহ কোনওদিন উক্ত বিষয়ে আমাকে সচেতন করে নাই। কোনও অনুসন্ধানও করে নাই আমার ভাবনাচিন্তা মানসিকতার ব্যাপারে। এবং আমিও কখনও মুখ ফুটিয়া কিছু বলি নাই। যেন সচেতনও ছিলাম না, নিজস্ব ইচ্ছা, লক্ষ্যের ব্যাপারে। অন্ধের মতো নির্ভরশীল হইয়া পথ চলিয়াছি, প্রদর্শকের নির্দেশমতো। যে পথ, যে লক্ষ্য তিনি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি চোখে ঠুলি বাঁধা বলদের ন্যায় তাহার অনুগামী হইয়াছি।

আমার সেই পথপ্রদর্শকটি আপনি। আমার পিতা, ডাক্তার শঙ্করপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আপনিই প্রকৃতপক্ষে বহুকাল পূর্ব হইতেই রীতিমতো পরিকল্পিত ভাবনায়, মানসিকতায় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন, যেহেতু আপনি ডাক্তার, সেই হেতু আপনার ওরসজাত সন্তান হিসাবে, আমাকেও ডাক্তার হইতে হইবে। ডাক্তার ব্যতীত আপনার সন্তানের অন্য কোনও ভূমিকা, জীবিকা আপনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। ভাবিবার কারণও কিছু নাই। কেননা, জন্মাবধি আমার বোধবুদ্ধি, বিচক্ষণতার উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া করিয়া, আপনি এমনই একটি আবহ রচনা করিয়া দিতে সফল হইয়াছিলেন, যে স্বাধীনভাবে নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবা এবং ভাবিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও মানসিকতা, ক্ষমতাই আমার গড়িয়া উঠে নাই। এবং যাহাতে না গড়িয়া উঠে, বরাবর সে বিষয়ে আপনি সচেতন এবং যত্নবান ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও পরিস্থিতি ও আবহের শিকার হইয়াছিলাম সহজে। নিজস্বতার বোধ বলিতে কিছু ছিল না। চিকিৎসক হইবার মতো মানসিক গঠন আছে, কি না আছে, এমনকী কিছু হইয়া উঠিবার মতো ক্ষমতা আছে কি না, মন আছে কি না, তাহাই তো জানিতাম না। হয়তো অবচেতন মনে ছিল। কিন্তু তাহাকে চেতনে আবিষ্কার করার মতো কৌশলগত পরিপক্কতা আমি পাইব কোথা হইতে! আপনি তো সর্বদিক হইতেই আমার যাবতীয় ইন্টেলেক্ট অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সদ্য বছর দেড়েক পূর্ব হইতে আমি যেন আপনাকে (নিজেকে) আবিষ্কারের কিছু সূত্র পাইলাম। বয়ঃপ্রাপ্তি, নতুন বন্ধু বান্ধব, কলেজের তৃতীয় বর্ষ হইতে পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন.....সব মিলিয়াই যেন এই প্রথম আমি কিঞ্চিৎ আত্মাবিষ্কারের অবকাশ পাইলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বারংবার ভাবি, আমি কী চাই, কীসে আমার আনন্দ কী করিলে আমি ঠিক আমার মতো হইয়া উঠিব।

যতই এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নিজেকে সংলগ্ন করিয়াছি, দিনে দিনে ততই মনে হইয়াছে আপনিই আমার ভাবনাচিন্তা, মানসিকতাকে কখনও অবাধ হইতে দেন নাই। নিজের ইচ্ছা, ধ্যানধারণা দিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানি, আপনার উদ্দেশ্য কিছু অশুভ ছিল না। আমার মঙ্গলকামনার অভিপ্রায়ই আপনি অতি সতর্ক এবং বিবিধ তথাকথিত সামাজিক, নৈতিক দূষণ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত রক্ষণশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত যে বিষয়টির ব্যাপারে আপনি মনোযোগ দেন নাই, কিংবা আপনার ভাবনাচিন্তার সীমবদ্ধতাই হয়তো যে বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক করে নাই, তা হইতেছে, নিজস্ব ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা-দর্শন-উদারতা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া, এমনকী নিজের সন্তানকেও শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি। একটি অস্থায়ী আবহ রচনা করা যায়, হয়তো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও। কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে। একটা না একটা সময় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তাহার নিজস্ব পথ চলার দিক নির্দেশ করিয়া দেয়। নতুন বা সে অসম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয় বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তীকালে ইহাও ভাবিয়াছি, আমার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক হইবার জন্য আপনার কি অন্য কিছু কারণ ছিল! হয় আপনি নিজেকেই সুরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও কি সম্ভব। আপনার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা-অক্ষমতা-সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি যাহাতে কখনওই প্রকাশ্য না হয়, সেই কারণেই যেনতেন প্রকারেণ আমার পৃথিবীটাকেই সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে চান। এ অতি কষ্টকল্পনা যদিও, তথাপি আমার ব্যাপারে আপনার জোর খাটাইবার তীব্র প্রচেষ্টা দেখিয়াই ওই সম্ভাবনার কথা মাথায় আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, বলা যায় না, আপনার মতো নিমগ্ন একদর্শী (নাকি, ভালো ছেলে!) মানুষের জীবনে, যদি কোনও পদস্খলনের ইতিহাস থাকে, তাহাকে ধামাচাপা দিবার জন্যও হয়তো, আমার ব্যাপারে ওভার-প্রোটেক্টিভ হইতে চান, এবং কোনও কারণেই যাহাতে আমার মধ্যে কিছুই অনুসন্ধানের স্পৃহা না জাগে, তাহার জন্যই আমার চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতীয় আবেগের প্রাচীর খাড়া করিয়া রাখিতে চান। কে জানে, ছদ্ম পরিচয়ের মানুষকেই তো আসল পরিচয় ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বেশি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বাঁধন যাহাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢিলা না হইয়া পড়ে, সেই কারণেই বেশি শক্ত করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করে; অথচ ইহাও সত্য যে শেষ পর্যন্ত সব বজ্র আঁটুনিই ফসকা গেরোতে পর্যবসিত হয়। এসব অবশ্য নেহাত ভাবনাই।

তো সে যাহা হউক, আপনার সম্পর্কে আমার তেমন কোনও অভিযোগ, নেতিবাচক মানসিকতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক, আমার মধ্যে যখন হইতে একটু একটু করিয়া নিজেকে জানিবার, বুঝিবার আগ্রহ সঞ্চারিত হইতেছিল তখন হইতে খুব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজনেই, আপনি মানুষটাকেও যেন জানিতে-বুঝিতে হইতেছিল। কেন না, আমার আমিত্বের অনেকটাই তো অধিকার করিয়াছিল আপনার আপনত্ব। এ যেন সেই রবীন্দ্রনাথের কথামতোই 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে তোমায় জানা'।.....যদিও ওঁর সেই 'তোমায়' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর অথবা দেবতা....কিংবা রবীন্দ্রনাথের মননে যিনি কখনও নাথ, স্বামী অথবা শুধুই তুমি। অর্থাৎ কোনও একজন উপরওয়ালা। আর আমার ক্ষেত্রে নেহাতই আপনি— আমার পিতা, রক্তমাংসের মানুষ ডাক্তার শঙ্করপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দেবতা নন।

কিছু পূর্বেই যে ঝাঁকানির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আমার অনুভূত হয় এই পর্যায়ে আসিয়া। বলা বাহুল্য, এই সময় নিজের সম্পর্কে সচেতন হইতে হইতে, আপনার বিষয়েও যেসব তথ্য, খবরাখবর জানিতে পারিতেছিলাম, তাহাতেই হঠাৎ-হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খাইতেছিলাম। আমি যে আপনি মানুষটির ব্যাপারে অনুন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা কিন্তু সত্য নহে। কলেজের হস্টেলে থাকিয়া সেই সুযোগই বা আমার কোথায়!

কিন্তু যেহেতু তখন আমি আর আগের মতো ঘরকুনো ছিলাম না, মেলামেশার পরিধি বিস্তৃত হইতেছিল, মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, আবার হস্টেলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এদিক-সেদিক বাহির হইয়া পড়িতাম—এইসবের মধ্য দিয়াই অনেক কিছু আপনা আপনি আমার গোচরে আসিতেছিল। কত কী যে জানিতে পারিতেছিলাম। আর একইসঙ্গে বিস্ময় বেদনা আনন্দ অনুভব করিতে করিতে ভাবিতাম, সত্যই আমার ভুবন কী সঙ্কুচিতই না ছিল! কিংবা আপনার স্থিরীকৃত বেষ্টনীর মধ্যে বড় হইতে হইতে, দুইটি দশক জীবদ্দশায় জগৎটাকে কী ক্ষুদ্র করিয়াই রাখিতে হইয়াছিল। একমাত্র লেখাপড়া করা, পরীক্ষায় ভালো ফল করা ব্যতীত, দুনিয়া মানুষ সমাজ প্রকৃতি..... কোনও কিছুকেই যেন জানিতে, বুঝিতে পারি নাই।

স্কুলের উঁচু ক্লাসের দিকে যেমন, পরবর্তিকালে বাঁকুড়ার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার পরেও, আপনি একেবারে প্রাইভেট টিউটরের মতো নিয়ম করিয়া আমাকে পড়াইতেন। প্রয়োজনে হাসপাতাল হইতে ছুটি লইয়া, প্র্যাকটিস কমাইয়া, আপনি আমাকে পড়াইতেন। আপনার সহিত সত্যি আর কোনও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তো গড়িয়া উঠে নাই। জীবনযাপন, দিনকাল, রাজনীতি খেলাধুলা শিল্প সংস্কৃতি....প্রভৃতি আর কোনও বিষয় লইয়াই তো আলোচনায় উৎসাহ বোধ করিতেন না আপনি। অথচ আমি টের পাইতেছিলাম, আরও বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা চতুষ্পার্শ্বে ঘটিতেছে। প্রথম প্রথম ওই সব কিছুকেই আপনার মানসিকতা অনুযায়ী এবং তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ভাবিতাম, অপ্রয়োজনীয়। ওইসবে লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়। বাহ্যিক সব ঘটনাই যেন লেখাপড়া করিয়া 'ভালোছেলে' হইয়া উঠিবার অন্তরায় এবং পরিপন্থী, কেননা 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মন্ত্র আপনি মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমশ আমি নিজেই বুঝিয়াছিলাম, প্রকৃত মানুষ হইতে গেলে, আবদ্ধ থাকিলে চলে না। জীবনটাকে বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে চাহিলে, খোলা মনের প্রয়োজন, বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন, মেলামেশার প্রয়োজন। বহির্বিশ্ব আমাকে টানিতেছিল। আমাদের বর্ধমান মেমারি ছাড়াও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি, মাতুলালয়, কলিকাতাতেও মাঝেমধ্যে যাতায়াতে, বেড়াইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম।

এই সময়েই, আপনা হইতে আমাদের পরিবারের কত সব অতীতের কথা জানিতে পারিতেছিলাম। আপনার কথাও। অনুমান করিয়াছিলাম, আপনার অতীত জীবন, ছাত্রাবস্থাও, যেন কিছুটা আমার মতোই ছিল, তবে তফাত এই যে, সম্ভবত আপনারটি ছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং আমার ক্ষেত্রে তা ছিল বাধ্যতামূলক। আপনার জীবনে যে নারীঘটিত ব্যাপারে একবার পদস্খলন হইয়াছিল, কানাঘুষো এই সংবাদটি শুনিয়া আমি একেবারে তাজ্জব হইয়া গিয়াছিলাম। এমনকী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসও করি নাই। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম, অবিশ্বাসেরই বা কী আছে! সুযোগ পাইলে একটি মেয়ের সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছা কি আমারও হয় না!

মিথ্যা বলিয়া লাভ নাই। হয়। এবং বর্তমানে আমার একটি বান্ধবীও আছে, মেলামেশাও আছে। তবে খোলামেলা সম্পর্কটি আছে বলিয়াই জানি, হঠকারীর মতো কিছু ঘটনায় আমরা উদ্বেগ ডাকিয়া আনিব না। হয়তো তেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা হইত, যদি আমার মধ্যে নিজেকে দমন করিয়া রাখিবার বাধ্যতামূলক ভয় এখনও থাকিত। আপনি আশাহত হইলেও, মনে মনে আমি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ভাবিয়া আমার ভালো লাগে।

কিঞ্চিৎ নিজের পরিকল্পনার বিষয় আপনাকে জানাই। আমার সিদ্ধান্তও বলা যায়।

না, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, ডাক্তারি পড়ায় আমি ইস্তফা দিব না। মেডিক্যাল-এর চতুর্থ বর্ষে পৌঁছিয়া, আর সে ঝুঁকি আমি লইতে পারি না। একেবারে প্রথমদিকে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতার কথা চিন্তা করিলে এবং স্বাধীনভাবে ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকা নির্বাচনের সুযোগ ঘটিলে, আমি হয়তো ডাক্তারি পড়িতে চাহিতাম না। অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, প্রশাসনিক কাজ, শিক্ষকতা করা এইসবের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। তো সে যাক, ভাবিয়া দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে চিকিৎসক হইয়াও আমি কিছু কিছু মনের মতো কাজ ইচ্ছা হইলে করিতে পারিব। এই কারণেই পারিব, কেননা আমি 'আপনার মতো' চিকিৎসক হইব না।

আমি চটকদরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হইব না। আমার ইচ্ছা কমিউনিটি প্র্যাকটিশনার হওয়ার। গ্রামদেশেই বসবাসের ইচ্ছা এবং গ্রামের ডাক্তার হিসেবে জীবন গড়িব। গ্রামে বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা সাধারণ চিকিৎসকের প্রয়োজন ঢের বেশি, এবং মনে হয়, সেই কাজে আমিও আমার তুষ্টি খুঁজিয়া লইব। আমি জানি, আপনি চূড়ান্ত নিরাশ বোধ করিবেন। কিন্তু আমার কিছু করার নাই। সামান্য একটু অতিরিক্ত কারণও আছে।

আমার বান্ধবীর কথা একটু আগে উল্লেখ করিয়াছি। নামটি বেশ মিষ্টি। দোয়েলপাখি। কিন্তু বংশনাম বা পদবিটি আমি জানি আপনার পছন্দ হইবে না, কেন না দোয়েলরা তফশিল জাতির অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়। হেমব্রম। তফশিল সম্প্রদায়ের ছাত্রী হিসাবেই ও সংরক্ষিত আসনে মেডিক্যালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান্স পাইয়াছিল এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজে আমার সহপাঠিনী। দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই আমরা পরিচিত। ক্রমশ পরিচয় বন্ধুত্বে এবং বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে। অস্বীকার করিব না, আমরা একটি সম্ভাব্য পরিণতির স্বপ্ন দেখি। আমাদের ভাবনায় মিল আছে। দোয়েলও গ্রামদেশে প্র্যাকটিস করিতে চায় ভবিষ্যতে। ডাক্তারির পাশাপাশি কিছু উন্নয়নের কাজও। বৎসরের গোড়ার দিকে দোয়েল উহাদের গ্রামের বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বাঁকুড়া জিলারই প্রত্যন্ত গ্রাম, মেদিনীপুর সীমান্তের কাছাকাছি ফুলকুসমা-য় গিয়া আমার খুবই ভালো লাগিয়াছে। নিবিড় নির্জন ছায়াশীতল পরিবেশ, গাছপালা পরিবৃত শান্ত প্রকৃতি। বাড়িতে হাঁস -মুরগি, গরু আছে। আমি অবশ্য অনুমান করিতেছিলাম, বর্ষাকালে এই গ্রামেরই কী চেহারা হইতে পারে। তথাপি প্রকৃতি পরিবেশ, ওদের বাড়ির মানুষজন বাবা-মা-ভাইবোন সব মিলিয়া আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে। আমি অনুমান করিতে পারিতেছিলাম, দোয়েল বিশেষ করিয়া ওর মা-কে আমাদের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে জানাইয়াছে। তাহাতে আমারই বা আপত্তির কী। মধ্যবয়সিনি মহিলার আমার সম্পর্কে কৌতূহলটি আমি বেশ উপভোগ করিতেছিলাম।

পড়ন্ত বিকালের দিকে হাঁটাপথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। দোয়েলের নানান পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য। তফশিল সম্প্রদায় হইবার সুবাদে ইতিমধ্যে নিকট গ্রাম ঢেকুয়া-তে স্বল্পমূল্যে কিছু জমি কিনিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসালয় করিবার জন্য ও বিডিও অফিসে আবেদন করিয়াছে। আমাকে তাহা দেখাইতে গিয়াছিল। ওর মা-ও গল্প করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিলেন। মহিলা বেশ বুদ্ধিমতী এবং সপ্রতিভ। আমাদের বাড়ি বর্ধমান জিলায় শুনিয়াই বোধ হয় অধিক উৎসাহিত বোধ করিতেছিলেন, কেন না ওঁর পিতৃগৃহ ছিল বর্ধমান জিলায়। নানান খোঁজখবর লইতেছিলেন। যতদূর মানে হয়, খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসাবে উনি আপনার নামও শুনিয়া থাকিবেন। তবে ইদানীং আর সর্বকাল শহরে যাইতে পারেন না। পিতৃগৃহও নাই। কী নাকি এক জটিল পরিস্থিতির শিকার হইয়া ওঁরা সপরিবারে বর্ধমান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। এমনকী এফিডেবিট করিয়া সন্ধ্যা নাম বদল করিয়া সুচেতনা লশকর হইয়াছিলেন। আরও নানান কথাবার্তার মধ্য দিয়া, আমার মানসিকতা সম্পর্কে সুচেতনাদেবীর মনে যে একটি দোলাচল রহিয়াছে অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। তাহার কারণ যে আমার বংশপরিচয়, না বুঝিবার কিছু নাই। কিন্তু ওঁদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা যথাসম্ভব আমি কাটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি, কেন না দোয়েলকে আমি ভালোবাসি।

আপনাকে সবিস্তারে এই প্রথম আমার ভাবনা, মানসিক অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত জানাইতে পারিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছি।

খবর ৩৬৫ দিন, ১৮ নভেম্বর ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল বাতির নিষেধ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভগবানপুর থেকে বোন তৃষ্ণা চিঠি লিখেছে রমিতকে। অফিস থেকে ফিরে বাগ-বাজারের মেসের দোতলার ঘরে তক্তপোশের বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রমিত সেই চিঠি পড়ছিল।

আজকাল কি কেউ কাউকে সহজে চিঠি লেখে? চিঠি লেখার দিন বোধ হয় শেষ। এখন মুঠোফোনে এস এম এস পাঠাবার যুগ। পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে বিজ্ঞাপনেও তো এখন উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বারবার; 'পাঠান এস এম এস কাগজ বাঁচান ...।'

ভগবানপুর (পূর্ব মেদিনীপুর) থেকে কি কলকাতায় মুঠোফোনে কথা বলা যায় না? কেন যাবে না। নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু রমিতের ওই যন্ত্রটি থাকলেও তৃষ্ণার তো নেই। তৃষ্ণা চায় না বলেই নেই। কত বার রমিত বোনকে সাধেছে যে, তোকে একটা মোবাইল সেট কিনে দিই। সস্তা মডেলই না হয় নে। তাতে লাভটা হবে এই—প্রতিদিনই আমরা ইচ্ছেমত কথা বলতে পারব, বাড়ির খবর-টবর নিতে পারব। মায়েরও দিন দিন বয়স হচ্ছে, শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না মায়ের। আজকাল কলকাতায় বসে থেকে তোদের দু'জনের জন্যে আমার বড় চিন্তা হয় রে ...।

কিন্তু বরাবর তৃষ্ণার সেই এক গোঁ, একই জবাব। ... নাহ্ দাদা, মোবাইল-টোবাইল এখন আমার দরকার নেই। এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। সারাদিন কানে ফোন লাগিয়ে কথা বলার মতো আমার অত পরিচিত লোকজনও নেই। যদি কোনও দিন দরকার হয় নিশ্চয়ই কিনব একটা মোবাইল। তবে সেটা আমার চাকরির পয়সাতে।

এটা ঠিক। অজ গাঁয়ে পড়ে থেকেও, নিজের পায়ে দাঁড়াবার, একটা ভদ্রস্থ চাকরি খুঁজে নেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তৃষ্ণা। তার সেই আত্মবিশ্বাসকে কোনও দিনই দমিয়ে দিতে চায় না রমিত। তাই সে বলে যে ভাবে তুই পরিশ্রম করে যাচ্ছিস, চাকরি তুই একটা পাবিই পাবি। ঠিক আছে তখন না হয় নিজেই একটা মোবাইল কিনে নিবি, তত দিন পর্যন্ত না হয় ...

তত দিন পর্যন্ত আমি প্রয়োজন মতো তোকে বাড়ির সব খবর জানিয়ে একটা করে চিঠি লিখব দাদা। আমার চিঠি লিখতে যে কী ভাল লাগে। চিঠি পেতেও ভাল লাগে।

রমিত বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ সব কথা থেকে কি স্পষ্ট নয় যে,

AMARBOI.COM

চব্বিশ বছরের তৃষ্ণার এখনও কোনও প্রেমিক জোটেনি? কী করে জুটবে? কালো, অসুন্দর, দাঁত উঁচু মুখের তৃষ্ণাকে কে আর ভালবাসবে? প্রেমিক জোটাতে গেলেও অনেক কোয়ালিফিকেশন দরকার। অথচ মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রমিতের একটা বিয়ে দেওয়ার জন্য। রমিত কলকাতার মেসে পড়ে থাকুক। বউ থাকবে গ্রামের বাড়িতে। এক জন সঙ্গী হবে মায়ের। কিন্তু বোনের বিয়ে না দিয়ে রমিত বিয়ে করে কী ভাবে? আর চাকরি না পেলে বিয়ে করবে না, এটা তৃষ্ণার ধনুর্ভঙ্গ পণ ...।

তৃষ্ণার চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে রমিতের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নীল খামের এক একটা অক্ষর যেন এক একটা অশ্রুবিন্দু। তৃষ্ণা লিখেছে, 'দাদা, এ বারের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অনেক ভাল রেজাল্ট করে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন বোধ হয় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।' ... কেন? কেন? রমিত চিঠিটার ওই অংশটা বারবার পড়েছিল। প্রথম দিনের পরীক্ষা দিতে গিয়েই ভয়ানক বিপর্যয়। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা-কেন্দ্রে পৌঁছতেই পারেনি তৃষ্ণা। পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার প্রায় দু'ঘন্টা পর সে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয়। তৃষ্ণার আক্ষেপ হল, এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম দিনেই সে যদি ঠিকমত পরীক্ষাটা দিতে না পারে, তা হলে সে অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কী ভাবে? আর তার এই বিপর্যয়ের মূল কারণ হল কী? ... একটা লাল বাতির গাড়ি। ...

চিঠির এই অংশ পর্যন্ত পড়ে কৌতূহলে রমিতকে নিজের আধশোয়া ভঙ্গি বদলাতে হয়। সে বিছানাতেই শিরদাঁড়া সোজা করে বসে ও একটা সিগারেট ধরায়। মেসের দোতলার স্যাঁতসেঁতে এই ঘরে দু'পাশের নোনা ধরা দেওয়াল ঘেঁষে দুটো মলিন বিছানাসমেত তক্তপোশ। একটা রমিতের। অন্যটা বরদাচরণবাবুর। পদবি সাহানা। বয়েস প্রৌঢ়। বেসরকারি অফিসের চাকুরে। এই মেসে রমিতের থেকে অনেক সিনিয়র। প্রায় পনেরো বছর আছেন। রমিত তো সবে আট পেরিয়েছে। বরদাচরণের বাড়ি বাঁকুড়ার রাজগ্রামে। কী একটা পারিবারিক কারণে কয়েক দিন ছুটিতে। তাই ক'দিনের জন্যে এই ঘরটার মালিক রমিত। এখন রাত ঘন হয়ে নামছে। মেসটা গলির মধ্যে হলেও ঘরে ফিরে যাচ্ছে এমন ট্রামের ঠং ঠং, শেষ প্যাসেঞ্জারগুলো নিয়ে বাসের বিষণ্ণ হর্ন কানে আসে। কলকাতা ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়বে। রমিতেরও ভরা পেটে হাই উঠছিল। ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু ঘুমোনো যাবে না। বোনের হাহাকারময় চিঠিটা তাকে শেষ করতেই হবে। তাই সিগারেট। ঘরের মেঝেটাই ছাইদানি।

তৃষ্ণার চিঠি থেকে যা জানা গেল, ব্যাপারটা এ রকম ঘটেছিল। ... প্রথম পরীক্ষার দিন সকালে রিকশাতে চেপে তৃষ্ণা আসছিল স্টেশনে। সকাল ন'টা পনেরোর লোকালটা ধরবে বলে। ট্রেনে তিনটে স্টেশন যাওয়াব কথা তার। তার পরের স্টেশনে নেমে রিকশা ধরার কথা। রিকশাতে মিনিট পাঁচ-সাত লাগার কথা পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে। তার মানে সব কিছু ঠিকঠাক চললে সকাল ন'টা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই তৃষ্ণার পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু। কিন্তু সব কিছু তো ঠিকঠাক চলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। সে-দিন ... অন্তত তৃষ্ণার পক্ষে তো নয়ই ...।

সেদিন তৃষ্ণাকে সওয়ারি করে রিকশা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছনোমাত্র দেখা গিয়েছিল বৃত্তাকারে পুলিশের সারিবদ্ধ পাহারা। কোনও গাড়িকে (এমনকী রিকশা এবং ঠেলাগাড়িকেও নয়) রাস্তার এ-পার থেকে ও-পারে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ... কারণ কী? .. ভি আই পি আসছেন। কোন এক ডাকাবুকো মন্ত্রী ভগবানপুর এলাকায় মিটিং করতে আসছেন। তিনি 'যে কোনও মুহূর্তে' 'পাশ' করবেন হাইওয়ে দিয়ে। তাঁর 'কনভয়' যতক্ষণ না চৌরাস্তার মোড় পেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নিরাপত্তার কারণে কোনও গাড়িকেই পুলিশ পারাপার করার অনুমতি দিতে অপারগ।

তৃষ্ণার তেতাল্লিশ লাইনের চিঠিটা দু'বার তন্নতন্ন পড়া শেষ। বাইরে রাত আরও নিঝুম। এখন নৈঃশব্দ্যের গতানুগতিক জাল মশারির মতন ছড়িয়ে পড়েছে চার পাশে, রমিত বেশ কল্পনা করতে পারছে। বিছানা থেকে কোমর বেঁকিয়ে উঠে সে ঘরের বেমানান টিমটিমে আলোটাকে নিভিয়ে দিল। তার পর অন্ধকারে নিজের ময়লা বিছানায় শুয়ে রইল চুপচাপ। এ সব মুহূর্তে ঘুম না এলে রমিতের মনে হয়, সে জলের অতলে ভাসমান। এ সব মুহূর্তে চোখ খুলে রাখা কিংবা বন্ধ রাখা দুই সমান। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে রমিত চোখ খুলেই রাখল। এবং থেমে থাকা রিকশায় তৃষ্ণ বিরসবদনে বসে আছে; এর পর থেকে সে, (তৃষ্ণা যেমন লিখেছে এ ভাবে) ঘটনাগুলো ভিসুয়ালাইজ করতে চাইল ...।

থেমে যাওয়া রিকশাতে বসে বিরক্তমুখে ঘড়ি দেখল তৃষ্ণা। ন'টা বেজে ঘড়ির কাঁটা প্রায় দশের ঘরে। সামনে মুখ তুলে তাকাল। পিঁপড়ের সারির মতন ট্রেকার, বাস, মাল বোঝাই টেম্পো, রিকশা, রিকশা, রিকশা, আর সাইকেলের জটলা। কী করবে এখন তৃষ্ণা? হায় ভগবান! এখনও স্টেশনে পৌঁছতে হাইওয়ে ধরে বেশ কিছুটা যেতে হবে। তার পর টিকিট কাটা। তৃষ্ণা তো আর নিত্যযাত্রী নয় যে, তার মান্থলি থাকবে। রিকশার সামনে লাঠি হাতে, বেমানান খাকি পোশাকে প্যাংলা চেহারার এক জন হোমগার্ড বেশ বীরদর্পে ঘোরাঘুরি করছিল। পান চিবোচ্ছিল। পিক ফেলছিল মাঝে মাঝে। তৃষ্ণা হোমগার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল দাদা, আমার চাকরির পরীক্ষা আছে। দশটায় শুরু। ন'টা পনেরোর লোকালটা ধরতে হবে। আমার রিকশাটাকে একটু ছেড়ে দিন না।

— ভি আই পি পাশ করে গেলেই সব গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে ...

— দাদা, প্লিজ এই লোকালটা মিস করলে আবার সেই ন'টা পঞ্চান্নয় ...

— কেন ভ্যাজর ভ্যাজর করচেন? বলচি না ভি আই পি ... পানের লাল রসের রঞ্জিত হোমগার্ডের ঠোঁট, দাঁত। জহ্লাদের দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল তৃষ্ণার মুখের দিকে নয়, বুকের দিকে। ইতিমধ্যে তৃষ্ণার রিকশাচালক কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়ে তার রিকশাটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। তার দিকে রক্তচক্ষু হেনে আইনের পেটরোগা রক্ষক রিকশার হ্যান্ডেলে দিয়েছিল এক ডান্ডার বাড়ি—শুয়োরের বাচ্চা, লাইন ভাঙচিস কেন? বড় তেল হয়েচে না? ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ হয় সাত মিনিটেরও বেশি রিকশাতে নিরুপায় বসে থাকার পর ছ'সাতটা গাড়ির কনভয় নিয়ে অবশেষে সেই ভি আই পি চৌরাস্তাটুকু পেরিয়ে গিয়েছিলেন। দুধ সাদা গাড়ির মাথায় দপদপ করে জ্বলতে থাকা লাল বাতির অহঙ্কার দেখে তৃষ্ণা অনুমান করেছিল ওটাতেই তিনি ...।

নাহ্, সেদিন ন'টা পনেরোর লোকাল তৃষ্ণার পক্ষে ধরা সম্ভব ছিল না। জটিল যানজট পেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছতেই পনেরো মিনিট লেগেছিল। তৃষ্ণা ঘামতে শুরু করেছিল। টিকিট কাউন্টারের সামনে দেখেছিল সর্পিল লাইন। তৃষ্ণার মাথা কাজ করছিল না। ট্রেনে যাবে না বাসে? কে যেন তাকে বলেছিল বাসে গেলেই পরীক্ষাকেন্দ্রে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। সেই বাসে ওঠাই অবশ্য চরম ভুল হয়েছিল। স্টেশনকে অনেক দূরে রেখে, লোকাল বাস হাইওয়ে ধরে ঢিকির ঢিকির করতে করতে, এক একটা স্টপেজে অনেকক্ষণ ধরে মালপত্র-প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, আবার মালপত্র-প্যাসেঞ্জার তুলে ঘুরে ঘুরে, থেমে থমে, বেতো ঘোড়ার মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন বিক্রমপুর হাইস্কুলের (তৃষ্ণার পরীক্ষাকেন্দ্র) সামনে পৌঁছল, তখন সত্যিই ঘড়ির কাঁটা বেলা বারোটা ছাড়িয়ে গেছে।

মন্ত্রী কিংবা সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের গাড়িতে লাল বাতি জ্বলে কেন? সেই রাতে বহুক্ষণ না ঘুমিয়ে বিষয়টা নিয়ে অনেক ভাবল রমিত। সংবাদপত্রে প্রায়ই এ সব নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়, চিঠিপত্রও প্রকাশ হয় মনে পড়ল তাঁরাও-সব পড়ে তার যা মনে হয়েছে তা হল, গাড়িতে কারা লাল বাতি ব্যবহার করতে পারবেন এবং পারবেন না; এ সব নিয়ে বেশ গোলমাল আছে। মাঝে মাঝেই আদালত থেকে নানা ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সেই নির্দেশ ঠিকঠাক পালন করতে। দু'চার দিন ধর-পাকড় হই-হট্টগোল, মিডিয়ার তৎপরতা। তার পর আবার সব ধামাচাপা পড়ে যায়। মন্ত্রীদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। রমিতের ধারণা, অনেক মাঝারি মাপের সরকারি আমলা, যাদের গাড়িতে লাল বাতি ব্যবহার করা আইনসঙ্গত নয়, তারাও পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, লাল বাতির গাড়ি চড়ে এই শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কে কাকে বাধা দেবে? আইন ভাঙাই তো এই শহরের শ্রেষ্ঠ আইন।

আর মন্ত্রীদেরও বলিহারি যাই। সব সময়েই কি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চার দিক সচকিত করে, পথচারীদের ভিরমি খাইয়ে, সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে যে তাঁরা যাচ্ছেন। শুধু লাল বাতির গাড়ি নয়, তার সঙ্গে আরও কয়েকটি গাড়ির কনভয়! এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে সত্যিই কি মন্ত্রীদের এ ভাবে যেতে হয়? নাকি এটা সিস্টেম? এই 'সিস্টেম' ভাঙার বা প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস বোধ হয় কারও কোনও দিন হবে না। হায় সিস্টেম ...। অন্ধকারে, মেসের বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে রমিত ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল। সেদিন ভগবানপুরের রাস্তায় যে ভি আই পি মন্ত্রীর সৌজন্যে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ট্রাফিকের স্বাভাবিক গতি বন্ধ রাখা হয়েছিল তিনি কি কোনও দিন জানতে পারবেন, তার ফলে এক বেকার যুবতী কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে? এই ভাবেই লালচক্ষু, নির্দয়, ক্ষমাহীন 'সিস্টেম'-এর স্টিম রোলারের চাকায় সাধারণ মানুষের কত স্বপ্ন, কত অভিলাষ প্রতিনিয়ত পিষে যাচ্ছে। মন্ত্রীরা, উচ্চপদস্থ আমলারা কি তার খোঁজ রাখেন?

রমিতের সাদা শরীরে যেন কে লঙ্কা ঘষে দিয়েছে। তার সারা শরীর ব্যর্থ আক্রোশে জ্বলছিল! সে কী জ্বলুনি! মনে হচ্ছিল, বিছানা থেকে উঠে, এই মাঝরাতে, মেসের অপরিসর, নোংরা চানঘরে গিয়ে চৌবাচ্চা থেকে বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালে। অনেক কষ্টে সেই ইচ্ছে সংবরণ করল। এক বার মনে হল, সংবাদপত্রে তৃষ্ণার ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু তাতে ফল কী হবে? হয়তো ছাপা হবে সে চিঠি। পড়বেও দু'পাঁচ জন। পরিচিত দু'এক জন ফোনও করবে তাকে। জানাবে সহানুভূতি। ... ওই পর্যন্তই। কিন্তু তৃষ্ণা তো তার হারিয়ে যাওয়া সময়টা ফেরত পাবে না। আর রমিতের এই একটা চিঠি কি রাজ্য জুড়ে, শহর জুড়ে লাল বাতির এই নির্লজ্জ প্রদর্শন বন্ধ করতে পারবে?

পরদিন মিনি বাসে জানলার ধারের সিটে বসে অফিস যাচ্ছিল রমিত। রোজই এ রকম জানালার ধারের সিট পায়। তার ব্যাঙ্ক ডালহৌসিতে। বাগবাজারের মিনি বাস স্ট্যান্ড থেকে ওঠে বলে এই সুবিধা। গিরিশ পার্কের কাছে এসে বাস সিগন্যালে থেমে আছে। চার পাশে থেমে থাকা অন্যান্য যানবাহনের জড়াজড়ি। রমিত আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎই তার দৃষ্টি প্রখর হল। চোখ টানটান করে ভুল ভাবে সে দেখার চেষ্টা করল।

তার মিনিবাসের একেবারে গায়েই।

দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার। গাড়ির সামনে লাগানো আছে লাল বাতি। জ্বলছে আর নিভছে। রমিত মুখ নামিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। কার গাড়ি এটা? কোনও মন্ত্রীর? মনে হল না। মন্ত্রীর গাড়ি হলে সামনে 'পাইলট কার' থাকত। এবং সিগন্যাল সত্ত্বেও ট্রাফিক-পুলিশ সেই গাড়িকে আগে পার করে দিত। কারণ, মন্ত্রীদের সময়ের দাম আছে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। একটা মুহূর্তও যানজটে কিংবা সিগন্যালে নষ্ট করলে চলে না। তা হলে এ গাড়িটা কার? কোনও সরকারি আমলার?

গাড়ির ভেতরে যারা বসে আছে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রমিত। ... ও হরি! গাড়ির পেছনের আসনে বসে আছে দু'জন খোকা-খুকু! তাদের পরনে স্কুল-ইউনিফর্ম। পিঠে বই-খাতা বোঝাই স্কুল ব্যাগ। রমিতের মনে হল, বাচ্চা দুটো নিজেদের মধ্যে 'মক-ফাইট' করছে। গাড়ির চালকের অবশ্য সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। সে পাথর চোখে তাকিয়ে আছে সিগন্যালের দিকে।

গাড়ির সামনে লাল বাতিটা—দপ্‌দপ্ দপ্‌দপ্! হঠাৎ রমিতের মাথায় রক্ত উঠে গেল—দপ্‌দপ্ দপ্‌দপ্! সে ঝপ করে নিজের নিশ্চিত আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। তার পর অতটুকু বাসের খোলের মধ্যে অফিস টাইমের জমাট ভিড়ের ব্যূহজাল দু'হাতে ঠেলতে ঠেলতে, নানা রকম বিরক্তিকর এবং কটু মন্তব্য কানে নিতে নিতে সে বাস থেকে নেমে পড়ল এবং পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লাল বাতির গাড়িটার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, হ্যাঁ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেই মুহূর্তেই সিগন্যালের চোখ সবুজ এবং এবং থেমে থাকা গাড়িগুলো নড়তে লাগল সামনের দিকে। লাল বাতির গাড়িটাও হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। রমিত নিজেকে ঠিক সময়ে সরিয়ে নিয়েছিল। তা না হলে তার বাঁ পায়ের পাতার ওপর দিয়েই হয়তো ওই গাড়ির একটা চাকা চলে যেত। রমিতের মাথার আগুন তখনও নেভেনি। চার পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তার বাসটাও তাকে ফেলে চলে গেল। কী ভেবে সে বাস থেকে হঠাৎ নেমে পড়েছিল এখন আর যেন খেয়ালও হচ্ছে না। এখন সে কী করবে? অফিসে তো যেতে হবে? কিন্তু প্রত্যেকটা বাসেই এত ভিড়। ফুটবোর্ডে পা রাখাই সমস্যা। কী ভাবে মাঝ রাস্তা থেকে বাসে উঠবে?

চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক, মাথায় হেলমেট, হাতে ওয়াকি-টকি, ট্রাফিক পুলিশ। যান নিয়ন্ত্রণ করছে। রমিতের মনে হল, ওই আইনের রক্ষকটিকে তার কিছু বলা উচিত। সে সতর্ক ভাবে গাড়ির ভিড় সামলে পুলিশটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ...।

— এই যে শুনছেন? রমিত পুলিশটির উদ্দেশে বলল। অতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ। তাতেও না দমে রমিত বলল— একটা কথা বলেছিলাম ... রাস্তার দিকে চোখ, হাতের নানা রকম ভঙ্গি করে যান-নিয়ন্ত্রণ করছে লোকটা; রমিতের দিকে না ফিরেই বলল, এখন কথা বলার সময় নেই। এ বার নাছোড়বান্দার মতো রমিত বলে যাচ্ছিল— এই মাত্র একটা গাড়ি চলে গেল লাল বাতি জ্বালিয়ে।

... গাড়ির ভেতরে কোনও মন্ত্রী দেখলাম না, কোনও অফিসারও ছিল না, শুধু দুটো স্কুল গোয়িং বাচ্চা ছেলে ... এ সব কী হচ্ছে এটা? দেশে আইনকানুন কি একেবারে নেই? আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে সরকারি গাড়িতে লাল বাতি জ্বালিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যাবে? এতক্ষণে এ প্রান্তের সিগন্যালের চোখ লাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ গাড়ির যাতায়াত থেমে গেছে। এখন রাস্তার অন্য প্রান্তের সিগন্যাল সবুজ। সে-দিককার দায়িত্বে অন্য ট্রফিক পুলিশ। সে কারণেই বোধ হয় এ প্রান্তের লোকটা রমিতের কথার উত্তর দেওয়ার মতো ফুরসত পেল। মাথার হেলমেটটা খুলে ফেল সে। দেখা গেল তার মাথার মাঝখানে টাক। ঘাড়ের কাছে এবং কানের কাছে শাড়ির পাড়ের মতন চুল। লোকটা একটুও না রেগে, হলদেটে দাঁত বের করে হেসে রমিতের দিকে তাকিয়ে বলল—মশায়, নিজের কাজে যাচ্ছেন যান। ফালতু ব্যাপার নিয়ে ভাবেন কেন? যে গাড়িটার কথা বলছেন ওটা শিয়োর কোনও ভি আই পি অফিসারের গাড়ি। কার গাড়ি আমি কী ভাবে জানব? চ্যালেঞ্জ করে বিপদে পড়ব? একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না?

— কী?

— ভি আই পি-রা শুধু নিজেরা ভি আই পি নন, ওঁদের ম্যাডাম, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সবাই ভি আই পি ...

— কিন্তু ... রমিত বোধ হয় আরও কীসব বলতে যাচ্ছিল।

— চোপ শালা। পুলিশটি হঠাৎই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। আর তখনই এ প্রান্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ট্রাফিকের চোখ সবুজ। শুরু হল গাড়ির পর গাড়ির হুশ্‌হাশ ছুটে যাওয়া ...।

অফিস ছুটির পর বিশ্রী ভিড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে রমিত একটু অন্য কায়দায় মেসে ফেরে। হেঁটে হেঁটে সে চলে আসে গঙ্গার ধারে বাবুঘাট পর্যন্ত। সেখান থেকে চক্ররেল ধরে একেবারে বাগবাজার। এ রকম আরামের রিটার্ন-জার্নি তার নিজের আবিষ্কার।

আজও সে রকম। হাইকোর্টের রাস্তা পার হয়ে চক্ররেল স্টেশনের দিকে সে হাঁটছে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সাদা গাড়ি। আর গাড়ির মাথায় লাল বাতি দপ্‌দপ্‌ দপ্‌দপ্‌। এতক্ষণ বাদে রমিতের খেয়াল হল এই শহরে, বিশেষত এই অফিসপাড়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিদিনই তার চার পাশ দিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে গাড়িরা এ রকম ছুটে যায়। সে কোনও দিনই তেমন খেয়াল করে না। আজ খেয়াল করছে, কারণ তৃষ্ণার ওই চিঠি। তৃষ্ণার চিঠি একটা সত্য কিংবা একটা অন্যায়ের ব্যাপারে তার চোখ যেন খুলে দিয়েছে। একটা অন্যায়, যা আমাদের চোখের সামনে হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। অথচ আমরা দেখেও দেখি না।

হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল রমিত। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। লালবাতিটা তখনও ঘুরে ঘুরে জ্বলছে। রমিত দেখতে পাচ্ছে এক জন মানুষ, অত্যন্ত খর্বকায়, পরনে সাফারি স্যুট, মাথায় চকচকে টাক গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল এবং হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল আউট্রাম ঘাটের দিকে। চোখ দুটো জ্বলে উঠল রমিতের। এই তো এক জনকে হাতের কাছে পেয়েছে সে। এক জন রাজপুরুষ। ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে। ওকে প্রশ্ন করতে চায়। তার বুকে অনেক প্রশ্ন জমে আছে; অনেক অভিযোগ ...।

রাস্তার ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে গাড়িটার কাছাকাছি এল রমিত। আরোহী নেই অথচ লাল বাতি তখনও। চালক একটা বিড়ি ধরিয়েছে।

— এটা কার গাড়ি? রমিত রুক্ষ ভাবে জিজ্ঞেস করল।

— সেটা আপনাকে জানাব কেন? চালকেরও রুক্ষ উত্তর।

— গাড়িতে যিনি ছিলেন তিনি নেমে গেলেন অথচ আপনি এখনও লাল বাতি নেভাননি? রমিত ধমকে উঠল। এই ধমকানিতে কাজ হল। লোকটা বাতিটা নিভিয়ে দিল।

একটু শুকনো স্বরে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি সাংবাদিক?

— ধরে নিন সে রকমই। আচ্ছা উনি কে?

— উনি এক জন বিরাট অফিসার। ...

সেক্রেটারি সাহেব।

— কোন দফতরের সেক্রেটারি?

— সেটা বলব কেন? ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন গে ...

— কোথায় গেলেন উনি?

— গঙ্গার হাওয়া খেতে। চেঁচিয়ে বলল লোকটা। তার পর বিড়ি টানতে টানতে তফাতে সরে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

নদীর ধারের চওড়া, বাঁধানো রাস্তা ধরে রমিত হাঁটছে। অনুসন্ধানী চোখ। গোধুলির এই সন্ধিক্ষণে এখানে মূলত প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। এদের মাঝে এক জন বয়স্ক আমলা ... প্রেম করতে এসেছে? অবৈধ প্রেম? ...

কিছুটা হাঁটতেই রমিত লোকটাকে দেখতে পায়। ওই তো ঝোপঝাড়ের মাঝে একটা বেঞ্চে একা বসে আছে। মাঝে মাঝে হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। এক জন বয়স্ক মানুষ নদীর ধারে বসে কাঁদছে?

... দৃশ্যটাতে কোনও রোমান্টিকতা নেই। হাস্যরস থাকলেও থাকতে পারে।

— নমস্কার। বসতে পারি?

— বসুন না। বেঞ্চে তো জায়গার অভাব নেই। ... টাকমাথা চোখ তুলে তাকাল। রমিতের অনুমান ঠিক। সজল চোখ।

— ইজ সামথিং রং?

— আপনি কে? ... আপনার পরিচয়টা জানলে ভাল হত ...

— আমি এক জন অতি সাধারণ মানুষ। একটা সামান্য চাকরি করি। মেসের বাসিন্দা। ভিড়ে ঠাসা বাসে-ট্রামে গলদঘর্ম হয়ে যাতায়াত করি। আপনার মতো পাওয়ারফুল ব্যুরোক্র্যাট নই। যিনি লাল বাতির গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ান। রাস্তার মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করেন না। — কথাগুলো স্পষ্ট ভাবে বলতে পেরে রমিতের খুব আনন্দ হচ্ছিল। লোকটা গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলাটা এক বার ঝেড়ে নিল। রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নিল।

তার পর খুব মিহি, প্রায় মেয়েলি স্বরে বলল—এটা ঠিক আজ সকাল পর্যন্ত আমি নিজেকে সত্যিই খুব পাওয়ারফুল ভাবতাম। ... ইয়েস আই অ্যাম আ ব্যুরোক্র্যাট ... আ ব্যুরোক্রাট! একটা সরকারি দফতরের কর্তা। আমার অধীনে অন্তত কয়েক গণ্ডা অফিসার আর কয়েকশো কর্মচারী কাজ করে। পুলিশ উঠতে বসতে আমাকে সেলাম ঠোকে।

... কিন্তু তাতে কী হল? ... অ্যাঁ? ... কী হল?

— হবে আর কী? সমাজের উপরতলায় বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে ক্ষমতা উপভোগ করছেন?

— ক্ষমতা ... উপভোগ? ... আজ সকাল পর্যন্ত ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাতাম। এখন আর ভাবি না। এই একটা ই-মেল আমার সব অহঙ্কার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এটা সেই ই-মেল-এর প্রিন্ট আউট। আমার ছেলে পাঠিয়েছে। ... বেঙ্গালুরু থেকে। আমার একমাত্র ছেলে। ওখানে চাকরি করে। বড় চাকরি। লোকটা একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরে। রমিত উৎসাহ পায় না কাগজটা পড়তে।

— কী লেখা আছে ওতে?

— ছেলে জানিয়েছে সে বিয়ে করেছে ওর এক জন মরাঠি কলিগকে। রেজিস্ট্রি করেছে। অনেক দিনের সম্পর্ক নাকি ওদের। অথচ আমাকে আগে কিছুই জানায়নি। কী আশ্চর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখুন। অথচ কত দিন ধরে আমি ভেবে আসছি যে, ছেলের জন্যে পাত্রী আমি পছন্দ করব। ঘটা করে ওর বিয়ে দেব। পার্টি থ্রো করব তাজ বেঙ্গলে বা ক্যালকাটা ক্লাবে। আর সেই ছেলে বিয়ের ব্যাপারে আমার কাছে কোনও পারমিশান চাওয়ার দরকারই মনে করল না। তা হলে আমার এত প্রভাব, প্রতিপত্তি, অথরিটি, এ সবের দাম কী বলুন? আমার ছেলের কাছেই তো আমার কোনও মূল্য নেই ...

— ওর মা কী বলছেন?

— ওর মা? ... তিনি তো বছর দশ আগে এক জন পেন্টারের সঙ্গে চলে গেছেন। এখন বোধ হয় দিল্লিতে থাকেন। ডিভোর্স চেয়েছিলেন। আমি দিয়েছি। উনি বলেছিলেন, তোমার মধ্যে কোনও ক্রিয়েটিভিটি নেই। তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। তার পর থেকে ওই ছেলেই ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। আজ সেই ছেলেও আমাকে ...। ... নাহ্ আমি আর কাউকে চাই না। আমি একা বাঁচব। আমি কারও সিমপ্যাথি আশা করি না। আমার সবাই একা। আমরা সবাই ফাঁপা। ...

রমিতকে অবাক করে হাতের বিচিত্র ভঙ্গিসহ লোকটা আউড়ে যাচ্ছিল— we are the hollow man, we are the stuffed men, headpieces filled with straw ...

তারপর একটু থেমে রমিতের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল— মনে রাখবেন, বিশেষত, আমরা, এই আমলারা, সত্যিই ফাঁপা মানুষ, আমাদের মাথাভর্তি খড়, খোপরিমে খড় ... হাঃ হাঃ হাঃ লোকটা হেসেই চলেছে ... হেসেই চলেছে ...

রমিতের মনে হল, হাসিটা কী রকম যেন অস্বাভাবিক। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

রমিত দ্রুত রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল ...।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জুন ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্বৈত

নচিকেতা

সন্ধ্যেবেলা আড্ডা মারছিলাম রকে বসে, আমরা গোটা চারেক বন্ধু। শীতকালের সন্ধে, দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলি কেমন কুয়াশার ঘোমটা ঢাকা বিধবা পিসিমার মতো। বাইরে লোক খুব একটা নেই, আমরা মূল রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি মাঠের মধ্যে নিজেদের বানানো কাঠের রকে বসে, অন্ধকারে। একটা সময় কথাবার্তার মোড় ঘুরে এল আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে। বিষয়—নেলসন ম্যান্ডেলা। আমরা প্রাথমিক পর্বে নেলসনের গুণকীর্তন করেই চলেছিলাম। তাঁর তেইশ বছর জেলের অন্ধকারের মধ্যে থাকা, বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে অধিকারের লড়াই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন সময় ছায়ার মতো এক জন প্রবেশ করল আমাদের আড্ডায়। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি তাঁর উপস্থিতি। আমাদের মধ্যে অনিন্দ্যই প্রথম সমালোচনার সুর ধরল, "কিন্তু যাই বল, নেলসন জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স করে ভাল করেননি। অথচ ভাব, এই স্ত্রীই নেলসনের আবর্তমানে অর্থাৎ জেলে থাকার সময় নেলসনের আন্দোলনকে এতদূর নিয়ে এসেছিলেন, এটা খুব অমানবিক কাজ হল না?"

চন্দন বলে উঠল, "এটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়, উনি কার সঙ্গে থাকবেন না থাকবেন বা, এটা তো উনি নিজেই ঠিক করবেন। এ সব বলে ওঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে কলঙ্কিত করার কোনও মানেই হয় না। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই।" হঠাৎ ছায়ার মধ্যে থাকা ছায়ামূর্তিটা বলে উঠল, "আচ্ছা! তাই নাকি?" আমরা চমকে তাকিয়ে দেখি ছায়ার মধ্যে, কখন মানুষটা এসে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে বুঝতে পারিনি। ছায়ামূর্তিকে সনাক্ত করা গেল—ঘটাদা! ঘটাদা আমাদের পাড়ারই এক জন, আমাদের থেকে বছর দশেকের বড়। ঘটাদা সম্পর্কে এক কথায় কিছুই বলা সম্ভব নয়। সে বড় কঠিন কাজ। কারণ, ঘটাদা সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের ধারণাই পরস্পর বিরোধী। কেউ ভাবেন ঘটাদা এক জন নির্বোধ মানুষ, কেউ ভাবেন ঘটাদা এক জন বোধ সম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ। সুতরাং এ হেন মানুষ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করতে চাওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে, আমরা ঘটাদা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই ঘটাদাই ছায়ার মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে বলল, "আচ্ছা! তাই নাকি?"

আমরা চুপ। বুঝতে পারছি না ঘটাদার পরের কথা কোন রুট নেবে। তার পর বললেন, "হ্যাঁ। তাই নাকি। নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রীকে ডিভোর্স করা রাজনৈতিক বিষয় নয়? আচ্ছা

AMARBOI.COM

তোরা ভেবে দেখেছিস? তেইশ বছর বাদে নেলসন মুক্ত হল জেল থেকে, সারা পৃথিবীর মিডিয়া হামলে পড়ল, নেলসন রাতারাতি হিরো। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারও গাদা গাদা গেট বানাল সারা কলকাতা জুড়ে—স্বাগত নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন এলেন-দেখলেন-চলে গেলেন, ভিনি-ভিডি-ভিসি। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণের মানুষগুলোর কী উপকার হল, কী লাভ হল? আমরা যারা ভেবেছিলাম নেলসনের মুক্তি বর্ণবিদ্বেষী সরকারের মুখে ঝামা। তো কি হল? পর্বতের মূষিক প্রসব! আমি যদি আবার বলি, এই গোটা ব্যাপারটা পুরো প্ল্যান। পুরোটা পূর্ব পরিকল্পিত। তেইশটা বছর খুব একটা কম সময় নয়। যদি বলি, এই তেইশ বছরে কারাগারে থাকার সময়ই আসল নেলসনের মৃত্যু হয় বা তাঁকে হত্যা করা হয়? কোনও এক look alike-কে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল নেলসনের ভূমিকায় থাকার জন্যে? যেটা ওই বর্ণবিদ্বেষী সরকারেরই প্ল্যান্ট করা বা বপন করা। এ বার সময় বুঝে তাঁকে মুক্তি দিতে সরকারের অসুবিধে কোথায়? এ বার সেই লোকটা মুক্ত হবার পর কী করতে পারেন? মূল আন্দোলনের স্রোতকে শ্লথ বা গতিহীন করতে পারেন। যেটা উনি করেছেন। সে মানুষটা সরকারের মদতে এতটাই Trained বা শিক্ষিত যে, তার ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তবু তাঁর ধরা পড়ার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়।—কার কাছে?" চন্দন সম্মোহিত ভাবে বলে উঠল, "তাঁর স্ত্রীর কাছে।" ঘটাদা হঠাৎ দু'হাতে তালি মেরে বললেন, "ইয়েস! অতএব নেলসন ম্যান্ডেলার তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স করাটা কি ব্যক্তিগত না রাজনৈতিক!"

কুয়াশা বেড়েই চলেছে। দূরের ল্যাম্পপোস্টগুলো ভেজা চোখে আলো দেখার মতো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। অনিন্দ্য হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, "তুমি কী বলতে চাও, ঘটাদা? আমরা যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে দেখি খবরের কাগজে, সে look alike?" ঘটাদা নাটকীয় ভাবে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কলেজের কেমস্ট্রির টিচারের মতো বলে উঠলেন, "Boy's! try to understand! What is what." তার পর আমার থেকে একটা সিগারেট চেয়ে সেটা কানে গুঁজে ঘাসের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে বললেন, "বেশ, তোদের একটা গল্প বলি, কাল—তিন হাজার পাঁচশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। সময়—দ্বি প্রহর। স্থান—উত্তর ভারতের বনাকীর্ণ এক পথ। শকটের ঘর্ঘর। আধুনিক ইতিহাস যাকে রথ বলে, তা আসলে ঘোড়ার গাড়ি বই কিছু নয়। বনাকীর্ণ পথে চাকার ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে চলেছে একটি রথ। দুটি ঘোড়ায় টানা। কৃষ্ণ বর্ণ ঘোড়া, দু'জন সওয়ারি, একজন সারথি। সারথি মধ্যবয়স্ক। সওয়ারিদ্বয় কৈশোর অতিক্রান্ত সদ্য যুবক। সারথি এই দুই সওয়ারির কৌতুকের পাত্র। আধুনিক ভাষায় টিজ্ করার পাত্র। দুই সওয়ারি ক্রমাগত শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতুকের ভাষায় সারথিকে খোঁচা মেরেই চলেছে। অথচ, সম্বোধন করে চলেছে খুল্লতাত বলে অর্থাৎ খুড়ো বলে। দুই সওয়ারি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেই চলেছে। দুই সওয়ারির একজন কালো চেহারার ও এক জন সাদা চেহারার। অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত বর্ণ। কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা বলে উঠল, "খুড়ো, এত তাড়াতাড়ি যাব না। আজ অনেক দিন বাদে গ্রামছাড়া হয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারথি মুখ ঘুরিয়ে বলে, "এর মানে কী?" পিছনে বসে থাকা শ্বেত বর্ণের সওয়ারিটি বলে, "ভাই যা বলছে তাই হবে।" সারথি গাড়ি শ্লথ করে। এক সময় গাড়ি দাঁড়ায়। তার পরে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কী চাও?" কৃষ্ণ বর্ণ মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো আমার খুব একটা যাবার ইচ্ছে নেই তোমাদের রাজধানীতে। আমার গ্রাম আমার কাছে স্বর্গ। সেখানে অপেক্ষায় বসে আমার বাপ, আমার মা, আমার নর্মচরীরা অর্থাৎ আমার প্রেয়সীরা। তাদের ছেড়ে যখন মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশকে একটু চিনি না কেন! আকাশকেই ছাদ ভেবে পৃথিবীর খানিকটা অংশকে ঘর ভাবি।" সারথি কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখে আবার প্রশ্ন করে, "কিন্তু কী চাও?" শ্বেত বর্ণের মানুষটা আবার বলে ওঠে, "ভাই যা বলবে, তাই হবে।" কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো, আমি এত তাড়াতাড়ি অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে চাই না। আমাকে একটু বেশি সময় প্রকৃতির কোলে থাকতে দাও।"

অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে সারথি আরও নির্জন বনাকীর্ণ পথ ধরল। দু'পাশে আদিম বৃক্ষের সারি, মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য, ঘন পল্লব ভেদ করে মাঝে মাঝে হানাদার আক্রমণ করছে ঠিকই, তবে সে হানা খুব জোরদার নয়। এরই মধ্যে রথের ভেতর জমে থাকা নানা জিনিসের আড়াল থেকে শ্বেত বর্ণ মানুষটা সন্তর্পণে একটি মদ্যপাত্র বার করল। তার পর পাশের মানুষটার দিকে তাকিয়ে কেমন সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "ভাই একটু পান করি?" ভাই মুখ টিপে হেসে বলল, "আমি নিষেধ করলে যেন কত শুনবে।"

এমন সময়েই অঘটনটা ঘটল। রথের চাকা বনাকীর্ণ পথের মাঝেএকটি গহ্বরে পড়ে ভেঙে গেল। সারথি রথ থেকে নেমে সব কিছু নিরীক্ষণ করে বলে, "রথচক্রের পরিবর্তন করতে হবে, তার আগে এই গহ্বর থেকে রথ তোলা বড়ই আবশ্যক। কারণ, একটু পরেই সন্ধে হবে। এই অরণ্য শ্বাপদসংকুলও বটে।" রথটা এমন একটা জায়গায় স্থির হয়েছে যে, জায়গাটা একটা উঁচুনিচু প্রান্তরের মতো, খুব একটা গাছপালা নেই। তিন জনের প্রচুর চেষ্টায় কিছুই হল না। আর এক এজন মানুষ হলেও তা সম্ভব হবে। এ দিকে সূর্য ডুবতে বসেছে—দূরে একটি উপত্যকার প্রান্তে সূর্য এসে দাঁড়িয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গা-ঢাকা দেবে। কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা এক দৃষ্টিতে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে। সবাই তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করল। দেখা গেল, দূরে সূর্য ডুবছে আর রক্তিম বর্ণ আকাশকে পিছনে রেখে এক জন মানুষ এগিয়ে আসছে।

এক দণ্ডকাল পরে, সবাই ঘর্মাক্ত কলেবরে মাটিতে বসে—রথের চাকা গহ্বর-মুক্ত। সারথি বলল, "এ বার আগুন জ্বালাতে হবে। কারণ রথচক্রের পরিবর্তন এই অন্ধকারে সম্ভব নয়। আজ রাতে এখানেই থাকতে হবে।" সারথি আগন্তুককে বলে, "আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, আমাদের সাহায্য করার জন্য।" আগন্তুক ধীর স্বরে বিনয়ের সঙ্গে বলে, "এ তো মানুষের ধর্ম।" সারথি খুশি হয় তার বিনয় দেখে। তার পর প্রশ্ন করে, "তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায়ই বা যেতে চাও?" আগন্তুক কেমন ইতস্তত করে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে বলে, "আমার নাম বিষ্ণু। এইটুকু জানাতে পারি, আমি এক জন ভাগ্যান্বেষী। ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরছি এর বাইরে কিছু প্রশ্ন করবেন না দয়া করে, তা জানানোর সময় আসেনি।" সারথি বিরক্ত হয়, "এ আবার কেমন কথা?" কৃষ্ণ বর্ণের মানুষটা সহাস্য বদনে বলে, "খুড়ো, কেন ওকে বিব্রত করছো, সাহায্যকারী ঈশ্বরেরই আর এক রূপ।" তার পর হেসে বলে, "তুমি কিছু মনে কোরো না বিষ্ণু। আমার নাম বাসু। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, তবে ঘুরতে ঘুরতে। আমার পাশে আমার ভাই বলদেব। যদি কিছু মনে না কর, আজ রাতে আমাদের অতিথি হতে পারো। এই রাতে এই বনাকীর্ণ পথ চলা নিরাপদ হবে না। তুমি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে আমরা খুশি হব।" এক দণ্ড পরে, দেখা গেল অরণ্যের মধ্যে আগুনের আভা। চার জন আগুনের পাশে বসে। বলদেব ততক্ষণে মৃৎপাত্রের অমৃতসুধা পানে রত হয়েছেন। সারথি রাতের ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত। বাসু এবং বিষ্ণু মুখোমুখি বসে। বাসু প্রশ্ন করে, "বিষ্ণু তোমার অতীত সম্পর্কে কিছু জানতে চাইব না, তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে আপত্তি আছে কি?" বিষ্ণু অদ্ভুত ভাবে হাসে। তার পর বলে, "যার অতীতই অন্ধকারের গর্ভে, তার আবার ভবিষ্যৎ কী।" বাসু বলে, "তার মানে কী? তোমার কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই নেই?" বিষ্ণু বলে, "ভাগ্য আমায় যে দিকে নিয়ে চলেছে, আমি সেই দিকেই চলেছি।" বাসু বলে, "সরল শক্তিশালী মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। আর তোমায় দেখে দুর্বল মনে তো হয় না।"

বিষ্ণু কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। সারথি ওদের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ওদের লক্ষ করে চলে। আগুনের আলোয় বিষ্ণুকে দেখা যাচ্ছে। গায়ের রঙ কৃষ্ণ বর্ণ। সম্ভবত ভারতের দক্ষিণ অংশের বাসিন্দা। ছিপছিপে চেহারা, চিতা বাঘের মতো ক্ষীপ্র। তার শরীরের পেশি দেখে বোঝা যায়—প্রয়োজনে তার ব্যবহার অকল্পনীয় হতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য তার দুটি চোখ। এত নির্বিকার এবং এত গভীর যে, মানুষ সম্মোহিত হয়ে যেতে পারে। সারথি মন দিয়ে বাসু ও বিষ্ণুর কথোপকথন শুনে যায়। বাসু মহাপণ্ডিত। তার কথা তার মেধা আজ প্রায় কিংবদন্তী। কিন্তু বিষ্ণু? এ মানুষটা কে? এক অজ্ঞাত কুলশীল অথচ কী তার পাণ্ডিত্য! কী মেধা! কী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। কী প্রচণ্ড বিশ্লেষণী শক্তি। কোনও অংশেই বাসুর চেয়ে কম নয়! রাত বাড়ে, দু'জন দু'জনের কথায় মুগ্ধ। দু'জন মানুষ যেন আয়নায় নিজেদেরই দেখছে। সারথি ভাবে এ রকম কি হতে পারে? একই রকম দু'জন মানুষ? এত মিল।

পরের দিন সকালে সারথি ঘুম থেকে উঠে দেখে বলদেব পাশে শুয়ে। কিন্তু বাসু আর বিষ্ণু নেই। সারথি চিন্তিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অরণ্যের ভেতর প্রবেশ করে দেখে একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে দু'জন ধনুর্বিদ্যাভাস করছে। সারথি দূর থেকে দেখে, দু'জনের কী আশ্চর্য দক্ষতা! কেউ কম যায় না। ধীরে ধীরে বিষ্ণু সহজ হয়ে আসে। সারথি দেখে বাসু আর বিষ্ণু দু'জনেই দু'জনকে ভীষণ ভাবে পছন্দ করে ফেলেছে। বলদেব খুব খুশি। কারণ, সে জানে ভাইয়ের সঙ্গে তার বুদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তর ফারাক। ভাই তার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলে খুব একটা সুখ পায় না। ভাই তার মনের মতো বন্ধু পেয়েছে, এতেই তার আনন্দ। আনন্দে একটু বেশি মাধবী পান করে ফেলে। সারথি বিষ্ণু ও বাসুর কথোপকথন শোনে নানা কাজের ফাঁকে। বাসু বলে, "আচ্ছা বিষ্ণু, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার কি মত?" বিষ্ণু বলে, "আচ্ছা, তুমি কখনও ভেবে দেখেছ, একটি দেশ মানে তো শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড নয়। দেশ মানে তো জনসাধারণও। জনসাধরণের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি কি সম্ভব?" বাসু মুচকি মুচকি হেসে বলে, "বলে যাও, বলে যাও। বেশ বলছ।" বিষ্ণু বলে, "অথচ দেখ যারা দেশ শাসন করে চলেছে সেই ক্ষাত্র শক্তি বা ক্ষত্রিয় শক্তি কী আশ্চর্য রকম জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন।" বাসু বলে, "তা হলে কী হওয়া উচিত?" বিষ্ণু বলে, "আমি জানি না। তবে এই সম্ভোগম ও কলহপরায়ণ মাৎস্যন্যায়ধর্মী নির্বোধ ক্ষাত্র শক্তির অধীনতা মুক্ত একটি শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন।" বাসু মুখ টিপে হাসে। বলে, "অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষ?" বিষ্ণু বলে, "ঠিক, এই রাজায় রাজায় কলহে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। আমি নিজে তার শিকার,"—বলেই বিষ্ণু চুপ করে যায়। বাসু হেসে বলে, "না বন্ধু, তোমার অতীত জানতে চাইব না।" বিষ্ণু হেসে ওঠে। সারথি ভাবে. কী আশ্চর্য ভাবে দু'জন মানুষের দর্শনের মিল।

দ্বিপ্রহর ভোজনের সময় বাসু প্রশ্ন করে, "বিষ্ণু, তুমি কি বিবাহিত?" বিষ্ণু লাজুক ভাবে বলে, 'না'। তার পর বাসুকে প্রশ্ন করে, "তুমি কি বিবাহিত?" বলদেব বলে ওঠে, "কোন মতে? গান্ধর্ব মতে কি?" তার পর সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। বিষ্ণু অপ্রস্তুতের মতো বলে, "আমি কি কিছু ভুল প্রশ্ন করেছি?" বাসু হাসতে হাসতে বলে, "না বন্ধু, তোমার প্রশ্ন সঠিকই ছিল। কিন্তু আমার উত্তর দেওয়াটা বড় কঠিন।" সারথি হাসতে হাসতে বলে, "আমাদের বাসু প্রতি সন্ধ্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" বিষ্ণু চুপ করে যায়। সবাই হাসাহাসি করেই চলে। সারথি লক্ষ করে বিষ্ণুর নারী সম্পর্কিত বিষয়ে একটু রক্ষণশীলতা আছে। এই একটি জায়গাতেই বাসুর সঙ্গে তার অমিল।

সন্ধেবেলা ওরা রথ থামায় এমন একটি স্থানে যার খুব কাছেই একটি শবরপল্লি আছে, এবং জানা গেল আজ তাদের উৎসব। বলদেব তো উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। কারণ, তার মৃৎপাত্র এখন প্রায় শূন্য। বাসু ছেলেমানুষের মতো বিষ্ণুকে বলল, "চলো ওদের উৎসবে যাই—শবর রমণীরা কিন্তু সত্যিই রমণীয়।" বিষ্ণু বলে, "না বন্ধু, আমার ওতে উৎসাহ নেই। তবে তুমি যেতে চাইলে তোমার সঙ্গে যাব, কারণ তোমার সঙ্গই আমার কাছে পরম প্রিয়।"

উৎসবের আনন্দে মত্ত সবাই। বলদেব প্রায় মত্ত অবস্থায় রমণীদের সঙ্গে নেচে চলেছে। বাসু রমণীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায় ব্যস্ত। সারথি অত্যধিক সুরাপানের ফলে প্রায় অচৈতন্য। বিষ্ণু চুপ করে বসে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক সময় বলদেব এসে তার পাশে বসে হাঁপায়। বিষ্ণু বলে, "সত্যি বলতে কী আমার কিন্তু ভালই লাগছে।" বলদেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "এ আর কী এমন, আমাদের গ্রামের হপ্তাশকের তুলনায় এ উৎসব তো ম্লান।" বিষ্ণু প্রশ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, "হল্লীশক আবার কী উৎসব?" বলদেব আর এক দফা নাচার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "সে উৎসব বাসুরই আবিষ্কার।" বলেই দৌড়ে চলে যায় রমণীদের মাঝে।

পরের দিন সকাল—সারথি ঘুম থেকে উঠে শোনে বাসুর একটু জ্বর এসেছে। সারথি ব্যস্ত হয়ে সবাইকে বলে, "এ বার আমাদের রাজধানীর দিকে যাওয়া উচিত। রাজধানী এখান থেকে প্রায় দু'দিনের পথ।" সবাই সম্মত হল। রথ ঘোরানো হল রাজধানী অভিমুখে। বেলা দ্বিপ্রহরের দিকে বাসুর শুরু হল ভেদ বমি, আগের রাতে শবরপল্লির খাবারে কোনও ভাবে বিষক্রিয়া হয়েছে তার। বিষ্ণু সারথিকে বলল, "খুড়োমশাই, যত তাড়াতাড়ি পারেন লোকালয়ে চলুন। এই মুহূর্তে বাসুর চিকিৎসা বড় আবশ্যক।" ঝড়ের গতিতে রথ ছুটে চলে। কিন্তু কোনও লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ সন্ধে এসে পড়ছে, বাসুর শরীরের অবস্থার অবনতি ঘটছে।

সারাটা রাত বিষ্ণু বাসুর মাথা কোলে নিয়ে শুশ্রূষা করে চলে। বলদেব তো কেঁদেই চলেছে। সকালের দিকে সারথির একটু চোখ লেগে এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখে বলদেব ঘুমোচ্ছে। বাসু শুয়ে আছে, তবে বিষ্ণুর কোলে মাথা দিয়ে নয়। বিষ্ণু অদ্ভুত ভাবে বাসুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারথি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, "কী হয়েছে?" বিষ্ণু সারথির দিকে তাকায়। বিষ্ণুর দুটো চোখ লাল হয়ে আছে। কাঁদতে না পারার যন্ত্রণায়। সারথি বুঝতে পারে, বাসু আর ইহলোকে নেই। এর মধ্যে বলদেব উঠে দাঁড়ায়। সব বুঝে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

বেলা বাড়ে। গাছের তলায় বাসুর দেহটা শায়িত। বলদেব কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বিষ্ণু চুপ করে বাসুর দেহটার দিকে তাকিয়ে বসে। অস্থির ভাবে পায়চারি করছে শুধু সারথি। তার মনের মধ্যে আকাশ-পাতাল হচ্ছে। তার গোটা অভিযানটাই নষ্ট হয়ে গেল। এখন বাসুকে যদি রাজধানীতে না নিয়ে যেতে পারে, তবে সেই মানুষগুলোকে কী বলবে সে, যারা বাসুর অপেক্ষায় দিন গুনছে। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ নদী। সারথি এগিয়ে যায় নদীর দিকে। মোহাবিষ্টের মতো নদীর জলে নেমে যায়। তার পর গলাজলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকে দূরে বাসুর দেহটা আর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুকে দেখা যাচ্ছে। বাসুর শরীরের হলুদ আবরণের একটা প্রান্ত হঠাৎই হাওয়ার বিষ্ণুর মুখের ওপর উড়ে পড়ল। মনে হল, বাসু শায়িত দেহটা থেকে বেরিয়ে এসে দণ্ডায়মান বিষ্ণুর মধ্যে প্রবেশ করছে। সারথির মনে হল, তার ঈশ্বর দর্শন হল। তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ভাবনার উদয় হল। সে জল থেকে উঠে ধীর পায়ে বিষ্ণুর কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর বিষ্ণুর হাত ধরে বলে, "চলো কথা আছে।" এক দণ্ড পরে নদীর ধারে বিষ্ণু ও সারথি মুখোমুখি। বিষ্ণু বলে, "অসম্ভব অঅপনার প্রস্তাব আমি মানতে পারছি না।" সারথি ধীর স্বরে বলে, "এটাই নিয়তির ইচ্ছে।" বিষ্ণু বলে ছাড় "এ শঠতা। এ অপরাধ।" সারথি বলে, "তার বিচার ইতিহাস করবে। তুমি আমি নির্ণয় করার কেউ নই। আর এ কথা আমার না। এ বাসুরই দর্শন।" বিষ্ণু আশ্চর্য ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা ঝাঁকায়। বলে, "কিন্তু আপনি আমায় বাসু সাজতে বলছেন?" সারথি বলে, "তুমি তোমার ভূমিকাই পালন করবে, শুধু বাসুর নাম নিয়ে।" তার পর একটু সময় নিয়ে বললেন, "ভেবে দেখ, যেখানে যাচ্ছি আমরা, রাজধানীতে, বিজয়ধনু উৎসবে। সেখানে কেউ বাসুকে আগে দেখেনি। শুধু নাম শুনেছে। তোমাকে তো আগেই আমি বললাম, এই অভিযানে আমার ভূমিকা দ্বি-মুখি গুপ্তচরের মতো। অর্থাৎ রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন বাসুকে রাজধানী নিয়ে যাবার জন্য, সেখানে রাজা তাকে হত্যা করবে। আর আমি বাসুকে নিয়ে যাচ্ছি অত্যাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করানোর জন্যে। এ ক্ষেত্রে অগণিত মানুষ অপেক্ষা করছে বাসুর জন্যে। বাসু এসে তাদের মুক্তি দেবে। সে ক্ষেত্রে যদি বাসু না পৌঁছয়, এত মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হবে। যার দায়ভার তোমাকেই নিতে হবে, বিষ্ণু। আর বাসু তোমার অপছন্দের লোক তো নয়, তোমাদের দু'জনের যোগ্যতা দর্শন সবই প্রায় একই রকম। সে ক্ষেত্রে তোমার নিজেরই দর্শনের দার্শনিক হতে আপত্তি কোথায়?" বিষ্ণু চুপ করে থাকে। সারথি বলে, "ভেবে দেখ, তুমি তো ভাগ্যন্বেষী। এত বড় সুযোগ ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে, আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করছ?" বিষ্ণু বলে, কিন্তু বলদেব? সারথি হেসে বলে "বাসুর অবলম্বন ছাড়া বলদেবের অস্তিত্ব কতটুকু? ও বাসুর নামের অবলম্বনটুকুও ছাড়তে চাইবে না।"

সময় বয়ে যায়। এক সময় দু'জন নদীর পাড় থেকে এগিয়ে যায়, বাসুর শায়িত দেহটার দিকে। বাসুর দেহটা এই জনহীন প্রস্তরে একটি গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হল। বলদেব বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বলে, "চল ভাই, রাজধানী আমাদের মানে বাসু আর বলদেবের প্রতীক্ষায় বসে আছে।" সারথি অক্রুর সসম্ভ্রমে বিষ্ণুর গায়ে বাসুর হলুদ অঙ্গ আবরণটি জড়িয়ে দিল। বিষ্ণু এগিয়ে যেতে যায়। বলদেব তার হাত ধরে বলে, "এটা নিতে ভুলে যাচ্ছো—"। বলদেবের হাতে একটি ময়ূরপুচ্ছ।

তিন জনে রথের দিকে এগিয়ে যায়। তিন জনের এক জন মানুষ গাছের নীচে মাটির তলায় শায়িত মানুষটার হলুদ অঙ্গ আবরণীটি গায়ে জড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে নিল শায়িত মানুষটার অসংখ্য কিংবদন্তী। এই মানুষটা জানে না, এই মানুষটার সামনে অনেক কাজ। এই মানুষটাকে রাজধানী পৌঁছে রাজাকে হত্যা করতে হবে। আগামী দিনে অর্জুনের সারথি হতে হবে, ভারতযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে হবে। আরও অসংখ্য কাজ করতে হবে।"

এইটুকু বলে ঘটাদা থামলেন। আমরা বোকা হয়েগেছি, মুখ থেকে কথা বার হচ্ছে না। অনিন্দ্য প্রথমে গলা খাকারি দিয়ে বলল, "তুমি কি বলতে চাইছ, ঘটাদা? বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর মথুরার কৃষ্ণ আলাদা? এ তথ্য কোথায় পেলে?" ঘটাদা আমার দেওয়া সিগারেটটা কানের পাশ থেকে বার করে ধরায়। তার পরে বলে, "তথ্য লুকিয়ে আছে মহাভারতেই। তথ্য জুগিয়েছেন অনেকেই। ব্যাসদেব থেকে রাজশেখর বোস, মায় তোদের নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়িও।" আমি বললাম, "কী সে তথ্য?" ঘটাদা বললেন, "বেশ, ধরে নিলাম দু'জনে আলাদা নয়, তবে তোদের কৃষ্ণ মথুরায় যাবার পর বৃন্দাবনে আর ফিরে এলেন না কেন? সারা জীবন ফিরে এলেন না। অথচ মথুরা থেকে বৃন্দাবনের পথ মাত্র ঘন্টা তিনেকের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ বলদেব, মানে বলরামকে পাঠিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। নিজে যাননি। কেন? বৃন্দাবনের পুরনো বন্ধু সুদামার সঙ্গে মথুরায় দেখাও করেননি। কেন? মহাভারতে এক বারই মাত্র রাধার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। তখন যুদ্ধবিরতি চলছিল। রাধা ঘুরতে ঘুরতে সখীদের নিয়ে কুরুক্ষত্র প্রান্তরে এসে পড়লে। যুদ্ধক্লান্ত কৃষ্ণকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কোনও কথা বললেন না। তার পর ফিরে গেলেন। তার পর সখীদের বললেন, 'এ মানুষটার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভাল হত। আমি যে মানুষটাকে চিনতাম, এ মানুষটা সে মানুষ নয়। যে কালিন্দীর তীরে বসে বাঁশি বাজাত, আমি তাকে চিনতাম। এই যুদ্ধক্লান্ত নিষ্ঠুর ক্রুর মানুষটা আমার কৃষ্ণ নয়'। আমরা ভাবলাম, শ্রীরাধা এ কথা অভিমানে বলেছেন। প্রেমিক কৃষ্ণকে যুদ্ধ বেশে দেখে শ্রী রাধার ভাল লাগেনি। তাই অমন বলেছিলেন। আমি যদি বলি, শ্রীরাধা আক্ষরিক অর্থেই বলেছিলেন, 'এই লোকটা আমার কৃষ্ণ নয়'।"

এই বলে ঘটাদা হঠাৎই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ বাবা! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, বাচ্চার বেবিফুডটা কেনা হয়নি। চলি রে," বলে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

আমরা চার জন বাকরুদ্ধ হয়ে কুয়াশার মধ্যেই বসে রইলাম। বাইরে কুয়াশা, ভেতরে এক নতুন কুয়াশা, যার জাল বুনে দিয়ে গেলেন ঘটাদা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেখলীগঞ্জ তিস্তাপারে

নলিনী বেরা

ম্যাপটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, সাদার ওপর নীল খয়েরি আর হলুদ রংয়ের ছিটছিট্। মেখলীগঞ্জের এস ডি ও সাহেবই দিয়েছেন। বড় নদী তিস্তা যেন নীলকালির দোয়াত থেকে উপচে পড়ে গড়িয়ে চলেছে মেখলীগঞ্জের 'মেখলী' হলদিবাড়ির 'ডী' দেওয়ানগঞ্জের 'ঞ্জ' আর কুচলিবাড়ির 'কু'-কে আবছা ঢেকে দিয়ে। তার ওপর এদিক-সেদিক ইতস্তত নীলসুতোয় বাঁধা পড়ে আছে সাতঙ্গা ধরলা সেমিজান—আরও সব ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট করে লেখা। খয়েরি রংয়ের ওপর বড় বড় করে যা লেখা— বোলদিহাটি চ্যাঙ্গরাবাঁধা হলদিবাড়ি কুচলিবাড়ি হেমকুমারী বিবিগঞ্জ আর মেখলীগঞ্জ। বলতে কী, ম্যাপের ভেতর যত সব ঢালাও রঙ আমাদের আর রঙশূন্য সাদা শুধু বাংলাদেশ। মেখলীগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম দু'দিক জুড়েই তো সাদা ধবধবে বাংলাদেশ। তার মধ্যেও কোথাও কোথাও যেন হলুদগাঁদার ফুল হয়ে ফুটে আছে আমাদেরই 'তিনবিঘা' আমাদেরই 'ছিটমহল'। শুনছি কনকনে শীতেও সেখানে হল্‌কা ক্যাম্প করে চোখে ঠুলি পরে 'বর্ডার সার্ভেয়ারের' দল প্রফেসর শঙ্কুর মতো যন্ত্রের, সাহায্যে রাতের আকাশের তারা দেখে দেখে বর্ডারের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা নির্ণয় করে চলেছেন। হল্‌কা ক্যাম্পের হ্যারিকেনের আলো আর আমাদের ছিটমহল, বাংলাদেশের পাটগ্রাম-দহগ্রামের ডিব্‌রির আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে এখন দুদেশের আকাশেই কালো ধোঁয়া ছাড়ছে।

আমাদের কাজটা একটু অন্যরকম। কদিন আগেই কোচবিহার থেকে সরকারি তক্‌মাআঁটা 'অ্যামবাসাডার' আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে মেখলীগঞ্জ সার্কিট হাউসে। থাকছি বটে. মেখলিগঞ্জ সার্কিট হাউসে কাজটা কিন্তু চ্যাঙ্গরাবাঁধা ইন্দো-বাংলাদেশ বর্যারে। কাজ বলতে 'সুপারভিশন হ্যাজ টু বি মেড টাইটার টু ইফেকটিভলি চেক হোয়েদ্যার রাইস ইজ মুভিং উইদাউট দি ম্যান্ডেটরি রিলিজ সার্টিফিকেট', তার মানে এক কথায়, চালের চোরাচালান রোধ করা। চাল তো নয়, এখানকার লোকেরা বলে 'চাউল'। যেমন কলাচ্যাপা চাউল নুনিয়া চাউল। এসব কলাচ্যাপা সব কলাচাপা চাউন নুনিয়া চাউল নুনিয়াতেও আমাদের মন ছিল না, আমাদের মন পড়ে ছিল বর্ধমান-হুগলি, দুই দিনাজপুর-বিহার-ওড়িশা থেকে আনা 'এক্সপোর্টার'দের চালে। ওই যারা লেভি না দিয়ে চড়া দামে চাল পাচার করে দিচ্ছিল বাংলাদেশে। মেখলীগঞ্জ সার্কিট হাউসটা একেবারে তিস্তার পাড়ে। সামনে পূর্ব দিকে মেখলিগঞ্জ টাউন। পুবদিকের পাঁচকাম বেতগা বাদপানা বা থাকলেও পশ্চিমে তিস্তার পাড়ে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

হরেক গাছপালা, ঝোপঝাড়—নিম লালি কাটলি টুন কাওলা চাপু গামার কাঁটাকই পিপলি শিমুল অমলতাপস, নাগেশ্বর।

মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে কুয়াশার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে থানা, ফায়ার ব্রিগেড, ফুড অফিস, রামকৃষ্ণ মঠ, মেখলীগঞ্জ হাসপাতাল, পেট্রল পাম্প ছাড়িয়ে টায়ারের মতো পিচরাস্তায় অনেকটা দূরে চলে যাই। চোখেমুখে ঝরে পড়ে কুয়াশার জল। ফেরার সময় অবশ্য কুয়াশা কেটে আলো ফুটে যায়। তখন কত কী আবিষ্কার করে ফেলি।

রাস্তার দু-ধারে সবুজ পীত ছোট ছোট বুনো গাছ, মাথায় পীত-সাদা থোকা থোকা ফুল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি ওগুলো ধুলপি ফুল। ওভাবেই চিনে ফেলি ভাটিফুল, টেঁকিশাক, কানসিসা বা দণ্ডকলসের গাছ। ধাপড়া-মেখলীগঞ্জের মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে, রোজই দাঁড়িয়ে থাকে, পিছনে লেখা 'আওয়াজ Do'। আওয়াজ আসছে 'হঃ হঃ ডাউন-ডাইন'। এত ভোরেও লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে চাষী। হাদলা বা ছ্যাঁচার বেড়া দেওয়া চৌচালা, মিডডারি ভাঁজের কোনও একটা বাংলাঘর থেকে দোতারায় ভাওয়াইয়ার সুর আসছে, হয়ত ওই গানটারই সুর, ওই যে— 'ও তুই কিসেত্ গোঁসা হলু রে-চ্যাঙ্গ রাবান্ধার চ্যাঙ্গড়া বন্ধু রে।'

তবু সকালটা নয়, দুপুরটা, ঠিক দুপুরটাও নয়, দুপুর-বিকেলের মাঝখানটুকুই আমাকে গ্রাস করে রাখে, কেননা ওই সময়টায় সে আসে। 'সে আসে ধীরে।

AMARBOI.COM

দুই

মেখলীগঞ্জ থেকে তেরো কিলোমিটারের পথ চ্যাঙ্গরাবাঁধা। সকালদশটার ভেতর বর্ডারের গেট খুলে যায়। আমরাও প্রায় সাড়ে ন'টার ভেতর বর্ডারে পৌঁছে যাই। আমরা বলতে আমি, আমার সহকর্মী সৌমিত্র আর মেখলীগঞ্জ থানা থেকে পাঠানো 'লা মানচার দন কিহোতের' মতো দুজন শীর্ণকায় লাঠি ও দর্শনধারী হোমগার্ড।

যেতে যেতে ডাইনে-বাঁয়ে মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ কাঁটাতারের বেড়া। গোল গোল কাঁটাতারের ঘেরা জাল, গোলক ধাঁধা আর সেই ধুলপি ভাটি দণ্ডকলসের গাছ। কাঁটাতারের ওধারে বাংলাদেশ, এধারে 'ইন্ডিয়া'।

পুলিস, কাস্টমস, বি এস এফ, দালাল, সাদা অ্যাপ্রন গায়ে 'হু'-এর লোকজন, হরেক কর্মী ইউনিয়ন, নর্থ বেঙ্গল মোটর কর্মী সঙ্ঘ, ওপারের লোক, এপারের লোক, তার ওপর একের পর এক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিহার, বাংলা, ইউ পি, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, ওড়িশার মালবোঝাই ট্রাক, ড্রাইভার, খালাসি, এক্সপোর্টার, এক্সপোর্টারের লোকজন, আশপাশের বস্তির লোকজন তার ওপরেও কুকুর, ছাগল, শুয়োর, পাখিপয়ালে জায়গাটা গমগম করে।

আমরা ট্রাক ধরে ধরে চালের স্যাম্পল, রোড চালান, সাপ্লায়ার-এক্সপোর্টারদের নামধাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলাচ্ছি। মান্ডি ট্যাক্স, ভ্যাট জমা করেছে কি করেনি, ট্রাক ড্রাইভারের এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাতায়াতের ইন্টার-স্টেট বা ন্যাশনাল পারমিট আছে কি নেই, ডালখোলা দিয়ে ঢোকার সময় সিল-তারিখের ছাপ্পা পড়ল। কি পড়ল না—সব ধরে ধরে মেলাচ্ছি। এক্সপোর্টারের নাম: ব্রিজকিশোর প্রসাদ; সাপ্লায়ার: মা মুণ্ডেশ্বরী ট্রেডার্স, চেনারি-তেলারি, রোহতাস, বিহার; ট্রান্সপোর্টার: কমল ট্রান্সপোর্ট, জিটি রোড, সাসারাম, ট্রাক নম্বর দেখে দেখে এইমাত্র দুটো ট্রাক ওকে করলাম। মাথার ওপর বটগাছ থেকে একঝাঁক বটঘুঘু উড়ে গেল।

'জিরো পয়েন্ট' থেকে আমাদের ক্যাম্পটা একটু দূরে, ভি আই পি মোড়ের কাছাকাছি। মেখলীগঞ্জের বি ডি ও সাহেবই বাঁশের ছ্যাঁচারি আর বন্যাত্রাণের ত্রিপল দিয়ে শেড বানিয়ে দিয়েছেন টেম্‌পুর‍্যারি। আমরা সেখানেই পাকাপোক্তভাবে বসে আছি। ট্রাকের পর ট্রাক আসছে—কোনটা চালের, কোনটা পেঁয়াজের, কোনটা কমলালেবুর, কোনটা আপেলের, কোনটা বোল্ডারের, নদী-বেড থেকে পাথর তুলে এনে চালান করে দিচ্ছে বাংলাদেশে। ট্রাক আসছে, আর আসছে চারধার আচ্ছন্ন করা ধুলোর ঝড়। আমরা কোনও মতে মাথায় টুপি, নাকে রুমাল চেপে চালান দেখে দেখে ট্রাকগুলো ওকে করছি।

ট্রাক আসছে, ট্রাক থামছে। গাড়ির জানালা খুলে ট্রাক ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে পড়ছে। কেউ কেউ গাড়িতেই বসে থেকে জানালার পাল্লা খুলে ধরে খালি মুখ বাড়াচ্ছে। যে নামল সে তো খুপরিতে ঢুকলই, যে নামল না তার কাছে লোক চলে এল খুপরি থেকে। 'স্লিপ' নিয়ে ড্রাইভাররা গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে। ততক্ষণে খুপরির কেউ কেউ নামিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভারের সিটের পিছনে রাখা গোটা কতক আপেল কী কমলালেবু। এত দ্রুত ও মসৃনভাবে সব কিছুই ঘটে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা এ জন্মের নয়, গত জন্মের।

তারপর তো এল দুপুরটা, ঠিক দুপুরটাও নয়, দুপুর-বিকেলের মাঝখানটা।

তিন

ওই একটা-দেড়টা। ওই পর্যন্তই ব্যস্ততা। তারপর তো শুনশান। শুনশান শুনশান। গাছের একটা পাতা নড়ে না, বটগাছ থেকে আচমকা ঝাঁক বেঁধে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় না বটঘুঘু। ট্রাকগুলোও সারি বেঁধে রাস্তার দুধারে ঝিমোয়। কতক যাবে এখন ওপারে, কতক ওপারে খালি করে এসে গেছে এপারে। আমি সার্কিট হাউস থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। হোমগার্ড দুজন খেতে গেছে ফাঁড়িতে নিজেদের মেসে। সহকর্মী সৌমিত্রও এই ফাঁকে ঢুঁ মেরে আসে নিজের অফিসটায়। অন্যান্য খুপরিগুলোয় কেউ আছে বলেও মনে হয় না। সবাই আশেপাশের লোক, খেতে গেছে যে যার ঘরে, দুপুরের খাবার। ক্যাম্পে একাই বসে আছি। চোখের সামনে ওই তো একটা গ্রাম, গাছগাছালি, বাঁশবন, দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে। এক সাইকেলিয়া যেন শুকনো পাতার ওপর খোসোরমোসোর সাইকেল চালিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কামিজে ঢাকা গৃহবধূ আচমকা ঘর থেকে বেরিয়ে উলুকভুলুক চেয়ে আছে এদিকেই।

এ সময়ই হাওয়াটা উঠল। উঠল কী, 'রোল' খেতে খেতে গড়াতে গড়াতে যেন এল। ঝরন্তি জলের মতো পিচরাস্তায় ধুলো গড়াচ্ছে এখন। 'ধুলধুল ধুলি/তিন নোগুলে তুলি।' দুধারে সারি দিয়ে দাড়িয়ে থাকা লরিগুলোর তলায় সে ধুলো ঢুকে যাচ্ছিল, আর সে ধুলোর ওপর একটা ঈষৎ কালো ছায়া খেলে বেড়াচ্ছিল। ছায়াটা ট্রাকগুলোর তলা দিয়ে খেলতে খেলতে যেন এগিয়ে আসছে। সামনাসামনি হতেই ছায়াটা স্পষ্ট হল, সে এতক্ষণ ট্রাকগুলোর নম্বর দেখে দেখে ধুলোর বিপরীতে হাঁটছিল। একজন স্ত্রীলোক, বয়স বড়জোর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী।

'এইঠে তোমারগুলার কাম কি?'

'চালের ট্রাক ধরে ধরে চেক করা।'

'এই ট্রাক্‌টাক্‌ তোমরা ধইর্‌লেন?'

বলেই সে একটা দুমড়ানো-মুচড়ানো কাগজের চিরকুট বাড়িয়ে ধরল। 'সোর্স' ভেবে কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম—একটা ট্রাকের নম্বর 'ইউ পি সিক্সটি ওয়ান এফ-7851', 'না, কিন্তু কী ব্যাপার, বলুন তো?'

মহিলা আমাদের ক্যাম্পঘরটির খুঁটি ধরে পাশ-ও পাশ দুলতে দুলতে বলে চলল, 'হিটা মোর সোয়ামির ট্রাক। মোর ঘরত্‌ সোয়ামি নাই। বিয়া করি ঢেল দিন আগোত মোক ছাড়ি উঁয়ায় পালাইলোং।'

'কোথায়?'

'কাঁয় জানে, ইউ পি না বিহারত্‌।'

'খুঁজতে গেলেন না?'

'মুঁই না যাইম্‌। এইঠে অ্যালয় ট্রাকগিলার নাম্বার ধরি ধারি খুঁজি যাইম্‌। আইজ না হয় কাইল শালার বেটা শালা চ্যাংড়াটাক পামোয় পাম্‌।'

বলেই মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি নর্থ বেঙ্গল মোটর কর্মী সঙ্ঘের শিবুবাবুকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল—ঠিক বুঝতে পারলাম না। যখন ভাবছি আজ হোক কাল হোক 'ইউ পি সিক্সটি ওয়ান এফ-7851' ট্রাকটাকে আমরা ধরবই ধরব, তখনই শিবুবাবু বলে বসলেন, 'মাইয়াটার কোনোয় সরম নাই। ফ্যাকাল্টি মাইয়া। ইউ পি-র এক ড্রাইভারের সঙ্গে তার ছিল 'কারগিল লাভ'।

চার

সাড়ে চারটা—পাঁচটার ভিতর বর্ডার বন্ধ হয়ে যেত। আমাদেরও আর কোনও কাজ থাকত না। হাঁটতে হাঁটতে ভি আই পি মোড় থেকে চলে যেতাম জিরো পয়েন্টের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আগেই বি এস এফের টহলদারি ক্যাম্প। দুজন জওয়ান বন্দুক উঁচিয়ে টহল দিচ্ছিল। একজন উত্তরপ্রদেশ, আরেকজন ছত্তিশগড়। কাঁটাতারের বেড়ার গা-ঘেঁষে সোজা চলে গিয়েছে সি পি ডব্লিউর পিচ রোড। রাস্তাটা নয়, কাঁটাতারের বেড়াই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের। বি এস এফ-কে বলেই আমরা হাঁটতে লাগলাম। পুব থেকে পশ্চিমে। কাঁটাতারের দৈর্ঘ বরাবর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, তার যেন একফালি এদিকে, আরেকটা ওদিকে।

আমাদের বাঁ পাশে কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে দেড়শো গজের ভিতরেও আমাদের 'ইন্ডিয়া'। বাংলাদেশের লোকদের ওখানে চলাফেরার অধিকার নেই। তবু তো দিব্যি বসে আছে বুড়িমারির একঝাঁক মেয়ে। যেন সব 'উড়ানি কৈতোর'। পাখনা মেলে রোদ পোহাচ্ছে। বি এস এফ জওয়ান হাতের তালি মারলেই উড়ে উঠবে ফুড়ুৎ করে। ডানধারে আমাদের চ্যাংরাবাঁধা। ঢালু জমিতে খেতের পর খেত সবুজ ফনফনে হয়ে উঠেছে তামাকের গাছ, তামাকপাতা। একেকটা হাতির কানের মতো। রোদে শুকিয়ে পাতার উপর পাতা দিয়ে থাক থাক সাজাতে হয়। এক হাজার পাতার একটা বান্ডিল একশো টাকা। ফিরে এসে দেখি বি এস এফ চৌকিতে এক জওয়ানের দু'পায়ের পাতার উপর পা দিয়ে তিন-সাড়ে তিন বছরের এক শিশু দাঁড়িয়ে। গলায় কালো কারে ঝুলছে একটা তাবিজ। খালি গা, পরনে একটা হাফ পেন্টুল। পেন্টুলের উপর দিয়ে ঝুলছে কোমরের ঘুনসির দড়ি। বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত দড়িটা মুখে পুরে চুষছে ছেলেটা।

উত্তরপ্রদেশীয় জওয়ান জানাল ছেলেটার নাম 'সানা'। বাপ নেই, মা আছে—ওই তো থাকে ছ্যাঁচার টাটি ঘেরা চৌয়ারি ঘরে। মা মুসলমান, বাপ কেরালিয়ান, সে এক বি এস এফ জওয়ান। এর জন্মের আগেই সে পালিয়েছে। পার্মানেন্টে বিয়ের কথায় চাকরিই ছেড়ে দিয়েছে।

বিএসএফ জওয়ান আরও বলল, এরকম ঘটনা তো আকছারই ঘটছে। মেয়েরাই গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসে। তার বলার ভঙ্গিতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল সমরেশ বসুর গল্প 'কে নিবি মোরে'। যেন ওই যে যারা 'উড়ানি কৈতোরের' মতো রোদে পাখা মেলে বসে আছে, তারা উদ্‌বাহু হয়ে বলছে 'কে নিবি মোরে' 'কে নিবি মোরে'। শুধু এক রাতের জন্য নয়, সারা রাত সারা জীবনের জন্য। কোনও রঙ-ঢঙে নেই, বি এস এফ জওয়ানদের সঙ্গে তারা যেন পার্মানেন্টে ঘর বাঁধতেই আগ্রহী। মনে মনে ভাবছি, তাই কী? এতই সস্তা? সবই কী 'কারগিল ভালবাসা'? কানের কাছে কে যেন গেয়ে উঠল, 'ও সখী রে নাকাই তোরে গুয়ারে সখী নাকাই তোরে পান। যৈবনে না মানে সখি হেন্দু মুসলমান'।

পাঁচ

'জিরো পয়েন্ট' থেকে কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তায় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মাঝখানের সময়টায় ট্রাক চলাচলের উপর সি আর পি সি র ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে। সূর্যাস্তের পরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা টহল দিতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। কোনওদিন চালের ট্রাক ধরা পড়ত, কোনওদিন পড়ত না। যেদিন পড়ত না, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেতাম তিনবিঘায়। যত না তিনবিঘার প্রতি আকর্ষণ, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ ছিল ওই হলকা ক্যাম্প, ওই যেখানে প্রফেসর শঙ্কুর মতো চোখে ঢুলি পরে যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা দেখে দেখে বর্ডারের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা নির্ণয় করে। সন্ধ্যা না হলে তো আকাশে তারা ফোটে না। এখানকার লোকেরা 'সন্ধ্যা' বলে না, বলে 'সৈঞা'। তাই অপেক্ষা করতাম কখন 'সৈঞ্জা' হবে, কখন আকাশে তারা ফুটবে।

সন্ধেও হত, আকাশে তারাও ফুটত, কিন্তু কোনদিনই দেখা হত না রহস্যময় 'বর্ডার সার্ভেয়ারের' দলটার সঙ্গে। মঘা ফাল্গুনী শতভিষা অশ্বিনী ভরণী অশ্লেষা কৃত্তিকা—কোথায় কখন কোন কোন তারা নিয়ে তারা যে ব্যস্ত থাকত। আমরাও আটকে থাকতাম তিনবিঘায়।

তিনবিঘার জন্য নয়, বর্ডার সার্ভেয়ারের দলটার জন্যও নয়, আমার মন আনচান করত সন্ধ্যা রাত্রি সকাল পেরিয়ে সেই দুপুরটার জন্য। ঠিক দুপুরটার জন্যও নয়, দুপুর-বিকেলের মাঝখানটুকুই আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। সেই বেচারা তুলার মাশুল আদায়কারী লোকটার মতোই চালের লেভি আদায়কারী আমিও যেন কী একটা নেশার জালে জড়িয়ে পড়েছি। তবে গল্পের ছেঁড়া পাতার পিছনে পিছনে ঘর-ও ঘর ঘুড়ে বেড়াচ্ছিও না, বরঞ্চ ছেঁড়া পাতাগুলো জুরে জুড়ে দেখছি গল্পটা সম্পূর্ণ হয় কিনা। সম্পূর্ণ করতেই হবে। আর তা যেন এক্ষুনি।

AMARBOI.COM

ছয়

ক্যাম্পে বসে চালের স্যাম্পল দেখতে দেখতে আমরা কথা বলেছিলাম তুলাইপঞ্জি চাল নিয়ে। না, তুলাইপঞ্জি চাল এখানে পাওয়া যায় না। সে পাওয়া যায় দুই দিনাজপুরে। দেরাদুন রাইস বাসমতী রাইসও না, যা আসছে সবই নন-বাসমতী সুপার ফাইন। কেউ একজন বলল, 'সুপার ফাইন না ডুপার ফাইন, অ্যাগলি হৈলো বোল্ডার চাউল।' সত্যি সত্যি কালো 'মাছি' আর লাল 'গ্র্যাইনে' ভর্তি। 'কিন্তু বোল্ডার চাউল? সেটা আবার কী?' সেই লোকটাই বলল 'বোল্ডার চাউল পাথরের নাখান শক্ত, যা এক ঘন্টাতেও সেদ্ধ না হয়।'

আজ আবার ওপার থেকে আসছিল একটার পর একটা তুলোর ট্রাক। সব বাংলাদেশ পরিবহনের ট্রাক। প্রায় ট্রাকের ডিজেল ট্যাঙ্কে বাংলায় লেখা—'জন্ম থেকেই জ্বলছি'। আমাদের ধুলোয় ঢেকে দিয়ে ট্রাকগুলো চলে যাচ্ছিল নগর চ্যাংরাবাধায়। চলে যাচ্ছিল, তুলো নামিয়ে দিয়ে ফের ফিরেও আসছিল। তার পরেও কত ট্রাক এল, কত ট্রাক গেল, কত ট্রাক যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। কত এক্সপোর্টার তাদের আই ই সি দেখাল, আমিও কত ট্রাক ড্রাইভারের পারমিট পরীক্ষা করলাম, ভ্যাট মাশুল ট্যাক্স—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সব কিছুই যন্ত্রবৎ। আসলে আমার মন পড়েছিল সেই দুপুরটায়, ঠিক দুপুরও নয়, দুপুর-বিকেলের মাঝখানটায়। আসলে আমি মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম—কখন সে আসে, কখন সে আসবে।

দুপুরটা এলও। যেন শর্ত মেনে সঙ্গের হোমগার্ডদুটিও চলে গেল খেতে। জানতাম এ সময়টার অফিসের কাজে সৌমিত্রও যাবে, চলে গেল সে। আশপাশের খুপরিগুলোও ফাঁকা হচ্ছিল। ফাঁকা, ফাঁকা। মোষের মতো নধর গতর একটা শুয়োর রাস্তা পেরোল বড় অলস ভঙ্গিতে। চিড়িক করে ডেকে উঠছে না একটা-দুটো 'টেউরি'ও। একটা হুইসলিং টিল, না টিল নয়, যেন এক ফাচারু চ্যাংড়া হারমোনিয়ামের একটা রিড চেপে ধরে আছে, চেপে ধরে আছে তো আছেই, আর অনর্গল বেজে চলেছে হারমোনিয়ামটা। একটানা, একঘেয়ে।

ওপার থেকে একটা হাওয়া এল, এপার থেকেও একটা হাওয়া উঠল। দুটো হাওয়া জড়াজড়ি করে ধুলোর ঝড় তুলল। ধুলোর ভিতর চোখ বুজে ফেললাম, আর তখনই কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'মোর ঘরত সোয়ামি নাই'। চোখ খুলে দেখি, হাওয়াটা 'রোল' খেতে খেতে চলে যাচ্ছে। সেই দু'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলো, হাওয়াটা রোল খেতে খেতে ট্রাকের তলায় ঢুকে গেল, ঈষৎ কালো একটা ছায়া রোল খেতে খেতে গড়াতে গড়াতে সামনাসামনি হয়ে ফের বলল, 'সেই ট্রাকটাক্ তোমার ধইরলোং?' ইউ পি সিক্সটিওয়ান এফ-7851'? না, না। 'মুই কার সাথে যাঁও? কেরালা কি এইঠে?' যেন ফিসফিসিয়ে বলল হাওয়াটা। 'মরদ আসিল, মেটমাট করিবার তালে দুই লাখ টাকা দিবার চাহিল, মুই রাজি না হৈলাম। সগলে মোকে কহিল 'ডাউনিয়া' 'ফ্যাকান্টি মাগী'। হাওয়া এসেছিল, হাওয়া চলে গেল। তার মায়ের সঙ্গে সানাও এসেছিল, সানা চলে গেল।

কিন্তু সেই ফাচারু চ্যাংড়া বা ফাজিল ছেলেটা হারমোনিয়ামের রিডটা এখনও ছাড়েনি। চেপে ধরে আছে তো আছেই। টুকরোটাকরা জুড়েও গল্পটা এখনও পুরা হয়নি, হচ্ছে না। হয়ত ছেঁড়া পাতা কিছু উড়ে গেছে হাওয়ায়। হাওয়ায় রোল খেতে খেতে যখন গেছে হাওয়ায়। হাওয়ায় রোল খেতে খেতে যখন গেছে, তখন হাওয়ায় ফের ভাসতে ভাসতেই এসে যাবে। এখন শুধু অপেক্ষা একটা পাল্টা হাওয়ার।

প্রার্থনা করছি, হাওয়াটা উঠুক বোলদিহাটি হলদিবাড়ি কুচলিবাড়ি হেমকুমারী বিবিগঞ্জ দহগ্রাম পাটগ্রাম তিনবিঘা বুড়িমারি চ্যাংড়াবাঁধায়। হাওয়াটা উঠুক তিস্তা সাতঙ্গা ধরলা সেমিজানের কাকচক্ষু জলে। গল্পটাও পুরা হোক—পুরা হোক পুরা হোক পুরো হোক—

সত্যি সত্যিই হাওয়া উঠল। পাল্টা হাওয়া। জিরো পয়েন্টের ওদিক থেকে জড়ো হওয়া হাওয়া পিচ রাস্তার উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ভি আই পি মোড়ের দিকে ছুটে চলল। তিস্তা সাতঙ্গা ধরলা সেমিজানের জল হাওয়ার ধাক্কায় সিঁড়ি ভাঙছে। ছেঁড়াখোঁড়া তাপ্পি মারা গল্পটা এবার পুরা হচ্ছে—পুরা হচ্ছে পুরা হচ্ছে পুরা হচ্ছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময়ই তারা এল। তারা দুজন। একজন নারী একজন পুরুষ। পুরুষটা পুরোপুরি অন্ধ। 'জয় রাধে জয় নিতাই' বলে তারা এসে দাঁড়াল। অন্ধ পুরুষটার হাত ধরে লাল শাড়ি পরা প্রৌঢ়া হাত বাড়াল, 'বাহে দুই-চারখান পয়সা দেও।' খুচরা পয়সা ছিল না, একটা আস্ত দশ টাকার নোটই প্রৌঢ়ার হাতে গুঁজে দিলাম। তারপর থেকে অপেক্ষায় আছি, অপেক্ষায়—কখন তারা গদগদ হয়ে বলে উঠবে, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন' বা বলবে, 'আল্লা তেরা ভালো করুন'।

নাহ, তারা ওসব মঙ্গলটঙ্গল আল্টাটাল্লার ধারেকাছেও গেল না, তারা বলল, ''তোমারগুলার বেশি বেশি করি কামাই হোউক।' প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বললেন?' ভিখারি দুজন, হেমকুমারীর নগেন রায় আর সুরবালা রায়, হাসি হাসি মুখ করেই বলে গেল, 'তোমারগুলার বেশি বেশি করি কামাই হৈলে হামারগুলাও দুইটা পয়সা বেশি পামো।'

হারমোনিয়ামের রিডটা আর বাজছে না, গল্পটাও পুরা হল না। হাওয়া উঠেছিল, হাওয়া আমাকে আছড়ে ফেলে চলেও গেল।

আজকাল, ৮ জুন, ২০০৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনোদের ব্যক্তিত্বসঙ্কট ও তার সমাধান

পবিত্র সরকার

ছেলেবেলা থেকে বিনোদ ব্যক্তিত্ব কথাটা শুনে এসেছে, কিন্তু সেটা কী বস্তু—খায় না মাথায় দেয়, তখনও কিছুই জানত না। ইশকুলে মাস্টার মশাইরা বলতেন 'বুঝলি বিন্দে, ব্যক্তিত্ব নইলে জেবনে কিস্যু করতে পারবিনি বাপ'— বলে বানান ভুল করার জন্যে রসিয়ে রসিয়ে তার কান মুলতেন। বিনোদ 'উঃ আঃ' করে চিৎকার করত, মাস্টারমশাই ভদ্রেশ্বরবাবু তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াতেন না। ফূর্তি করে দুটি কান চমৎকার মুলে, যথেষ্ট লাল হয়েছে কি না এবং বিনোদের দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কি না দেখে, সে 'উঃ আঃ'-র পর হাউমাউ করে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর তার কানদুটোকে রেহাই দিতেন, এবং দুটো হাত ঘষে, যেন দু হাতের ময়লা তুলে, বলতেন, 'ব্যক্তিত্বই হল সব। আমাদের মাস্টারদের যেমন বেত, মানুষের তেমনই ব্যক্তিত্ব। কী রে? কিছু মাথায় ঢুকল?'

বিনোদের মাথা তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে কানমলায়, কোনওরকমে চোখের নোনা জল জিভ দিয়ে গিলে সে জানাল ঢুকেছে, তবে কানমলার পর কোনও শিক্ষাই মাথায় না ঢুকে পারে না—সে কথা বিশদ করে ভদ্রেশ্বর মাস্টারকে বলবার তার সুযোগ হয়নি। কিন্তু এ কথাটা সে হাড়ে হাড়ে, মর্মে মর্মে, শিরা-স্নায়ুতে বুঝে ফেলেছিল যে, ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষ মানুষই হয় না, ছুঁচো বা ছাগলজাতীয় জীব হয়ে থাকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সে তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা, ব্যক্তিত্ব কী গো?' মা বলেছিলেন, 'অত ভারী ভারী কথা আমি কী করে জানব, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর গে যা।' বাবা রাধাবাজারে মারোয়াড়ির দোকানের ছাপোষা কর্মচারী, তিনিও 'ব্যক্তিত্ব' কথাটা শুনে যেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল লাগার মতো প্রায় ভিরমি খেয়ে পড়লেন। নিজেও লেখাপড়া বিশেষ করেননি, তাঁর স্কুলের যজ্ঞেশ্বরবাবুদের কানমলা খেতে খেতে ম্যাট্রিকেই ঠেকে গিয়েছিলেন, ফলে ছেলের প্রশ্ন শুনে অতিকষ্টে মূহ্যমান কণ্ঠে বললেন, 'ব্যক্তিত্ব, মানে এই লোকে তোকে খুব মানবে, তোর চেহারা দেখে ভক্তি হবে, তোর কথা গেরাহ্যি না করে পারবে না—এই আর কী। এই দেখিস না আমাদের নেতাদের। চেহারা দেখলেই কী রকম ভক্তিছেরেদ্দা হয়। কত লোকে তো তাদের কথায় পেরান পর্যন্ত দেয়—বুঝলি নে? তারপর এই ধর কোম্পানির মালিক বা ম্যানেজার। তারা যখন সামনে দিয়ে গটগট করে চলে যায়—তখন সবাই কীর'ম তাকিয়ে দেখে, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, দেখেছিস তো? ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল যাকে বলে গিয়ে ব্যক্তিত্ব। আমি তো তাই বুঝি।' বিনোদের বাবা বেশ ভালই বুঝেছিলেন, বুঝিয়েও ছিলেন। বিনোদের মনে হল এতেই আমার চলে যাবে, এর চেয়ে বেশি বুঝে দরকার নেই। নইলে হয়ত আরও কানমলা খেতে হবে।

সেই থেকে বিনোদের একমাত্র সাধনা হল, কী করে ব্যক্তিত্ব জোগাড় করা যায়। বন্ধুদের কথা বলতে তারা বলল, 'তোর ব্যক্তিত্ব হবে নে তোর যা শুঁটকো চেহারা আর ঘোড়ার মতো মুখ। এ চেহারা আর মুখ নিয়ে ব্যক্তিত্ব হয় না।'

বিনোদ হতাশ হল অবশ্যই। তবে সে ভাবল, শুঁটকো চেহারা বদলানো এমন কিছু কঠিন নয়। কিছুদিন আগে পাড়ায় ব্যায়াম ক্লাবে সে যোগাচার্য বিষ্ণু ঘোষের একটা বক্তৃতা শুনে খুব জোশ পেয়েছিল। তাঁর আখড়ার ছেলেরা গায়ে তেলটেল মেখে শরীরের হাত-পা-পেট-পিঠের মাসলগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, কাঁপিয়ে-নাচিয়ে চারপাশে আলো ঠিকরে দিয়ে যে-কাণ্ড করছিল, তাতে বিনোদের প্রায় মূর্ছো যাবার জোগাড়। 'আহ কী জিনিস। পৃথিবীতে এমনও হয়। এই বোধহয় ব্যক্তিত্ব বা ওই রকম কিছু হবে। সবাই তাকিয়ে দেখছে কী, কেউ তো চোখ ফেরাতেই পারছে না। সে-ও কি পারবে ওই রকম ব্যক্তিত্ব জোগাড় করতে?

বিষ্ণুবাবু বজ্রগর্জনে বলেছিলেন, 'তোমরা কি ভেবেছ মাংস খেয়ে এরকম শরীর হয়? নির্বোধ কথা। পেট ভরে ডালভাত খাবে আর নিয়মিত ব্যায়াম করবে। আর মনে একদম কুচিন্তা আনবে না। ব্যস্, তাহলেই দেখবে অসীম শক্তি পেয়ে গেছ কখন।'

'কুচিন্তা' ব্যাপারটা নিয়ে বিনোদের মনে একটু খটকা লেগে থাকলেও, সে আসল কাজটা শুরু করে দিল। অর্থাৎ ডাল-ভাত, ছোলা ভেজানো, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজকুচি দিয়ে কাঁচা ডিম—এ সব খেয়ে দুর্ধর্ষ গতিতে ব্যায়াম শুরু করে দিল। ব্যায়ামের পর হাতের বাইসেপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দলাই মালাই করেছে, পায়ের ঠ্যাঙের মাসলও, এমনকি আয়নার সামনে নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বুকের, ঘাড়ের মাসলও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ তার শরীরে মাংসপেশির ব্যক্তিত্ব কতটা বেড়েছে, সে সম্বন্ধে তার চিন্তা ও উদ্‌বেগের সবটুকু ঢেলেছে এই ব্রতে।

কিন্তু দুমাস গেল, এক বছর গেল—তার টিংটিঙে শরীরে প্রায় কিছুই ব্যক্তিত্ব যোগ হল না। আসলে এক-এক জনের ধাতই ওই রকম, যতই খাও, যতই ব্যায়াম কর, যতই মাসল টেপো, কিছুতে কিচ্ছু নেই, যেরকম প্যাংলা সেই প্যাংলাই থেকে গেলে। তার বদলে বিনোদ প্রতিবেশীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ শুনল, 'কী রে মনোতোষ রায় হবি, না ভীম ভবানী?'

বছরখানেক পরে বিনোদ বুঝল, ব্যক্তিত্বের ওই রাস্তাটা তার পক্ষে সুবিধের হবে না। শরীর যে রকম কাঠি-কাঠি ছিল সেই কাঠে-কাঠিই থেকে গেছে। আর ঘোড়ামুখ তো একেবারেই বদলায়নি—ব্যায়ামে ঘোড়ামুখ বদলাবে—এরকম ভরসাও ছিল না বিনোদের।

এইভাবে দিন যায়, বছর যায়। মাঝখানে কে একজন বলেছিল, 'ও সব শরীরের ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় রে, মোদ্দা কথা হল গে জ্ঞান। তুই যত জ্ঞানী হবি তত তোর ব্যক্তিত্ব বাড়বে। জ্ঞান দিতে পারলেই মান পাওয়া যাবে'—সুন্দর মিল দিয়ে শেষ করেছিল কথাটা।

কিন্তু বিনোদের কাছে জ্ঞানের রাস্তা তো খুব চওড়া ছিল না। লেখাপড়ায় সে এমন ধুন্ধুমার কিছু নয়। কানমলা শুধু সে বানানভুলের জন্যেই খেত না ভদ্রেশ্বরবাবুর কাছে, কানমলা খেত যজ্ঞেশ্বর মাস্টারের কাছে অঙ্ক না পারার জন্যে। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছে ইংরেজি ভুল করায়, কিংবা বিন্ধ্যেশ্বরবাবুর কাছে ম্যাপে ঠিক জায়গা দেখাতে না-পারার কারণে। ফলে কানমলার সংখ্যা দিয়ে তার পড়াশোনার অগ্রগতি মাপা হয়, এবং এভাবে কানমলা খেতে খেতেই সে মাধ্যমিক পেরিয়ে গেল। তখন তার বাবা বললেন, আর আমি ধেড়ে ছেলেকে টানতে পারব না, আমার মহাজনের গদিতে একটা খাতা লেখার ছেলে চাইছে, তুই ঢুকে পড়।'

বিনোদ ঢুকে পড়ল, এবং সংসারের নিয়মে যা অপরিহার্য, কাজ করতে করতে ব্যক্তিত্ব না আসুক তার বিয়ের বয়েস যথা নিয়মে এসে পৌঁছল, কিছুতেই আটকানো গেল না। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ব্যপারটাও মন থেকে গেল না। ভদ্রেশ্বরবাবুর কানমলা এমনই মোক্ষম ছিল যে, তার স্মৃতি যেমন যাবার নয়, তেমনই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তার কথাবার্তাও মন থেকে মুছে যাবার নয়, সেটা বিনোদ বেশ বুঝতে পারল। ব্যক্তিত্বের চিন্তা রাহুর প্রেমের মতো কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। যতদিন বাঁচবে ততদিন ব্যক্তিত্বের খাঁইও তার চলবে।

মাড়োয়ারির গদির আশপাশে বিনোদের কিছু বন্ধুবান্ধব হয়েছে। তাদের সঙ্গে আড্ডায় মাঝে মধ্যে বিনোদ 'ব্যক্তিত্ব' কথাটা নিক্ষেপ করে। তাদের মধ্যে একটি ছেলে, সম্পদের সঙ্গে বিনোদের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়। ছেলেটির বোধবুদ্ধিও আছে। সে বলল, 'দ্যাখো ভাই, ব্যায়ামবীর হলেই ব্যক্তিত্ব হত, এ আমি বিশ্বাস করি না। লোকে তো বলে শরীর যত ঢুঁসো হবে তত তোমার মাথার ঘিলু কমবে, সেটাও নিশ্চয় বাজে কথা। জ্ঞানের লাইনেও তুমি-আমি তেমন এগোতে পারব না, সেও তো জানা কতাই, বিধেতা আমাদের তেমন মালমশলা দেননি। কিন্তু তোমাকে ভারভারিক্কি দেখাবে, তার তো আরও অনেক রাস্তা আছে। ধরো, তুমি দাড়ি রাখলে।'

এই কথাটা বিনোদের বেশ মনে ধরল।

কিন্তু দাড়ি রাখতে গিয়ে এক মহা সঙ্কট। দাড়ির তো একটা রকম নেই—তার হাজার ভঙ্গি। তুমি খোঁচাখোঁচা দাড়ি রাখতে পারো, যেন দিন-এগারো কামানো হয়নি, তাতে ব্যক্তিত্ব ফুটবে, না সেলুনওয়ালা ব্যাকুল কামনা নিয়ে ক্ষুর বাগিয়ে তোমার মুখের দিকে তাকাবে—সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। তারপর আছে ফেঞ্চ-কাট। তার অনেক হ্যাপা শুনেছে, আর ঘোড়ামুখে ফ্রেঞ্চ-কাট কতটা মানাবে তা নিয়েও সন্দেহ আছে। তারপর আছে তাসের রাজার মতো চিরুনি আঁচড়ানো দাড়ি। সে বিনোদের কপালে আছে বলে মনে হয় না। তবে এই বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো লম্বা পাকাদাড়ি হওয়া সম্ভব নয়, তা হলে বরং বিনোদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্বের একটা হিল্লে হত। অবশ্যই চাপদাড়ি রাখা যেতে পারে। 'আচ্ছা', বিনোদ ভাবল, 'শুধু গোঁফ দিয়ে কজ চালানো যায় না? তাতেও তো অনেকের ব্যক্তিত্ব ফোটে দেখেছি। দাড়ি তো খুব চুলকোয় শুনি।'

কিন্তু এখানেও একই সঙ্কট। হাজার জাতের তো গোঁফ আছে, তার কোনটা বিনোদকে ঠিক ব্যক্তিত্বটি উপহার দেবে? চ্যাপলিনের মতো নাকের নিচে দুটি মাছি-বসার মতো গোঁফ? তার চেয়ে একটু বড় প্রজাপতি গোঁফ?' দু'পাশে ঝুলে পড়া সিন্ধুঘোটকের গোঁফ? মিহি কার্তিক মার্কা গোঁফ? কিংবা সাইকেলের হ্যান্ডেলের মতো ডাক সাইটে মিলিটারি গোঁফ?

এই সব ভাবতে বিনোদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দু-চারদিন কাটবার পর বউয়ের দিকে তাকিয়ে বিনোদ বুঝতে পারল ব্যক্তিত্ব ঠিক কাকে বলে। বিনোদ মুগ্ধ, বিস্মিত, হতভম্ব। শুধু যে সে বউয়ের কথায় উঠছে তাই নয়, বা বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত বউয়ের পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে তাই নয়। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছুটির দিনে যে কাকগুলো পাশের বাড়ির ছাদে এসে ডাকাডাকি করত তারা পর্যন্ত লম্বা ছুটি নিয়ে কোথায় ভেগে গেল।

বিনোদ কিন্তু তার বাবা আর মায়ের ব্যবহারে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বউমার এই ব্যক্তিত্বে বেশ আহত ও ক্ষুণ্ণ হলেন, এবং অযৌক্তিকভাবেই নানারকম কটু সমালোচনা করতে লাগলেন। শেষে বিনোদের মা-ই একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা বিনোদ, বউমাকে নিয়ে তুমি আলাদা হয়ে থাকো কোথাও গিয়ে, সংসারের শান্তি হোক। আমাদের যেমন করে হোক চলে যাবে। ভগমান আছেন।'

বিনোদ এই প্রথম বাবা-মার কথায় একটা যুক্তি খুঁজে পেল। সে শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি নারকেলডাঙার প্রান্তে একটা একতলার ঘরে বউকে নিয়ে উঠল এবং মহোৎসাহে সংসারধর্মে মন দিল। বউয়ের ব্যক্তিত্বে সে খুশি, এবার বউকে একা পেয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজীবন সমস্যার কথা খুলে বলল তাকে।

বউ কথাটা যথেষ্ট মন দিয়েই শুনল। এমন বলল না যে, 'আমার যা ব্যক্তিত্ব আছে তাতেই দুজনের চলে যাবে, তোমার আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়ে আর কী দরকার।' স্বামীর একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব থাকে এ কোন স্ত্রী না চায়। কিন্তু বিনোদের ব্যায়াম, গোঁফদাড়ি ইত্যাদি প্রস্তাবের কথা সে তুমুল হেসে উড়িয়ে দিল। বলুন, 'ধুর! ব্যক্তিত্ব একটা এক্সট্রা জিনিস, তাই তোমাকে একস্ট্রা জিনিস লাগাতে হবে। তুমি একটা কাজ করো। তুমি একটা মোটা ফ্রেমের চশমা নাও।'

যে কথা সেই কাজ। চোখ খারাপ হয়নি বিনোদের, কিন্তু তাতে চশমা নেওয়া আটকাবে কে। এর মধ্যে বিনোদ উপরি আয়ের দুটো-একটা পথ জেনেছে, মানে উপরি আয়ই তাকে খুঁজে খুঁজে ধরেছে। ফলে তার পকেটে টাকা আছে। কলকাতায় টাকা থাকলে বাঘের দুধ মেলে তো মোটা ফ্রেমের চশমা তো ছার।

কিন্তু ঘোড়ামুখে মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে দেখা গেল সে এক বিপর্যয়। কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ব্যক্তিত্ববান দেখাবে, না তার বদলে মুখখানা কীরকম সার্কাসের ভাঁড়ের মতো হয়ে গেল। বউও তা দেখে চমকে গেল, বলল, 'না, চশমা চলবে না।'

বিনোদ নিরুপায়ের মতো বলল, 'তাহলে কী করি এখন? ব্যক্তিত্ব তো পেতে হবে, যে করেই হোক।'

এর মধ্যে বউ-বিনোদ দুজনে মিলে আরও অনেক কাণ্ড করেছে। বউয়ের নাইটি আর বিনোদের সুট বানিয়েছে এক প্রস্ত। সুট পরলে যদি বিনোদের ব্যক্তিত্ব তেড়েফুঁড়ে বেরোয়। সে আশাও ফলবান হয়নি। বিনোদের হাঁটাটাই এমন বিচ্ছিরি যে সুট পরেও তাকে হাস্যকরই দেখায়। বউ নাইটি পরে মুখে ব্রাশ নিয়ে রাস্তার টিউবওয়েলে জল আনতে গেছে, কিন্তু তাতে বিনোদের ব্যক্তিত্বে কিছু যোগ হয়নি।

শেষে বউ বলল, 'এক কাজ করো—তুমি একটা ভাল জাতের কুকুর পোষো। তাতে তোমার ব্যক্তিত্ব বাড়বে। নির্ঘাত বাড়বে।' চমৎকার। বিনোদ পরদিন গিয়ে কেনেল ক্লাব থেকে একটা অ্যাসসেশিয়ানের বাচ্চা কিনে আনল এবং খুবই যত্ন করে তাকে পুষতে শুরু করে দিল। তাকে গলায় চেন বেঁধে নিয়মিত দু'বেলা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মাঠে প্রাতঃকৃত্য করানো, বাজার থেকে মাংসের ছাঁট কিনে এনে সেদ্ধ করে খাওয়ানো—ইত্যাদি নানা পরিচর্যা ও সেবাযত্নের ফলে সে বছরখানেক যেতে না যেতেই বিশাল বলবান হয়ে উঠল। তার গলার আওয়াজে ব্যাঘ্রগর্জনের মাত্রা এল—প্রতিবেশীদের এবং অপ্রতিবেশী চোরেদের পিলে সে আওয়াজে চমকে-চমকে উঠতে লাগল।

ক'দিন পরেই প্রতিবেশীরা দেখল, চেনে-বাঁধা ডালকুত্তাকে বিনোদ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে ছবিটা বদলে গেছে। বরং অ্যালসেশিয়ান জর্জ-ই (বাঙালি বাড়িতে বিলিতি কুকুরের ইংরেজি নাম কেন হয়, এবং তারসঙ্গে কেন 'সিট ডাউন', 'গো', 'আপ' ইত্যাদি কঠিন কঠিন ইংরেজি কথা বলা হয় তা আপনারা সবাই জানেন। বাঙালি মালিকদের ধারণা সাহেব কুকুরেরা বাংলা বোঝে না) যেন আগে আগে ছুটছে বিনোদ তার সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিতে পারছে না। কারও কারও এমনই দৃষ্টিভ্রম হল যে, জর্জ-ই যেন বিনোদকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বর্ষার দিনে দেখা গেল, জর্জকে নিয়ে বিনোদ তার শরীরে ছাতা-ঢাকা দিয়ে রিকশোয় উঠেছে। বৃষ্টিতে হাঁটাতে না পারুক, অন্তত রিকশোয় চড়িয়ে তাকে মাঠ দেখিয়ে আনবে, এরকমই পরিকল্পনা। পরে একজন-দুজন রিপোর্ট করেছিল, তারা এমনও দেখেছে যে, জর্জ রিকশোর সিটে বসে আছে, বিনোদ তার পায়ের কাছে। কিন্তু আমি সেটা কুলোকের প্রচার বলে পাত্তা দিইনি। যাই হোক, বর্ষার দিনে বিনোদের রিকশোর খরচটা বেশ বেড়ে যেত।

লেখক সর্বজ্ঞ, তার চোখে কিছুই এড়ায় না, তার কানে সব খবরই আসে, ফলে পরের ঘটনাটাও পাঠককে জানিয়ে দেওয়া দরকার। সেটা এই, একদিন সকালবেলায় বিনোদের বাড়ির বৈঠকখানায় গিয়ে দেখা গেল জর্জ এবং বিনোদ সবে বেড়িয়ে ফিরেছে। আর জর্জ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোফায় গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে গা এলিয়ে দিয়েছে, একপাশে ল্যাজটা একটু একটু করে নাচাচ্ছে। এমন সময় বিনোদের বউ ভেতর থেকে হাঁক দিল, 'ওগো, হয়েছে, এসে নিয়ে যাও।'

বিনোদ ছুট্রে ভেতরে গেল, এবং অতি সন্তর্পণে ট্রেতে করে এক কাপ চা এবং আর একটা প্লেটে ছ'খানা বিস্কুট নিয়ে পর্দা ঠেলে ঢুকল এবং অত্যন্ত ভক্তিভরে জর্জের সামনে টি-টেবিলে রাখল। জর্জ থাবা দিয়ে বিস্কুট তুলে চিবুতে লাগল, তারপর অবহেলাভরে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। এমন সময় যে গিয়েছিল, সে সেই পুরনো বন্ধু, সম্পদ, যে বিনোদের ব্যক্তিত্ব বাইয়ের কথা জানত। সে স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী রে? এই তোর ব্যক্তিত্ব? তুই কুকুরের চাকর বনে গেছিস?' শুনেই জর্জ ক্রুদ্ধস্বরে 'ঘাউ' করে উঠল।

বিনোদ সম্পদকে ইশারা করে বসাল। বলল, 'ভাই, জর্জের সামনে এ সব কথা বলিস না। আরে শোন। আমার ব্যক্তিত্ব না হোক, আমি যে অন্য একজনকে ব্যক্তিত্ব দিতে পেরেছি, সে কি কম কথা? জর্জকে দ্যাখ একবার। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যক্তিত্ব হয়েছে বল।'

জর্জ আবার একটা 'ঘাউ' শব্দ করল। এটাতে যেন খানিকটা খুশি মেশানো।

আজকাল, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি

প্রচেত গুপ্ত

শ্রীপর্ণা বসে আছে বারান্দায়। গাঢ় বেগুনি রঙের একটা ওড়না তার কানে গলায় মাফলারের মতো করে জড়ানো। সে নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে হাঁচছে এবং নাক টানছে। তবে তার মন হাঁচি বা নাক টানায় নেই। তার মন কোলের ওপর রাখা ল্যাপটপে। টাইপ করতে করতে হাসছে। কখনও মুচকি, কখনও জোরে। সম্ভবত কারও সঙ্গে কথা চালাচালি হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা চালাচালি হচ্ছে?

ঘন ঘন নাক মোছার কারণে শ্রীপর্ণার ফর্সা, টিকোলো নাকের ডগা এখন টকটকে লাল। পঁচিশ বছরের এই মেয়েকে খুবই সুন্দর দেখাত। নাকের ডগা লাল হওয়ায় এখন অতিরিক্ত সুন্দর লাগছে। তবে শুধু টিকোলো নাক, ভাসা ভাসা চোখ আর গায়ের রং ফর্সা বলেই সে সুন্দর, এমন নয়, তার ছিপছিপে চেহারায় এক ধরনের বুদ্ধির ছাপ আছে। দেখা গেছে, যাদের চেহারায় বুদ্ধির ছাপ থাকে তারা সাধারণত বোকা হয়। শ্রীপর্ণার বেলাতে ঘটনা অন্য রকম। সে সত্যিই বুদ্ধিমতী।

মেয়ের থেকে কয়েক হাত দূরে বসে আছেন মানসবাবু। তিনি বসে আছেন মোড়ার ওপর। বারান্দায় একটাই চেয়ার। বেতের রকিং চেয়ার। সেই চেয়ারের দখল নিয়েছে শ্রীপর্ণা। রকিং চেয়ারের নিয়ম হল, সে সামনে পিছনে দুলবে। এই চেয়ার দোলে পাশাপাশি। শ্রীপর্ণার ফেভারিট। বসলে উঠতে চায় না। এই বারান্দাটাও চমৎকার। এখন আরও চমৎকার লাগছে। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। এখন বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ মেঘলা। এই মেঘকে বলে কাজল লেপ্টে যাওয়া মেঘ। মেঘ টপকে সকালের অল্প আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। আলো নয়, আলোর ছায়া। আলোর ছায়া খুব সুন্দর। হাত পেতে ধরতে ইচ্ছে করে।

আলো নয়, মানসবাবু ধরে আছেন খবরের কাগজ। চোখের সামনে তুলে ধরে আছেন। কিন্তু পড়তে পারছেন না। তার মধ্যে 'পাথর-ভাব' দেখা দিয়েছে। 'পাথর-ভাব' এক ধরনের কঠিন অবস্থা। এই অবস্থায় মনে হয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পাথর হয়ে গেছে। চোখের মণি, হাত-পা, ঘাড়, গলা সব পাথর। কিছুই নড়াচড়া করা যাবে না। মানুষ সাধারণত এই ধরনের অবস্থা লাভ করে গভীর শোকে। মানসবাবু পাথর হয়েছেন রাগে। তার রাগ দু'জনের ওপর। মেয়ে এবং মেয়ের মা। মেয়ের বুদ্ধি নিয়ে মানসবাবুর গর্ব ছিল। সম্বন্ধের সময় মাত্র সতেরো মিনিট এই মেয়ের সঙ্গে পাত্র কথা বলেছিল। মুখোমুখি নয়, কথা হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

টেলিফোনে, কর্পোরেট কায়দায়। ব্যস তাতেই ছেলে রাজি, বিয়ে ফাইনাল। এমন মেয়েকে নিয়ে গর্ব হবে না? আজ মানসবাবুর সেই গর্ব তছনছ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তার মেয়ে শুধু বোকা নয়, তার বুদ্ধি গাধার থেকেও নিম্নমানের। নইলে বিয়ের মাত্র আট মাসের মধ্যে এমন কাজ কেউ করতে পারে? শ্বশুরবাড়ি যদি গোলমালের হত, তা হলে একটা কথা ছিল। ঘটনা একেবারেই তা নয়। ফ্যামিলি অতি সজ্জন। জামাই রঞ্জন অতি ভদ্রসভ্য ছেলে। এতটাই ভদ্রসভ্য যে মাঝে মধ্যে শ্বশুর হিসেবে মানসবাবুরই অস্বস্তি হয়। দেখা হলে দু'বার করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এক বার প্রথমে, এক বার শেষে। আজকের দিনে দু'বার প্রণাম করা জামাই পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আগামী বছর জামাইকে অফিস থেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। গোটা ইউরোপ ট্যুর। লন্ডনে শ্রীপর্ণা গিয়ে মিট করবে। অথচ ছেলের এতটুকু গর্ব নেই। শুধু ছেলের নয়, ছেলের বাপ-মায়েরও নেই। বলছে, ও তো আপনাদেরও ছেলে। গর্ব আপনাদের। আহা। সব মিলিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হল সোনার শ্বশুরবাড়ি। বড় মাপের গাধা না হলে সেখান থেকে ...। মেয়ের মা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। মনে হচ্ছে, এই ঘটনায় সেও যুক্ত। কী ভাবে যুক্ত?

মানসবাবু খুব চেষ্টা করছেন রাগ কমিয়ে মাথা ঠান্ডা করতে। তিনি পর পর দু'কাপ গরম চা খেয়েছেন। মাথা ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। পাথর-ভাব কাটছে। আর একটু সময় নিচ্ছেন।

রাগের শুরু কাল রাতে। তখন সাড়ে দশটা বাজে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। রোজকার মতো বই হাতে শুতে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন মানসবাবু। এমন সময় গাড়ির আওয়াজ পেলেন। পুরনো লক্কড়ে গাড়ি স্টার্ট বন্ধ না করে দাঁড়ালে এক ধরনের পাড়া কাঁপানো বিচ্ছিরি আওয়াজ হয়, সেই আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন মানসবাবু এবং চমকে উঠলেন। ট্যাক্সি থেকে নামছে শ্রীপর্ণা। তার এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে ল্যাপটপের ব্যাগ। আধো আলো আধো অন্ধকারে মানসবাবু দেখলেন মেয়ের মুখ হাসি হাসি। মানসবাবু একই কারণে খুশি এবং চিন্তিত হলেন। মেয়ে হঠাৎ এসেছে বলে খুশি আবার মেয়ে হঠাৎ এসেছে বলে চিন্তা। কোনও গোলমাল হয়নি তো? এত রাতে কেন? গোলমাল হলে তো মুখে হাসি থাকার কথা নয়। নাকি ওটা হাসি নয়। আবছা আলো বৃষ্টির ফোঁটায় বিভ্রম হয়েছে। তিনি জানলা থেকে সরে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'অনুরাধা, পর্ণা এসেছে।'

অনুরাধাদেবী শোবার জন্য বিছানা করছিলেন। স্বামীর মুখে মেয়ে এসেছে শুনে খুশিতে বালিশ-টালিশ ছুড়ে ফেলে খাট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন।

'কী ব্যাপার বলো তো? পর্ণা কাউকে না জানিয়ে হুট করে চলে এল। তোমায় ফোন করেছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে অনুরাধাদেবী স্বামীর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েকে বাপের বাড়ি আসতে হলে আগাম জানিয়ে আসতে হয় নাকি! কী ভাবে জানিয়ে আসবে? আগে আগে ব্যান্ড পার্টি আসবে?'

মানসবাবু থমকে গেলেন। কথাটা ভুল নয়। এটাও তো শ্রীপর্ণার বাড়ি। বিয়ে হয়ে গেছে মানে এই নয় যে, এ বাড়ি তার নয়। এ বাড়ি অবশ্যই তার। যখন খুশি আসতে পারে। আসার আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে আসার কোনও যুক্তি নেই। তিনি ঢোঁক গিলে বললেন, 'না, ভাবছি কোনও সমস্যা হল কিনা? আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ভয় করে।'

অনুরাধাদেবী আরও কঠিন চোখে তাকালেন। বললেন, 'অলক্ষুনে কথা বলছ কেন? সমস্যা হবে কী জন্য? অমন হিরের টুকরো জামাই, তার সঙ্গে সমস্যা কীসের? এ রকম অলক্ষুনে কথা আর বলবে না।'

মানসবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আর বলব না।'

সিঁড়ির ধাপ টপকাতে টপকাতে অনুরাধাদেবী বললেন, 'ফট করে যেন মেয়েকে জিগ্যেস কোরো না কেন এসেছ, কত দিন থাকবে। বাপের বাড়িতে এসে মেয়েরা এই ধরনের প্রশ্ন শুনলে রেগে যায়। অপমানিত হয়।' স্ত্রীর শাসনে মানসবাবু বিরক্ত হলেন। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে আজকাল একটু ভয় ভয় লাগে। মনে হয় বয়স বাড়ার লক্ষণ।

শ্রীপর্ণার শরীর খারাপ। ঠান্ডা লেগেছে। গলা বসে গেছে। টনসিল ফুলেছে। সর্দি, কাশি, হাঁচি সব একসঙ্গে চলছে। ঠান্ডা লাগার কারণ জিগ্যেস করতে গিয়ে চেপে গেলেন মানসবাবু। কে জানে, এই প্রশ্নও করা উচিত হবে কিনা। আজ রাতে ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। কাল সকালে দেখা যাবে। মেয়ের কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। তবে মায়ের সঙ্গে তার কথা চলল আকারে ইঙ্গিতে। আকারে ইঙ্গিতে হাসাহাসিও হল। কাজটা কঠিন, তবু হল। হাসাহাসির বিষয় মানসবাবু বুঝতে পারলেন না। মা-মেয়ের হাসাহাসির কারণ কখনওই অন্য কেউ বুঝতে পারে না। মানসবাবুর ইচ্ছে করছিল মেয়েকে একটা ধমক দিয়ে বলেন, 'বোকার মতো হাসাহাসি বন্ধ করো। শরীর খারাপ নিয়ে এত রাতে এলে কেন? টালিগঞ্জ থেকে দমদম তো কম পথ নয়। তার ওপর বৃষ্টি বাদলার রাত। কাল সকালে এলে কি তোমার বাবা-মা পালিয়ে যেত?' মনে ভাবলেও কথাটা বলতে পারলেন না মানসবাবু। অনুরাধা ঠিক বলেছে। বাবা-মায়ের কাছে মেয়ের আসাটাই বড়। কখন এল, কেন এল, সেটা বড় বিষয় না।

বিষয় বড় হল রাতে। একটু বেশি রাতের দিকে। স্ত্রীর কাছ থেকে মেয়ের আসার কারণ আধখানা জানতে পারলেন মানসবাবু। জেনে শিউরে উঠলেন।

'পর্ণা আজ রাগ করে টালিগঞ্জ থেকে চলে এসেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানার ওপর ধড়ফড় করে উঠে বসলেন মানসবাবু। বললেন, 'চলে এসেছে মানে।'

অনুরাধাদেবী নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাই তুললেন। বললেন, 'চলে এসেছে মানে, চলে এসেছে। রাগ হয়েছে।'

মানসবাবু বিস্মিত হলেন। মেয়ে রাগ করে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে আর মেয়ের মা হাই তুলছে। তিনি বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'কী হয়েছে? হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

অনুরাধাদেবী মুচকি হেসে বললেন, 'ভেরি মজার থিঙ হ্যাপেন্ড। কাল মেয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ো। আমি এখন ঘুমোব।' কথাটা বলে অনুরাধাদেবী আবার মুচকি হাসলেন। তার পর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাইরে গুমগুম শব্দে বাজ পড়ল। মানসবাবুর মনে হল বাইরে নয়, বাজ পড়েছে তার মাথায়। পড়ারই কথা। বিয়ের মাত্র আট মাসের মাথায় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলে মেয়ের বাবার মাথায় বাজ পড়বে না? তার ওপর মেয়ের মা বলছে মজার ঘটনা। ভয়ংকর। মনে হচ্ছে, মা-মেয়ের মধ্যে কোনও চক্রান্ত রয়েছে। মানসবাবু খাট থেকে নেমে পুরো এক জাগ জল খেলেন। ঘরে পায়চারি করলেন। বেশ কয়েক বার খাটে বসলেন এবং উঠলেন। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এক তলায় মেয়ের ঘর পর্যন্ত গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে এলেন দু'বার। শেষ পর্যন্ত বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, রাগের কারণ জানার দরকার নেই। দরকার মেয়ের সঙ্গে কথা বলার। রাগ করে কথা নয়, ঠান্ডা গলায় কথা। তাকে বুঝিয়ে কালই ও-বাড়ি পাঠাতে হবে। বলবেন, 'ছি ছি। কী বলে তুমি এমন কাজ করলে পর্ণা। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। না, না আমি তোমার কাছ থেকে কোনও এক্সকিউজ শুনতে চাই না। এক জন বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছ থেকে এ জিনিস ভাবা যায় না। অমন শ্বশুরবাড়ি একশো হাত মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাবে? বলো পাওয়া যাবে? যদি বলো পাওয়া যাবে, তা হলে এখনই আমি বাগানে গিয়ে একশো হাত মাটি খুঁড়ব ...।'

মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টায় অনেকটা সফল হলেন মানসবাবু। পাথর ভাব কাটিয়ে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। শ্রীপর্ণা 'ফ্যাঁচ' আওয়াজে হাঁচল। এক গাল হেসে বলল, 'বাবা, অমন করে আড়চোখে তাকিয়ো না। আমার ভয় করছে।' মানসবাবু লজ্জা পেয়ে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। শ্রীপর্ণা বলল, 'আমি জানি তুমি আমার ওপর রেগে আছ। মা নিশ্চিয় তোমাকে সব বলেছে। তাই তো? তার পরেও হাসছি বলে তোমার রাগ আরও বাড়ছে। রাগের সময় হাসি ক্যাটালিস্টের কাজ করে। রাগ বাড়িয়ে দেয়। দুঃখের সময় ক্যাটালিস্টের কাজ করে সান্ত্বনা। সেই কারণে দুঃখের সময় কাউকে সান্ত্বনা দিতে নেই। কেন হাসছি তুমি কি শুনবে? শুনলেও তুমিও মজা পাবে।'

মানসবাবু ঠিক করলেন, এ বার কথা বলবেন। তবে প্রথমে কাজের কথা নয়। প্রথমে হাবিজাবি কথা। ঠান্ডা লাগা নিয়ে কথা শুরু করলে কেমন হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার ঠান্ডা লেগেছে কেন পর্ণা?'

শ্রীপর্ণা হেসে বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজেছি বাবা। ওই গরমের পর পরশু যখন প্রথম বৃষ্টি হল তখন খুব ভিজেছি।'

'ও, কোথাও গিয়েছিলে বুঝি? সঙ্গে ছাতা ছিল না? এ রকম করবে না। বর্ষাকালে সব সময় ছাতা নেবে।'

শ্রীপর্ণা খিলখিল করে হেসে বলল, 'ওমা! ছাতা থাকবে কেন? আমি তো ছাদে উঠে ভিজলাম। আগেও তো ভিজতাম। রঞ্জনদের বাড়ির ছাদটা খুব বড় আর খুব সুন্দর। মনে হয় ওরা বৃষ্টিতে ভেজার জন্যই ছাদটা বানিয়েছে।'

মানসবাবু মোড়াতেই নড়েচড়ে বসলেন। শ্বশুরবাড়ির ছাদে গিয়ে বাড়ির নতুন বউ ভিজেছে। কাজের কথা সব গোলমাল হয়ে গেল। আগে এই ধাক্কা সামলাতে হবে। তিনি ঢোঁক গিলে বললেন, 'কেউ দেখেনি তো মা?'

শ্রীপর্ণা দু'বার নাক টেনে রকিং চেয়ার দুলিয়ে বলল, 'দেখেছে কি না জানি না, তবে সবাই জেনেছে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে মানসবাবু বললেন, 'এটা ঠিক হয়নি। শ্বশুরবাড়ির ছাদে ভেজাটা ঠিক হয়নি। এখন তুমি বাড়ির বউ, কলেজের মেয়ে নও।'

'কী যে বলো না বাবা। বৃষ্টি নেমেছে আর আমি ভিজব না? এমন কখনও হয়েছে? বৃষ্টি হচ্ছে শ্বশুরবাড়ির ছাদে আর আমি ভিজব অন্য জায়গায়? জানো বাবা, শুধু ভিজিনি, সঙ্গে নেচেওছি। সিজনের প্রথম বৃষ্টিতে সব সময় ভেজার সঙ্গে নাচতে হয়। এটাই নিয়ম। থেই থেই করে নেচেছি। সঙ্গে বেসুরো গলায় গান। ঝর ঝর বরিষে বারিধারা/হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ... হি হি।'

মানসবাবু মুহূর্তখানেক চুপ করে রইলেন। অর পর নিচু গলায় বললেন, 'ছি ছি। আর কখনও এমন কোরো না।'

শ্রীপর্ণা দু'বার হাঁচি দিল, এক বার নাক টানল। গলার ওড়না টেনেটুনে জড়িয়ে বলল, 'রঞ্জনও ফিরে এসে এই কথা বলল। ও অফিসে ট্যুরে বাইরে গিয়েছিল। তিন দিন পরে রাতে বাড়ি ফিরে এসে সব খবর পেল। আমার বৃষ্টি স্নানের খবর। বলল, ছি ছি, আর কখনও এমন কোরো না শ্রীপর্ণা। বাবা-মা দুঃখ পেয়েছেন। আমি বললাম, একশো বার করব। একশো বছর বাঁচব তাই একশো বার। হাজার বছর বাঁচলে হাজার বার ভিজতাম। এর পর থেকে তোমার মা-বাবাকেও সঙ্গে নেব। ওরা যদি রাজি হন ভাল, না হলে জোর করব। আমার মাকে বিয়ের পর ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে দেয়নি বাবা। মায়ের সেই বৃষ্টিতে ভিজতে দেয়নি বাবা। মায়ের সেই দুঃখ আজও আছে। নিশ্চয় তোমার মায়েরও সে রকম কোনও দুঃখ আছে। আমি দুঃখ দূর করব। রঞ্জন এ কথা শুনে আমাকে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাট আপ। বাবা, তোমার জামাই তো খুব ভাল ছেলে, শাট আপের বেশি বলতে পারে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি স্যুটকেস গুছিয়ে চলে এসেছি। ঠিক করিনি?' শ্রীপর্ণা আবার খিলখিল করে হাসল।

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন মানসবাবু। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। সত্যি কী এমন হয়েছিল? অনুরাধাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেননি? কবে? এই সামান্য একটা ঘটনা সে আজও মনে রেখেছে! নাকি এটা সামান্য নয়?

শ্রীপর্ণা চকচকে চোখে বলল, 'বাবা, কার সঙ্গে কম্পিউটারে হেসে হেসে চ্যাট করছি জানতে চাইলে না তো? তোমার জামাইয়ের সঙ্গে। সে আজ আমাকে নিয়ে যেতে আসছে। আমি বলছি যেতে পারি একটা শর্তে। এ বাড়ির ছাদে উঠে আমার সঙ্গে তাকে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। তবেই তাকে আমি ক্ষমা করব। ও গাঁইগুই করছে। বলছে, আমার ঠান্ডা লেগেছে, আর ভেজা উচিত হবে না। আমি বলেছি, উচিত না হলেও ভিজব। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, মা বলেছে, হ্যাঁ ভিজবি, ঠান্ডা লাগলেও ভিজবি। যদি আমাকে সঙ্গে নিস আমিও ভিজব।'

মানসবাবু একটুখানি চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে গাধা মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন। লাজুক হেসে বললেন, 'এই বুড়ো বয়সে আমার বৃষ্টিতে ভেজাটা কি ঠিক হবে? তুই কী বলিস?

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ নভেম্বর ২০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন সুভদ্রা

প্রদীপ ঘোষ

বাংলোটি টিলার উপর। গাড়িতে আসতে আসতে দূর থেকে দেখলাম কিষেণলাল মেয়েটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলাম। ঘড়ির কাঁটা দুটো প্রায় এক সরলরেখায়। এখনও সূর্যের সেলগুলো শেষবারের মতো নিশ্বাস নিচ্ছিল। সূর্য ডোবার আগে আকাশের রঙ ডিমের লাল কুসুমের মতো। যেন কোনও অহংকারী নারী তার ওষ্ঠ দিয়ে এঁকে দিয়েছে সূর্যাস্তের রঙ।

পাথুরে কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে পাহাড়ি বর্ষায় হঠাৎ বেড়ে যাওয়া শটী এবং কন্টিকারী লতার মাঝখান দিয়ে নিপুণভাবে পথ করে ইঞ্জিন ও ডাইমেশান বেগোনভালিয়ার ঝাড় ছুঁয়ে থামল টাটা সুমো।

প্রায় একমাস হল এই চা-বাগানের চিফ ম্যানেজার হিসাবে যোগ দিয়েছি। নন্দিনী আর সায়ন্তনকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি কলকাতায়। সায়ন্তনের এবার বছর আট হল। আমার এই নতুন চাকরিতে জয়েন করার জন্য ওর পড়াশোনার খুব ক্ষতি হল। আগের চা-বাগানটায় জলপাইগুড়ির কাছে থাকায় ওর পড়াশোনার খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় ভাল স্কুল কোথায়? অতএব নন্দিনী এবং সায়ন্তনকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে হল। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত অবধি দুজনের চোখ ছলছল করছিল। নন্দিনী অনুযোগ করছিল, /এমন জায়গায় চাকরি নিলে, যেখান মোবাইলেও তোমাকে ধরা যাবে না। ল্যান্ডফোন এ-জায়গায় প্রায়ই খারাপ থাকে। কোনও কিছু হলে কীভাবে তোমাকে কনটা* করা যাবে বুঝতে পারছি না।* আমি প্রবোধ দিলাম, আমার ঘরে একটা হটলাইন আছে, কলকাতায় হেডঅফিসের সঙ্গে কথা বলার জন্য। শুনেছি কলকাতার একটি কোম্পানি একটি টাওয়ার বসাচ্ছে আমাদেরই চা-বাগানের কিছুদিনের মধ্যেই। তখন আর সমস্যা থাকবে না। দেখে নিও।

কিষেণলাল কোনও ভূমিকা না করে বলল, /স্যার একটা কুকের খোঁজ করতে বলেছিলেন, এনেছি নিয়ে আসব?* আমি সম্মতি দিলাম। এখানে এসে আমার খাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। একে তো এখানে সবজি-মাছ খুব একটা পাওয়া যায় না। ভুটান বর্ডারের কাছে একটা হাট বসে। সেখান থেকে আনাজ, চালানি মাছ আনতে হয়।

মেয়েটিকে বেশ দেখতে। স্থানীয় মদেশিয়া গোষ্ঠীর বলে মনে হয়। বেতসলতার মতো ছিপছিপে শরীর তনুনিয়ায়ে ঠকরা একটা খুব সাদা-লাল-টা লাল বেসের

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

উপর ব্লক ছাপা শাড়ি। গায়ে ফিকে ব্লাউজ। বারান্দার চেয়ারে বসে দেখছি সামনের একটা পিয়াল গাছে একটা দেশি পাখি একটানা ডেকে চলেছে ... কুর ... কুব ... কুর। তার উপর চোখ রাখতে রাখতে মেয়েটাকে জিগগেস করলাম, তোমার নাম কী?

— সুভদ্রা স্যর। মেয়েটি বেশ প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

— বাড়ি কোথায়?

— অনেক দূরে চা-বাগানের এলাকার বাইরে দু-চারটে কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। পাশ দিয়ে সবুজ খানখেত। তারই পাশাপাশি সবুজ চা বাগান। আরও দূরে একটা পাহাড়ি নদী। স্থানীয় লোকেরা বলে বায়ভাঙ। একটু জল বেড়েছে। ইদানীং গ্রীষ্মকালে জল থাকে হাঁটু অবধি। নিদাঘের দাবদাহে তখন তলার বালির চর পর্যন্ত দেখা যায়। আবার বর্ষাকালে এ নদী ফেঁপে ফুলে ওঠে। আশপাশের চাষের জমি, বাড়ি, ঘর ডুবিয়ে দেয়।

— লখাই তোমার গ্রামে থাকে না?

— হাঁ সাব।

সন্ধে হয়ে এসেছে। কিষেণলাল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন লোডশেডিং চলছে। দূরে আলো আঁধারির এক বিচিত্র খেলা চলছে। কিষেণলাল মেয়েটিকে ধমকে দিয়ে বলল, চুপ করে আছিস কেন? বল কী কী পারিস আর মাইনে কত নিবি। স্যার, দু'বছর আগে ঘোষ সাহেবের কাছে ও কাজ করেছে।

— ঘরদোর সাফ, রান্না, কাপড় কাচা সব করব। কিন্তু মাইনে লাগবে আমার পাঁচশো টাকা। মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

— পাঁচশো?

পাঁচশো টাকা এখানকার তুলনায় অনেক বেশি। আগে লখাই ছিল সে নিত তিনশো টাকা। তারপর ভাবলাম এ-চাকরির সঙ্গে আমার প্রায় পাঁচহাজার টাকা স্যালারি বেড়েছে। এছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম। শুধু খাওয়া দাওয়া নয়, বাংলোটাও টিপটপ থাকা দরকার। দরকার পরিষ্কার বিছানা, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

কিষেণলালকে জিগগেস করলাম, /ও থাকবে কোথায়?* আমার পাশেই সারভেন্ট কোয়ার্টারে স্যর। ঘরটা ফাঁকাই আছে। কোম্পানি থেকে একটা বেড, অ্যাটাচড বাথরুম, কিচেন সব দিয়েছে স্যর। বুঝলাম সিঙ্গল রুম সারভেন্ট কোয়ার্টার। মেয়েটির অবশ্য থাকতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিষেণলাল খুব সজ্জন লোক। নিয়মিত রামধনু গীত করে। আমার তো বেশ ভালই লাগে।

ড্রয়িং রুমে ইজিচেয়ারে বসে ঝাড়লণ্ঠনের স্নিগ্ধ আলোয় বেশ ক'দিনের পুরনো 'প্রতিদিন' পড়ছি। মোবাইলে সিগন্যাল দিচ্ছে, টাওয়ার নেই। টেলিফোনটা সকাল থেকে অকেজো হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার একমাত্র সম্পর্ক এখন এটাই। রেডিওর ব্যাটারি ফুরিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মৃদু কাচের চুড়ির ঝনঝনানি শব্দ পেলাম। চোখ তুলে দেখলাম, মেয়েটি চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনেছে টি-পটে।

— স্যার চা।

— রাখো, বেতের টেবিলটার উপর।

— একটা কথা বলব স্যর। আপনাকে ঠিক আগের চিফ সাহেবের কাছাকাছি দেখতে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আগের সাহেবই গাড়ি থেকে নামলেন। মেয়েটি এই প্রথম একনাগাড়ে কথা বলে গেল।

নিজেই চা-দুধ আর সুগার কিউব মেশাতে মেশাতে চমকে উঠলাম। আগের ঘোষ সাহেবের একটু বদনাম ছিল বলে শুনেছি। পোশাক বদলানোর মতো মেয়েমানুষ বদল করতেন।

ড্রয়িং রুমে গণেশ পাইনের আঁকা একটি নারীর ছবি। উনি আমার খুব প্রিয় শিল্পী। সেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আগের সাহেবের ঠিক এইরকম একটা ছবি। তবে সেটা ...

আমি চমকে উঠলাম আবার। মেয়েটি বলে কী। ঢাউস বর্ণাঢ্য ফ্লাওয়ার ভাসের উপর একটা কৃত্রিম ফুল এক কোনায় রাখা ছিল। সেটি দেখে মেয়েটি বলল, আগের সাহেবের ঠিক এইরকম একটা টব তবে তাতে লালফুল ছিল। সাহেব লাল রঙ ভালবাসতেন কি না।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে। মেয়েটি বেশ পরিচিত ভঙ্গিতে ফ্রিজ থেকে সবজি, মাংস রান্না করতে বসল। আমি 'প্রতিদিন' মুখস্থ করার পর মোবাইলে গেমস খেলতে শুরু করলাম। আপাতত কারেন্ট নেই বলে মিউজিটা শোনা যাচ্ছে না টিভিতে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা পাহাড়, নদী বেশ দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি অতি চটপটে। প্রায় একঘণ্টার মধ্যে গ্যাস ওভেনে রান্না করে ফেলল। খেতে বসে দেখি— গরম ভাত, ডাল, আলুভাজা, মাংস। দারুণ খিদে পেয়েছিল। চটপট খেয়ে নিলাম। মেয়েটিও দেখি রান্নাঘরে এককোণে বসে খাচ্ছে। ভালই রান্না করে মেয়েটি।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মেয়েটি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বিছানা ঠিক করে দিল। আমার দিকে তাকাচ্ছে বারবার। কৌতূহল বেড়ে গেল আমার। আমি তখনও বারান্দার চেয়ারে বসে আছি।

— এর আগে যেদিন ঘোষ সাহেবের কাজে কাজে লেগেছিল তখন প্রায় সন্ধে হয় হয় তা না?

— হ্যাঁ স্যর।

— আগের সাহেব তোমাকে চা খেতে দিয়েছিল?

— হ্যাঁ, স্যর।

— তারপর রেডিও চালিয়ে দিয়েছিল?

— হ্যাঁ স্যর। হিন্দি গান ছিল। —ইয়ে হ্যায় রেশমি।

তখন তোমাকে ড্রিংকস, অফার করেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আমাকে এক বোতল জল আনতে বলেছিলেন। এসে দেখি চিফ সাহেব দুটো গ্লাসে মদ ঢালছে। লাল রঙের মদ ছিল স্যর। তারপর নিজে আমারটাতে জল দিল। নিজেরটাতে নিল না। দু'বার স্যর।

— তারপর তোমাকে ...

— পাঁজাকোলা করে সোফায় তুলে নিয়ে গেছিল। বলল, মাইনে ডবল দেবে। আমার ঘোর আপত্তিতেও বাজে কাজ করেছিল সেদিন। ঠিক আমার স্বামী যেভাবে প্রতিদিন ঝামেলা করে। সে সব সময় মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকে। ভরত। আপনার কাছেই কাটিং সেকশনে কাজ করে, স্যর।

তাহলে তুমি যে বলেছিলে আমি আগের সাহেবের মতো দেখতে। একই রকম ভাবসাব, এসব বলেছিলে কেন? ভেবেছিলে, আমিও আগের সাহেবের মতো তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করব না? আমি রূঢ়ভাবে বললাম।

মেয়েটি এবার আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। বলল, না স্যর, আপনি একদম আলাদা। ঠিক আমার বাবার মতো।

তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল। নরম আলোয় সজল অশ্রুগুলি চিক চিক করছে। মায়াবী জ্যোৎস্নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ভিজছে তার কান্নাভেজা শরীর।

সংবাদ প্রতিদিন, ২ ডিসেম্বর ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাম! রাম!

বাণী বসু

আরে কৌন হ্যায় রে তু? — তাঁর সুখশয্যায় বৃদ্ধ ডালমিয়া আনচান করে উঠলেন। দিব্যি, ঘুমোচ্ছিলেন, একটি চমৎকার দিবানিদ্রা, তাঁর সুপুত্র বলেছে এই নিদ্রায় কোনও দোষ নেই, সভ্য দেশের লোকেরাও এটা মানে, তাই তার নাম দিয়েছে সিয়েস্তা। তিনি তো জীবনে কোনও দিন অবসর কী, আরাম বিলাসিতা কী, জানলেন না, আলস্যকে হারাম মনে করে এসেছেন, বরাবর। কামকাজে আদমি জিন্দা থাকে। তার পাকিট ভি জিন্দা থাকে, পৈসার বাচ্চা ভি পয়দা হয় পাকিটে, আর পৈসা না থাকলে জিন্দেগি কী? কেন?

সাতাশি পার হয়ে গেল। কোনও দিনই তিনি খুব খুবসুরৎ, লম্বা-চওড়া ছিলেন না। এখন হয়ে গেছেন আরও ক্ষয়া-খপ্পুরে, মাথাটা লোহার আলুর মতো, তাতে গুনে গুনে তিন গাছা চুল। মুখটা মাংসল, অথচ তুবড়ে গেছে। তবে মাহিন্দর ডালমিয়া যেহেতু অল্প বয়সেও কখনও সিসায় নিজের চেহারা দেখার গুনাহ করেননি, তাই এখন দেখলেও তিনি তফাতটা ধরতে পারবেন না, চিনতেই পারবেন না, হয় তো বলে বসবেন—কৌন হ্যায় এ বুড্ঢা বুরবক, যেমনি এর সুরত, তেমনি এর তাকত, একে খবরদার কামে বহাল করিসনি. বেটা।

তখন তাঁর সপুত্র যোগিন্দর, এখন তাঁর কারবারের মালিক যদি বলে— রাম রাম পিতাজি, আপ নে তো সত্যনাশ কর দিয়া। মেমরি হাপিশ হয়ে যায় সেই আলঝাইমার হল নাকি আপনার? খুদকো চিনতে পারছেন না? আচ্ছা তাই যেন হল যে আপনি কখনও আয়না দেখা-শিখা করেননি, ইৎনা বুড্ঢা আদমিকে দিয়ে আমি কাম করাব, এ কথাই বা আপনি সোচলেন কী করে?

তখন বৃদ্ধ ডালমিয়া বিড়বিড় করে বলবেন, কামকাজ না করে জিন্দা থাকাটা ঠিক না।

— তা কী হবে তা হলে আমাদের দাদা পরদাদাদের?

বৃদ্ধ বেমালুম বলে দেবেন—খতম কর দে বেটা, চুপচাপ খতম করে দে।

এই সময়ে হয় তো তাঁর স্মরণ ক্ষীণ ভাবে কাজ করছিল, তিনি যখন কারোবার ফলাও করছেন বাংলা মুলুকে, তখন ইনদৌরে গাঁওঘরে তাঁর দাদির সাঁস জিন্দা ছিলেন, মাতাজি চলে গেছেন, দাদিজি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পিতাজির মাতাজি এই বুড্ঢি আরামসে খাওয়াদাওয়া করছেন, [illegible] তো তিনি

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

কী করবেন? তিনি বুড়টিকে একলা রেখেই চলে এলেন, থাকুক সে আরাম করে, চার দিকে ফ্যামিলির চাঁদির বর্তন, তার নিজের লাখো রুপেয়ার গহনা সব আঁকড়ে বসে ছিল বুড়টি। বেমালুম মার্ডার হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকজন তাঁকেই দোষ দিতে লাগল, এ ভাবে বৃদ্ধাকে ফেলে যেতে হয়? তো তিনি কী করবেন?

এখন নিদারুণ গর্মি। ঠান্ডা মেশিন চলছে বিশ পয়েন্টে, ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর। তিনি নরম বিছানায় শুতে পারেন না, ডগদরের বারণ আছে, কিন্তু ছেলের স্টেটাসে লাগে, তাই ডবল স্প্রিংয়ের গদির ওপর তাঁর শ্বেতশুভ্র বিছানা। তার ওপর একটা সমান সমান কাঠের তক্তা পেতে তার ওপর আবার পাতলা ম্যাট্রেস দিয়ে তিনি শুয়ে থাকেন। তাই গায়ে হাত-পায়ে ব্যথা বেদনা নেই, খাসা আছেন তিনি, দু'বেলা দুধ, দহি, কচৌরি পুরি হজম করছেন, মটর পনির, গাজর কি হালবা, আগেও যেমন, এখনও তেমন। তবে এ কথা ঠিক নয় যে, তিনি একেবারে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। অবসর নিয়ে কী করবেন ডালমিয়াজি? তাঁরা হলেন সেকালের লোক। এখাকার ডালমিয়াদের মতো কলেজ ভার্সিটিতে গিয়ে মেলা পঢালিখা করেননি, বই পড়া, কী গান শোনা, কী নাচ দেখা, এ তাঁর তেমন আসে না। নিজের বাড়িটি ছেড়ে কোথাও গিয়েও খুব একটা শান্তি পান না তিনি। তবে? কী করবেন? করবেন সেই একটা জিনিসই। ধান্দায় মাথা লাগানো। হাতেকলমে করছেন না আর। কিন্তু অ্যাডভাইস দিচ্ছেন। বিজনেস নিউজ পড়ছেন, শুনছেন, কারবারের হালহকিকত জানছেন, আর যোগিন্দরটাকে হুঁশিশ দিচ্ছেন, এ কর বেটা, ও কর বেটা ...। সে তো এই বয়সেও তার পিতাজির কারবার ব্যবসাবৃদ্ধি দেখে, থেকে থেকেই পরণাম করে যায়। এই পিতাজি না থাকলে তার কী যে হবে? রাম রাম!

দুপুরবেলা নিদ্রার আমেজে ছিলেন সিনিয়র ডালমিয়া। কে যেন খসখস করে ঘরে ঘুরে বেড়ায়।

কৌন হ্যায় রে? তিনি শ্লেষ্মাভরা গলায় ফুকরে উঠলেন।

খুব ক্ষীণ স্বরে জবাব এল—আমি।

মেয়েলি গলা।

—দুবলি নাকি রে? খেতে পাস না? গলায় একটু বা হাসি এনে তিনি বললেন।

— আপনারা আমায় খেতে দিলে তো? ফরমান জারি করেছেন তো খেলেদেলে চলবে না! আইসক্রিম না, বাটার না, ঘি না, ভাত না। কী ভাব তবে আমি?

— আরে বেটি তু বঙ্গালিন, নয়? কৌন হারামখোর এমন আজগবি বাতটা তোকে বলল? মছলি মেখে, ঘিউ মেখে ভাত না খেলে কোন বঙ্গালিনটা বাঁচে রে? আমাদের জনানারা অত ভাত খায় না, কিন্তু ঘিউ মাখা পরেঠা তো হরবখ্‌ত খাচ্ছে।

একটু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল।

— আপনি কবেকার কথা বলছেন। এখন আপনাদের জনানারাও ও সব ঘিউটিউ খায় না। আইডিয়াল ফিগার বানাচ্ছে সব। আমরা তো হেরে যাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— বাপ রে, তবে তো ভারী আফসোস কি বাত হয়ে গেল রে। কম্পিটিশন কি বাত। হরিয়ানি রাজস্থানি লড়কির কাছে বাঙ্গালি লড়কি হেরে যাচ্ছে ...

— ধ্যাৎ, হেরে যাওয়াটাওয়ার বাত নয়। আপনি আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। টাকাপয়সা প্রচুর লাগে ওই রকম ফিগার বানাতে। জিমে যাও, ওয়াকিং শু কেনো এতগুলো টাকা দিয়ে, হাঁটো খুব কষে, বেছে বেছে ফল খাও, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট খাও, ওগুলোর দাম জানেন? ট্যাবলেট, ক্রিম, কোনওটাতে রোগা হয়, কোনওটাতে ফর্সা হয় ... আপনারাই তো বানিয়েছেন ওসব। এই দেখুন ফর্সা হতে গিয়ে আমার কী হাল হয়েছে। সে একটা ফ্যাকাসে হাত বাড়িয়ে দেয় তাতে ভরা দাগ। বলল, মুখটা আর দেখাব না, চুড়েল বলেন না? তেমনি হয়েছে ...

একটু ঘাবড়ে গেলেও ডালমিয়া তাঁর খুশ মেজাজ ধরে রাখেন, বলেন, তাই নাকি? আমরা বানিয়েছি, আমিই জানি না? তা এই নালিশ করতেই কি এই বুড়ঢাটার কাছে দুপুরের ঘোরে এসেছিস?

— নালিশ কি একটা নাকি?

— রাম রাম! ঔর ভি আছে? তবে তো খুদ ভগোয়ানের কাছেই আমার নামে নালিশটা করতে হচ্ছে রে!

— আহা, ভগবান বলে আবার কেউ আছেন নাকি?

— এ হি তো! বঙ্গালি লোগ কুছ মানবে না, পূজা ঘর রাখবে না, আর্তি করবে না, তবে আর তাদের সঙ্গে কী কথা কইবে এ ডালমিয়া?

কী করে মানবো বলুন! ভগবান যদি ভগবান হবেন তো তাঁর এমন অবিচার কেন? এক জন হবে ফুটফুটে ফর্সা তো আর এক জন হবে কুটকুটে কালো, এক জন সুন্দর তো আর এক জন কুচ্ছিৎ, তাই তো আমাদের ট্যাবলেট খেতে হয়, ক্রিম মাখতে হয়। এক জন পয়সায় লুটোপুটি খাচ্ছে তো আর এক জনের কিচ্ছুটি নেই, এ কী রকম ভগবান? আর এখন আপনারাই তো সেই ভগবানের কাজটা করছেন। কে মোটা ছিল তাকে বললেন, ট্যাবলেট খাও সে রোগা হয়ে যাবে, কে বেঁটে ছিল, তাকে বললেন লম্বা হয়ে যাও, সে ম্যাজিকের মতো লম্বা হয়ে যাবে। ... বাস, এইটুকু কথা বলে ঘুমটি একেবারে চটকে দিয়ে গায়েব হয়ে গেল লড়কিটা। গেল তো গেল। খুবই ভাবিয়ে দিয়ে গেল।

সত্যিই তো! ভগবান যদি ভগবানই হবেন, তা হলে তাঁর জগতে এত সাদা-কালো কেন?

কথাটা তিনি অগত্যা ছেলেকেই বললেন।

— হ্যাঁ রে যোগিন্দর। এই যে আমরা দানধ্যান করছি, মন্দির বনাচ্ছি, আর্তি করছি, তার টিকা লাগাচ্ছি কপালে, এর মানে কী?

যোগিন্দর তো হাঁ। তার পিতাজির কি মাথা খারাপ হল নাকি?

মন্দির বানানো তো থাকবেই, আরও দু'চারটে করতে পারলে ভাল, পিতাজি যদি তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দির বানানোর হুকুম করেন, সে এক্ষুনি লোকলস্কর লাগিয়ে দেয়। জমি কেনা আজকাল খুব হুজ্জুতের কাম হয়ে যাচ্ছে, তা সে সব জমি ঠিক করা, কেনাকাটা, তার পর তার প্ল্যান বানানো, স্যাংশন আর্কিটেকচার, হাল ফ্যাশন, কোন দেওতার মন্দির চাও লছমিজি না বজরংবলী ... কে এখন ফ্যাশনে আছেন ঠিক করা। কাজ কি একটা নাকি? বহোৎ ঝামেলার কাজ। তা সত্ত্বেও তার একটা মানে আছে।

কিন্তু মন্দির করা, দানধ্যান, আর্তি, টিকা লাগানো এ তো জনম জনম করে আসছে সবাই। এই পিতাজিই তো শিখিয়েছেন, নাহা করে সাফসুফ হয়ে আগে ঘরেলু দেওতার কাছে দিয়া দেখিয়ে আর্তি করবি, তার পর দুটো নকুলদানা পরসাদ মুখে দিয়ে কপালে একটা গোলা সিন্দুরের টিকা একটা কর্পূরের কালো টিকা লাগাবি, বাস, দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই তার কিছু নুকসান করে। সেই পিতাজিই এখন মানে জিজ্ঞেস করছেন এ সবের? ছিয়া ছিয়া ছিয়া! বুঢাপে কি পিতাজির দিমাগ একেবারেই খারাব হয়ে গেল?

তবু সে ধৈর্য ধরে। জিজ্ঞেস করে—কিঁউ? এমন মনে হবার আপনার কারণটা কী?

ডালমিয়া বললেন— আরে বুদ্ধু এটা কখনও সোচ করে দেখেছিস, কালী মায়ির কাছে তো কত জন যাচ্ছে, পূজা চঢ়াচ্ছে, তাতে কারও ভাল হচ্ছে, কারও হচ্ছে না, যে যেখানে আছে সব ভগোয়ানাকে ডাকছে, সব মায়ি সব বাপ তবে কেউ ল্যাংড়া লুলা কেউ আন্ধা কেউ গোরা কেউ কালা এমন হবে কেন? এর মানে কী?

ছেলে বলল, পুণ, আগের আগের জন্মের পুণ রয়েছে না? আপনার আমার সব জমে গেছে ...

এ বার গলা খাটো করে ডালমিয়া বললেন, আর তাইতেই এ জনমে পৈসা কামাবার ধান্দায় বাজার যে দিকে থাকবে, সে দিকে গিয়ে উঠতে হবে? আরে বুদ্ধু, কখনও সোচ করেছিস কি যে, সাফা বনবার ক্রিমটা, পৎলি হবার ট্যাবলেটটা চালু করেছিস, সেগুলোতে কী কেমিকল দিচ্ছিস, তাতে এ লড়কিগুলোর জিন্দগি বরবাদ হয়ে গেলে কে জবাব দেবে রে বেটা সোচ সোচ।

যোগিন্দর আর একটু হলেই সোফা থেকে সিধে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। আরে সত্যনাশ, এ বুড়টা বলে কী? আজ থেকে দশ গ্যারা বছর আগে সে যখন কারবারে নুকসান খেয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, এই পিতাজিই তাকে বলেছিলেন, আরে বেওকুফ, ম্যাগাজিন দেখিস?

— দেখি।

— কী দেখিস?

— টেররিজম চার ধারে পিতাজি, লাইফ বহোৎ রিস্কি হয়ে যাচ্ছে।

— আরে তু এক কারবারি, জিন্দগি মৌত তোর সোচ নয়, তুই কারবারের দুনিয়ায় কী দেখছিস?

— আই টি এসে গেল। উতে তো হমার নো হাউ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আরে বেওকুফ, তোর পিতাজি যখন আয়রন থেকে কেমিকলস এর কারবারে গেল, কীসের ডক্টর ডিগ্রি ছিল রে তার?

যোগিন্দর চুপ। আই টিতে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। প্রচুর কম্পিটিশন, দেশ বিদেশের বড় বড় ব্রেনগুলো সব আই টির পিছে পড়ে আছে। সেখানে সে কী করবে?

তখন সিনিয়র ডালমিয়া তাকে একটার পর একটা খবরের কাগজ খুলে দেখাতে লাগলেন। সর্বত্র সুন্দরী মেয়েদের ছবি। সুন্দরী যে তাও সব সময়ে নয়। কিন্তু বডি, বডি বডি। ব্রা পরা, প্যান্টি পরা, প্রায় নাঙ্গা, সব বডি পার্টস, হাত পা বুক, কোমর, নিতম্ব ... দেখানো শেষ হলে বললেন, ক্যা সমঝা তু?

— কুছ নেই পিতাজি! এ সব জনানা ... সরম ভরম কুছ নহী, লালবাত্তি এরিয়া কি কোঠিসে নিকলি আওরত সব, ছিয়া ছিয়া ছিয়া, বললেন বটে কিন্তু আড়চোখে একটু দেখেও নিলেন ঠিকই।

— আরে বেটা লালবাত্তি কি রান্ডিকে পাস অ্যায়সি বডি থোড়ি মিলেগি। এহি আজকালকা কারোবার বেটা। তুরন্ত সোচ, ক্যা করনা, ক্যায়সে করনা।

ফিল্ম ইনডাস্ট্রি একটা অতল গহ্বর, যোগিন্দর খুব ভাল করে জানেন, তিনি টাকা জোগাবেন, কিন্তু ডিরেক্টর, ক্যামেরা, অ্যাক্টর মিলে যে ঘ্যাঁট বানাবে, তাতে তাঁর কোনও হাত থাকবে না। বড়জোর হিরোইনকে এক দিন পেলেন নাগালের মধ্যে। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত সন্তোষ হয় তো হল, কিন্তু কারবারের কোনও শিয়োরিটি তা থেকে পাওয়া যাবে না। যখন এক সময়ে ব্যবসায় তাঁর প্রচন্ড উপচে পড়ছিল, তখন ফিল্মের কথা তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু লোভ সামলে নিয়েছিলেন। কেন না, কোটি কোটি টাকার ফিল্ম সব ধড়াধধ্ড় করে পড়ে যায়, এ তার স্টাডি করা জিনিস। এর সব নাকি বড় বড় মাফিয়াদের টাকা দিয়ে এ সব বানায়। তা তিনি তো আর মাফিয়া নয়, যে এত বড় রিস্ক সাধ করে নিতে যাবেন। পিতাজিকে এই সংবাদই তিনি জানালেন।

অনেকক্ষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন ডালমিয়া। তার পরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দীর্ঘশ্বাস না হতাশ্বাস! সে দীর্ঘশ্বাসের ভাষা বুঝলেন অবশ্য যোগিন্দর। পিতাজি তাঁর সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ব্যবসাবুদ্ধিতে মরচে পড়ে গিয়েছে, পিতাজি দেখতে পাচ্ছেন।

মুখ নিচু করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তো আপকা সোচ ক্যা, বাতাইয়ে না জি!

গলার স্বর আস্তে হয়ে গেল ডালমিয়াজির। তিনি বললেন, এ বডিকো ফায়দা উঠা বেটা, বডি কো ধান্দা বনা।

শুনে তো যোগিন্দরের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। পিতাজি শেষ পর্যন্ত তাকে মেয়ে বিক্রির ব্যবসা ধরতে বলছেন? অরক্ষিত সুন্দর সুন্দর মেয়ে। রাম রাম! তার মানে ইন্টারন্যাশনাল পাচার চক্র? তিনি তো বছর না ঘুরতেই ধরা পড়ে যাবেন, জেলে পচবেন জীবনভর। তার ওপর বদনাম। বুড়টাটাকে এখন তো তাঁর একটা ভালু কী ডাকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হচ্ছে! ভাবলেন এত সব, মুখে শুধু বললেন, হায় রাম!

— সনু বেটা, বৃদ্ধ ডালমিয়া এতটা না বুঝলেও ছেলে যে ধন্দে পড়েছে, সেটুকু বুঝেছিলেন। ঝানু লোক! তিনি ধৈর্য ধরে এ বার বোঝাতে বসলেন—এক চিজ তু মার্কিটমে ডাল, ক্যামপাইন লগা কি ইয়ে চিজ সবসে বটিয়া হ্যায়। পৈসা লগা, পৈসা লগা, বড়া বড়া সব আদমিকো, মডিল জনানাকো সার্টিফিট হাসিল কর, বাস, সব আদমি তেরা বায়ার বন জায়গা। পলিসি তো ইয়ে হি হ্যায়? হ্যায় কি নেই?

— জরুর।

— জনানালোগ ইয়ে পিকচার দেখকে সব মার্লিন মানরো বনতে চাইবে। ঔর মরদ? উও ভি অ্যায়সিই আওরত চাইবে। তু এক কাম কর, নয়া নয়া কসমেটিক্স বনাতে চল। বহোৎসা অ্যাড লগা। কেমিস্ট লোগ সব কাম করতে করতে হায়রান হো জায়গা। তব তো নয়া লাইন মিলেগা!

পিতাজির এই উপদেশই যোগিন্দরকে তার নয়া সম্রাজ্যের চাবিকাঠি জুগিয়ে দিয়েছিল। তার পর তিনি নয়া নয়া কেমিস্ট বহাল করেছেন, নয়া নয়া অ্যাড এজেন্সির টেন্ডার নিয়েছেন, বড় বড় মাল্টিপ্লেক্সে-তাঁর ভি শপ খুলেছেন ইমপোর্টেড গুডস এর শপের পাশে। এক দিনে এ সব হয়নি। ধীরে ধীরে হয়েছে, দশ বছর ধরে হয়েছে। তাঁর কোম্পানির ফেয়ারনেস ক্রিম, স্লিমিং পিল, লম্বা হওয়ার পিল, হরেক রকম হেয়ার কালার, হেয়ারডাই, টাকে চুল গজানো, মেছেতা দূর করা, স্ট্রেচ মার্কস দূর করা, রিঙ্কলস দূর করা ... কসমেটিক্স বেরিয়েই যাচ্ছে, বেরিয়েই যাচ্ছে, বছর বছর তাদের প্যাকেজিং পাল্টাচ্ছে। যত বার প্যাকেজ পাল্টাচ্ছে ততবার ভেতরের জিনিস কমে যাচ্ছে, কিন্তু সে শিশি কৌটোর এমন বাহার যে, ব্যবহারকারী তাকে প্রাণে ধরে ফেলে দিতেও পারে না। তারও আবার দাম আছে। সামান্য হলেও তো দাম! কোম্পানির কাছে বিক্রি করো, রিসাইকল হবে। একটা পরিবেশ সমস্যা সমাধানের কাজও হল, লাভও হল। বড় বড় ফিল্মস্টার, বড় বড় মডেলরা সব বলছে তারা 'ডালিজ' ছাড়া আর কোনও কসমেটিক্স ব্যবহার করে না, এখন তো তিনি মরদলোকের কসমেটিক্সও বানাচ্ছেন। তাঁর চিফ কেমিস্ট তাঁকে পার্ফুমে যেতে বলছে, আরও কিছু ওষুধপত্রের ব্যবসায় যেতে বলছে, উত্তেজক ওষুধ, কিন্তু তিনি সাহস করছেন না ... যোগিন্দরের হাত সাফ, গন্ধা কামে তিনি চট করে হাত লাগান না।

আর সেই পিতাজি এখন নিজের বাৎলানো ধান্দার সমালোচনা করছেন? আবার করছেন এমন ভাবে যেন যোগিন্দরই সব কিছু করেছে, তিনি বিলকুল কিচ্ছুটি জানতেন না। একেবারে নিষ্পাপ শিশুটি!

— হমারা ক্রিম সব বহোৎ বটিয়া পিতাজি, বেস্ট কেমিস্ট লোগো নে বনায়া। আপনার এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

ডালমিয়া বললেন, আরে বুদ্ধু, তু আমাকে ক্যা শিখলাবি? কেমিকলসে আভি কুছু হোবে না, কাল কুছু হোবে না, তার পর? ও তো স্কিন বিলকুল ডামেজ করে দেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রে? আর ও সব পৎলি হবার লম্বি হওয়ার চুল রং করার কসমেটিক্স বনাচ্ছিস ও ভি তো সিস্টম বিলকুল খারাব করে দেবে।

যোগিন্দরের মনে হল এই মহিন্দার ডালমিয়াই যে একদা তাকে বিউটি বিজনেসে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এ সব কথা এখন মনে করিয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই। এ বুড়ঢা এক দিকে মহা ধুরন্ধর আর এক দিকে বিলকুল বুড়ঢা যৈসা, সব ভুলে মেরে দিয়েছে। তাঁর কোম্পানির কোনও ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কেমিস্টই বোধ হয় বাপুজির কান ভাঙিয়েছে। তিনি বললেন, কে এত সব খাস বাত বলে গেল আপনাকে?

শয়তানি হেসে সিনিয়র ডালমিয়া বললেন, এক ছোটিসি চিড়িয়া, এক চুড়েল। তারপর বললেন, মেরি বাত সুনা করো বেটা, আমরা তো জনম জনম বহোৎ পুণ কামিয়েছি, তো এ জনমমে ইৎনা পাপ কামালে সব বরবাদ হয়ে যাবে। এ কসমেটিক্স কি কারোবার বন্ধ করে দাও। লোহা, আয়রন অ্যান্ড স্টিল কি কাম করো। বাস!

বলে ডালমিয়া পিতা আরামচেয়ারে কাত হয়ে চক্ষু বুজলেন। মানে, তিনি আর ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন না। বাত খতম।

এখন কী করেন যোগিন্দর? এ কসমেটিক্স বিজনেস এক আজিব চিজ। গ্লোবালাইজেশনের পরে ওয়েস্টার্ন দুনিয়া থেকে এসে গেল। তিনি যদি বন্ধ করেও দেন, অন্যে করবে, অনেকে করে চলবে। মেডিক্যাল স্যাংশন নেই, এমন চিজও বাজারে দিব্যি চলছে। কাগজে বড় বড় করে তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে। আর তিনি কী-ই বা অন্যায় করছেন? যে সব চিজ তিনি ব্যবহার করেন, তার বেশির ভাগই হরকার বলে রেজিস্টার্ড। লম্বা হওয়া? ও সব জিনের কাম।কেউ কাউকে করে দিতে পারে না। তাঁর চিফ কেমিস্ট, কনসালটিং ডাক্তার তাঁকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এখন ওই ট্যাবলেটের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু উপদেশ থাকে, প্রোটিন খাওয়া, স্ট্রেচ ব্যায়াম করা, কী স্কিপিং করা, এ সবে কিছুটা বডি ফিট হবে, একুশ বছর পর্যন্ত তো সব ছেলেপিলেরই কিছুটা বাড় হয়, তাইতেই ... স্লিমিংও তাই, ব্যায়াম করো, কষে হাঁটো, ফ্যাট শুগার কম খাও, কোনও হরমোনাল গোলমাল হয়ে থাকতে পারে, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাও, ঠিক হয়ে যাবে। তবু এ জনানালোগ ট্যাবলেট খেয়ে আরাম পায়। অনেকটা কালীমায়িকে পূজা চড়ানোর মতো। ওই বিশ্বাসটাকে তিনি তৈরি করেছেন এই মাত্র। আর এই বডির দিকে চোখ ফেরানো? বডিই স্বর্গ, বডিই ধর্ম, বডি হি পরমং তপঃ— এ কান্ট তিনি তৈরি করেননি, করেছে গ্লোবাল বাজার। তিনি নিমিত্তমাত্রা। হ্যাঁ, ব্লিচিং এজেন্ট বেশি পড়ে গেলে, বা দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে, যার সইছে না সে যদি ব্যবহার করেই যায়, করেই যায়, তা হলে ক্ষতি হতে পারে। তাতে তাঁর কতটুকু দায়? এমন লাভজনক ব্যবসাটা অমনি বন্ধ করে দিলেই হল?

কথাটা বাপুজিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। তখন বুড়ঢার নতুন আবদার হল বেশ, সিগারেটের পাকিটে বা বিজ্ঞাপনে যেমন থাকে, তেমনি ইউজ হার্মফুল লিখে দিতে হবে, আর নাঙ্গা মডিল বা যে মডিল ও প্রোডাক্ট ব্যবহার করেনি, তাকে কাজে লাগানোও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে না। এ কখনও হয়। তিনি পেরে উঠলেন না। বুড়টা তাঁকে উত্যক্ত করেই যেতে লাগলেন, করেই যেতে লাগলেন, না হলে নাকি তিনি নিজেই বিজ্ঞাপন দিয়ে 'ডালিজ'-এর গোপন কথা বলে দেবেন।

সত্যনাশ

তবে বুড়টার তো! মরণকাল যত এগিয়ে আসে ততই তাদের বুদ্ধি নাশ হয়। মহিন্দার ডালমিয়া খুব শিগ্‌গিরই প্রেশার চড়ে দুম করে মারা গেলেন। সে বছরই ডালমিয়া ঘরানার লছমিজির মার্বলের মন্দিরের ভিত পুজো হল নিউ টাউনে, প্রয়াত মহিন্দর ডালমিয়াজির নামে, বাইপাশে 'ডালিজ'-এর এক বিশাল হার্ডিংও উঠল, এক প্রায় নাঙ্গা আওরৎ, যার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব খুবসুরৎ চিজই নাকি 'ডালিজ কসমেটিক্স'ই বানিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় হইহই।

পিতাজির অ্যাডভাইসগুলো এখন প্রায়ই মনে পড়ে যোগিন্দরের। উমদা সব অ্যাডভাইস এ যুগের বেওসা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এ হি আজকালকা কারোবার, এ বড়িকা ফায়দা উঠা বেটা।

আর কামকাজ করতে অপারগ বুড়চাদের সম্পর্কে? বলেছিলেন, খতম কর দে বেটা, চুপচাপ খতম কর দে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়েন্দা-চটক

ব্রাত্য বসু

আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত। অবশ্যম্ভাবী বৃষ্টি আক্রমণোদ্যত মেঘনাদের মতো গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে কখন সে হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে। বিকেল পাঁচটার খবরে বলেছে, এমনকী সাইক্লোনও হয়ে যেতে পরে। ফলে গোটা শহর যখন আসন্ন এই তুফানের জন্য সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষমান, ঠিক তখন হেদুয়ার কাছে সন্ধে ছটা নাগাদ নিজের চেম্বারে যুগপৎ গম্ভীর ও উচাটন মন নিয়ে বসেছিলেন চটক। চটক চট্টরাজ। ব্যক্তিগত গোয়েন্দা। বয়স চল্লিশ। বেঁটেখাটো, মাঝারি গায়ের রং, চোখে কালো চশমা, পায়ে হেভি বুট, গলায় মা-তারা নামাঙ্কিত সোনার চেন, হাতে বিজভার মেশানো উদ্ধত বালা, গায়ে আজানুলম্বিত সিনথেটিক ওভারকোট। সত্যি কথা বলতে কী, সব সময়ে এই পোশাকেই থাকেন চটক। শুধু সন্ধে হলে কালচে সানগ্লাসটা পাল্টে নীলচে মুনগ্লাসটা পরে নেন তিনি। বাকিটা হুবহু এক। ইন ফ্যাক্ট এই পোশাকটাই চটকের লোগো। এই পোশাকেই তিনি তদন্ত করেন, আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করেন, রক্তবিন্দুর নিষিক্ত হিমোগ্লোবিন থেকে বার করার চেষ্টা করেন খুনির অস্ত্রের নমুনা বা পদ্ধতি—ইত্যাতি ইত্যাদি। তবে এখন যে তিনি এই গম্ভীর মুখে বসে আছেন তার কারণ ছিল। সেই কারণটাকে ঝালাই করতেই যেন আর এক বার তাঁর ডান হাতের কব্জিতে অবস্থিত রেডিয়াম লালচে ঘড়িটা দেখলেন চটক।

সবে সন্ধে ছটা পনেরো। মহিলা আসবেন সেই সাতটায়। এখনও সময় আছে। ইত্যবসরে চটক ভেবে নেওয়ার খানিক সময় পেলেন। তিনি তাঁর এখনকার প্রার্থীর কথা মন থেকে সরিয়ে ফেললেন। বরং তাঁর মনে পড়ল তাঁর শেষ কেসটির অর্থাৎ ১৩/২ ঝামাপুকুর লেনের খুনটিতে তাঁর অংশগ্রহণ ও ব্যর্থতার কথা। এ বছরে এটি তাঁর দ্বিতীয় ব্যর্থতা। প্রথম বার আঠারো নম্বর পাতিপুকুর বসাকবাগানের কেসটির দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। সেটা অবশ্য ছিল একটি নিছক পারিবারিক উইল সংক্রান্ত বিবাদের কেস। কেসটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি চটক। ফলে সেই ব্যর্থতার আঁচ তার খুব একটা গায়ে লাগেনি। কিন্তু ঝামাপুকুরের কেসটি সব অর্থেই স্বতন্ত্র। কারণ, যিনি খুন হয়েছিলেন, অর্থাৎ ঝামাপুকুরের প্রাক্তন শেয়ার-ব্রোকার তারাশঙ্কর লাহিড়ীর বিধবা বিন্দুদেবী, তার খুনের কারণ চট করে ধরা যাচ্ছিল না। কারও মনে হয়েছিল এটি নিছক হার্টফেল, আবার কারও মনে হয়েছিল সুপরিকল্পিত হত্যা। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যদিও পাওয়া গেছিল খাদ্যে অস্বাভাবিক বিষক্রিয়াই বিন্দুদেবীর মৃত্যুর কারণ, পুলিশের সন্দেহ ছিল বিন্দুদেবীর পরিচারিকা তথা

পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আপ্তসহায়ক মালতী দেবীর দিকে। কিন্তু তদন্তের ফলে চটক বুঝতে পেরেছিলেন গোরাচাঁদ গুঁই অর্থাৎ বিন্দুদেবীর এক নচ্ছার ভাইপোই প্রকৃত খুনি। পুলিশের অবশ্য সন্দেহ করার কারণছিল। কারণ, বিন্দুদেবীর রাতের খাবারে অর্থাৎ দুধরুটিতে বিষের বিক্রিয়া হালকা মতো পাওয়া গেছিল। তবুও পুলিশ ধন্দে ছিল, কেননা প্রতিবেশীরা জানিয়েছিল, বিন্দুদেবী অত্যন্ত খেতে ভালবাসতেন। এতটাই যে, খুনের রাতে গোটা আঠারো রুটি আর সের দু'য়েক দুধ খাবার পর বিন্দুদেবী গুনে গুনে পঁচিশটি ল্যাংড়া আম খান। ফলে সেই রাতেই তাঁর পেট ছাড়ে এবং পর দিন ভোরবেলা উত্তর দিকের শোওয়ার ঘরে বিন্দুদেবীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেহেতু চটকের বাড়ি ঘটনাস্থলের কাছে এবং যেহেতু চটক প্রতি দিন সকালে নৈর্ঋত কোণ অর্থাৎ হ্যারিসেন রোড থেকে দক্ষিণ-বিষাণ কোণ অর্থাৎ আহিরীটোলা পর্যন্ত অসম্ভব দ্রুতবেগে প্রাতঃভ্রমণ করেন, ফলে ঝামাপুকুরের বাড়ির সামনে রাস্তায় জটলা দেখে তিনি থেমে যান। সামান্য ইতস্তত করে তিনি বাড়ির ভেতর ঢোকেন ও মৃত বিন্দুদেবীকে দেখেন। পুলিশ আসে তারও একটু পরে।

ঝামাপুকুর থানার দারোগা বা ও সি বিশ্বনাথ বসাকের নেতৃত্বে আসা ওই পুলিশ বাহিনী নিমেষে বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। ঠাঙাড়ে বিশু তথা বিশ্বনাথ বসাক চটকের পোশাক আর হাবভাব দেখে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অর্থাৎ চটককেই সন্দেহ করে বসেন। কিন্তু অসম্ভব সহজাত ক্ষিপ্রতায় চটক স্বাভাবিক বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তার 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা কার্ডটি বার করে দেন। দারোগা বিশ্বনাথ প্রথমে কার্ডটি দেখে চমকিত হন ও কেসটিতে চটকের সাহায্য চান। সমগ্র পুলিশ বাহিনী ও ভাড়াটে অ্যালসেশিয়ানদের অবাক করে তখন চটক গোটা ঘরটি একটি ক্ষিপ্র আহ্লাদে নতজানু নেড়ির মতো শুয়ে-বসে শুঁকতে শুরু করেন। খানিক ক্ষণের মধ্যেই সিগারেটের একটি আধপোড়া ফিল্টার, মাটিতে ছিটকে পড়া বিন্দুদেবীর কালচে ব্রাউন শুকনো কফ আর তিন ইঞ্চির একটি প্যাঁচানো তার আবিষ্কার করেন তিনি। বাড়ির অন্যান্য মানুষের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং শুঁকে বার করা যাবতীয় প্রমাণ নিষ্কাশন করে চটক অবশেষে ঘোষণা করেন, গোরাচাঁদ গুঁই অর্থাৎ বিন্দুদেবীর ওই ভাইপোই বস্তুতপক্ষে খুনি। কিন্তু কল্পনাহীন অসাড় ঠ্যাঙাড়ে বিশ্বনাথ চটকের এই অপূর্ব নির্মাণক্ষম আবিষ্কারকে এক ইঞ্চি গুরুত্ব দিতে রাজি হন না। উপরন্তু তিনি এই বিষণ্ণ ভাবুক গোয়েন্দাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে বার করে দিতে উদ্যত হলেন। নির্বান্ধব একাকী চটক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যদিও যাওয়ার আগে কনস্টেবলকৃত ওই বলপূর্বক গলাধাক্কার সময়ও চটক সজোরে জানাতে ভোলেন না, তিনিই সঠিক, অর্থাৎ গুণ্ডা গোরাচাঁদ খুনি। হতাশ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন চটক। বাড়ি ফিরে ব্যক্তিগত বকযন্ত্রে তাঁর প্রাপ্ত ওই গোল্ট ফ্লেকের ফিল্টারের থেকে নিঃসৃত নিকোটিনের ওপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে চটক দৃঢ়নিশ্চিত হন যে, গোরাচাঁদই বিন্দুদেবীর ঘাতক। সেই সঙ্কেতেই ঝামাপুকুর থানায় ফোন করে দারোগা বিশ্বনাথবাবুর থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান এই গোয়েন্দা। যদিও বিশ্বনাথবাবু তথা ঠ্যাঙাড়ে বিশু চটককে প্রথমে যাচ্ছেতাই অপমান করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই দশ মিনিটের সাক্ষাৎকারটুকু চটককে দিতে। কেননা, চটক এক বারের জন্য বলেন যে, তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করে দেবেনই দেবেন, গোরাচাঁদই খুনি।

অগত্যা সময় স্থির হয় পর দিন সকাল দশটা এবং তদনুযায়ী চটক ফোন নামিয়ে রাখেন। কিন্তু ফোন রেখেই চটক পেছন ঘুরে দেখতে পান কালান্তক মদ্দা ষাঁড়ের মতো গোরাচাঁদ দাঁড়িয়ে আছেন। চটক কিছু ভেবে ওঠবার আগেই বছর তিরিশের এই ষণ্ডা গোঁয়ার রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে ফুঁসতে ফুঁসতে এগোন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় চটকের বাঁ কান পাকড়ে ধরেন। যদিও চটক পাল্টা একটা জুজুৎসুর প্যাঁচ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বহু দিনের বিস্মৃত অনভ্যাসে সেই প্যাঁচ নেহাতই হালকা মতো একটা চার-দশের ফুটবল ম্যাচের পাতি ল্যাং-এ পর্যবসিত হয়। ফলে খুব সহজেই গুণ্ডা গোরাচাঁদ ওই জাপানি জুজুৎসুর কূটকচালের তোয়াক্কা না করে একেবারে বাংলামতে গোয়েন্দা চটকের ডান কান মুলে লাল করে দেন এবং আর্তনাদরত চটকের থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন আর দ্বিতীয় বার ভুলক্রমেও যেন গোয়েন্দা গোরাচাঁদের নাম উচ্চারণ না করেন। তদুপরি বাবান্তকর নানান শব্দবাজির মধ্যে এ-কথাও গর্জনরত গোরাচাঁদ বলেন যে, বিগত এক মাস যাবৎ তিনি প্লীহা এবং উদর সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক নানান ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। আর তাঁকেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পিসির খুনি হিসেবে ঘোষণা করার মধ্যে নিহিত আছে এক মর্মান্তিক মন্দ্রমদির ঢ্যামনামো। অথচ, এই সময় গোরাচাঁদ চটকের ডান কান ছেড়ে বাঁ কান ধরেছিলেন। কর্ণ পরিবর্তনের ওই প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতেও সহসা ঝুলন্ত চটক লক্ষ করেন গোরাচাঁদের ডান হাতের মধ্যমার ক্ষয়া নখে স্পষ্ট কিউবান নিকোটিনের সরেচ ধরা ছাপ। কিন্তু কর্ণাকর্ষণের তারতম্য বৃদ্ধি হবার অনিবার্য আশঙ্কায় এই অপূর্ব আবিষ্কারও নিজের মধ্যে রেখে দিতে বাধ্য হন চটক। এমনকী ভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর গোরাচাঁদের গলা টিপুনি খেয়ে দারোগা বিশুকে আবার ফোন করতে বাধ্য হন তিনি। ফোনে যখন বিশ্বনাথ শোনেন চটক যে শুধু নির্ধারিত সাক্ষাৎকার বাতিল করছেন তাই নয়, উপরন্তু তাঁর খুনবিষয়ক অনুমানটিও প্রত্যাহার করছেন, তখন চটক যেন আবছামত শুনতে পেয়েছিলেন বিশ্বনাথের অস্ফুট দন্তঘর্ষণ, শব্দের মধ্যে ঘূর্ণায়মান উৎক্ষিপ্ত খিস্তির ধ্বনি এবং তৎসহ আরও কিছু মুদ্রণ অযোগ্য অশ্রাব্য কটুকাটব্য। পরিশেষে চটকের পশ্চাদ্দেশে দুই পদাঘাত করে তাঁকে সর্বার্থে ধরাশায়ী করে বিদায় নেন।

প্রাগুক্ত ওই প্রচণ্ড ব্যর্থতার রেশ মিলোতে না মিলোতেই আবার ওই দ্বিতীয় কেসটির মুখোমুখি হয়েছেন চটক। এই বারে খুন হয়েছেন চেতলার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার অ্যাট ল' মণীশ খোকন বিশ্বাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন। খবরে প্রকাশ, আগের রাতে 'প্রিয়াঞ্জলি' নামক নবনির্মিত বহুতলে তাঁর ফ্ল্যাটে কিছু বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে খাদ্যপানীয় গ্রহণ করছিলেন মণীশ খোকন। জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেন ও তৎসহ পাড়ার পিন্টুর দোকান থেকে আনানো প্রণ পকৌড়া ও 'বোনলেশ চিল্লি'। পরিবেশন করছিলেন মণীশ খোকনের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট তাঁর অর্ধাঙ্গিনী লিপিকা। আকাই এর সি ডি তে হালকা করে বাজছিল নমকহালালের সেই বিখ্যাত বন্দিশ—'জওয়ানি জানেমন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিনা দিলরুবা... শিকারি খুদ ইঁহা, শিকার হো গ্যয়া।' জলসা ভাঙে গ্লাসেমদে ভেঙেটেঙে বমিতেচিল্লিতে মাখামাখি হয়ে প্রায় রাত দুটোয়। প্রায় সবাই একমাত্র মণীশ খোকনের জুনিয়র টাইপিস্ট আমন মিত্র ছাড়া, প্রত্যেকে বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি ফেরেন উকিল নিখিল মনসুখানি। বাড়ি ফেরেন সস্ত্রীক মোক্তার ত্রিপিটক তালুকদার। বাড়ি ফেরেন মণীশ খোকনের মুহুরি লোচন লস্কর। বাড়িতে গেস্ট রুমে একমাত্র অতিথি আমন রাত তিনটের সময় বাথরুমে যাবে বলে ঘুমন্ত অবস্থায় ওঠে, কিন্তু নেশার ঝোঁকে বাথরুম খুঁজে না পেয়ে দশ তলার বারান্দায় চলে আসে ও সেখান থেকে অব্যর্থ টিপে নীচের ভ্যাটে পেচ্ছাপ করে। করেটেরে আবার ঘরে ঢুকে নেশার ঘোরে মণীশ খোকনের বেডরুমে ঢুকে পড়ে আমন। এমনকী নেশার চোটে মণীশের বেডসুইচও জ্বালিয়ে দেয় সে। কিন্তু ওই বেডরুমে মৃদু সবুজ আলোয় আমন যা দেখে তাতে তার পিলে চমকে ওঠে। সে দেখে মণীশ খোকনের টিলাসদৃশ লোমশ পেটে বালক ব্রহ্মচারীর লকেটের ঠিক নীচে একটি ছ ইঞ্চির ড্যাগার গেঁথে আছে। পাশে মূর্ছিতা লিপিকা। ধূপদানিতে ধূপের ধোঁয়া প্রায় ধ্বংসাবশেষ হয়ে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। একেবারে অবিকল স্বপনকুমার।

আমনের থেকেই ফোন পেয়ে শেষরাতে পুলিশ আসে এবং প্রথমেই বিনাবাক্যব্যয়ে আমনকে গ্রেফতার করে। স্থির হয় আরও দু'দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর লিপিকাকেও গ্রেফতার করা হবে। কারণ, ক্রিমিনাল ল'ইয়ার তথা মণীশ খোকনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিখিল মনসুখানি ঠেট হিন্দিতে স্পষ্টতই জবানবন্দি দেন, লিপিকার সঙ্গে আমনের রয়েছে এক বহুদিনব্যাপী তনদুরস্ত ইশ্‌ক, এক পেয়ার কি চর্চা। শুধু খুদা কি মেহেরবানি যে এই লটরবটর, এই আশনাই আশিকি মণীশের আঁসুতে ধরা পড়েনি কখনও। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই জানত। জানত যে, এই ভিগে হোঁঠ, এই আগমাফিক তনবদন, এই জ্বলতা হুয়া জিস্‌ম এ আসলে শালা সবই ওই বৃদ্ধ কি তরুণী ভার্য্য কী জাতীয় প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ। ফলে হনুমানজি কি কৃপা ঠিক যা হওয়ার তাই তো হয়েছে।

ও দিকে এই কেচ্ছা পড়ে শহরসুদ্ধ সবার রসনা যখন লালায়িত হয়ে উঠেছে, চটকও এই রহস্য সুরাহাবাঞ্ছায় প্রিয়াঞ্জলির কাছে যান। গিয়ে ঘন্টা দুয়েক বহুতলের চার পাশে নিজস্ব পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঘুরঘুর করেন। চেতলা থানার সেকেণ্ড অফিসার তরুণ সুদর্শন প্রিয়ব্রত সান্যালের চটককে সন্দেহ হয়। যদিও প্রিয়ব্রত তখন মাঝে মাঝেই ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে লিপিকার শুদ্ধ অথচ সরস, তন্বী অথচ পুরুষ্টু এবং চোখের নীচে কালিমাচ্ছন্ন নিবিড় দেহলতাটি নিরীক্ষণ করে আসছিলেন, তবু চা খেতে নীচে নেমে এই অদ্ভুত পোশাক পরিহিত মানুষটিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওপরে নিয়ে আসেন প্রিয়ব্রত। এবং সেখানেই প্রথম চটক দেখতেপান লিপিকাকে। চটকের চোখে লিপিকার ওই আলুলায়িত কুন্তল যখন ক্রমেই এক ধ্রুপদী মাদকতা তৈরি করছিল তখনই প্রিয়ব্রতর জিজ্ঞাসাবাদের ফলে লিপিকা জানতে পারেন চটক আসলে এক জন ব্যক্তিগত গোয়েন্দা। প্রিয়ব্রতর সিলিং কাঁপানো হাসিকে অনায়াসে অতিক্রম করে এমনকী চটকের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎকারও চেয়ে বসেন লিপিকা। অবশেষে প্রিয়ব্রতর হাসি বন্ধ হয় তখন যখন তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন চটক অল্প মাথা নেড়ে মৃদু স্বরে ঘোষণা করছেন লিপিকা বস্তুত নির্দোষ। এমনকী আমনও নির্দোষ। খুনি নিঃসন্দেহে নিখিল মনসুখানি বা সেই রাত্রে অন্যতম উপস্থির মোক্তার ত্রিপিটক তালুকদার বা মুহুরি লোচন লস্কর বা অন্য কেউ। এমনকী এটি মণীশ খোকনের পূর্বপরিকল্পিত আত্মহত্যাও হতে পারে। সহাস্যে সুরসিক প্রিয়ব্রত যখন চটকের কাছে জানতে চান চটক শেষ কবে লুম্বিনীতে বা কাঁকেতে গিয়েছিলেন, তখন আরও মৃদু স্বরে চটক মান্না দে'র সেই করুণ কালোয়াতি গানটি গেয়ে ওঠেন—'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে, তার প্রতিবাদ করি আমি।'

বলাই বাহুল্য, এই গানের মাঝখানে, চটক যখন অস্থায়ী ও সঞ্চারীর মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুতে নিজস্ব গালবাদ্য দিয়ে আবহসংগীতটুকু তৈরি করছেন, তখন গাইতে গাইতেই চটক লক্ষ করেন যেন ক্লোজশটে লিপিকা তাঁর ওই কলঙ্কিনী কাজলকালো চোখ দুটি তুলে চটককে দেখছেন। যদিও গানশেষে প্রিয়ব্রত হাততালি দিয়ে ওঠেন এবং চটককে এলাচমিশ্রিত চা অফার করেন, তবু ঘাড় নেড়ে ওই সোসাইটি কা পিসাব প্রত্যাখ্যান করে নিঃশব্দে মাথা উঁচু করে গটগট করে হেঁটে 'প্রিয়াঞ্জলি' পরিত্যাগ করেন চটক চট্টরাজ। কেননা বহু দিন পর তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁর হৃৎপিণ্ডের ভেতর নাগাড়ে বেজে ওঠা আবার সেই পুরনো দামামা, আবার সেই স্ফূর্তির পুলক, আবার সেই তুঙ্গ অশ্বখুরধ্বনি। আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল এটাই যে সিল্যুয়েটে চটকের মিলিয়ে যাওয়ার পর হাস্যরত প্রিয়ব্রত যখন লিপিকার দিকে তাকান তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখতে পান লিপিকা অস্বাভাবিক অন্যমনস্ক, গম্ভীর ও অবিমিশ্র উদাসীন। শুধু তাঁর চোখের পাতায় টলটল করছিল জল। নিস্তল। গাঢ়। প্রেম যেন নীচেতে তাকাল।

আজ সেই সন্ধ্যা। কলকাতাতে সাইক্লোন হওয়ার একটু আগে। এখন ঠিক সাতটা দশ। সমস্ত কাজ থেকে মিডিয়া থেকে শুরু করে সমাজের প্রায় সব তালেবররা বলেছেন যে, মহিলার ফাঁসি চাই। সেই জামিন পাওয়া মহিলা কেস কোর্টে ওঠার আগের দিন এসেছেন গোয়েন্দা চটকের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু আসেননি, এখন চটকের ঠিক উল্টো দিকে বসে আছেন। শান্ত চোখে। যদিও চটক তাঁর নিজের দ্রুত ধাবমান তালপিনদ্ধ হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন, যদিও চটকের মনে পড়ছিল: এই তো একটু আগেই, মাত্র মিনিট দশেক হল তিনি যখন তাঁর চেম্বারের দরজায় হলুদ সর্ষে রঙা শাড়ি পরিহিতা লিপিকাকে দেখতে পেলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল 'কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর/সুরধনী তীরে অভিনব প্রেমকল্পতরু...' ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু এত কিছুর মধ্যেও দ্রুত লিপিকাকে চা অফার করে, মহিলার নোতিবাচক ঘাড়নাড়া দেখে ড্রয়ার থেকে নোটবুক পেন্সিল বার করে, কানের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছে পর পর প্রশ্ন করে চললেন গোয়েন্দা চটক। প্রতিটি প্রশ্নই ছিল খুনকে কেন্দ্র করে বা খুনের পদ্ধতি নিয়ে বা আঙুলের ছাপ বা ওই সব হাবিজাবি বিষয় নিয়ে। এমন কোনও প্রশ্নই চটক করেননি যে, ঠিক খুনের সময়টা কী করছিলেন লিপিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমোচ্ছিলেন না কি জেগেছিলেন, না কি ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে রাত দুটো বা তিনটের ঘন্টা বাজছিল—এই সব অবান্তর প্রশ্নমালা নিয়ে গোয়েন্দা ঝাঁপিয়ে পড়েননি সন্দেহভাজন খুনির ওপর।

বরং চটক আসলে জানতে চাইছিলেন, কবে শেষ মন খারাপ হয়েছে লিপিকার; বা কবে শেষ আকাশ থেকে ঝরে পড়া অঝোর ধারার সঙ্গে লিপিকার চোখের জল ধুয়েমুছে একাকার হয়ে গেছিল; বা ঠিক কবে লিপিকার হৃদয় একটি বারের তরে কেঁপে উঠে ভেবেছিল জীবন ও জীবন—এই আশ্চর্য সম্ভাভাবনারাজি নিয়েও আমি কেন এমন একাকী! আমি তবু এমন একাকী! এই সব প্রকৃত গোয়েন্দাসুলভ নিজস্ব পর পর প্রশ্নে চটক হতবাক করে দিচ্ছিলেন লিপিকাকে। লিপিকা হয়তো ভাবছিলেন, এই সব প্রশ্নের মানে কী? হয়তো ভাবছিলেন, এটাই বোধহয় চটকের পদ্ধতি। হয়তো এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মণীশ খোকনের খুনির প্রকৃত ইশারা, যথার্থ সংকেত। ফলে কখন যে লিপিকার হলুদ রঙা জাফরান শাড়ির আঁচল চটকের গলায় এসে ঝাপটা দিল, কখন যে মাথা আচ্ছন্ন করা এক অপার্থিব সুগন্ধির ঝিমঝিমানি প্রভাবিত করল চটকের স্নায়ুকে, কখন যে আশ্চর্য এক দমবন্ধ করা উচাটন এসে গ্রস্ত করল চটকের হৃদয়, এই সব হনন, এই সব খুনের আনুপূর্বিক দস্তাবেজ আর চটক লিখে রাখতে পারেননি তাঁর খেরোর খাতায়। শুধু গোয়েন্দা এটুকুই বুঝতে পারছিলেন খুনি হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে। আর তাই চটক নিশ্চিত ভাবে বুঝছিলেন; লিপিকা তো বটেই, এমনকী লিপিকার ছোট ভ্রাতৃবৎ আমনও আদ্যন্ত নির্দোষ। এমনকী মণীশ খোকনের একটি বিকল্প আত্মহত্যার পূর্বেকার চিঠির খসড়াও মনে মনে তৈরি করে ফেলেছিলেন চটক। এতটাই নিমগ্ন ছিলেন তিনি তাঁর ওই খসড়া নির্মাণে যে, কখন অল্প বজ্রবিদ্যুৎসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এসেছিল, লিপিকার শরীরে লক্ষ করা গেছিল চাঞ্চল্য, আর কখন যে মৃদু পায়ে বেরিয়ে গেছেন মহিলা, তা আর খেয়ালও করতে পারেননি এই বিষণ্ণ গোয়েন্দাটি। শুধু যখন ঘড়িতে ঠিক ঢং করে ন'টা বাজল, চটকা ভাঙল চটকের। লিপিকা যে তার সামনে আর বসে নেই, তা আর যেন খেয়ালও করলেন না গোয়েন্দা। বরং ধীরে ধীরে ক্রমশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছিলেন তিনি। সামনের ড্রয়ারটি তিনি টেনে খুললেন। বৃষ্টির ছাঁট তখন ভালই ছিল।

চটক ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, না—লিপিকাকে নির্দোষ প্রমাণ করা অসম্ভব। বরং এই মহিলার জন্য অবশ্যম্ভাবী অপেক্ষা করে আছে একটি মোম-ঘষা শণের দড়ি। সমস্ত হেঁয়ালি, সমস্ত প্রতিকূলতা, সমস্ত কচালের গতিপ্রকৃতি উল্টেপাল্টে, জেনেবুঝে, বিশ্লেষণ করে চটক ক্রমশই ভবিষ্যৎকে অমোঘ ভাবে পড়ে উঠতে পারছিলেন। কিন্তু, তিনি এও বুঝতে পারছিলেন। এ অন্যায়! এ ঘোরতর অন্যায়! আর তাই চটকের রাগ, ক্রোধ, অসহায়তা সমস্ত কিছু মিলেমিশে তাঁর মুখের সামনে মড়মড় শব্দে মেলে ধরছিল বহুবর্ণ বিচ্ছুরিত নানান রঙের কালাইডোস্কোপ; টুকরো টুকরো মন্তাজ গোয়েন্দার বড় হয়ে ওঠা জীবনের, আনন্দ ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিকীর্ণ লম্বা জীবনের নানান টুকরো ঘটনা; অনেক হাসিকান্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশানো পরিচিত কিছু মুখ, কিছু মুহূর্ত; কিছু সুখ, কিছু দুঃখের শীত গ্রীষ্ম বসন্ত ঘেরা স্মৃতির অনুভূতিমালা।

অবশেষে সব মুখ, সব স্মৃতি মিলেমিশে ভিবজিওর হয়ে গিয়ে একটি মুখই স্পষ্ট হয়ে উঠল গোয়েন্দার সামনে। সে মুখ ছিল ওই হাস্যরত তরুণ পুলিশ অফিসার প্রিয়ব্রতর। প্রিয়ব্রতর হাসির শব্দ, আর বাইরে রাস্তায় ঝরে পড়া ভারী বৃষ্টির শব্দ আর মাথার ওপরে চার পয়েন্টে ঘুরতে থাকা প্রজাপতিসদৃশ খৈতানের শব্দ—এ সব শব্দই নিখুঁত ভাবে পৃথক করে নিতে পারছিলেন চটক। এবং এই সমস্ত শব্দ ও দৃশ্যরাজি ভেদ করে নিজের অনিবার্য নিয়তিকেও যেন দেখতে পাচ্ছিলেন গোয়েন্দা। আর তাই শেষ অবধি উঠে দাঁড়ালেন যখন তিনি, তাঁর দু'আঙুলের ফাঁকে ঝুলছিল ড্রয়ার থেকে বার করে আনা সাঁইত্রিশ ক্যালিবারের কুঁচকুচে ফিঙে রঙা কোল্ট, আর চোখের সামনে যেন চাঁদমারির বেলুনের মতো একটু একটু করে ফুটে উঠছিল প্রিয়ব্রতর আমড়াসদৃশ মাথার জলছবি, তার খুলি, তার হাসি, তার কপালের ঠিক মধ্যবর্তী অংশটুকু তথা দু'ভুরুর ভাঁজ। বৃষ্টির জোর আরও যেন বেড়ে গিয়েছিল তখন। রাতের অন্ধকারে ওভারকোটে আর কালো বৃষ্টিতে মিশে গিয়ে, রাষ্ট্রের ওই বজ্জাত প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন গোয়েন্দা চটক। গোটা শহরকে তখন ধুইয়ে দিচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসা বর্শার ফলক। ধুয়ে যাচ্ছিল পথঘাট, এত রক্তের সম্ভাবনা, এত গোপন নিজস্ব প্রতিশোধস্পৃহাগুলি ধুয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যক্তিগত অপমান, ক্ষতস্থান, এমনকী অতীতের সমস্ত খুনের ইতিহাস। শুধু এই সব কিছু মাথার ঠিক মাঝখানে ভরে নিয়ে রাস্তার একেবারে মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষিপ্র চিতাবাঘের মতো হাঁটছিলেন গোয়েন্দা। গোয়েন্দা চটক চট্টরাজ। হাঁটছিলেন। হেঁটেই যাচ্ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ মার্চ ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনান্তের বিহঙ্গ

বীথি চট্টোপাধ্যায়

পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে অপেক্ষা করতে করতে দেবেশ অধৈর্য হয়ে পড়ল। ঠিক চারটের সময় অনিন্দিতার এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে—কোথায় অনিন্দিতা। কথামত দেবেশ প্রথমে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যতই এগোতে লাগল ভেতর থেকে একটা অস্থিরতা, ছটফটানি দেবেশকে আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। একেবারে স্টেশনের ভেতরেই নিয়ে এসে দাঁড় করাল।

দমদমের দিক থেকে একটা করে ট্রেন আসছে আর উত্তেজনায় দেবেশের চোখ মুখ জ্বলজ্বল করে উঠছে। কিন্তু একটু পরেই ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে—মানুষজন যে যার নিজের ব্যস্ততা নিয়ে চলে যাচ্ছে—তখন খাঁ খাঁ করে প্ল্যাটফর্মের শূন্যতা দেবেশকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। হতাশা, অভিমান, ক্রোধ সব মিলেমিশে দেবেশ যেন কেমন নেতিয়ে পড়ল।

অনিন্দিতার কি কিছু হল—না কি বাড়িতে কিছু হয়েছে? কিন্তু মনটা ঠিক সায় দিচ্ছে না। কারণ তাহলে তো অনিন্দিতা ওকে একটা ফোন করত। এমন ঘটনা যে এর আগেও ঘটেনি তা তো নয়। আবার এমন নয়তো যে অনিন্দিতা এমন একটা অসুবিধার মধ্যে আছে যে যেখান থেকে ফোন করতেও পারছে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ছটা বেজে গেছে। ঘন্টা দুই কখন কেটে গেছে নিজেও টের পায়নি। নাঃ অনিন্দিতার আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। দেবেশ মেট্রো স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

দোলাচল চিত্তে এলোমেলো পায়ে দেবেশ হাঁটতে শুরু করল। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। হাঁটতে হাঁটতে দেবেশ কখন ময়দানে চলে এসেছে নিজেও বুঝতে পারেনি। চারদিকে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ময়দানের চারদিকে তখন জোড়ায় জোড়ায় বা অনেকজন একসঙ্গে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। দেবেশর মনটা মোচড় দিতে লাগল। অফিস ফেরৎ অনেক দিন অনিন্দিতা আর ও এখানে বসে অনেকটা সময় কাটিয়ে গেছে।

একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে দেবেশ বসে পড়ল। মনটা শূন্য। চুপচাপই বসে ছিল। কিন্তু ভেতর থেকে একটা আকুলতা আবেগ ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। উঠে দোনামোনা করে দু-চার পা হাঁটতেই কানে [illegible] উচ্চকিত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

হাসিতে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখল ওরই দেওয়া বোমকাই সিল্কে ঝলমল করে অনিন্দিতা একটা ছোকরার সঙ্গে হাতে হাত ধরে ময়দান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দেবেশের পা আটকে গেল। ধপ করে ওখানেই বসে পড়ল। দু'হাতের পাতায় মুখ ঢেকে বসে রইল। খালি মনে হতে লাগল ওর মত একটা দুঁদে অফিসার সামান্য একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের কাছে এইভাবে ধোঁকা খেয়ে গেল। ঘুণাক্ষরেও ওকে কিছু টের পেতে দেয়নি। ওর কাছ থেকে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে চাকরি বাগিয়ে কিভাবে সরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওর অরিজিতের কথা মনে পড়ে গেল।

দিন কয়েক আগেই অরিজিত ওকে বলেছিল,—এটা তুই কী করছিস? এই বয়েসে অনিন্দিতার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছিস? এ কী! তুই ভাবছিস ডুবে ডুবে জল খাবি—কেউ টের পাবে না। এখন আমার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে কী কুক্ষণে ঝুমরীর জন্মদিনে তোকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। জানিস সেদিন ঝুমরী ওর মায়ের সামনেই আমাকে বলল—বাবা তুমি দেবেশ কাকু আর অনিন্দিতার কথা শুনেছো? আমরা বন্ধুরা কেউ আর অনিন্দিতার সঙ্গে ভালো করে কথা বলি না।

আমার তো লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছিল। আমার বউই তো সব শুনে থ। বলল—কী ব্যাপার গো, দেবেশদার কি বুড়ো বয়সে ভীমরতি হল? এতকাল ভদ্রলোককে অন্যরকম জানতুম—আর এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়েকে নিয়ে এসব কী কাণ্ড। বনানী তো এত রেগে গেছিল তখনই সুতপাকে ফোন করতে যাচ্ছিল। আমি অনেক কষ্টে ওকে আটকালাম। বললাম—দাঁড়াও, আগে দেবেশের সঙ্গে কথা বলে ভালো করে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে ওকে ঐ পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করি। না পারলে তখন ব্যবস্থা নেব।

সব শুনে দেবেশ অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারেনি। মাথা নিচু করে বসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে অরিজিতের চোখ চোখ রেখে বলেছিল—সবই বুঝি, সবই জানি। কিন্তু এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই। অনিন্দিতাকে আমার পক্ষে এখন আর কিছুতেই ছাড়া সম্ভব নয়। অনিন্দিতাও আমাকে ছাড়তে পারবে না।

—তোর মাথা। তুই একটা ইডিয়েট। বুড়ো বয়েসে অনিন্দিতার প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিস যে চারপাশের সব কিছুই এখন তোর কাছে ঝাপসা। চোখ থেকে রঙিন ঠুলিটা খুলে বাস্তবটাকে বোঝার চেষ্টা কর। অনিন্দিতা তোকে ধরে সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। এত ভালো একটা চাকরি বাগিয়ে নিয়েছে। আজ দু'বছর ধরে তোর কাছ থেকে টাকা পয়সাও নিচ্ছে। তুই কি জানিস, অনিন্দিতা ওর অফিসের একটা ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। ঝুমরীরা শুনেছে খুব শিগগিরই দুজনে বিয়ে করবে। নিজের বোধ বুদ্ধিটাকে একটু কাজে লাগা তাহলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখবি।

দেবেশের বুকটা দড়াস করে উঠল। কিছুদিন যাবৎ অনিন্দিতা ওকে কীরকম এড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে। দেখাসাক্ষাৎ হয় ঠিকই। কিন্তু আগের সেই ঘনিষ্ঠতা, ব্যাকুলতা কোথায়। দেবেশ এটাকে অনিন্দিতার অভিমান বলেই ধরে নিয়েছিল।

অনিন্দিতার এমন লুকোচুরি করে হোটেলে যাওয়া বা বাইরে কোথাও গিয়ে দু'একদিন কাটিয়ে আসা এসব আর পছন্দ হচ্ছিল না। দেবেশকে বারবার বলছিল—আমাদের এই ভালোবাসার পরিণতি কী? তারপর তুমি ভালো করেই জানো—আছি দূর সম্পর্কের দাদা-বৌদির কাছে। তারা আমার এই রাত করে বাড়ি ফেরা, হুটহাট বাইরে যাওয়া এসব নিয়ে বাজে সন্দেহ, বিরক্তি প্রকাশ করছে। মেদিনীপুরে মা-বাবাকেও সব জানিয়েছে। তোমাকে তো আমি বলিনি দিন তিনেক হল মা-বাবার একটা দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। আমাকে এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি যেতে লিখেছে। ওখানে আমার জন্যে একটা পাত্রও দেখেছে। তার সম্পর্কেও ডিটেলস লিখেছে। আরও লিখেছে পত্রপাঠ আমি যেন আমার মতামত জানাই। তোমার কাছে আমি এটা বলিনি কারণ তুমি ভাববে আমি হয়ত অন্যভাবে তোমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছি।

দেবেশ অনিন্দিতাকে জড়িয়ে ধরে মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—আমার সামনে কোনদিন তুমি আর এসব কথা বলবে না। তোমার জন্যে আমি একটা ফ্ল্যাটের চেষ্টা তো করছিই। শুধু তুমি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমি তো ফ্যামিলি ম্যান—সুতপা এসব কিছুই জানে না। জানতে পারলে প্রচণ্ড শকড হবে। তারপর আমার ছেলে এসেও বা কী ভাবে? আমরা একটা রফা করে নিই। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সারা সন্ধে তোমার ফ্ল্যাটে কাটিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে যাব। তাহলে সব দিকই রক্ষা হবে।

অনিন্দিতা ছিটকে সরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সরোষে দেবেশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি আমাকে কী ভাব বল তো? আমি মেদিনীপুরেই ফিরে যাব। এভাবে দু'নৌকায় পা দিয়েচলা আমার পক্ষে আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

দেবেশও সেদিন প্রচণ্ড রেগে গেছিল। —আমাদের এই দু'বছরের সম্পর্ক, এই ভালোবাসা—এগুলোর কোনও মূল্যই নেই তোমার কাছে? তারপর কীরকম অসহায় গলায় বলছিল—তুমি বুঝতে চাইছ না কেন? যতই যাই হোক সুতপা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তার ওপর আমার একমাত্র ছেলে, তার সঙ্গেও তাহলে আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অনিন্দিতাকে নরম করার জন্য নিজেরও গলার স্বর একটু নরম করে বলেছিল—এই দু'বছরে তুমি আমার ভালোবাসায় কোনও খাদ দেখেছো? তোমায় আমি সব দিক দিয়েই ভরিয়ে দিইনি?

অনিন্দিতার মুখের রেখায় কোনও সহানুভূতি বা ভালোবাসার ছাপ দেখতে পায়নি দেবেশ। কঠোর সুরেই বলেছে অনিন্দিতা—আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। এবার তুমি তোমার ডিসিশন নিও। বলেই হোটেলের বিছানায় ওর ফেলে রাখা ওড়নাটা জড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় দেবেশ আর থাকতে না পেরে ওকে জোর করে বিছানার ওপর ফেলে মুখের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলেছিল—আমি পারব না। তোমার জন্যে যদি আমার স্ত্রী-ছেলে-সবাইকে ত্যাগ করতে হয়, করব। কিন্তু তোমায় আমি ছাড়তে পারব না।

অরিজিতের কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না দেবেশ। মরিয়া হয়ে দেবেশ সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দিতার অফিসে ফোন করে আজকের এই প্রোগ্রাম ঠিক করেছিল। অনিন্দিতার গলার সুরে আপত্তির কোনও লক্ষণই ছিল না। দেবেশ ঠিক করেছিল অনিন্দিতার সঙ্গে আজই সব কিছু ফাইনাল করে ফেলতে হবে। সম্পর্কটা আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না। এরপর সুতপাকে সব কিছু খুলে বলে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া একটা করতেই হবে। মনকে ও সেইভাবে প্রস্তুত করেও নিয়েছিল।

কিন্তু অনিন্দিতার আজকের ব্যবহার সমস্ত ব্যাপারটাকেই তো উলটে দিল। দূর থেকে নয় একেবারে কাছ থেকেই নিজের চোখের সামনেই যা দেখল তাতে অরিজিতের কথাই তো সত্যি বলে প্রমাণ হয়ে গেল।

দেবেশের বার বার মনে হচ্ছে আজকের অনিন্দিতা তো ওরই তৈরি ছিল। কী ছিল মেয়েটা—যখন ঝুমরীর জন্মদিনে প্রথম দেখা হয়। মেদিনীপুরের একটা আনস্মার্ট লাজুক মেয়ে। তিল তিল করে ওকে তৈরি করল দেবেশ। এই যে এত ভালো একটা চাকরি করছে, সে কি ওর নিজের যোগ্যতায় না দেবেশের দাক্ষিণ্যে? তখন বলেছিল—তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি। তোমার সঙ্গ আমার যত ভালো লাগে এমন আর কারুরই নয়। আমার বন্ধুই বল, প্রেমিকই বল সব তুমিই। আমার বিয়ে, সংসার, ছেলেপুলে এসব একদমই ভালো লাগে না। যতই বয়েসের ব্যবধান হোক আমি সারা জীবন তোমার হয়েই থাকব।

দেবেশের নিজেকে কীরকম হীনম্মন্য লাগছে। জগৎ সংসারে আজ সবাই ওকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। আর সেটাই হয়ত ওর প্রাপ্য। ওর ভালোমানুষ স্ত্রী-ছেলের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা ও করেছে অনিন্দিতাও ওর সঙ্গে ঠিক সেই বিশ্বাসঘাতকতা করে শোধবোধ করে দিল।

দেবেশ ভাবল কিন্তু ওর দিকটা কি কেউ একবারও ভেবে দেখবে না? মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভের সারাদিনের ব্যস্ততা, একঘেয়েমি যেন একটা যন্ত্রমানবে পরিণত করে দিয়েছিল ওকে। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে বেশিরভাগই দিনই দেখে সুতপা ওর এন জি ও কোম্পানির অথবা বান্ধবীদের বাড়ি। ছেলেটাও থাকে দূরে। বাড়িতে যেন কোন প্রাণ নেই। বাড়ি ফিরে যান্ত্রিকভাবে তাই টিভির সামনে ড্রিঙ্কস নিয়ে বসা। একই শরীর, একই মুখ দেখে দেখে ক্লান্ত দেবেশের মনে হত পঞ্চান্নেই বার্ধক্য ওকে গ্রাস করে ফেলেছে।

মনের এই অবস্থাতেই ওর ছেলেবেলার বন্ধু অরিজিতের মেয়ে ঝুমরীর জন্মদিনে এক পাল সবুজ তরতাজা ছেলেমেয়ের সঙ্গ পেয়ে অনেকদিন পর নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে দেবেশের খুব ভালো লেগেছিল। সাদ্ধ্য ভালো লাগাটা আরও গভীর হল ফেরার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় ঝুমরী যখন ওকে অনুরোধ করল—কাকু, তোমার গাড়িতে অনিন্দিতাকে একটু পৌঁছে দিও।

সেই শুরু। আস্তে আস্তে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেল। তারপর অভ্যাসে। পঞ্চান্ন বছরের ক্লান্ত দেবেশ তেইশ বছরের অনিন্দিতার তাজা নিঃশ্বাস থেকে সজীব হয়ে উঠল। অনিন্দিতার যৌবনদীপ্ত শরীরের ছোঁয়ায় দেবেশ যেন নিজেকে আবার নতুন করে ফিরে পেল।

প্রবঞ্চিত, প্রতারিত দেবেশ নিথর হয়ে বসে রইল। আস্তে আস্তে ময়দান ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। শীতল বাতাসে দেবেশের কিছুক্ষণ আগের উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল একটা মিথ্যে বন্ধনের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার আগেই যে ওর চোখ খুলে গেল এটাই বোধহয় সবদিক দিয়ে ভালো হল। সত্যিই তো আজ ওর নিজেকে যেমন প্রবঞ্চিত, প্রতারিত মনে হচ্ছে সুতপার সঙ্গে আজ দু'বছর ধরে দেবেশও তো সেই প্রবঞ্চনাই করে আসছে। সুতপা কি এতই বোকা যে ওর চালচলনে কিছুই বুঝতে পারেনি। নিশ্চয়ই মনে মনে সব বুঝেছে।

কিন্তু ওর ভদ্রতাবোধ, রুচিশীলতা ওকে মুখ খুলতে দেয়নি। নাঃ আর অপরাধ বাড়াবে না। দেবেশ আজ সুতপাকে সব কথা খুলে বলে ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। এই জন্যে সুতপা ওকে যে শাস্তি দিক ও মাথা পেতে নেবে। দুজনের মধ্যে তিল তিল করে যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল সেটাকে সহজ করে ফেলার জন্যে যা করতে হয় সবই করবে। আর বসে না থেকে তাড়াতাড়ি দেবেশ ময়দানের বাইরে পা বাড়াল।

AMARBOI.COM

বর্তমান, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিড়কি

বিপ্লব রায়

যত আবদার দিদার কাছে। ছোটবেলায় মায়ের কোল কমদিনই পেয়েছে সঞ্জু। মা বলতে দিদাকেই জানত সে এতদিন। দিদাও সঞ্জু বলতে অজ্ঞান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দিদার পিছন পিছন ঘুর ঘুর করত সে। একেবারে ন্যাওটা। সঞ্জুর বাবা-মা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন সে বছর খানেকের। দিদাই তাকে কোলে-পিঠে করে বড় করেছে। একবারও মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। প্রফুল্লবাবু ছেলের শোক ভুলতে পেরেছেন সঞ্জুকে আঁকড়ে ধরে। বৃদ্ধ বয়েসে সঞ্জুই তার বাঁচার আশা জোগায়। ছেলের শৈশব খুঁজে পান সঞ্জুর মধ্যে। বছর খানেকের সঞ্জুকে নিয়ে প্রফুল্লবাবু যখন অকূল সাগরে তখন রাই বউদিকে নিয়ে আসেন তিনি। সঞ্জুর দিদা। তিনকালে কেউ নেই তার। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়। তিন বছর কাটতে না কাটতে স্বামী হারা। শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে, পাবনার তাঁতিবন্দ গ্রামে। কখন যে কৈশোর যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে টের পায়নি। লোকের বাড়ির ধান চাল কুঁটে যা পেত তা দিয়ে দিব্যি চলে যেত তার। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। ওই কথা মনে আনাও ছিল পাপ সেই সময়। প্রফুল্লবাবুর অনুরোধ ফেলতে পারেনি। চলে আসে ভারতে, প্রফুল্লবাবুর বাড়ি। বুকে তুলে নেয় ছোট্ট সঞ্জুকে। অতৃপ্ত মাতৃত্বের সুখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকে। সঞ্জুর মধ্যে খুঁজে পায় নিজের ফেলে আসা দিনগুলি, যা কাছে এসেও আসেনি তার জীবনে।

রাই বউদিকে এনে অনেকটা নিশ্চিত হন প্রফুল্লবাবু। সংসারের কাজকর্ম সে নিপুণ হাতে সামলে গল্প শোনাত সঞ্জুকে। তার গ্রামের গল্প। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, পাল তোলা নৌকো, সারি সারি আম কাঁঠালের বাগান, জমিদার বাড়ির দুর্গা পূজা, যাত্রা গান আর কত কী। বলত ইংরেজ সাহেবদের কথা, স্বাধীনতার কথা, মাস্টারদার কথা। অবাক হয়ে শুনত সঞ্জু। রাতে ঘুমাতে চাইত না। আরও গল্প শুনতে চেয়ে বায়না করত। ভূতের গল্প বললে জড়িয়ে ধরত আষ্টেপৃষ্ঠে।

সঞ্জু সবে প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে হাইস্কুলের দরজায় পা দিয়েছে। শীতের সকালে দাওয়ায় বসে তিনজনে। নরম নরম রোদ গাছ গাছালির ভিতর দিয়ে দাওয়ায় এসে পড়ে। একথা সেকথায় রাই বউদি বলে—প্রফুল্ল তোমার বাড়ি আর ঝিগিরি করতে পারব না।

কেন বউদি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন প্রফুল্লবাবু।

ও মা, তুমি দুনিয়ার সব কথায় এমন ভাব প্রফুল্লবাবু। খেলতে যা ঠাকুর দালানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়দের কথায় থাকতে নেই।

—কেন বউদি, আমার কী কোনও ভুল হয়েছে? আবার জিজ্ঞেস করেন প্রফুল্লবাবু।

—না বাপু। তোমার ভুল হবে কেন। আমি আর ঝিগিরি করতে চাই না ব্যাস। আমার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।

—ভবিষ্যৎ। তোমার ভবিষ্যতের জন্য তো আমি আছি। বলেন প্রফুল্লবাবু।

—তুমি আর ক'দিন! শরীর শক্ত থাকতে থাকতে নিজের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

—এ বয়েসে কী করবে শুনি। মৃদু হেসে বলেন প্রফুল্লবাবু।

—হেঁয়ালি কোরো না প্রফুল্ল, আমি ঠিক করেছি—ভিক্ষা করব।

আকাশ থেকে পড়েন প্রফুল্লবাবু। বলেন, আমি থাকতে তুমি ভিক্ষা করবে? লোকে কী বলবে? দেশ থেকে এনে তোমাকে দিয়ে ভিক্ষা করাচ্ছি। তোমার যে দেখছি ভিমরতি ধরেছে। ভিক্ষা করলে আমার এখানে থাকতে পারবে না।

—সে আমি ঠিক করেই রেখেছি। লক্ষ্মীদির সঙ্গে থাকব।

—লক্ষ্মীদি? সে আবার কে? কোথা থেকে জোটালে তাকে। বুঝেছি, ওই তোমাকে ভিক্ষার মন্ত্র দিয়েছে। শ্লেষ ভরে বলেন প্রফুল্লবাবু।

—নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে। তোমার বাড়ি কাজ করে ক'টাকা পাই শুনি। খাওয়া-পরা আর বছরে দু'জোড়া কাপড় দাও। আর পান খাওয়ার জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা। এতে কি ঝি পাওয়া যায়? তুমিই বলো।

—তোমাকে কি ঝিয়ের মতো দেখি? তুমি তো আমার আত্মীয়ের মতো। আমরা এক গ্রামের। সেই ছোট থেকে তোমাকে চিনি। তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করতে পারি। শেষ ক'টা দিন একসঙ্গেই থাকো বউদি। তোমারও ভালো লাগবে, আমারও। বলেন প্রফুল্লবাবু।

—তা আর হয় না প্রফুল্ল। দুই গাঁ ঘুরলে কিলো দুয়েক চাল পাব। সঙ্গে তরিতরকারি। এক পোঁয়া চালে আমার একদিন চলে যায়। বাকিটা বিক্রি করলে দিনে পনেরো কুড়ি টাকা পাব। মাসে কম করেও সাড়ে চারশো টাকা। তরিতরকারি কেনার ঝামেলা নেই। এক সিদ্ধ ভাতে আমার চলে যাবে। সন্ধেবেলা দুই বুড়ি বসে হরিনাম করব। শেষ বয়সে কী আর আছে বলো। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলি বলে রাই বউদি।

—ও তোমার টাকার দরকার? আগে বলবে তো। তার জন্য এত কথার কী আছে। তা ক'টাকা চাও শুনি? বলেন প্রফুল্লবাবু।

—টাকার জন্য বলছি না প্রফুল্ল। শেষ বয়সটা আমি নিজের মতো কাটাতে চাই। তুমি একটা কাজের লোক দেখে নাও বাপু। নইলে পোলাটার কষ্ট হবে। মা-বাপ মরা তো। বিনয়ের সঙ্গে বলে রাই বউদি।

—থাক অনেক হয়েছে। ওর কথা ভাবলে কাজ ছাড়ার কথা বলতে না। তা কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে শুনি? বিরক্তি ভরে জিজ্ঞেস করেন প্রফুল্লবাবু।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাই বউদি বলে আজই। বিকালে লক্ষ্মীদি নিয়ে যাবে। হাসপাতালের পাশেই ও থাকে। আজই চলে যাবে? ক'টা দিন পরে গেলে হয় না? অনুরোধ করেন প্রফুল্লবাবু।

—কয়েকদিন ধরে কথাটা বলতে চেয়েছি। পারিনি। আজ বলেই ফেললাম। যেতে যখন হবেই তখন মায়া বাড়িয়ে কী লাভ বলো। কথাগুলি বলে ঠাকুর চাতালে যায় রাই বউদি।

আপনমনে খেলছে সঞ্জু। তুমি ঝি। ছিঃ, কী বাজে লাগে শুনতে। ঝি মানে কী দিদা? শিশুসুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে সঞ্জু।

—ঝি মানে কাজের লোক। আমি তোমাদের বাড়ির কাজের লোক। আমি তোমার দিদাও। গালটি টিপে আদর করে বলে।

—কী সব বল না দিদি! দিদা কখনও কাজের লোক হয় নাকি? শ্রেয়ার দিদা আছে। সে কি কাজের লোক। গদাইয়ের দিদা আছে। সে কি কাজের লোক? তুমি কিচ্ছু জানো না।

—তোমাকে আর পাকা বুড়োর মতো কথা বলতে হবে না। বেলা হল স্নান করতে চলো। বলে টেনে নিয়ে যায় কলের পাড়ে। স্নান করাতে করাতে বলে সময় মতো খাবে। একদম দুষ্টুমি করবে না। স্কুলে যাবে। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাব। অবাক হয়ে শোনে সঞ্জু। আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারে না? উঠানে দাঁড়িয়ে রাই বউদির কথাগুলো শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না প্রফুল্লবাবু। ঘরে চলে যান। বারান্দায় আসন পেতে প্রফুল্লবাবুকে খেতে দেয় রাই বউদি প্রতিদিনের মতো। কোনও কথা বলেন না তিনি। নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যান। সঞ্জুকে কোলে করে পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাখি দেখায় আর ভাত খাওয়ার ওর দিদা। তারও চোখে জল নীরবে নেমে আসে। আঁচল দিয়ে মুছে নেয় বার কয়েক। খাওয়া শেষে ঘুম পাড়িয়ে দেয় সঞ্জুকে। ও জেগে থাকলে চলে যাওয়া কঠিন হবে। বারান্দার এক পাশে রাখা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন প্রফুল্লবাবু। চোখ দুটো বুজে এসেছে। শীতের দুপুরে খাবার পর যেমনটা হয়। রাই বউদি তৈরি হয়ে নেয় এর মধ্যেই। সম্বল বলতে একটা কাপড়ের পোটলা আর একটা পান সুপারির কৌটো নেবার সুতোর নকশা করা থলে।

লক্ষ্মীদি আগেই চলে এসেছে। দাওয়ায় বসে পান চিবতে চিবতে সুপরামর্শ দেয় রাই বউদিকে। বলে, আজ আট-দশ বাড়ি ঘুরেই কিলো দেড়েক চাল আর পাঁচ টাকা পেয়েছে সে। দু'জনে একসঙ্গে ঘুরলে অন্তত তিন কিলো চাল আর দশ টাকা হত। আরও বলে, রাতে বাউল গান শুনতে যাবে হরিতলায়। সারারাত ধরে গান হবে।

লক্ষ্মীদির বক বকানি শোনে কিন্তু জবাব দেয় না রাই বউদি। তার মনটা ভার হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। কীভাবে প্রফুল্লবাবুর কাছে চলে যাবার অনুমতি চাইবে বুঝে উঠতে পারে না। অনেক ভেবেচিন্তে ইজিচেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লবাবুকে ডাকে। দু-একবার ডাকার পর প্রফুল্লবাবু চোখের পাতা খোলেন। পোঁটলাটা দেখে নাও। পরে হয়তো বলবে জিনিসপত্র নিয়ে গেছি। রাই বউদি বলে।

—আমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে? তোমার পোঁটলাটা দেখতে যাব। রাগান্বিত হয়ে কথাগুলো বলেন প্রফুল্লবাবু। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে রাই বউদি। দু'জনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মীদি। ওর দিকে তাকিয়ে রাই বউদির উদ্দেশ্যে প্রফুল্লবাবু বলেন—ও তোমার মাথাটা খেয়েছে। মনে রেখো বউদি—বাঁধন ছেঁড়া লোকেরা শুধু অন্যের ঘর ভাঙতে জানে। একবার ভিক্ষার জন্য হাত পাতলে সেই হাতে আর অন্য কাজ করতে পারবে না, কোনওদিনও না।

প্রফুল্লবাবুর কথা কোনও প্রভাব ফেলে না রাই বউদির মনে। সে পেয়েছে মুক্তির হাতছানি। মুক্তির দূত স্বয়ং এসেছে তার কাছে। আসি, বলে প্রফুল্লবাবুর বাড়ির বাইরে পা রাখে সে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একের পর এক গ্রাম। দু'হাত উপচে পড়ছে চাল, তরকারি, পয়সা, আরও কত কী! শুধু কাজের হাত দুটো রেখে যায় প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে।

প্রাত্যহিক খবর, ১২ আগস্ট ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্বী

বাণীব্রত চক্রবর্তী

বিতনু মাঝে মাঝে একটা ট্রামে উঠে পড়ে। তার কোনও গন্তব্য নেই। সেদিন একটা ট্রামে উঠে সে একটু বদলে গেল। অন্তত বিতনুর তো তাই মনে হচ্ছে।

ওই ট্রামে এক বালক ভিখিরি রামপ্রসাদী গান গাইছিল। বালকটি অন্ধ। তার হাতে ছিল একটা টিনের কৌটো। গান গাইতে গাইতে লেডিজ সিটের সামনে এসে দাঁড়াল। একটি তরুণী অবাক হয়ে বালকটির গান শুনছিল। কেউ অন্ধ বালকের কৌটোয় একটা পয়সাও ফেলেনি। বিতনুও পকেটে হাত ঢোকায়নি। অন্ধ বালক ওই মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়ালে, সে কৌটোতে একটা একটা করে কয়েন ফেলছিল আর ফেলার সময় মেয়েটির চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল। একটা স্টপে ট্রাম দাঁড়ালে মেয়েটি নেমে পড়ল। বিতনুও। বিতনুর কোনও গন্তব্য ছিল না।

ট্রাম থেকে নেমে মেয়েটি জোরে জোরে হাঁটছিল। বিতনু এক রকম ছুটেই তার কাছে পৌঁছে যায়, 'এমন তো কোনও দিন দেখিনি।' মেয়েটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, 'তার মানে।' বিতনু অকপট, 'অন্ধ ভিখিরির টিনের কৌটোয় একটা একটা করে কয়েন ফেলে দেওয়া আর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া।'

মেয়েটির প্রজ্বলিত চোখের দিকে তাকিয়ে বিতনুকে থমকে যেতে হয়। মেয়েটি বলে, 'এই ছুতোয় আলাপ করতে এসেছেন।' বিতনুকে একটা টিউবওয়েলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি আবার হন হন করে হাঁটতে শুরু করে।

কিন্তু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটি ফিরে আসে। বিতনু দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর সামনে এসে মেয়েটি বলে, 'আমি উর্বী। আপনি?' বিতনু বলে, 'আমি বিতনু।' উর্বী জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় থাকেন। কী করেন। এ ভাবে অনেক মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছেন বুঝি?' বিতনু বলল, 'বাড়িতে থাকি। কই, কিছু তো করি না। কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিনি তো।' উর্বীর মায়া হয়। হেসে ফেলে, 'বাড়িতে তো আমিও থাকি। কিন্তু আপনার বাড়িটা কোথায়।' বিতনুর সমস্যাটা ওইখানে। মাঝে মাঝে ভুলে যায় তার বাড়িটা কোথায়। মনে করার চেষ্টা করে।

উর্বী কী বোঝে কে জানে। বলে, 'চলুন।' বিতনু এক বারও জিজ্ঞেস করে না কোথায় যাবে। তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। জানে না কোন স্টপে সে নেমেছে। জানে না এটা কোন জায়গা। উর্বী বলল, 'আজ থেকে আমি তোমার নাম রাখলাম বিতনু।' বিতনু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

বলল, 'সত্যি বলছেন! আপনাকে আমার বন্ধু হলে খুব মানাবে। আমার কোনও বন্ধু নেই।' উর্বী এ বার খিলখিল করে হাসে, 'সে তো বুঝলাম। তা হলে ওই আপনি আপনি বলাটা ছাড়ো। আমাকে তুমি বলো।' বিতনু বলল ঠিক আছে তুমি বলব। উর্বী বলল, তাই বলবে বিতনু সেন।' বিতনু অবাক, 'তুমি আমার পুরো নামটা জানো।' উর্বী বলল, 'জানি। আমার নামটা তোমার মনে আছে!' বিতনু বলল, 'মনে পড়ছে না। আর এক বার বলো।'

উর্বীর চোখে জল এসে থমকে যায়। মুখ ঘুরিয়ে রুমালে চোখ মুছে বলে, 'আমার নাম উর্বী। কোথায় থাকো মনে পড়েছে!' বিতনুর মাথার ভেতরে স্মরণের জানলাটি খুলে যায়। বলল, 'মনে পড়েছে। ফেডারেশন স্ট্রিট। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের উল্টো দিকে।এটা কোন জায়গা।' উর্বী বলল, 'ক্রিক রো। চলো হাঁটি।'

উর্বী খবরের কাগজের অফিসের চাকরি করে। সেখান থেকে একটা মাছলি ম্যাগাজিন বেরোয়। সে তাতে সাব এডিটর।

সেদিন অফিসে গিয়ে বসতে না বসতেই শীতল চা এনে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে শীতলকে বলল, 'আমাদের পুরনো, খবরের কাগজের ফাইলগুলো একটু এনে দেবে।' শীতল বলল, 'দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।' শীতল এখন ডেস্কে ডেস্কে গিয়ে চায়ের জোগান দেবে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট খেলে ভাল হত। অফিসে স্মোক করা যাবে না।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে উর্বী বিতনুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সিগারেট খাও না বুঝি।' বিতনু মাথা নেড়েছিল, 'কই, খাই না তো।' উর্বী জিজ্ঞেস করেছিল, 'ইচ্ছে করে না।' বিতনু অবাক দৃষ্টিতে উর্বীর দিকে তাকিয়েছিল।

শীতল পুরনো কাগজের ফাইলগুলি এনে উর্বীর টেবিলে রাখল। কোন মাসে খবরটা বেরিয়েছিল মনে পড়ছে না। এটা জুন মাস। উর্বীর মাথার ঠিক নেই। মাস দিয়ে কেন হিসেব করছে। অন্তত বছর চারেক আগেকার ঘটনা।

বিভাসদা এসে দাঁড়াল, 'একটা সিগারেট দে তো।' উর্বী উঠল, 'চলো আমিও স্মোক করব।'

রাস্তায় এসে উর্বী সিগারেট দিয়ে বলল, 'বিভাসদা, হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘটনাটা কবে ঘটেছিল মনে আছে।' অতন্দ্র দূরে দাঁড়িয়ে স্মোক করছিল। হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকল। বিভাসদা বলল, 'চল, অতন্দ্র ডাকছে।' উর্বী বলল, 'তুমি যাও।' বিভাসদা চলে গেল। উর্বীর মনে হল কথাটা বিভাসদাকে জিজ্ঞেস না করলেই হত। তাকে একা কাজটা করতে হবে। তার আরও মনে হল বিতনু তার থেকে অন্তত তিন বছরের ছোট।

পেছন থেকে কে যেন এসে তার চোখ টিপে ধরেছে। পারফিউমের গন্ধ দিয়াকে চিনিয়ে দেয়। দিয়া সামনে এসে দাঁড়াল, 'তুই না আমাকে কথা দিয়েছিলি আর স্মোক করবি না।' উর্বী বলল, 'এক মাস পরে ছেড়ে দেবে। তোকে বলিনি।' তার পর উর্বী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস।' দিয়া বলল, 'গ্র্যান্ড। বলরুমে বিউটি কনটেস্ট আছে। সামাদা বললেন কভার করতে হবে।' উর্বী জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবি।' দিয়া বলল, 'জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেরি হলে অফিসের গাড়ি লিফ্‌ট দেবে।' কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দিয়া ফিরে এল, 'একটা কথা কেবলই মনে হয় উর্বী।' উর্বী বলল, 'কী কথা?' দিয়া বলল, 'তোর নীল জিন্‌স। ডান হাতে ঘড়ি। মুখে সিগারেট। তা হলে কথায় কথায় কাঁদিস কেন। একটুও মানায় না।' উর্বী বলল, 'কোথায় কাঁদলাম।' দিয়া বলল, 'কারও একটু দুঃখ দেখলেই কেঁদে ফেলিস। আমি কি জানি না।' দিয়া দাঁড়াল না। চলে গেল।

সেদিন ট্রামে অন্ধ বালকটিকে দেখে তার রন্টুর কথা মনে পড়েছিল। মেজ মাসির ছেলেটা আস্তে আস্তে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। উর্বী কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন তো ট্রামে দিয়া ছিল না। না থাক। দিয়া জানে। সে একটুতেই কেঁদে ফেলে। দিয়া কেন, সবাই জানে। সাম্যদা মাঝে মাঝে বলেন, 'তোমার লেখা এত বোল্ড। কিন্তু একটুতেই কেঁদে ফেলো কেন?'

অফিসে ঢুকে নিজের ডেস্কে এসে দেখল পুরনো খবরের কাগজের ফাইল নেই। কে নিল। শীতল এসে দাঁড়াল, 'সার আপনাকে ডাকছেন।' উর্বী জিজ্ঞেস করল, 'পুরনো খবরের কাগজের ফাইল কি তুমি নিয়ে গেছ?' শীতল বলল, 'হ্যাঁ, স্যর চাইলেন।'

দরজা ঠেলে উর্বী সাম্যদার দিকে মুখ বাড়াল, 'ডেকেছেন?' সাম্যদা বললেন, 'হ্যাঁ, এসো।' উর্বী এসে সাম্যদার টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল। সাম্যদা বললেন, 'হাতে ক'টা সংখ্যার গল্প রেডি আছে?' উর্বী বলল, 'আপাতত দুটো।' সাম্যদা বললেন, 'আর ও দিকে পুজো সংখ্যার উপন্যাসগুলো পেয়ে গেছ?' উর্বী বলল, 'একটা পেয়েছি। বাকিগুলো এ মাসের শেষে পেয়ে যাব। আশা করছি।' সাম্যদা বেল টিপলেন। শীতল মুখ বাড়াল। সাম্যদা বললেন, 'দু'কাপ চা।'

আবার সাম্যদা কথা শুরু করলেন, 'এ বারে নতুন যারা উপন্যাস লিখছেন তাঁদের নামগুলো বলো তো।' সাম্যদার হাতে পেন। সামনে রাইটিং প্যাড। উর্বী নামগুলি বলল। সাম্যদা বললেন, 'তা হলে নতুন তিন জন। পুরনো দু'জন। প্যাডে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে সাম্যদা বললেন, 'দেড় মাস সময় দিচ্ছি। তুমি একটা উপন্যাস লেখো।' উর্বী আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি।' সাম্যদা বললেন, 'তিরিশ হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে। পারবে না।' উর্বী বলল, 'পারব না সাম্যদা।' শীতল চা আনল। চায়ে চুমুক দিয়ে সাম্যদা বললেন, 'পারবে। নতুন ধরনের সাবজেক্ট চাই।' পুরনো খবরের কাগজের ফাইল সাম্যদার টেবিলে। বললেন, 'শীতলকে দিয়ে এই ফাইল তোমার টেবিলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুঁজে খুঁজে দেখো। একটা সাবজেক্ট নিশ্চয়ই পাবে।' উর্বী বলল, 'ঠিক আছে।' ডিপার্টমেন্টে ফিরে হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফোন করল। যা ভেবেছিল তাই।

সন্ধে সাড়ে সাতটায় উর্বী ফেডারেশন স্ট্রিটে ঢুকল। ঠিকানা জানে না। গলিটা খাঁ খাঁ। দু'একটা আলো জ্বলছে না বলে গলিটায় অন্ধকার বেশি। পাশ দিয়ে একটা সাইকেল চলে গেল। একটা কুকুর ডাকতে ডাকতে সাইকেলটার পেছনে ছুটছে। খানিকটা দৌড়ে থেমে গেল। উর্বী হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল যে কোনও একটা বাড়িতে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। একটা লাইটপোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল।

বিতনুকে দেখতে পেল। এ দিকে এগিয়ে আসছে। উর্বী দাঁড়িয়ে রইল। বিতনু তার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার দিকে তাকাল না। উর্বী বিতনুর পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। চার পাঁচটা বাড়ি ছাড়িয়ে একটা বাড়ির ভেজানো দরজা ঠেলে বিতনু সেই বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

উর্বী হাঁটতে হাঁটতে টামরাস্তা পেরিয়ে সুকিয়া স্ট্রিটে চলে এল। মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা খেল। হিপ পকেট থেকে পার্স বার করে দেখল খুচরো নেই। দোকানদার হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে ভাঙিয়ে দিল। আবার ট্রামলাইন পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফেডারেশন স্ট্রিটে এল।

বিতনুদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। বেল পুশ করল। দরজা খুলছে কেউ। বিতনু। 'কাকে চাই।' বিতনু তাকে চিনতে পারেনি।

উর্বী বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না।' বিতনু বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে এলেন, 'কাকে চাই!' উর্বী বলল, 'আমি একজন রিপোর্টার।' ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন, 'আর নয়। আর কিছু বলতে পারব না।' উর্বী বলল, 'বিতনুর বন্ধু আমি।' ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললনে, 'ও নিশ্চয়ই আপনাকে চিনতে পারেনি।' উর্বী মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক বললেন, 'ওর কোনও দোষ নেই।' উর্বী বলল, 'জানি। মাথায় খুব লেগেছিল।' ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়ান, বিতনুকে ডাকি।' উর্বীর অস্বস্তি হচ্ছিল, 'আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন।' ভদ্রলোক বিতনুকে ডাকলেন। বিতনু এল। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধুকে চিনতে পারছ।' বিতনু উর্বীর দিকে তাকাল, 'না, চিনতে পারছি না।' বিতনু আবার বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বিতনুর বাবা প্রণব সেন। তোমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে পারছি না। ওর মায়ের মনের অবস্থা ভাল নয়। চলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

রাস্তায় বেরিয়ে প্রণববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কত দিন বিতনুকে চেনো?' উর্বী বলল, 'দিন সাতেক আগে আলাপ হয়েছিল।' ভদ্রলোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, 'ট্রামে এক অন্ধ ভিখিরিকে পয়সা দিতে দিতে কাঁদছিলে!' উর্বী অবাক, 'আপনি জানেন। কে বলল! বিতনু।' প্রণববাবু বললেন, 'আমাকে বলেনি। ওর মাকে বলছিল। এটা দেখে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছিল। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলেনি। এটাই বিতনুর বৈশিষ্ট্য। এক একটা দৃশ্য মাথার ভেতর নিয়ে ও বয়ে বেড়ায়।' বিতনুর বাবার গলাটা ধরে আসছিল।

রাতে উর্বীর চট করে ঘুম এল না। ভাবল সাম্যদার কথা। তিরিশ হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে একটা উপন্যাস। উর্বীর কত দিনের স্বপ্ন। সে পাঁচ বছর এই কাগজে কাজ করছে। পাঁচ বছর ধরে সাম্যদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এত দিনে এই কাগজে পাঁচ-ছ'টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প লিখতে পেরেছে। সাম্যদা চেয়েছেন। উর্বী দিয়েছে। সে অপেক্ষা করেছে সাম্যদা কবে বলবেন, একটা উপন্যাস দাও উর্বী। আজ চাইলেন। কিন্তু আনন্দ কই! কেবল স্মৃতি-বিস্মৃতির টানাপোড়নে অস্থির একটা ছেলে তার চোখে জল এনে দিচ্ছে। বিতনু।

প্রণববাবু বলেছেন, 'তুমি এক দিন আমার অফিসে এসো।' উর্বী বলেছিল, 'কবে আসব বলুন।' উনি বলেছিলেন, 'শনি-রবি বাদ দিয়ে যে কোন্য দিন। ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের অফিস। কাগজ কলম আছে। আমার মোবাইল নাম্বারটা লিখে নাও।' উর্বী তার মোবাইলে নাম্বারটা সেভ করে নিয়েছিল।

উর্বীর ঘুম আসছিল না। সব কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল। ইনসেটে বিতনুর ছবিও ছিল। তখন একটু অন্যরকম দেখতে ছিল। টিভিতেও বিতনুকে দেখিয়েছিল। এখন মনে পড়ছে।

মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়। পাঁজাকোলা করে কলেজের দোতলা থেকে যারা বিতনুকে এক তলায় ফেলে দিয়েছিল তাদের শাস্তি হল কই! বিতনুর চোট লেগেছিল মাথায়। মেধা-বুদ্ধি-স্মৃতির কোষগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ঘুম আসছিল না।

বিছানায় শুয়ে উর্বী কাঁদছিল।

পরের দিন অফিসে যেতেই অতন্দ্র এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, 'তোর জন্যে অভিনন্দন উর্বী।' অবাক, 'অভিনন্দন। হঠাৎ অভিনন্দন কেন?' অতন্দ্র বলল, 'কেন, জানিস না।' উর্বী মাথা নাড়াল, 'সত্যিই জানি না রে।' অতন্দ্র হাসছে, 'এ বার পুজোয় আমাদের কাগজে যে উপন্যাসটা লিখবি তার নায়কের নাম দিস অভিনন্দন।' কথাটা বলে অতন্দ্র চলে গেল আর্ট ডিপার্টমেন্ট।

উর্বীর খুব লজ্জা করছিল। কথাটা চাউর করল কে! সাম্যদা যদি জানতে পারেন! ভয় হল। শীতল এসে বলল, 'স্যার আপনাকে ডাকছেন।' ভয়টা চেপে ধরল। সে স্পষ্ট বলে দেবে কাউকে কিছু বলেনি।

সাম্যদা বললেন, 'এসো।' উর্বী সাম্যদার টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। সাম্যদা বললেন, 'কবে লেখা শুরু করবে!' উর্বী বলল, 'এ বারে আমাকে বাদ দিন।' সাম্যদা বললেন, 'তুমি লিখছ, দু'এক জনকে বলেও দিয়েছি। অতন্দ্র ইলাসস্ট্রেশন করবে। এক কাজ করো। লাঞ্চের পর ছুটি দিয়ে দিলাম। বাড়িতে গিয়ে লেখাটা শুরু করো।'

দুটোর পর অফিস থেকে বেরিয়ে উর্বী প্রণববাবুকে ফোন করল। উনি বললেন, 'তিনটের মধ্যে চলে এসো।'

এ-ক রো-এ উর্বীদের অফিস। হাঁটতে হাঁটতে সেই টিউবওয়েলটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বিতনুকে এখানে রেখে সে চলে যেতে চেয়েছিল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উর্বীর মনে হয়েছিল ছেলেটাকে সে যেন কোথায় দেখেছে। ফিরে এসে নাম শুনে বুঝতে পেরেছিল এই সেই বিতনু সেন। পার্শ্বিক ব্যাগিংয়ে যে বিতনুর সব হারিয়ে গেছে। বন্ধুতার হাতটি তখন সে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্বী ল্যান্সডাউন রোডে এল। প্রণব সেন তাঁর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনটে বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি।

বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফিরল। মা অবাক, 'ছুটি হয়ে গেল! নাকি শরীর খারাপ।' উর্বী বলল, 'কাজ আছে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম।' মা বললেন, 'কী কাজ! কীসের কাজ।' উর্বী উত্তর দিল না।

এখন সাড়ে চারটে। এখনও ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। নিজের ঘরে ঢুকে উর্বী দরজা বন্ধ করল। জানলার পর্দাগুলি টেনে দিল। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বিতনুর কথা ভাবতে ভাবতে কাঁদল। ছেলের কথা বলতে বলতে প্রণব সেনের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। ভদ্রলোক ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি উর্বীর সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় এসে বসেছেন।

কেন এমন হয়! কেন বিতনুদের শেষ করে দেয়। যারা শেষ করে তারা কারা! ধারাবাহিক ভাবে এমন হয়ে আসছে কেন! এই অন্বেষণ নিয়ে একটা উপন্যাস কি লেখা যায় না? একই সঙ্গে বিতনুকে ভাল করে তোলার চেষ্টা করতে পারে তো! এক অমলিন বন্ধুতায়।

উর্বী চোখের জল মুছল। জানলার পর্দাগুলি সরিয়ে দিল। ঘরের দরজা খুলল। আলোয় ঘর ভরে গেল।

একটু পরে মা এসে দেখলেন খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মন দিয়ে উর্বী কী যেন লিখছে। মায়ের মুখে হাসি ফুটল।

AMARBOI.COM

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইটল মিউজিক

বিপুল দাস

দোলা, এই দেখ আমার জুলফি, আমার কানের পাশে সব চুল সাদা। পাগলামি করিস না। এই সতেরোই সেপ্টেম্বর আমি আটচল্লিশে পড়ব। আর তোর বার্থ ডে তো আমি জানি। ছাব্বিশে পা দিলি। বাইশ বছরের ডিফারেন্স আমাদের। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করব।

তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু আসে যায় না। যা সত্যি, তাই বললাম। রোজ যদি তোমার একটা ফোন না পাই, আমি কিন্তু সোজা তোমার অফিসে গিয়ে সব তছনছ করে দিয়ে আসব। জানো তো আমাকে, সত্যিই আমি পারি। বেশি কিছু চাইনি তো তোমার কাছে। শুধু রোজ এক বার তোমার সঙ্গে কথা বলব। তোমার কথা শুনব।

পাগল, পাগল হয়ে গেছিস তুই। আমি সুস্থ আছি, আমি বুঝতে পারছি কী অ্যাবসার্ড একটা কথা তুই বলছিস। এ রকম হয় না দোলা। আমাকে তো তুই ভাল করে এখনও জানিস না। চার মাস আমরা একসঙ্গে নাটকের রিহার্সাল দিয়েছি। তোর সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, সেগুলো তো আমার বা তোর নিজের কথা নয়। আমরা তৈরি করা সংলাপ বলেছি। যেমন চেয়েছে প্রবালদা, তেমন সিচুয়েশন তৈরি করেছি।

তুমি একটা আকাট, আনস্মার্ট, লেবদুসমার্কা ল্যাগব্যাগার্নিগাস।

এক কথায় বললে পারতিস। মেয়েরা তো আজকাল ছেলেদের মতোই যখন তখন স্ল্যাং বলছে। আমাকে তোর ও রকম কেন মনে হল, জানতে পারি?

বুদ্ধু, হাবাগঙ্গারাম, অগারাম, উদো। তৈরি করা সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে আমার নিজের না বলা সংলাপ কেন বুঝতে না।

বুঝতাম দোলা। বিশ্বাস হত না। মনে হত প্রবালদা, তপনবাবু, স্বাতী—আমার মতো ওরাও বুঝি তোর নিজের কথা, চোখের ভাষা বুঝতে পারছে। ভয় হত। এক দিন রিহার্সাল শেষ হতে দেরি হয়েছিল। আমার বাইকে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছিল প্রবালদা। খুব মজা পেয়েছিস—এমন মুখ করে আমার দিকে তাকিয়েছিলিস।

তুমি নার্ভাস হয়ে ঘড়ি দেখছিলে। শেষে বলেছিলে, বেশি রাত হয়নি। বাস পেয়ে যাবে। প্রবালদা তোমাকে ধমক দিয়েছিল। সুড়সুড় করে বাইক স্টার্ট করেছিলে। আমি পিছনে বসেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকতলা ব্রিজ পেরোতেই আমার কাঁধে হাত রাখলি তুই। আমার হাত কেঁপে উঠল।

আমার বুক কাঁপছিল। রিহার্সালের বাইরে তোমার এত কাছে কোনও দিন বসিনি। নিজেকে এত সুচিত্রা মনে হচ্ছিল ... কী বোকার মতো বললাম না? আমার তো ইচ্ছে করছিল পিছন থেকে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে।

শিয়োর অ্যাকসিডেন্ট হত।

অ্যাকসিডেন্ট তো হয়েই গিয়েছে। রোজ তোমার সঙ্গে কথা বলতে কী ভীষণ ইচ্ছে করে। জানতাম, শো হয়ে গেলে আর রোজ দেখা হবে না। মাঝে মাঝে হয়তো প্রবালদা রিহার্সাল ফেলবে। গ্রুপে যেতে বলবে। এক মিনিট দেরি করে গেলে যাচ্ছেতাই বলবে। কত কায়দা করে তোমার নম্বর জোগাড় করেছি। কত দিন কল করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নম্বরগুলো মুছে দিয়েছি। তখন যে কী কষ্ট হত।

দোলা, সেধে কেন এই কষ্ট নিলি বল তো? কী পাবি? তোকে দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু নেই। যদি জানতাম ...

ও মা, আমি আবার তোমার কাছে কখন কিছু চাইলাম। শুধু, রোজ একটা ফোন।

দোলা, আমার সংসার আছে। বউ, ছেলেমেয়ে। আমার সময়, আমার বেঁচে থাকা, আমার সুখদুঃখ, আমার স্নেহ ভালবাসা, শরীরের কামনা বাসনা, এমনকী আমার দেখা আর না দেখা স্বপ্নগুলো পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আচ্ছা বলো তো, তুমি কী ভেবেছ? তোমাকে নিয়ে আমি কোথাও পালিয়ে যাব? তার পর তাহারা সুখে সংসার করিতে লাগিল—সে রকম কোনও হ্যাপি এন্ডিং?

না দোলা, এ হয় না। সব কিছু টালমাটাল হয়ে যাবে। কেন তুই এমন একটা ইমপসিবল মিশনে নিজেকে জড়ালি।

তার পর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করেই বাঁ দিকে ঘুরলে। উল্টোডাঙা থেকে ভি আই পি ধরলে। খুব সাবধানে চালাচ্ছিলে তোমার বাইক।

আমি জানতাম তুই ওদিক থেকেই আসিস। তোর এক দিন রিহার্সালে আসতে দেরি হচ্ছিল। প্রবালদা বলছিল লেক টাউনে ঝামেলা হয়েছে। ভি আই পি অবরোধ করে রেখেছে লোকাল লোকজন। তুই নাও আসতে পারিস। তোর স্বাতীকে প্রক্সি দিতে বলে রিহার্সাল শুরু হয়েছিল।

তফাতটা কি সে দিন বুঝতে পেরেছিলে?

হুঁ। স্বাতী চেষ্টা করছিল। হয়তো তোর চেয়ে ভাল করার চেষ্টা করছিল। জানিস তো, প্রক্সিতেও কেউ ফাঁকি দিলে প্রবালদা কেমন রেগে যায়।

আমি কেষ্টপুরের মোড়ে বাসে বসে থাকতে থাকতে তোমার কথা ভাবছিলাম। আমার বলছিল স্বাতীদি এখন আমার পার্ট প্রক্সি দিচ্ছে। আমার জন্য প্রবালদা বসে থাকবে না। আমি তো জানিয়েই দিয়েছিলাম জ্যামে আটকা পড়েছি। মনে মনে দেখছিলাম তুমি স্বাতীদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছ, দোলা, এই দেখ আমার জুলফি ... ব্যাক স্টেজে গিয়ে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলছ, দোলা, সেধে কেন এই কষ্ট নিলি বল তো ...

ট্রাফিক আইল্যান্ড পার হলে আমার কাঁধে একটু জোরে চাপ দিয়েছিলিস। আমি বুঝেছিলাম এ বার তোকে নামাতে হবে। বাইক থেকে নেমে আমার দিকে এক বার তাকিয়ে লাল আলোর সুযোগ নিয়ে ভিড়ে মিশে গেলি। এক বার শুধু দেখলাম ওপার থেকে আমাকে খুঁজছিস। তখনও তো জানি না ... এই, তুই সত্যিই আমার অফিসে গিয়ে ঝামেলা করবি নাকি?

করবই তো। আর কিছু তো চাইনি তোমার কাছে। শুধু রোজ এক বার তোমার কথা শুনব।

কী লাভ দোলা। কথা শুনতে শুনতে এক দিন ক্লান্ত হয়ে পড়বি।

তাই তো চাইছি। তোমার কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

দোলা, ড্রামা করিস না। রোজ শুধু আমার কথা শোনার জন্য তুই আমার সঙ্গে জড়াতে চাইছিস?

বিশ্বাস করো। ওই যে, শেষ দৃশ্যে তুমি ভলিউম চেপে, কিন্তু কী ভরাট গলায় বলো—দোলা, নেমে আয়। এই যে, আমি এখানে তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি—রাতে আমি তোমার ওই কথা স্বপ্নে শুনি। আমি অনেক উঁচু একটা টাওয়ারের মাথায় বসে থাকি। তুমি ডাক দিলে স্বপ্নের ভেতরেও আমার কী অসহ্য সুখ হয় ...

ও, তাই বল। আমার গলার আওয়াজ পেলে তোর এক ধরনের ইয়ে, মানে এক্সাইটমেন্ট হয়। তাই রোজ তোকে আমার ফোন করে কথা শোনাতে হবে। আমার ভয়েস শুনে সেক্সুয়াল প্লেজার পেতে চাস।

না, না, বিশ্বাস করো। ওই যে বলো—আমি এখানে তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি, অডিটোরিয়াম হাততালিতে ভরে যায়, তোমাকে তখন মনে হয় ...।

কী, কী মনে হয়? চুপ করে আছিস কেন, কী রে? আমাকে তখন তোর কী মনে হয়?

তোমাকে মনে হয় একটা নরম শিমুলতুলোর বালিশ, একটা পয়সা জমানোর পিগি, এক জন দমকল কর্মী, একটা টলটলে নীল জলের নদী।

ও। চলি রে। পরে দেখা হবে। মাথা থেকে ওসব ভূত তাড়া তো।

তোমার নম্বর আমি জানি। আমারটা তুমি নেবে না?

কেন, রোজ তোকে কথা শোনাতে হবে? হয় না দোলা, ও ভাবে হয় না। ক্লান্তিকর কথা শুধু।

তা হলে কী ভাবে চাও আমাকে? সত্যি কি চেয়েছ আমাকে? কথাহীন জড়পুতুলের মতো আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো বলিনি তোকে আমি চাই। এক বারও বলিনি। আমি শুধু বলেছি অসম্ভব, কেমন করে হবে। আমি বিশ্বাস করিনি তোর চাওয়া। এক রকম পাগলামি আছে তোর।

হ্যাঁ হ্যাঁ পাগলামি আছে আছে আছে।

এই এই দোলা, কোথায় যাচ্ছিস, ওই টাওয়ারে উঠিস না, হাই-টেনশন লাইন। দোলা, নেমে আয়। এই যে, আমি এখানে তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি ...

দোলা, নাটকটা কিন্তু শুধু ডায়ালগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ক্যারেকটার তোমাকে বুঝে নিতে হবে। রিহার্সাল শেষ হল, বাড়ি চলে গেলাম—ওভাবে হবে না। প্রতিটি সংলাপ তোমাকে ভাবতে হবে। ভেরিয়েশন না আনলে কিচ্ছু দাঁড়াবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাগলামি আছে আছে আছে— এখানে প্রথম দুটো 'আছে' বলে টাওয়ার ধরে ঝাঁকাবে, শেষের 'আছে' বলেই টাওয়ারের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবে। তুমি তো প্রফেশনাল, এত বার দেখাতে হবে কেন। আসলে অফিস-ক্লাবগুলোতে শো করে করে একটা টাইপ তৈরি করে ফেলেছ, ভাঙতে পারছ না। দুলাল, বাইরে গিয়ে সিগারেট খা। চা বলে আয়। শ্রাবণী, তোদের গ্রুপের সবাইকে বলে দিবি ড্রিম সিকোয়েন্সে সবার ওড়না যেন এক রকম হয়। লাস্ট শো-এ পুতুলের ওড়না একটু অফ হোয়াইট ছিল। চলবে না। বুলুদা, তুমি সিনিয়র লোক, বলতে খারাপ লাগে—ব্যাক স্টেজে গিয়ে যখন ডায়ালগ বলছ, গলা একটু তুলবে না? মাথা থেকে ও সব ভূত তাড়া তো, এটা বলার আগেই ওঠার ভঙ্গি নেবে। ডায়ালগ শেষ করে হঠাৎ তুমি উঠছ। গত দুটো শো-এ তাই করেছ। অথচ রিহার্সালের প্রথম দিন থেকে তোমাকে বলে আসছি। দেখছ তো, মিনিমাম স্টেজ প্রপ, শুধু সংলাপের ওপর নাটকটা দাঁড়িয়ে আছে।

এক্সপেরিমেন্টাল নাটক, ড্রামা উইদিন ড্রামা। বুঝছ না, তোমার আর দোলার সিকোয়েন্সগুলো কী রকম গুরুত্বপূর্ণ। চা নাও। সঞ্জয়, থার্ড সিনে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তোকে কী করতে বলা হয়েছে। সারাক্ষণ দীপার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিস। মারব এক চাঁটি। বলেছি না বেরিয়ে যাওয়ার সময় বেতের চেয়ারটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিবি।

আবার কার ফোন এল। হ্যাঁ রানা, বল। হ্যাঁ, কল শো নিচ্ছি। সে সব সামনাসামনি আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, রজতদা, সীমাবউদি একদম ফার্স্ট রো-এ ছিল। ভাল লেগেছে ওদের। না, বিবেকদের কাগজ রিভিউ করবে না। আমি জানতাম। সে অনেক ব্যাপার আছে। পরে বলব তোকে। এই, তোর রেডি? প্রথম থেকে।

আচ্ছা দাঁড়া, পাঁচ মিনিটের ব্রেক। চলো বুলুদা, বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসি। না ভাই, টিকিটের ব্যাপার আমি কিছু জানি না। ওসব প্রতুল জানে। নেহাত স্ক্রিপ্ট পড়ে ভাল লাগল, অনিরুদ্ধর কথায় রাজি হলাম। টিকিটফিকিটের কথা আমি বলতে পারব না। বুলুদা, দোলা কিন্তু লাস্ট শো-এ ফাটিয়ে দিয়েছে। তুমি দু'একটা জায়গায় একটু শেডেড হয়ে যাচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ব্যাপার বলো তো। তুষারের প্রোডাকশনে তো দুর্দান্ত করো। প্রায় একাই নামিয়ে দাও। এদের সঙ্গে কি অসুবিধা হচ্ছে কোনও। তা হলে বলো, আমি দরকার হলে শাফল করব। আজ রিহার্সালের পর একটু বসবে নাকি। না না, বাইরে নয়, আমার ওখানেই। ঠিক আছে, তুমি বেরিয়ে যাও। আমি ওই কু-ঝিক-ঝিক কম্পোজিশনটা আর এক বার দেখেনি। মিউজিক কিন্তু সায়ন্তন দারুণ করেছে। ব্যাপাক এফেক্ট এসেছে।

দোলা, কোথায় গেলি?

এই যে, আসছি মা। ডাকছ কেন?

তুই যে বললি এ বার ওরা পেমেন্ট বেশি দেবে। কোথায়, কাল রাতে আমি আর গুনে দেখিনি। সকালে দেখলাম বেশি তো নেই।

দিয়েছিল। এক্সট্রা টাকাটা আমি রেখেছি। আমার দরকার আছে। তোমাকে যা দেওয়ার, কম তো দিইনি।

তোর টাকার দরকার আছে, আমার নেই?

বাবার পেনশনের টাকা কে পাচ্ছে? কোনও দিন কিছু দিয়েছ? সব সময় হাত পেতে আছ। শুধু রিহার্সালে আসা যাওয়ার খরচ কত হয় জানো? গত মাসে শো-এর দিন দেরি হচ্ছিল বলে বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি নিয়েছি। কতগুলো কড়কড়ে টাকা এক বারে বেরিয়ে গিয়েছে।

কথা শোনাবি না। তুই কি মনে করিস তোর টাকায় বেঁচে আছি। নাকি মনে করিস তোর বাবার মতো আমিও তোকে মাথায় তুলে নাচব।

প্লিজ মা, সকালে উঠেই শুরু করো না।

আমি কোথায় শুরু করলাম। তুই তো তোর বাবার পেনশনের কথা তুললি। মানুষটা নেই। তার টাকাগুলো নিতে কি আমার ভাল লাগে। টাকাগুলো দিয়ে কী করবি দোলা? আমাকে দে না। এ বার ইলেকট্রিক বিল অনেক বেশি এসেছে।

শাড়ি-ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার কিনব, লিপস্টিক-ক্রিম কিনব, ফেশিয়াল করতে যাব। তোমার আপত্তি আছে?

হ্যাঁ, যত বুড়ি হচ্ছিস, তত সাজগোজের বাহার বাড়ছে। এ সবের পিছনে বেশি খরচ করে কী লাভ দোলা। বয়স কত হল সে হিসেব আছে?

মা, বাবা আমার জন্য একটা বালা বানিয়ে রেখেছিল, এক দিন পরতে দেবে? চুপ করে আছ কেন? তোমাকে আবার ফেরত দেব। মা, তুমি কোনও দিন বাবাকে ডিউটির সময় দেখেছ? খাকি পোশাক, মাথায় লাল হেলমেট, জলভরা লাল গাড়ি নিয়ে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

এক বার দেখেছি। আমাদের পাড়াতেই এসেছিল। বেনারসীলালের পাট গুদামে আগুন লাগল যে বার, ও দিকের আকাশটা লাল। এখান থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলাম। দমকলের ঘণ্টা শুনলেই বুকের ভেতর কেমন কেঁপে ওঠে আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ বার, মই বেয়ে তিন তলার ওপর জল ছুড়ে দিচ্ছিল, বাবা, গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটল ...

চুপ কর দোলা, চুপ কর। কেন সে কথা মনে করিয়ে দিস।

মা, আমার যে ভীষণ বাবার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, মা গো ... কত ওপরে উঠে বসে আছি, সামনে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস। নীচে তাকিয়ে দেখি আমার জন্য কেউ বসে নেই।

চুপ কর পোড়ারমুখী। নাটক করে করে মাথাটা গিয়েছে। সত্যিমিথ্যের তফাত বুঝিস নে। যা হয় না, তাকে আর কেমন করে পাবি। আয় দেখি, তোর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

মা, বালাটা সত্যি সোনার? ইমিটেশন নয় তো।

প্রতিমাসে অল্প অল্প টাকা জমিয়ে তোর কথা ভেবে ... কানের, গলারও করবে বলেছিল। দাঁড়া, বালাটা নিয়ে আসি।

থাক মা। ওটা দেখলে পরতে ইচ্ছে করবে। পরলে মনে হবে, ইস এর পাশে একটা লোহা-বাঁধানো, তার পর কত মিথ্যে স্বপ্ন পর পর পর পর ...

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুলাই ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকড়সা

বিনোদ ঘোষাল

বিশাল উঁচু সাদা ঝকঝকে বাড়িটা। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটতলা হবে। শহরটাও বিদেশের। বাড়ির সবথেকে উঁচুতলার মস্ত লম্বা একটা ঘরে অজিত একা একা বড়বড় পা ফেলে হাঁটছে। কাচের মতন ঝকঝকে পাথর বসানো মেঝে। ঘরভর্তি লাখ লাখ টাকার জিনিসপত্র ছড়ানো। মেঝের ছোঁয়ায় অজিতের পা সিরসির করছে। ঢাক পেটানোর শব্দ হচ্ছে বুকে। উহ কী আনন্দ। কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে হাতের মুঠোয় আকাশ। চাঁদটাকেও মনে হচ্ছে আরেকটু হাত বাড়ালে পেয়ে যাবে। এত কাছে ... হাত বাড়াতেও যাচ্ছিল জানালা. দিয়ে, তখনই পেটের বাঁ পাশে ক্যাঁৎ করে লাথি খেয়ে পুরো স্বপ্নটা লাট খেয়ে গেল অজিতের। লাথিটা ঝেড়েছে অজিতের পাশে ঘুমিয়ে থাকা মুনু, অজিতের ছয় বছরের ছেলে। ঘুম চটকানো মেজাজে বাঁ হাত দিয়ে মুনুর ঠ্যাংটা একঝটকায় ছুড়ে দিল অজিত। মুনু ঘুমের ঘোরেই বার দুয়েক কোঁৎ পেড়ে আবার তলিয়ে গেল। ওপাশে জয়া হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে গলে আসা ভোরের আলোয় দৃশ্যটা দেখল অজিত। ফুরুৎ করে ঠান্ডা মিষ্টি ছোট্ট একটা হাওয়া ঢুকল ঘরের ভেতর। তাতেও মন ভাল হল না। মিনিট কয়েক চাটাইয়ে এপাশ ওপাশ ভাল করে উঠে পড়ে জানলার সামনে গিয়ে বাইরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। আবার আজকের দিনটা খারাপ যাবে। সেই ছোট্টর থেকে বড়লোক হবার হেব্বি ইচ্ছে অজিতের। ওর মা সাত মাস বয়েসে মারা গেছিল ক্যানসারে। বাবা ছিল রিষড়ার একটা নামকরা মোটর কারখানার ফিটার। ইনকাম খারাপ নয়, বাপ ছেলের সংসার ছুটছিল ভালোই। হঠাৎ কারখানা কুঁজো হতে শুরু করল, দমাদম ছাঁটাই, বদলি। অজিতের বাবার তখন আটচল্লিশ চলছে। অজিতের সতেরো। বাবা বেগতিক বুঝে ভি.আর.এস. নিয়ে অজিতকে এদিক ওদিকে ঢোকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু অজিত তদ্দিনে রোজগারের সহজ রাস্তা জেনে গেছে। সিগারেটের প্যাকেটে সাট্টার নাম্বার লেখা থেকে শুরু করে পুকুর চুন্নুর ঠেকের হেল্পার। প্রায় ডেইলি পকেট চমকানো ইনকাম। বাবার দেখানো রাস্তায় হাঁটলো না ও। চোখে তখন অন্য স্বপ্ন সেঁটে গেছে। আরও মাল্লু কামাতে হবে। তারপর কলকাতা কিংবা মুম্বইতে ঝিংকাস একটা ফ্ল্যাট। প্রীতি জিন্টার মতন সুরৎ বউ। বাবা প্রচুর বুঝিয়েছিল। অজিত বোঝে নি। শেষে রেলের জি.আর.পি. বোঝাল। পকুর টিমের সঙ্গে ওয়াগান ভাঙতে গেছিল। পুলিসের টর্চ চোখে ঝাপটা মারতেই দৌড়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। রেল লাইনে পা ছড়কে সোজা খুনিয়ার গাড়ির [illegible] নিয়ে [illegible] গেল, অজিত বুঝিবুঝি

www.amarboi.com

করল, কিন্তু ছাড়া পেতেই আবার যে কে সেই। তবে একটা জিনিস অজিত বুঝে গেছিল। এই লাইন শালাহ বহুৎ খতরনাক। দুসরা লাইন ভাবতে হবে। লাইন হাতড়াতে থাকল অজিত। তারমধ্যে বাবা কোথা থেকে জয়াকে জুটিয়ে আনল। অজিত কিন্তু কিন্তু করেও শেষ পর্যন্ত না বলতে পারেনি। বেশ ঝিলকি মারা দেখতে। যাকগে এখন লাথ খাওয়া মার্কেট। আপাতত এইটাই চলুক, পরে রোকড়া চলে এলে। রোকড়া আর এল না ... বছর ঘুরতে না ঘুরতে জয়ার কোলে মুনু এসে গেল। অজিতের হাফ চুল ফর্সা। আরও কিছুদিন পর বাবা ফুটে গেল। বাবার জমানো টাকা কটা সুপারলোটো, সাট্টা আর চুন্নুর ঠেকে সাফা করে মাস কয়েকের মধ্যে হাতে হ্যারিকেন। মুনুর খিদের কান্নায় চুপচাপ জয়া মুখ খুলল। তাতে বিশেষ কাজ হল না। আরও মাল খাওয়া বেড়ে গেল অজিতের। অগত্যা জয়া একদিন নিজের পাড়াতুতো দেওরদের ডেকে এনে অজিতের সব বিষ ঝাড়িয়ে দিল। কয়েকদিন পরেই লোন করে রিক্সা কিনল অজিত। রিক্সায় স্পিড হলেও সংসারটা চলল কয়েক দিন, কিন্তু বছর ঘুরতেই পাড়ায় অটো রিক্সা চালু হয়ে যাওয়াতে আবার পেটে লাথ। ফ্যামিলি নিয়ে প্রায় বসে পড়ল অজিত। প্যাসেঞ্জার জোগাড় করতে হাড় কেলিয়ে যায়। জয়ার মুখ আবার বেড়ে গেল। ছেলেটার খিদেও যেন দিনে দিনে রাক্ষসের মতন হয়ে যাচ্ছে ... এই এতো কিছুর পরেও বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা কিছুতেই কাটছাড়া হল না অজিতের। হঠাৎহঠাৎ ও যেন দেখতে পায় বিশাল লম্বা একটা বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় সুন্দর মস্ত একটা ঘরে ও একা খালি পায়ে হাঁটছে। কাচের মতন মার্বেলের মেঝের ঠান্ডা ছোঁয়ায় সিরসির করছে পায়ের পাতা। খাবার টেবিলে দামি দামি সব খাবার রাখা। ঝকঝকে বাথরুম। একেবারে হিন্দি সিনেমায় যেমনটা দেখায়। জিভে জল চলে আসে অজিতের। স্বপ্নটা ভেঙে যায় একসময়, তালগোল পাকিয়ে যায় সব। তারপরেই মেজাজ চটকে কৎবেল। মাইরি বলছি, বিশ্বাস কর, শিবু এখন ভাল কামাচ্ছে এই লাইনে। হাতে ছ্যাঁকা খেয়ে বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল বুড়ো। অজিত অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা সাড়ে বারোটা। চাদ্দিক হিলকে দিচ্ছে। বেলুড় স্টেশন বাজারের পাশে ওদের রিক্সা স্ট্যান্ড। এই সময়টায় যে ক'জন লোক ট্রেন থেকে নামে তাদের কেউই প্রায় রিক্সা পার্টি নয়। তবু আশা নিয়ে বসেছিল অজিত। যদি লেগে যায়। খালি হাতে ঘরি ফিরলে জয়া বিশ্বাস করবে না। ভাববে সব ফুটিয়ে এসেছে। মনে মনে জয়াকে আরও গোটা চারেক খিস্তি মেরে গামছা দিয়ে ঘাম মুছল ও। বুড়ো নিজের ডান পাটা সিটের ওপর খচ খচ করে চুলকাতে চুলকাতে বলল। তুই কিন্তু আমার কথাটা মন দিয়ে শুনলি না।

— শুনলাম তো।

— তা'লে?

— তা'লে আবার কী?

— একবার দেখবি না কি?

— কত ইনকাম বললি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— বলল, ডেইলি আড়াইশ তিনশ হবে।

টাকাটা প্রথমে শোনেনি অজিত। রিক্সার সিটে কেতরে ছিল, এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বলল, সত্যি?

যা বলল ও।

এখন বাড়িতে হবে শিবু?

— থাকার তো কথা।

— এখনই যাবি?

— দেখি একবার।

পিচগলা রাস্তা চাটতে চাটতে ওর বুড়ো রিক্সাটা যখন শিবেনের বাড়ি পৌঁছাল, তখন শিবেন বৌ বাচ্চা নিয়ে আয়েশ করে টিভি দেখছে। অজিতকে দেখে বাইরে এসে বলল, কীরে তুই?

— একটু দরকার ছিল।

— আয় ভেতরে আয়।

— নাহ, বাইরেই বসি।

শিবেন ঘরের ভেতরে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা তাই বোস।

— বুড়োর কাছে তোর কথা শুনে এলাম। কথাটা বলেই অজিত আড়চোখে ঘরের ভেতরে তাকাল। ছোট ঘরটা বেশ সাজানো। বেঁটে স্টিল আলমারির মাথায় বসানো পোর্টেবল টিভিটা চলছে। বউটা ফ্যানের পাশে বসে হাঁ করে সিরিয়াল গিলছে, বেশ গায়েগতরে হয়েছে এখন, আগে চিমসানো ছিল। শিবেনের বউ এর দিকে তাকিয়ে কথা ভুলে গেছিল অজিত। শিবেন গলা খাঁকড়ে বলল, হ্যাঁ বল কী বলবি?

— ওহ হ্যাঁ তুই কোন রঙ করার কোম্পানিতে কাজে ঢুকেছিস শুনলাম।

— কেন কী নাম রে কোম্পানির?

— ইউনিয়ন পেইন্টস। কেন বলবি তো?

— একজনকে ঢুকিয়ে দিতে পারবি?

— কাকে?

— পারবি কি না বল না?

— না। আমি নিজেই গত পরশু কাজটা ছেড়ে দিলাম।

— সেকি? ... কেনরে? প্রায় আঁতকে উঠল অজিত।

— ধ্যাস শা, হ ... ও মানুষের কাজ।

— কেন? পয়সা কড়িতো ভালই দেয় শুনেছি।

— উঁহ ... ওই পয়সার গোয়া মারি ... ফুল লাইফ রিস্ক।

... কেনহ্?

— কেন আবার কি? পনেরো বিশতলা একেকটা বাড়ি। দড়িতে ঝুলেঝুলে রঙ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। ও আমার পোষাবে না। মাথা ঘোরে নীচে তাকালে।

— পনেরো বিশ তলা! ... হেব্বি মাল্লুপার্টিরা থাকে না রে?

— নয়তো কি অত্ত উঁচুতে তুই আমি থাকব? বলে একটু থেমে শিবেন বলল, কেন, তুই করবি না কি?

— না নাহ আমি না। নিজের কেসটায় বেমালুম টেপ মারে অজিত। আসলে আমার একটা বন্ধু খুব করে বলছিল।

— অ। ওকে অন্য লাইন দেখতে বল।

— কি'রম দেয় রে রোজ?

— ঠিক নেই। কাজ বুঝে। দুশ, আড়াইশ ... তিনশ ...।

— আবার বোম্বেটম্বেও নিয়ে যায় শুনেছি।

— হ্যাঁ যায়, তবে রেট একই। শুধু থাকা খাওয়াটা ফ্রি। আর যদি কখনও ওপর থেকে খসে যাস তবে বউ হাজার পঞ্চাশেক পাবে। বলে শিবেন ঘরের ভেতরে একবার চট কর উঁকি দিয়ে চাপা গলায় বলল, তা শালা আমিই ফুটে গেলে তারপর আমার বউ রাণী হোক কি রেন্ডী হোক, তাতে আমার কি এসে যায় বলত?

— হুম ঠিকই তো। যাকগে ছেলেটা খুব করে অজিতকে ধরেছে। তুই ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দে, আমি ধরিয়ে দিয়ে খালাস।

— বোস একটু। বলে শিবেন উঠে গেল। খানিক বাদে একটুকরো কাগজে খ্যাঁচা মারা হাতের লেখায় নাম ঠিকানা লিখে এনে বলল, নে আমি সব লিখে দিয়েছি। গিয়ে শুধু ম্যানেজার বিকাশ বাবুকে আমার নাম বললেই হবে।

— ঠিক আছে, বলে ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল অজিত। আরেকবার শিবেনের বউ-এর দিকে তাকাল ... নাহ সত্যি সলিড ফিগার বানিয়েছে। পেটের ভাজে জমে ওঠা ঘাম ঝিল্লি মারছে। মুনুটা হবার পর জয়ার চেহারা সেই যে দু'টাকা প্যাকেটের আমলকির মতন হয়ে গেল আর ঠিক হল না।

— ঠিক আছে, তুই তা'লে আয় এখন।

— হ্যাঁ চলি রে। বেশ জোরে বলল অজিত। শিবেনের বউ একবার ওর দিকে তাকিয়ে আবার টিভিতে মুখ গুজে দিল।

রাস্তায় রিক্সা টানতে অজিত ভাবল টেনশন মটকা জ্যাম হয়ে গেছে, পকুর ঠেকেআজ একটু প্লাসটিক মারতে হবে। প্লাসটিকের প্যাকেটে সিল করা পকুর চুল্লুর সঙ্গে দুই একসময় অজিতের হেব্বি দোস্তি ছিল। আজ অনেকদিন পর ... জয়াটা খিস্তোবে। খিস্তোক।

না ভাই কাজটা ঠিক করলে না। রিক্সা চালানো এর থেকে ঢের ভাল ছিল। ঠোঙা থেকে একখাবলা মুড়ি মুখে দিয়ে কাঁচা লঙ্কায় কামড় মেরে কালোর কথাটা মন দিয়ে শুনল অজিত। তারপর পালটা প্রশ্ন করল, কেন?

— কেন বুঝবে দু'দিন গেলে। সারাদিন দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে টেংরি টাটাবে যখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত আর কিছু না বলে মুড়িতে মন দিল। সেদিন বিকেলে গলা পর্যন্ত বাংলা খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল ঠিকই, জয়া ঘরে ঢুকতে দেয় নি। অজিতের টাল খাওয়া হাল দেখে মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। হাজার ধাক্কাধাক্কিতেও খোলেনি। অজিত রাগের চোটে সেদিনেই সোজা রেলস্টেশন। ট্রেনে চেপে হাওড়া এসে রাতটা প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে পরদিন সকালে ঠিকানা খুঁজে সোজা ইউনিয়ন পেইন্টস। ম্যানেজার বিকাশ পরাশর ফাঁকা গুঠকার প্যাকেট ভাঁজ করে দাঁত খুঁচিয়ে ফুকফুক করে সুপুরির টুকরো ফেলতে ফেলতে বলেছিলেন, রং এর কাজ করচো কখনও?

সেই কোন এককালে সমীরের প্লাস্টার ছাড়া ইটের দোকান চুনকাম করেছিল অজিত, সেইটাকেই মুঠোয় নিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

— এ কাজে পোচুর রিস্ক আছে কিন্তু।

— জানি।

— ঠিক আছে, করে দেকো।

নাম ঠিকানা খাতায় লিখে নাম সই করে ইউনিয়ন পেইন্টস এর টেম্পোরারি রঙ মিস্তিরি হয়ে গেল অজিত। বাড়িতে যে বউ বাচ্চাকে ফেলে পালিয়ে এসেছে সেটা আর জানাল না কাউকে।

বালিগঞ্জ মে ফেয়ার রোডে পুরোটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল উঁচু চারখানা বিল্ডিং এর বাইরেটা হাল্কা গোলাপী রং হচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ি বারোতলা। এত উঁচু বাড়ি। সেইই স্বপ্নের মতন। কারা এইসব বাড়িতে? দেখার জন্য রক্ত ছলছল করে ওঠে অজিতের। মোট তেরো জনের টিম। চারটের মধ্যে একটা বাড়ি এরমধ্যেই পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সেকেন্ড বাড়িটার বারোতলা থেকে রং করতে করতে এখন তিনতলায় কাজ চলছে। অজিত তিন তলায় ওঠার পারমিশন পেল।

পাগলা করে দেওয়া ঘ্যামা সাজানো বিশাল হল ঘরটার ঠিক মাঝখানে মস্ত সোফার মধ্যে হাতির মতন মোটা লোকটা বসে একা মাল খাচ্ছে। কাচের টেবিলে বেশ বড় সাইজের বোতল রাখা। তার পাশে খান পনেরো গ্লাস মালে ভর্তি। লোকটা একটা করে গ্লাস তুলছে, মালটা গলায় ঢেলেই ফাঁকা গ্লাসটা সটান ছুড়ে দিচ্ছে সামনের দেওয়ালে। টুকরো টুকরো হয়ে কাঁচ ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। কী কিম্ভুত ব্যাপার মাইরি ... এমন সিন অজিত হিন্দি সিনেমাতেও কোনওদিন দেখেনি। আরও চমকাল, পাশের ঘরেই একটা বউ, নিশ্চয়ই এই লোকটারই হবে, দু'টো বাচ্চাকে নিয়ে মৌজসে টিভি দেখছে। বরটা যে মাইরি এই ঘরে একা একা বসে লাট খাচ্ছে সেটা কোনও ব্যাপারই না। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর জলহস্তির মতন লোকটা টাল খেয়ে সোফার মধ্যেই ধড়াস হল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে দুজন সাদা ড্রেস পরা চাকর গম্ভীর হয়ে এসে বাবুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল অন্য ঘরে। আরেকটা চাকর এসে হাতে বালতি আর প্লাস্টিকের বড় চামচ মতন কী একটা দিয়ে ভাঙা কাঁচগুলো কাচিয়ে তুলতে থাকল বালতিতে। হেবিব অবাক হল অজিত। পুরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনটা এমন ভাবে ঘটল যেন রোজের কেস। জীবনে আজ প্রথম আসল বড়লোক দেখল অজিত।

দু'নম্বর বিল্ডিংটা কমপ্লিট হয়ে তিন নম্বর শুরু হয়ে বারোতলা থেকে সাততলায় আসার পর চান্স পেল অজিত। তার আগে পর্যন্ত শুধু নিচে থেকে রঙ গোলা, ছেকে কৌটোয় ভরে দেওয়া হেল্পারের কাজ। বিরক্ত লাগে অজিতের। অবশ্য অন্যান্য সব পাকা মিস্তিরিরাও বলে অজিত কাজ শিখছে খুব দ্রুত। ম্যানেজার বিকাশবাবুও, মুখে কিছু না বললেও হাবেভাবে বুজিয়ে দেন অজিতের কাজে উনি বেশ খুশি। দড়িতে ঝুলে সাততলায় উঠে দারুণ খুশির মুডে নিচে তাকাল অজিত। মানুষগুলো সব এইটুকু হয়ে গুবড়ে পোকার মতন সাইজ হয়ে গেছে।

— কী দেখছিস এত মন দিয়ে? ব্রাশ চালানো থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো কালো।

— নিচের লোকগুলোকে একবার দেখ কালোদা। হি-হি ... শালা গুবড়ে পোকার মতন লাগছে।

কালো মুচকি হেসে বলল, আবার নিচ থেকে আমাদেরকে এখন মাকড়সার মতন লাগছে জানিস?

কথাটা খুব মনপসন্দ হল না। অজিতের রংয়ের কৌটোয় ব্রাশ ডুবিয়ে একপোচ মেরেই আবার মুখ ঘুরিয়ে বলল, জানো তো কালোদা, একবার আমার ছেলের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখতে গেছিলাম। বইটার নাম ছিল স্পাইডার ... হ্যাঁ ইসপাইডারম্যান। সেই হিরোটা হল গিয়ে একটা মাকড়সা, বুঝলে। হাতের এইখানি দিয়ে না ... এই দেখ, ঠিক এইখান দিয়ে দড়ির মতো জাল ঝুড়ে এই রকম উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর টং-এ সাঁ-সাঁ উঠে যেত। হেব্বি ছিল বইটা।

কালো পুরোটা শুনল মন দিয়ে। তারপর বলল হুম, তাড়াতাড়ি হাত চালা। বাবু লাস্ট টেড দিয়ে দিয়েছেন কাজ শেষ করার।

— ঠিক আছে।

অজিত কাজে চোখ ফেরালেও মন ফেরাতে পারল না। ওই সিনেমাটা দেখার পর বেশ কয়েক রাত-দিন হারাম হয়ে এসেছিল। চোখ বন্ধ করলেই অজিত দেখতে পেত মাকড়সা ছেলেটার মুখোশ আর গায়ের ছালটা পরে অজিত নিজের হাত থেকে অমন সুরুৎ করে জাল ছুড়ে ছুড়ে তরতর করে কোনও এক বিদেশি অচেনা শহরের বিশাল উঁচু বাড়িগুলোর ওপর উঠে যাচ্ছে। রাজার মতন বুক ফুলিয়ে ঢ্যাঙা বাড়িগুলোর ছাতে হাঁটছে। ইচ্ছে মতো যে কোনও ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ওহ ... কী ফাটাফাটি সেইসব ঘর।

— ওরে এবার কাজ কর। হাতটা নাড়া।

— এ্যাহ ... হ্যাঁ। স্যাটাস্যাট কয়েকটা পোচ মেরে সামনের কাচের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর চোখ চালাল অজিত। উড়েহ্-শাহ্ এটা রান্নাঘর। ধপধপে সাদা ঘরটায় দেওয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলমারিগুলো পর্যন্ত সাদা রঙের। কয়েকশ' কাপ ডিস, থালা চামচ হাতা দারুণভাবে সাজানো। কত রকমের মেশিন। ওগুলো যে রান্নায় কী কাজে লাগে বুঝল না অজিত। ঘরের ভেতর সাদা জামাপ্যান্ট আর টুপি পরে কয়েক জন লোক ঝড়ের বেগে কাজ করছে। পুরো দামি হোটেলের মতো ব্যাপার। একটা ছেলে জিতেরই বয়েসি ঢাউস স্টিলের বেসিনে কাপডিস ধুচ্ছিল, অজিতকে বাইরে ঝুলতে দেখে ভুরু নাচাল। সুবলের সঙ্গে সঙ্গে হাতের ইশারায় ছেলেটার কাছে জল খেতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে ইশারায় উত্তর পেল, হবে না। জগা সুবলের ডানদিকে কাজ করছিল। হেসে বলল, ওদের সঙ্গে খেজুরে করতে হবে। না পাত্তা পাবি না। বড়লোকের চামচা শালারা। বোহুৎ ঘ্যাম।

এর মধ্যে একদিন রাত্রে আচমকা জয়া আর মুনুকে স্বপ্নে দেখল অজিত। তিনজনে মিলে কোথায় বেড়াতে গেছে। প্রাসাদের মতো বিশাল একটা বাড়িতে রয়েছে সবাই। হঠাৎ ওই বাড়ির মধ্যেই অজিত গেল হারিয়ে। কিছুতেই বেরনোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জয়া আর মুনু দিব্বি একটা ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে আদিখ্যেতা করছে। অজিত যে হারিয়ে গেছে তাই নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা নেই। হারামীগুলো স্বপ্নের মধ্যেও জ্বালিয়ে মারল।

কিন্তু এ রাগের মধ্যেও দু-বেলা ছাগলেরও অখাদ্য রান্না খাওয়া কিংবা মেয়েমানুষ সোহাগ করার ইচ্ছে জাগলে, কখনও মুনুর বয়েসী কোনও ছোট ছেলেকে দেখলে আচমকা মনটা বোম মেরে যায়। কিচ্ছু ভালো লাগে না তখন।

গতকাল থেকে অজিত যেদিকটায় চলে এসেছে সেখান থেকে সাততলার ফ্ল্যাটটার ভেতর অনেকটা দেখা যায়। সাদা মার্বেলের মেঝে। ফাটাফাটি দেয়ালের রং, বড় বড় ছবি টাঙানো। একেকটা ঘরে একেক রকমের আলো। ডুমগুলো এমনভাবে লুকোনো থাকে যে শুধুমাত্র আলোটা দেখা যায়। পালিশ করা কাঠের টুলের ওপর কোনও সাদা পাথরের কোথাও পিতলের মূর্তি বসানো রয়েছে। কালোদা বলেছে ওগুলো নাকি পাথর নয়, স-ব হাতির দাঁতের। ঝুল বারান্দায় আবার সবুজ ঘাস। অজিত যত দেখে তত হাঁ হয়ে যায়। বন্ধ কাঁচের জানালার ওপার থেকে ভীষণ ইচ্ছে হয় সামনের ওই মস্ত ঘরটার মেঝেতে একবার দাঁড়াতে। এ ঘর ও ঘর পায়চারি করতে। তুলতুলে গদিওলা ধুমসো চেয়ারগুলোয় বসে ইয়াব্বড় টিভিটা চালিয়ে ইচ্ছেমতো দেখতে। নাহ এরাই মাইরি আসলি মানুষের বাচ্চা। কী নেই।

পুরো দু'-দুটো দিন ধরে অজিত এদিক ওদিক চেটে খেল ফ্যামিলিটাকে। ফ্ল্যাটের বাবু রোজ সকাল দশটা নাগাদ কোট-প্যান্ট পরে অপিসে বেরোন। চাকরে জুতো মোজা পরিয়ে দেয়। আরেকজন বাবুর ওয়াটার বোতল, ব্যাগ, টিফিনবাক্স, বয়ে নিয়ে যায়। নিচে দাঁড়ানো চকচকে কালো রঙের বিদেশি গাড়ি চেপে বাবু অফিস যায়। গাড়ির ড্রাইভারটাও সাদা ড্রেস। বাবু বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বৌটা ছম্মকছল্ল ড্রেস মেরে বেরিয়ে পরে। মালকিনের গাড়ি লাল রঙের। যা দেখতে। একটা জিনিস অজিত বুঝেছে এই মিঞাবিবিতে কথা হয়ে খুব কম। যে যার নিজের তালে থাকে। লোকটা একটু চুপচাপ ধরনের। বৌটা পুরো উলটো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ রবিবার। সকাল দশটা নাগাদ ব্রাশ টানতে টানতে প্রায় সাতফুট লম্বা শ্বেতপাথর বসানো কাঠের টেবিলে এদের ফ্যামিলির সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পেল অজিত। স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে মিলে টিফিন খাচ্ছে। বৌটার ফিগার একটু ধস খাওয়া হলেও এখনও বেশ চটক আছে। গেঞ্জি আর বারমুডা পরে। ফর্সা ফর্সা পা দুটো। ইকিরে মাইরি। চাকর-বাকর নিজের ছেলের সামনে হাফ প্যান্ট পরে থাকে কেউ? ছেলেটার বয়েস মুনুর থেকে একটু বেশিই হবে। তবে বাপের মতন কালচে আর ভোতকা। ক্রিকেট খেলার ড্রেস পরে কোৎ কোৎ করে এটাওটা গিলছে। চাকরগুলো বিয়ে বাড়ির ক্যাটারিঙের কায়দায় বাবুদের খাবার দিচ্ছিল। যেমন সব খাবার, তেমনই দেবার স্টাইল। বাচ্চাটা একবস্তা খেয়ে গরমজলের বাটিতে হাত চটকে সাদা কাপড়ে হাত মুখ মুছে উঠে পড়ল। একজন চাকর হাতে ব্যাগ আর ব্যাট নিয়ে রেডি। ছেলেটা চাকরকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর ওরা দু'জনেও উঠল। আজ যেন কত্তাগিন্নীতে কথা বড্ড বেশি কম। বাবুদের খাইয়ে-দাইয়ে চাকরগুলো সব বাইরে চলে গেল। বোধহয় নিজেদের কোয়ার্টারে টিফিন করবে। কিছুক্ষণ পর বোধহয় কেউ কলিংবেল বাজাল, কারণ বউটা হামলে পড়ে নিজে গিয়ে দরজা খুলল। একটা লোক এসেছে। উড়িব্বাস কী দেখতে। যেমন লম্বা-চওড়া ফিগার তেমনই সাহেবদের মতো গায়ের রং। পুরো ইংরিজি বইয়ের হিরো। ওই লোকটার সামনে বাবুকে পুরো ফিকা লাগছে। বাবুর সামনেই বৌটা ওই লোকটার গালে চুমু দিল। শাল্লাহ ... জয়া যদি কারুকে এমন করত না ... অজিত কেলিয়ে তার ইয়ে ছেড়ে দিত। আর এই বাবু মাইরি উলটে ওই হিরোটার সঙ্গে হেসে কী সব কথা বলে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। মিনিট কয়েক বাদে অজিত নিচে তাকিয়ে দেখল বাবু গাড়ি করে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। এদিকে হিরো সোফাতে বসল পা ছড়িয়ে। এর পর কেসটা কী ঘটবে ভালো করে বোঝার আগেই হারামী বউটা নিজে এসে সাঁই করে জানলার পর্দা টেনে দিল অজিতের মুখের ওপর।

— তুই মাইরি কাজকর্ম্ম ছেড়ে সারাক্ষণ ভেতরে কী দেখিস বলত? গরিব মানুষ গরিবকে দেখ। ওইসব দেখিস না। চোখ জ্বলে যাবে।

কালোর কথা অজিত ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ঠিকই বলেছ কালোদা। আমরা মাইরি একেবারে ... ইয়ে। নিচে তাকাল অজিত। অনেক নিচে কালো সাপের মতো রাস্তায় ছোট ছোট পোকার মিছিল যাচ্ছে।

টিফিনে গোগ্রাসে রুটি-সব্জি চিবোচ্ছিল অজিত। মনের ভেতরটা খুব খচমচ করছে। বাবুর ঘরে কী চলছে কে জানে? জগা বলল, এখানের কাজ শেষ হলে কয়েকদিন ছুটি পাওয়া যাবে। তুই বাড়ি যাবি তো? অজিত অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিল, দেখি।

— দেখি কিরে! আচ্ছা সত্যি বলত, তোর কি বউ পালিয়েছে? না কি বউকে ঠিকঠাক পারিস না? অ্যাদ্দিন এখানে আছিস কোনওদিন মেয়েছেলে করার সখও তো দেখলাম না। কালো পাশ থেকে টোন কাটল, তোর আসল জিনিসটা আদৌ আছে তো? না থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিস আমরা আছি। বলেই খিক খিক করে হাসি।

— ধুর আমার ওসব ভাললাগে না। বলেই জয়ার মুখটা একবার মনে এল অজিতের। ভেতরে এত চাপা অস্বস্তি হচ্ছে। এখন যা ঘটছে ডেফিনিট বেডরুমে।

— শুধু বড়লোকদের ঘরে ঝাড়ি মারতে ভাল্লাগে নাকি রে? আমার ভালো কথা শোন, এবারে ছুটিতে বউয়ের সঙ্গে দু'-দিন গিয়ে থাক। নইলে বউকে যখন ...

অজিত তড়াক করে উঠে পরে। হাত ঝেড়ে বলে কাজে লাগি। এই জগা তুই আমার সাইডটা দেখ, আমি তোর দিকটা করছি।

— কেন রে?

— এমনই।

অজিতের মুখস্ত জগার দিকটায় বাবুদের বেডরুম। সাঁই সাঁই করে দড়ি বেয়ে সাততলায় উঠে পড়ল। বেডরুমের বড় জানালাটার পাশে গিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারতেই ... ধুসসহ শাহ ... এখানেও পর্দামারা। মেজাজটা পুরো খিচড়ে গেল। ঘরে চোখ চালানোর আর কোনও উপায় নেই জেনেও জানালার পর্দায় চোখ রেখে পাশেই রঙ তুলি নিয়ে খুঁটখাট করতে থাকল অজিত। বেশ কিছু সময় পেরোবার পর হতাশ হয়ে রঙের কৌটোয় ভালো করে ব্রাশ ডুবিয়ে টান মারতে যেতেই হাত থেমে গেল অজিতের। এতক্ষণের আন্দাজটা মিলে যাওয়া সত্ত্বেও বুকে ঝিং খেয়ে গেল। জানলার রেশমি কাপড়ের বাহারি রঙের পর্দাটা ঘরের ভেতরের হাওয়ায় কয়েক সেকেন্ডের জন্য দু'-এক আঙুল ফাঁক হতেই অজিত দেখতে পেল বাবুর বউ আর সেই হিরোকে। ঠিক যেন একটু আগে খোলস ছাড়া সাদা ধেড়ে দুটো তেলাপোকা বিশাল বিছানায় একটা আরেকটার ওপর চেপে। দু'জনেই তুমুল ডানা ঝাপটাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য চোখে ধাঁ লেগে গেল অজিতের। তারপর হুঁশ ফিরতেই চোখ মুখ কুচকে এল। পর্দা আবার কাঁচের জায়গায় সেঁটে গেছে।

ভেতরে ভেতরে হাঁফাতে শুরু করেছিল অজিত। আ-র ভাল্লাগছে না। সবাই শাল্লা গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ। মুনু আর জয়ার জন্য মনটা খুব অস্থির করছে ক'দিন ধরে। দু'টোতে মিলে এতদিন ধরে একা কেমন আছে কে জানে? ফ্ল্যাটের ভেতর চোখ চালাতেও ইদানিং আর তেমন ইন্টারেস্ট আসে না। স্রেফ আজকের দিনটার জন্য নিজের ভেতরটাকে খুঁচিয়ে শেষ একবার দপ করে জ্বলে উঠতে চাইছিল অজিত। আজ শেষ বিল্ডিংটার কাজ শুরু হবে। একেবারে বারোতলা থেকে। সবথেকে উঁচু। এতদিন পরে সেই স্বপ্নে আজ সত্যিসত্যি পৌঁছবে অজিত। মেন গেটের সিকিউরিটি গার্ড তেওয়ারিজী এখন অজিতের খাস দোস্ত। ওর কাছেই সব বাবুদের হাঁড়ির খবর শোনে অজিত। সব কিস্যা তেওয়ারির মুখস্ত। ওর কাছেই অজিত শুনেছে চার নম্বর বিল্ডিং-এর বারোতলায় থাকেন নবীন সরাফ। ওই ফ্ল্যাটগুলো সব নবীনজীর জমিতেই তৈরি হয়েছে, গোটা দেশে ওনার নাকি প্রায় দশ বারোটা বড় বড় ফ্যাক্টরি রয়েছে। নিজের পাঁচটা বিদেশি গাড়ি আর নয়জন চাকর। লোকটা না কি ইন্ডিয়ার প্রথম দশজন বড়লোকদের মধ্যে একজন। অজিত খুব উৎসাহিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করেছিল কারা থাকেন ওর সঙ্গে? তেওয়ারি কপালে হাত ঠেকিয়ে উত্তর দিয়েছিল ওহিতো নসীব ভাইয়া। ইতনা আমীর, লেকিন বাবু পুরা আকেলা। আপনা রিলেটিভ কোই নেহি হ্যায় সাথমে।

— কেন?

— আরে বাবু দেখনেমে বহুৎ হি খরাব হ্যায়। বিলকুল ভালুকে তরা তো ইসিলিয়ে বাবুকা শাদী ভি নেহি হুয়া। অব মাতা-পিতা ভি গুজর গ্যয়া তো রহেগা কৌন? বলে একটু থেমে তেওয়ারি বলেছিল পহলে তো ফিরভি কভি কভি লড়কী লোগ রাতমে আতি থি। পর অব তো ইনলোগভি সায়েদ ডরকে মারে আনা বন্ধ কর দিয়া। অ্যায়সা ভি হোসকতা হ্যায় কে বাবু খুদ মানা কর দিয়া। সায়দ অউর ইয়ে সব আচ্ছা নেহি লাগতা।

— মানে ... ওনাকে এতটাই খারাপ দেখতে কি?

তেওয়ালী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল, উপড় তো চড়োগে, অগর দিখাই মিলেগা তো দেখকে ফিন হামকো বাতানা। লেকিন হাঁ উনকা জো ঘর হ্যায় ও দেখনে কা চীজ। বাপরে ইতনা বড়িয়া ডেকরেশন শালা আকবার বাদশাভি সায়দ নেহি কর সকা। ইৎনা কড়োর. রুপেয়া বাবু ঘর সাজানেমে ডালা উনমে সায়দ দুসরা হাওড়া বীরিজ বন যাতা। হা-হা।

এত কিছু শুনে অজিতের এনার্জিটা আবার চাগিয়ে উঠেছিল। আজ সব থেকে বড়লোক দেখবে, সবচেয়ে উঁচুতে উঠবে, আকবর বাদশার মতো মহল দেখবে। ... উহহ!

দড়ির মই বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছিল অজিত। খানিকটা উঠেছিল আর নিচের দিকে তাকাচ্ছিল। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিচের মানুষগুলোর সাইজ যে একটু একটু করে ছোট হতে থাকে এইটা দারুন মজা লাগে অজিতের। একেবারে বারোতলায় উঠে আবার নিচে তাকাল। ইরি! শুধু সুড়সুড়ি পিঁপড়ের লাইন যাচ্ছে কালো টেলিফোন তারের মতো রাস্তা দিয়ে। চোখ তুলল অজিত। প্রায় হাফ কোলকাতা অজিতের ছোট ছোট চোখ দুটোর মধ্যে এঁটে গেছে। হাত-পা সিরসির করছিল আনন্দে। কৌটোয় ব্রাশ ডুবিয়ে এক-দুই পোঁচ মেরে সামনের জানলাটা দিয়ে ঘরের ভেতর চোখ চালাতে গিয়ে, যাহ কলা! জানলার কাঁচ এত অন্ধকার, এত কালো যে বাইরে থেকে কাঁচে নাক ঠেকিয়েও ভেতরের কিছু দেখাই যায় না। হেব্বি নেতিয়ে পড়ল অজিত। উঁকি দিয়ে দেখল এই দেওয়ালের সবকটা জানলারই একইরকম কাঁচ। তারমানে কিস্যু দেখা যাবে না। না বাদশা না তার মহল। মন খিচড়ে ব্রাশ চালাতে থাকল অজিত। কাজ করতে করতে হয়তো খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই অন্য দেওয়ালটার ঠিক মুখের কাছে যেতে হঠাৎ যেন গোটা শরীরে সপাটে চাবুক পড়ল। এই দেওয়ালটার মুখেই একটা ছোটমতো জানলা। জানলার সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পুরো উদোম। অজিত সরে যেতে গিয়েও পারল না। পা যেন দড়িতে আটকে গেছে। মাত্র ফুট খানেক দূরে থাকা সত্ত্বেও লোকটা যেন অজিতকে দেখতেই পাচ্ছে না! এই জানলাটার কাঁচ সাদা। জানলায় প্লাস্টিকের খড়খড়ি অনেকটা তুলে দিয়ে বহু নিচের রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। অজিত একটু সাহস নিয়ে দড়িতে ঝুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর আরও কাছে এল। প্রায় মুখোমুখি। ভালো করে দেখল মানুষটাকে কদাকার মুখওলা মুসকো কালো বেঁটে লোকটার গা ভর্তি ইয়া বড় বড় লোম। এ্যাহহ ... এই তাহলে আকবর বাদশা। বুনো মাকড়সার মতো লোমশ হাতদুটো বন্ধ কাঁচের পাল্লার ওপর ছড়িয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। ঘরটার ভেতর তাকাল অজিত। বেশ বড় মাপের আকাশি রঙের ঘর। মেঝের অর্ধেকটায় পালিশ করা কাঠ আর বাকিটায় দুধসাদা মার্বেল। একদিকে দেওয়াল জোড়া কাঠের আলমারি। আলমারির একটা পাল্লা খোলা। ওর ভেতরে থরে থরে জামা কাপড় ভাঁজ করে রাখা। অন্যদিকে মস্তবড় গোল কাঁচের আয়না ড্রেসিং টেবিল। টেবিলটার মধ্যেই গোল একটা বড় আকাশি রঙের বেসিন বসানো। তার চারপাশে কত রকমের শিশি বোতল। সেন্টফেন্ট হবে বোধহয়। আরেক কোন কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা চৌকোমতো জায়গা। ওখানে শাওয়ার বসানো। তারপাশেই মুখ ঢাকা দেওয়া পায়খানা করার প্যান। আর ঘরের ঠিক মাঝখানটায় প্রায় দেড় মানুষ লম্বা আর তিন হাত চওড়া একটা সাদা শাঁক বসানো। শাঁখটায় জলভর্তি। অজিত খুঁটিয়ে দেখে বুঝল ওটা আসলে সাদা পাথর দিয়ে তৈরি। বাবু শুয়ে চান করে ওখানে। টিভিতে মেয়েরা সাবান মেখে চান করে যেমন ...। এটা বাথরুম! স্রেফ হাগা-মোতা-চানের জন্য কত খসিয়েছে! চোখ ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকাতেই আবার ধক করে জ্বলে ওঠে অজিতের বুক। খানিকটা কখন যেন নিচ থেকে চোখ সরিয়ে অজিতের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। অবশ হয়ে থাকা মোটা কালো ঠোঁট দুটোর মাঝখান দিয়ে ঘন আটার মতো লাল সুতো হয়ে নিচ পর্যন্ত ঝুলছে। ফ্যানের হাওয়ায় ফিনফিন করে উড়ছে লোকটার গায়ের লোমগুলো। উদোম মানুষটা অজিতের দিকে তাকিয়ে থাকে, ... তাকিয়েই থাকে ... সরে যায় না। কেমন যেন তাকানোটা! ... কেমন যেন ...

কালো চিল্লে ওঠে, এই অজিত ... কীরে কী হল ... এই নেমে যাচ্ছিস কেন? আরে ... আস্তে আস্তে নাম, অত হড়বড় করিস না।

অজিত দড়ি বেয়ে হু হু করে নেমে যেতে থাকে। নিচের কয়েকটা মিস্তিরিও চিৎকার করে ওঠে, কী হলরে নামছিস কেন? ওই নামছিস কেন?

দু'দিকের হাঁকডাক শুনে মাঝখানে থেমে যায় অজিত। উঠবে না নামবে বুঝে পায় না। দড়িটা অল্প অল্প দুলতে থাকে।

আবার যুগান্তর, ১২ আগস্ট ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মভূমি

ভগীরথ মিশ্র

মণীশের অনুরোধে খুলনার ডিসি সাহেব রাজি হওয়া মাত্রই মনীশের দু-চোখে বুঝি একজোড়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় ঘটে। আর মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায় ডিম পাড়বার স্বপ্নে বিভোর একঝাঁক রুপোলি ইলিশ। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে মণীশ ফরমান জারি করে, কাল খুব ভোরে বেরোব। যারা যেতে চাও, আগেভাগে তৈরি থাকবে। দেরি হলেই কিন্তু একাই চলে যাব আমি।

সেই তখন থেকেই মণীশের মধ্যে এক ধরনের আসন্নপ্রসবা গাভীর ব্যাকুলতা দেখে বন্ধুরা মুখ টিপে হাসতে থাকে।

তমাল বলে, তুই আজই চলে যা না। সন্ধেয় প্রদ্ধেয় বেরিয়ে পড়। রাতভর পায়দলে... ভোর ভোর পৌঁছে যাবি। বলা যায় না, এই এক রাতের মধ্যে তোর জন্মভূমিটা যদি কপ্পুরের মতো উবে যায়।

অন্য দিন হলে এমন কাঁচা মশকরায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত মণীশ, কিন্তু আজ সে বুঝি উদারতার পরাকাষ্ঠা। খেপে তো উঠলই না, বরং চোখ দুটোকে ডিমালু মাছের মতো ভাবালু করে বলে, সত্যি রে, আজই চলে যেতে পারলে বেশ হত। কাল অবধি আর তর সইছে না।

আসলে মণীশের অনুরোধটার মধ্যে তার দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল। ডিসি সাহেবের বদান্যতায় এতদিন বাদে স্বপ্নটা পূরণ হতে চলেছে।

চারজনের একটি সাংস্কৃতিক দল কলকাতা থেকে খুলনায় এসেছে দিন চারেক আগে। দলে রয়েছে তমাল, তপন, মণীশ ও দীপঙ্কর। এদের মধ্যে মণীশের পৈতৃক ভিটে ছিল সাতক্ষীরা জেলারই কলাবাগান গাঁয়ে। মণীশ জন্মেছে ওই গাঁয়ে। ওখানেই কেটেছে ওর শৈশব। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোর অবধি পড়বার পর বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে এসেছে এপারে। বাবা ছিলেন ওই গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার। এপারে এসে কলকাতার শহরতলিতে থিতু হয়েছে ওরা। অন্য একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছেন বাবা। মণীশও পড়াশোনা করে চাকরি করছে। বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। কিন্তু সেই শৈশবের গ্রামটি এখনও অবধি তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে রয়েছে। সারা শৈশব-যৌবন জুড়ে জড়িয়ে রয়েছে ছেলেবেলার স্মৃতি। ছেলেবেলার সেই গ্রাম, গ্রামের রাস্তাঘাট, ফুল-ফলের বাগান, খেলার মাঠ, গ্রামের পুকুর, [illegible] কোনও কিছুকেই

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

তিলমাত্র ভুলতে পারেনি মণীশ। তাই খুলনা শহরে যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে তার সারা মন নেচে উঠেছিল। তখন থেকেই স্বপ্নটা দেখছিল। ছেলেবেলায় ছেড়ে আসা গ্রামটিতে সুযোগ পেলে একটিবারের জন্য যাবেই।

ডিসি সাহেব একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সঙ্গে দিয়েছেন গাইড হিসেবে সংস্থারই একজন কর্মী নিয়ামতকে। মণীশের অন্য বন্ধুরাও তার সফরের সাথী হয়েছে স্বেচ্ছায়।

সাতক্ষীরা শহরটা পেরিয়ে গাড়ি যখন কাঁচা রাস্তায় ঢুকল, তখন থেকেই মণীশের চোখমুখ বদলে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ মা-বিহনে থাকা বাচ্চা ছেলেটি দূরে মাকে দেখে যেমন করে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, তেমনই উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল মণীশের সারা শরীর। গাড়ির জানলা দিয়ে চারপাশের দৃশ্যাবলিকে যেন দু-চোখ দিয়ে গিলছিল সে। কিছু কিছু চেনা দৃশ্যপট, অনেকখানি অচেনা, মণীশ অবিরাম ধারাবিবরণী দিচ্ছিল নিজের থেকেই। এই রাস্তাটা পেরোলেই বামুনডিহি খাল। একটা বাঁশের সাঁকো ছিল আমাদের ছেলেবেলায়। সাঁকোটা পেরোলেই রাস্তাটা আবার ডানদিকে বেঁকেছে। সামনের দক্ষিণডিহি গাঁ। ওই গ্রাম থেকে আসতেন আমাদের জয়নাল স্যার। গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা খেলার মাঠ...।

বন্ধুরা বুঝতে পারে ছেলেবেলার সেই দৃশ্যপটটি এখনও অবধি ওর স্মৃতিতে জমাট বেঁধে রয়েছে।

একসময় মণীশের গাঁয়ে ঢুকে পড়ে গাড়ি।

ঠিক গাঁয়ে ঢোকার মুখটাতে রাস্তার বাঁদিকে একটা পাকাবাড়ি। তাই দেখে মণীশ আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, গাড়ি থামান। গাড়ি থামান।

হকচকিয়ে গাড়ি থামায় ড্রাইভার।

—এটাই আমাদের প্রাইমারি স্কুল। এই স্কুলেই আমি পড়তাম। বলতে বলতে মণীশ লাফ মেরে নেমে পড়ে। বন্ধুরাও নামে। মণীশ হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে স্কুলের দিকে।

একসঙ্গে পাঁচজন অচেনা মানুষকে স্কুলের গেট খুলে ঢুকে পড়তে দেখে শিক্ষকরা ক্লাসরুম থেকে তাকান।

মণীশ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে সটান উঠে পড়ে বারান্দায়। তাই দেখে একজন শিক্ষক বেরিয়ে আসেন ক্লাসরুম থেকে।

চেখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়ান মণীশের সামনে। মণীশের দুচোখে ঘোর। সে দুচোখ দিয়ে সারা স্কুলটাকে যেন গিলছে। শিক্ষকমশাইয়ের কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না।

নিয়ামত কিছু বলার আগেই বন্ধুদের ভেতর থেকে তমালই বলে, আসলে এর নাম মণীশ চক্রবর্তী। এই গাঁয়েই ওর জন্ম। এই স্কুলেই পড়েছে ক্লাস ফোর অবধি। ওর বাবা গুরুচরণ চক্রবর্তী ছিলেন এই স্কুলের হেডটিচার। আমরা একটা কালচারাল প্রোগ্রামে খুলনা এসেছি। ও তাই ওর জন্মভূমিটিকে দেখতে এসেছে।

ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শিক্ষকটির চোখ, আপনি গুরুচরণ স্যারের ছেলে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো তাঁরই ছাত্র ছিলাম। আমার নাম শেখ গফুরুদ্দিন। আসুন, অফিস ঘরে আসুন।

ততক্ষণে আরও একজন শিক্ষক বেরিয়ে এসেছেন। গফুরুদ্দিন সাহেব তাঁকে সংক্ষেপে বললেন, ওদের আগমনের উদ্দেশ্য। তার জবাবে ওই শিক্ষকটি মিষ্টি করে হাসেন।

ওদের নিয়ে গফুরুদ্দিন সাহেব ঢোকেন অফিস ঘরে। সেখানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বসেছিলেন। গফুরুদ্দিন তাঁর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, ইনি আমাদের স্কুলের হেডটিচার, মহঃ জালালুদ্দিন।

মণীশের পরিচয় পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জালালুদ্দিন সাহেবের চোখমুখ। সবাইকে সমাদর করে বসান। স্কুলের ডাবগাছ থেকে ডাব পাড়তে বলেন স্কুলের পিয়নকে।

মণীশের তখনও অবধি ঘোর রয়েছে দু-চোখে। বিড়বিড় করে বলে, আমাদের সময় স্কুলটা পাকাবাড়ি ছিল না।

জালালুদ্দিন সাহেব বলেন, আপনরা বাবা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। এলাকার মানুষজন ওকে খুব ভালবাসতেন।

ডাবে চুমুক দিতে মণীশ বলে, এই নারকেল গাছগুলোর চারা আমার বাবাই বসিয়ে ছিলেন। বলতে বলতে গলাটা ধরে গেল ওর।

অনেক কথা হল। এবার উঠে পড়তে হয়। কিন্তু মণীশ আবদার ধরে, সে যখন এই স্কুলে পড়ত, ওই সময়কার অ্যাডমিশন রেজিস্টারটা একবার দেখবে। জালালুদ্দিন সাহেব মৃদু হাসেন। স্কুলের পিয়নকে ডেকে বললেন, জহির, ওই ওপরের র‍্যাক থেকে রেজিস্টারগুলো নামাও তো।

জহির চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে একেবারে সিলিংয়ের কাছাকাছি কাঠের র‍্যাকে সাজানো পুরোনো রেজিস্টারগুলোকে নামিয়ে আনে।

জালালুদ্দিন সাহেব রেজিস্টারগুলোর গায়ে জমে থাকা পুরু ধুলোগুলোকে প্রথমে ঝাড়েন। তারপর মণীশের দিকে তাকিয়ে শুধোন, কোন সালে ভর্তি হয়েছিলেন?

মণীশ মনে মনে হিসেব করে বলে, ১৯৫৪-তে।

জালালুদ্দিন সাহেব রেজিস্টারগুলো থেকে খুঁজেপেতে একটা রেজিস্টার নির্বাচন করেন। তারপর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থেমে যান। রেজিস্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে একসময় বলে ওঠেন, এইতো, এইতো রয়েছে। মণীশ চক্রবর্তী। পিতা গুরুচরণ চক্রবর্তী।

মণীশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে রেজিস্টারের পাতার ওপর। ওর অন্য বন্ধুরাও ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে খাতার পাতায় মণীশের নাম-ধাম, ভর্তির তারিখ। রেজিস্টারের একেবারে শেষ কলামে প্রধানশিক্ষকের সইয়ের তলায় লেখা গুরুচরণ চক্রবর্তী।

খাতার ওপর ঝুঁকে থেকে মণীশ বিড়বিড় করে বলতে থাকে, বাবার সই, আমার বাবার সই, স্পষ্ট চিনতে পারছি।

তমালদের কাছে পুরো ঘটনাটা খুবই রোমাঞ্চকর লাগছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য রাষ্ট্রের একটি স্কুলের অ্যাডমিশন রেজিস্টারে একজন খুঁজে পেয়েছে তার নাম, তার বাবার স্বাক্ষর!

মণীশ ঝুঁকেই ছিল রেজিস্টারের ওপর। বন্ধুরা তার আবেগটাকে অনুভব করছিল, কিন্তু আর তো সময় নেই। এবার রওনা দিতে হবে মণীশের ভিটের দিকে। ওটা দেখতেই তো ওর আসা।

মণীশকে তাড়া লাগাতে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনি সময়ে তমাল দেখল একফোঁটা জল ওপর থেকে টুপ করে পড়ল রেজিস্টারের ওপর। ব্যাপারটা সবাইকে ইঙ্গিতে দেখায় তমাল।

জালালুদ্দিন সাহেব ঝটিতি খাতাটাকে সরিয়ে নেন মণীশের চোখের তলা থেকে, নইলে চোখের জলে এতকালের কালির লেখা মুছে যাবে।

বন্ধুরা মণীশকে সরিয়ে নিয়ে আসে। বলে, এবার চল। আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে খুলনাতে ফিরে যেতে হবে।

চোখের জল মুছতে মুছতে মণীশ বেরিয়ে আসে। মাস্টারমশাইদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির দিকে রওনা দেয় ওরা।

নিজের ভিটেয় পৌঁছে মণীশ একেবারে ছেলেমানুষের মতো আচরণ করতে থাকে। কোন পুকুরটিতে সে সাঁতার কাটত, কোন কাঁঠাল গাছটি তার মায়ের নিজের হাতে পোঁতা, কোনদিকটাতে ওদের গোয়াল ছিল, মূল বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় ছিল, আরও অনেক খুঁটিনাটি চিহ্ন বন্ধুদের একে একে দেখাতে থাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দেখাতে দেখাতে একসময় ওর চোখ-দুটি ভরে আসে জলে। একসময় হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে সে। আর তাই দেখে শখের ফটোগ্রাফার দীপঙ্কর ওর রোদনরত মুখটিকে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে ধরতে থাকে ক্যামেরায়।

এখন ওই ভিটেয় যারা থাকে তাঁরা খুব সদাশয় মানুষ। খুব আন্তরিক আচরণ করলেন। দুপুরে খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সব শেষে মণীশকে অনুরোধ জানালেন, একদিন মা-বাবা সবাইকে নিয়ে ঘুরে যাবেন কিন্তু। এসে সাতদিন থেকে তবে যাবেন।

২

ফেরার পথে গাড়িতে চড়েই সবাইয়ের মনে হল অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয়নি। একটু চা খেতে পারলে ভাল হয়।

গ্রামের ঠিক শেষ প্রান্তে, স্কুল থেকে সামান্য আগে কাঁচা রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট চায়ের গুমটি। তার সামনে গাঠের পাটাতন পেতে বসবার ব্যবস্থা। জনাকয় লোক তাতে বসে খোশগল্পে মজে রয়েছে। এতগুলি অচেনা মানুষকে দেখে তাঁরা দু-চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকান।

গাড়ি থামিয়ে নামে সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চা হবে?

বলা মাত্রই স্থানীয় মানুষগুলি পাটাতন খালি করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, বসেন, বসেন।

পরিচয় পর্ব শুরু হল। এরা যে ওপার বাংলা থেকে এসেছে সেটা জানতে পেরে ওঁরা সবিশেষ চমৎকৃত। তার ওপর এদের মধ্যে একজনের বাড়ি ছিল এই কলাবাগান গাঁয়ে, এটা জেনে ওঁদের কৌতূহলটা দ্বিগুণ গাঢ় হয়।

ওঁদের মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ। নাম বললেন নুর মহম্মদ, তাঁর কৌতূহলটাই সবচেয়ে বেশি। একেএকে সবাইকে নামধাম শুধোতে থাকেন। লোকটির বয়েস ষাটের ওধারে। মাথা ও দাড়ির সব চুলই পাকা। বেশ দুঃখী-দুঃখী চেহারা।

বলেন, বাবুরা সব ওপার থিক্যা আসতেছ্যান?

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় ওরা।

—কলকাতায় থাকেন?

তমাল বলে, সবাই প্রপার কলকাতায় থাকিনে। আমার বাড়ি বেহালা।

মণীশ বলে, আমার বাড়ি গড়িয়া।

দীপঙ্কর বলে, আমার বাড়ি হাবড়া।

—হাবরা? চমকে ওঠেন নুর মহম্মদ,—তাহলে তো বাঁশপুল ভালই চিনবেন।

—হ্যাঁ, বাঁশপুল তো হাবড়ারই লাগোয়া।

—তা হলে তো বাঁশপুলের জোড়ামন্দিরটা চিনবেন? মন্দিরটা ঠিকঠাক রইসে তো? মন্দিরের লাগোয়া ডাঙাটা কি অতটাই খোলামেলা রইসে এখনও? এখনও ফাগুন মাসে ঘুড়ি ওড়ানো হয় সেখানে? আর সায়েরদিঘিটা? দিঘিটা এখনও ওইরকমই রয়েছে? আর, অর গা ঘেঁইসা ওই কয়েত বেলের গাছটা?

শুনতে শুনতে দীপঙ্কর অবাক হয়ে যায়। নিজেদের এলাকাটাকে ওর চেয়ে নুর মহম্মদ বেশি চেনেন, এটাই তাকে বিস্মিত করছিল। বলে, আপনি অতসব কি করে জানলেন?

—জানুম না? ওই ডাঙার কত্তো ঘুরি উরাইসি। ওই দিঘিতে কত সাঁৎরাইসি। আর, ওই গাছের কোঁৎবেলের যা সুয়াদ, এখনও অবধি মুখে লাইগ্যা রইসে।

কথায় কথায় জানা গেল, বাঁশপুলেই নুর মহম্মদের পৈতৃক ভিটে। ওখানেই জন্মেছেন। তারপর যখন বছর বিশেক বয়স, সবকিছু এক্সচেঞ্জ করে চলে এসেছেন এপারে।

অকস্মাৎ জন্মভূমির একজন মানুষকে পেয়ে গিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন নুর মহম্মদ। কথায় কথায় চোখের কোল চিকচিকিয়ে ওঠে। বাঁশপুল এলাকার খুঁটিনাটি জায়গা, গাছগাছালি, দিঘি-পুষ্করিণী, মেলাপার্বণ নিয়ে পুছতাছ চালাতে থাকেন। ছেলেবেলার সহপাঠী বন্ধুরা কে কোথায় আছে, কেমন আছে, তাই নিয়ে জেরায় জেরায় একেবারে অস্থির করে তোলেন দীপঙ্করকে। অন্যরা যখন দেশগাঁয়ের নানান কথা নিয়ে মশগুল, নুর মহম্মদ ততক্ষণে দীপঙ্করকে সবাইয়ের থেকে আলাদা করে নিয়েছেন।

কথায় কথায় নুর মহম্মদ বললেন, এই পোরা দ্যাশে আছেটা কী? বাঁশপুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েরদিঘির মাছের যা সোয়াদ, অহন অবধি লাগিয়া রইসে মুখে, আর, বাঁশপুলের কাঁঠালের একটা কোয়া মুহে দিত তো বুঝতো, কাঁঠাল কারে কয়। অমন খোলা হাওয়া আর কোথাও আছে।

দীপঙ্কর বলে, তো সেই আম-কাঁঠাল আর খোলা হাওয়ার দেশ ছেড়ে চলে এলেন কেন?

—আইসি কী আর সাধে? বলতে বলতে নুর মহম্মদের গলাটা ধরে আসে, তখন দাঙ্গা সবে শুরু হইসে। চারপাশে কত ভয়, আতঙ্ক...। ঘটে যত, রটে তার থিকা শতগুণ। ছা-ছাওয়ালরে লিয়া রাইতে বেলায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনে। মন্টু-দিবাকররা দিনকয় রাত জাগিয়া পাহারা দিল। একসময় অরাই কইল, সময় থাকতে চইলা যাও ও-দ্যাশে। আমাদ্যার কিছুই ভাল ঠ্যাকতেসে না। আচমকা একটা সুযোগ আইল। এক্সচেঞ্জ করবার সুযোগ। চটজলদি সব কিছু চুকাইয়া দিয়া চইলা আইলাম।

বলতে বলতে নুর মহম্মদের দু-চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ে। শুকনো ধুলো তা তৎক্ষণাৎ শুষে নেয়।

নুর মহম্মদ বাঁশপুলের স্মৃতিতে ক্রমশ বিভোর হয়ে যেতে থাকেন। ঘনঘন সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে থাকেন। চোখ দুটি তাঁর বারবার ভরে যায় জলে।

এবার ফিরতে হয়। তমালরা দীপঙ্করকে তাড়া লাগাতে গিয়ে লক্ষ্য করে, তার বাম হাতের কব্জিটা শক্ত করে ধরে রয়েছেন নুর মহম্মদ।

খুব নরম গলায় দীপঙ্করকে ডাক দেয় তমাল। বলে, আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু দুটোয়। খেয়েদেয়ে তৈরি হতে সময় লাগবে। এইবেলা রওনা না দিলেই নয়। দীপঙ্করও সেটা বোঝে। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই অনুভব করে, নুর মহম্মদের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে চেপে বসেছে ওর কব্জিতে। দীপঙ্কর খুব অসহায় চোখে তাকায় তমালদের দিকে।

এতক্ষণ মণীশের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু মানুষকে দেখতে দেখতে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল দীপঙ্কর। এতক্ষণে চোখের সামনে আরও একজন উদ্বাস্তু। জন্মভূমির স্মৃতিকে গাঢ় বেদনার মতো বুকের মধ্যে পুষে রেখে মানুষটির আরও দুঃখময় প্রবাসজীবন চলছে এখানে।

দীপঙ্করের চোখের সামনে ওই মুহূর্তে জন্মভূমির কোল থেকে খসে পড়া দুজন উদ্বাস্তু মানুষ। দুজনের বুকের মধ্যেই একজোড়া বেদনার নদী বইছে।

দীপঙ্কর অনুভব করে, সেই নদী দুটোর জলের রঙ সবদিক থেকে একেবারেই এক।

আজকাল, ১২ আগস্ট ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লকার

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

মেঘ আর বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বৃদ্ধ প্রফেসার ভট্টাচার্যকে কলকাতা বেরতে হল। তবে এটা ঠিক বর্ষাকাল নয়। কিছুক্ষণ পরে আবার ঝলমলে রোদ উঠতে পারে। তাঁর বয়েস এখন প্রায় সত্তর। শরীর সুস্থ। শুধু কিডনির ট্রাবল দেখা দেয় মাঝে মাঝে। কিন্তু না বেরিয়ে উপায় নেই।

বহুকাল তিনি বিপত্নীক। ছেলেমেয়ে কেউ নেই। দীর্ঘ ফর্সা শরীর সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি যে এককালে খুব সুপুরুষ ছিলেন, তার প্রমাণ এখনও মেলে। প্রশস্ত ললাট, সোজা নাক, মুখের সামনের দাঁতগুলো এখনও অক্ষত আছে। কিন্তু সবচেয়ে একটা বড় অসুবিধে, মাঝে মাঝে তাঁর মন স্তব্ধ হয়ে যায়। কেমন যেন এক ধরনের শূন্যতাবোধ তাঁকে গ্রাস করে। তখন তিনি সব কিছু ভুলে যান।

প্রফেসার ভট্টাচার্য ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। সেটা তাঁর অন্তরের বিষয়ও। তাঁর মন চিন্তাশীল এবং এখনও জিজ্ঞাসু। অতি সম্প্রতি তাঁর শরীর অবশ্য ভালো যাচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে না। বাড়ির সব কিছুর ভার কাজের মেয়ে সুখদার ওপর। ঘরে সব সময় সব কিছু বাড়ন্ত। আসলে সুখদা নামটার সঙ্গে তার কাজের সামান্যতম কোনও মিল নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা, তাঁকে যে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেয় তা যেন কেবল এই চাকরির শর্ত হিসেবেই। অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি, সহানুভূতি, দরদ এতটুকু নেই। প্রফেসার ভট্টাচার্য সব বুঝতে পারেন, কিন্তু তিনি অসহায়। এই নিঃসঙ্গতা, এই একাকিত্ব, এই অবহেলা, দিনে দিনে তাঁকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়। অথচ তিনি দীর্ঘদিন বাঁচতে চান। তিনি জীবন-প্রিয় মানুষ।

প্রফেসার ভট্টাচার্য কলকাতার একটি নামকরা কলেজ থেকে বছর দশেক হল রিটায়ার করেছেন। চাকরিতে থাকার সময় স্থানীয় ব্যাংক ছাড়াও, কলেজের কাছের যে ব্যাংকে তিনি একাউন্ট খুলেছিলেন, সেই ব্যাংকে তাঁর একটি লকার আজও আছে। সেখানে স্ত্রীর গয়না, লাখ দুই টাকার ফি'ড ডিপোজিট পেপারস, পেনসনের কাগজপত্র, বাড়ি ও জটির দলিল, আর যৌবন বয়সের কিছু কবিতা ও ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি—অর্থাৎ তাঁর কাছে এই ধরনের মূল্যবান যা কিছু, সে সব লকার-এ রেখেছেন। আজ লকারটা খুলে দলিলগুলো বের করতে হবে। কারণ জমিগুলো বিক্রির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া কিছু টাকাও তুলতে হবে ওই ব্যাংক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সঙ্গে আরও একটা খুব জরুরি কাজ আছে। পরিচিত এবং বিখ্যাত পাবলিশার 'ধরিত্রী' প্রকাশনীর মালিক প্রবাল সরকার চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর একটি 'ম্যানাসক্রিপ্ট' সম্পর্কে। আসছে রথের সময় তিনি বইটা বের করতে চান। ম্যানাসক্রিপ্ট অবিলম্বে চাই। নইলে দেরি হয়ে যাবে। সেটাও তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই বইয়ের বিষয়টা বড় জটিল— /উপনিষদ ও মিস্টিসিজম*। যাই হোক, পোর্ট ফোলিও ব্যাগে লকারের চাবি, চেক বই আর ম্যানাসক্রিপ্টটা ঢোকালেন। কিন্তু আবার ভাবতে লাগলেন, /মিস্টিসিজম* না বলে যদি বলা হয় অতীন্দ্রিয়বাদ? না, তাতেও স্পষ্ট হয় না। প্রাচ্য দর্শনের, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনের, গোটা জগতটাই কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন বলে তাঁর মনে হয়।

এখন অতি সামান্য বৃষ্টি পড়ছে। মনে মনে তিনি আজকের প্রোগ্রামটা স্থির করে নিয়েছেন। প্রথমে যাবেন ব্যাংকে, এই একটা থেকে সোয়া একটার মধ্যে। ওটা গড়িয়াহাট অঞ্চলে। চেকটা জমা দিয়ে টোকেনটা নিয়ে লকারটা খুলবেন, দলিলপত্রগুলো বের করবেন। তারপর ক্যাশ কাউন্টার থেকে টাকাটা নেবেন। সেখান থেকে যাবেন /ধরিত্রী পাবলিকেশন*-এ। তারপর যাবেন একজন বন্ধু স্থানীয় নামকরা ডাক্তারের কাছে। বাড়িতেই তাঁর চেম্বার। সেখানে কিডনির ট্রাবলটা সম্পর্কে একটু পরামর্শ করবেন। এসব করে সাতটা নাগাদ কোনও ট্রেনে হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া রওনা হবেন। পৌঁছবেন খুব দেরি হলেও রাত সাড়ে ন'টা-দশটা।

বাড়ি ফেরার কথায় মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, মানুষের আন্তরিকতাহীন শুধু স্বার্থ-গন্ধী সম্পর্ক, এ বড় দুঃখের। হৃদয়ের স্পর্শ, ভালোবাসা, সমবেদনা, দরদ, এসব ছাড়া জীবন তো একটা মরুভূমি! তিনি আর কতদিন এই নিঃস্বতার এবং শুষ্কতার মরু প্রান্তরে কোনও পিপাসার্ত প্রাণীর মতো নিজেকে টেনে নিয়ে চলবেন!

নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে, তাঁর পরলোকগতা স্ত্রী সুচেতার স্মৃতি মনে আসে। স্বামীর সময় মতো না ফেরার জন্য তার কী উদ্বেগ, কী ব্যাকুলতা। সামান্য অসুস্থতার সময়ও তার সেবা, পাশে বসে খাওয়ানার কী আগ্রহ! এসব স্মৃতি মনে পড়লে আজও এই বয়সেও তিনি কেমন বিষণ্ণ হয়ে যান। বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব তখন কেমন অর্থহীন, শুধু কেমন যুক্তি তর্কের শুষ্ক উপাদান বলে মনে হয় তাঁর। আসলে মূল সত্য হল, জীবন এবং এই জগৎ, যা রিয়েলিটির পরিধির মধ্যেই!

এসব ভাবতে ভাবতে তিনি কখন যে স্টেশনে পৌঁছেছেন, সে খেয়ালই নেই।

টিকিটটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসলেন তিনি। শেডের নিচে যাত্রী আর হকারদের ভিড়। এখন বৃষ্টি পড়ছে না ঠিকই, তবে আকাশে ঘন মেঘ আছে। শিরিষ গাছের সবুজ পাতার ওপর সেই মেঘের ছায়ার রং। প্ল্যাটফর্মের লাল মোরাম, সবুজ দূর্বা ঘাস এখনও ভেজা। বাতাসে মেঘের শব্দ যেন মিশে আছে।

ঘড়ি দেখলেন প্রফেসার ভট্টাচার্য। ইস, এইখানে আধ ঘণ্টা চলে গেল। তা হলে যে কলকাতা পৌঁছতেই একটা হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেউলটির কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছাতে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আরও বিপদ হল হাওড়া এসে। তখন জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলেন, ছাতাটা আনা উচিত ছিল। অবশ্য অসুবিধাও অনেক। হয় ছাতা নয়, পোর্টফোলিও, দুটোর যে কোনও একটার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার যোলো আনা আশঙ্কা।

মিনিট পনেরো পরে বৃষ্টি একটু কমলো। রাস্তার জল দাঁড়িয়ে গেছে। তা না নামলে মিনিবাস আসবে না। অতএব শেষ উপায় ট্যাক্সি করে যাওয়া। কিন্তু সেখানেও বিপদ। মিটারে কেউ যাবে না। অতিরিক্ত অন্তত কুড়ি টাকা দিতে হবে। কেউ কেউ আবার আরও বেশি চায়। অথচ আজ তাঁর কাছে টাকা বেশি নেই।

মন খারাপ হয়ে গেল প্রফেসার ভট্টাচার্যর। কেমন আশ্চর্য একটা দিন। তিনি ভেবেছিলেন, বর্ষাকাল তো নয়। এ বৃষ্টি থেমে যাবে। অন্ধকার রাত্রি জীবনে শেষ কথা হতে পারে না। ভোরের রোদও জীবনের উঠোনে এসে পড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার তো কোনও চিহ্ন চোখে পড়ছে না।

এমন সময় এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবি ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন স্ট্যান্ডে। জিজ্ঞেস করলন —কাঁহা যাইয়েগা সাব?

প্রফেসার ভট্টাচার্য বললেন—গড়িয়াহাট।

— তব আইয়ে।

সর্দারজি পেছনের দরজাটা খুলে দিলেন।

প্রফেসার ভট্টাচার্য খুশি হলেন। দুনিয়ায় ভালো লোকও আছে তাহলে।

তবু বিপদ কাটছে না। রাস্তার জল দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ট্রাফিক জ্যাম। ঠিকমতো গাড়ি চালানো সর্দারজির পক্ষে অসম্ভব। তবে সর্দারজি লোকটি ভালো। এ গাড়িকে ক্রশ করে, ও গাড়িকে রং সাইড দিয়ে পেরিয়ে আসার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত গড়িয়াহাট পৌঁছল যখন তখন সোয়া একটা। যাক এখনও সময় আছে। সর্দারজিকে মিটারে ওঠা ভাড়ার চেয়ে দশ টাকা বেশি দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে বলল—ঠিক হ্যায় সাব। টাইমলি আ গিয়া।

প্রফেসার ভট্টাচার্যও খুশি হলেন। টাকা মিটিয়ে পোর্টফোলিও ব্যাগটা হাতে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন ব্যাংকের দিকে। সেখানে তখন তাঁর জন্য পৃথিবীর আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এ কী! ব্যাংকে লোকজন দেখা যাচ্ছে না! দোতলার গেট বন্ধ। কী ব্যাপার। ব্যাংকটা কি ম্যাজিকে 'ভ্যানিস' হয়ে গেল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় একটা নোটিস চোখে পড়ল—তার বাংলা অর্থ হল, এই শাখা রাসবিহারী এভিন্যুর নিম্নের এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত। আমানতকারীদের অধিকতর সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা।

প্রফেসার ভট্টাচার্য হতবাক। যাই হোক, ঠিকানাটা নোট করলেন। অন্তত জায়গাটা দেখে যাওয়া যাক। তারপর ক্লান্ত শরীরে চললেন সেই দিকে। ঘড়ি দেখলেন, এখন আড়াইটে। খুঁজে খুঁজে ব্যাংকে যখন পৌঁছলেন তখন তিনটে। গেট বন্ধ। দারোয়ান টুলের ওপর বসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেই জানায়—ব্যাংক বন্ধ হো গিয়া।

সেটা প্রফেসার ভট্টাচার্য নিজেও জানেন। হতাশায়, দুঃখে, ক্লান্তিতে, অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিডনির জায়গায় মাঝে মাঝে একটু ব্যথাও হচ্ছে। টাকা তোলার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ এখন সোয়া তিনটে। এদিকে হাতে বেশি টাকাও নেই।

ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে নেমে এলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছেন, এখন কী করা যায়। কিছু টাকা যে দরকার। উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছেন তিনি। হঠাৎ একটা টেলিফোন বুথ চোখে পড়ল। হ্যাঁ, /ধরিত্রী* প্রকাশনীর প্রবালবাবুকে একটা ফোন করে যদি বলা যায়, আপনার ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে এসেছি। হঠাৎ অসুবিধায় পড়েছি, কিছু টাকা দরকার। ঢুকলেন বুথে।

পোর্টফোলিওটা কোণের টুলের ওপর রেখে ছোট্ট পকেট ডায়েরি বের করে ধরিত্রী প্রকাশনীর নাম্বারটা ডায়েল করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য। জানা গেল, নাম্বারটা বদলে গেছে। কী দুর্ভোগ। আজকের সারা দিনটা কি এমনি করে ব্যর্থ যাবে! বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠছেন তিনি। ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে মালিকের ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আপকে পাস টেলিফোন ডাইরেশরি হ্যায়?

— হ্যাঁ জী, নয়া মিলা। লিজিয়ে। তারপর বইটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—বৈঠিয়ে জী। প্রফেসার ভট্টাচার্য ওখানে বসেই ধরিত্রী প্রকাশনীর নতুন টেলিফোন নাম্বারটা ডায়েরিতে লিখে নিয়ে আবার আগের ওই ঘরে ফিরে এসে ডায়েল করলেন।

সাড়া মিল—প্রবাল সরকার বলছি।

প্রফেসার ভট্টাচার্য বললেন—আমি এসেছি। আপনার কথা মতো ওটাও এনেছি। কিন্তু একটু যে বিপদে পড়েছি প্রবালবাবু। আমার যে সমান্য কিছু টাকা দরকার?

প্রবালবাবুর কথায় সহানুভূতি। বললেন— তাতে কী হয়েছে? আপনি তাড়াতাড়ি চলে অঅসুন। আমি চারটেয় বেরিয়ে যাব। পাবলিশারদের একটা মিটিং আছে।

প্রফেসার ভট্টাচার্য ঘড়ি দেখলেন। কলেজ স্ট্রিটে 'ধরিত্রী' প্রকাশনীতে পৌঁছাতে আর মাত্র আধঘণ্টা খানেক সময় আছে। না, দেরি করা যাবে না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বুথের মালিকের টাকা মিটিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

যাক। বাস এসে গেল। মনটা খুশি খুশি লাগছে। প্রবালবাবুর কথার মধ্যে আন্তরিকতার সুর। নানা কথা ভাবতে ভাবতে তিনি কখন যে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছে গেছেন, সে খেয়ালই নেই। এবার নামতে হবে।

নামতে গিয়ে পোর্টফোলিওটা হাত নেবেন। কিন্তু এ কী। কোথায় পোর্টফোলিওটা? নিচে পড়ে গেছে? তিনি সিট-এর নিচে এবং সামনে দেখলেন। এদিকে বাস এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। উঃ কী বিপদ। সব গেল! লকার-এর চাবি, চেক বই, ম্যানাসক্রিপ্ট। কী অবস্থা। এই বয়সেও চোখে জল আসছে তাঁর। দুর্বল পায়ে, সিট ধরে ধরে কোনওভাবে নামলেন বাস থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক এখন একটা গভীর শূন্যতাবোধ তাঁকে গ্রাস করছে। চেতনাও যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনি দাঁড়ালেন কয়েক মিনিট। ক্রমে ক্রমে স্মৃতি ফিরে আসছে। হ্যাঁ, টেলিফোন বুথ-এর কোণার দিকে রাখা টুলটার ওপর পোর্টফোলিওটা রেখেছিলেন। তা হলে?

বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অবস্থায় প্রফেসার, ভট্টাচার্যকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রবালবাবু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন— কী হয়েছে, আগে স্থির হয়ে বসুন। সব শুনব।

প্রবালবাবু বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ঠান্ডা মাথায় মানুষ। একটু পরে সব শুনে প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন— চেক বই হারিয়েছে, একাউন্ট নাম্বার দিয়ে দরখাস্ত করলে ওরা নতুন চেক বই দেবে। লকার-এর চাবিও ডুপ্লিকেট পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। অন্তত দলিলপত্র, গয়না-টয়না খোয়া যাবার কোনও আশঙ্কা নেই।

এখন শুধু ম্যানাসক্রিপ্টটা। আচ্ছা, ওটা জের' করেননি?

প্রফেসার ভট্টাচার্য বললেন— না, তবে—

— তবে কি?

— তবে ড্রাফটা আছে। ওটার থেকে ফ্রেশ কপি করেছিলাম।

প্রবালবাবু উৎসাহিত হয়ে খুশি গলায় বললেন—ওতেই হবে, ওতেই হবে। বাঁচালেন স্যার। আমি একজন ভালো প্রুফ রিডার বা এইরকম কাউকে দিয়ে প্রেস কপি করিয়ে নেব। আপনি কিছু ভাববেন না। জীবনে এসব হয়ই। যাক, আপনি চা-টা খান। স্থির হন। টাকার ব্যবস্থা হবে। ও নিয়ে ভাববেন না।

আশ্বাস পেয়ে প্রফেসার ভট্টাচার্য ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলেন। ভাবছিলেন, মিসেস থাকলে সংসার আর তাঁর জীবনের অর্ধেক ভার বইতে পারত। তিনি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতেন।

— হ্যাঁ, জী। যাইয়ে, টেলিফোন ঠিক হ্যায়।

তখন ঠিক সেইসময় সেই বুথেরই মালিক এক ভদ্রমহিলাকে দেখে বলছিলেন।

কিন্তু টেলিফোন সেরে টাকা দিতে এসে সেই ভদ্রমহিলা দেখলেন, বুথ-এর মালিক একটা পোর্টফোলিও নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। বাংলায় নাম লেখা আছে ব্যাগটার লক-টার ওপরে ছোট্ট পকেটে। কিন্তু তিনি বাংলা পড়তে পারেন না। বললেন— ম্যাডাম, আপ তো বাঙালি আছেন?

— আছি।

— তব পড়িয়ে তো, ক্যা নাম লিখা হ্যায়? বলেই পোর্টফোলিওটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলার হাতে।

ভদ্রমহিলা মনে মনে নামটা পড়লেন। একবার তাকালেন বুথ-এর মালিকের মুখের দিকে। তারপর আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ পোর্টফোলিও আপকা ক্যায়সে মিলা?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফোন করতে এসেছিলেন। তিনি যাবার সময় ফেলে গেছেন। কেউ নিয়ে চলে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি থানাতে ডিপোজিট করে দিতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রমহিলা গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন, কী আশ্চর্য ঘটনা। প্রফেসার ভট্টাচার্যের কাছে তিনি ফোর্থ ইয়ারে পড়েছেন নন্দীগ্রাম কলেজে। প্রাচ্য দর্শন পড়াতেন এবং সুন্দর পড়াতেন। দেখতেও খুব সুপুরুষ ছিলেন। তখনও অবিবাহিত। পাঁশকুড় বা মেচেদা এইরকম কোনও জায়গা থেকে কলেজে আসতেন। তারপর বোধহয় কলকাতার কোনও বড় কলেজে 'বেটার চান্স' পেয়ে চলে যান। এই অধ্যাপকের প্রতি বহু ছাত্রী আকৃষ্ট হয়েছিল। সে নিজেও কি সেই দলে ছিল না? হ্যাঁ, ছিল। বান্ধবীরা ক্ষ্যাপাত, ফিলসফির স্যার, তোর দিকে চেয়ে চেয়ে পড়ান কেন রে? আমরা কি ফ্যালনা? তার আরও মনে পড়ে, ওঁর ফেয়ারওয়েলের দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু কেন কেঁদেছিল সে নিজেও ঠিক জানে না! তবে বড় নীরব একটা দুঃখ সে অনুভব করেছিল। যে অনুভবটা তার জীবনে আর ফিরে আসেনি। অনুভবটা অশ্রুময় হলেও সুন্দর।

জীবনের তটভূমিতে তাহলে কোনও কোনও পদচিহ্ন চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে যায়! সময়ের স্রোতে তার কিছুটা যে মুছে যায় না, তা নয়। কিন্তু কোনও কোনওটা মৃত্যু পর্যন্ত অস্পষ্ট হলেও অক্ষয় হয়ে থাকে। জীবন ইতিহাস নয়। তা দর্শনের কাছাকাছি কোনও এক অজানা প্রার্থনা।

বুথের মালিক আবার জিজ্ঞেস করলেন— ম্যাডাম অ্যাড্রেস হ্যায় কি নেহি?

ভদ্রমহিলা দেখলেন পোর্টফোলিওটা চাবি দিয়ে লক করা নেই। এমনি আটকানো। খুলে ফেলতে ফাইলে আটকানো ম্যানাসক্রিপ্ট দেখা গেল। বোঝা গেল 'ধরিত্রী প্রকাশনী'র জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন এটা।

ভদ্রমহিলা বললেন— থানায় জমা দেবার দরকার নেই। এই পাবলিশারকে ফোন করলে—

—ঠিক হ্যায় ম্যাডাম। আপ মেরা টেলিফোন 'ইউস' কিজিয়ে। কোই হরজা নেহি।

প্রবালবাবুর ঘরে চা আর টোস্ট খাচ্ছিলেন প্রফেসার ভট্টাচার্য। খেতে খেতে ভাবছিলেন, সত্যি ক্ষুধার্ত ছিলেন তিনি। মাঝে খাওয়ার সময়ই তো পাননি। হঠাৎ ধরিত্রী প্রকাশনীর টেলিফোনটা বেজে উঠল। প্রবালবাবুর সাড়া দিলেন। তারপর কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে খুশি গলায় বললেন— নিন প্রফেসার ভট্টাচার্য, এক ভদ্রমহিলা সঙ্গে কথা বলতে চান।

প্রফেসার ভট্টাচার্য অবাক। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন— নামটা কি বললেন? মিনতি দাস? ও ... সেই নন্দীগ্রাম কলেজে? ক্লাসে ফার্স্ট হতেন? কম্বিনেশন ছিল হিস্ট্রি, ফিলসফি? অনার্স ছিল হিস্ট্রিতে। আচ্ছা, আচ্ছা। ... হ্যাঁ, ছাত্রী ছিলে যখন 'তুমি' বলতেই পারি। যাক, পোর্টফোলিও সব ঠিক আছে? ... ঠিকই বুথের মালিক খুব ভদ্রলোক। তা, তুমি কোথায় থাকো? ... সেকি ফ্ল্যাট কিনেছ? সাদার্ন এভিন্যুতে? তুমি কোন কলেজে অধ্যাপনা করতে? আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা? পার্কটার পশ্চিমে, বাড়িটার নাম— 'লেক ভিউ'? ফ্ল্যাট বাড়ি? নিচে নাম লেখা লেটার বক্সে? দোতলার ছ'নম্বর ফ্ল্যাটে? দেখ, জীবনে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তোমাকে আর আসতে হবে না এ্যাদ্দুরে। প্রবালবাবুর গাড়িতেই যাব। উনি বলছেন যখন। না না, কষ্ট হবে না।

রিসিভার রেখে প্রফেসার ভট্টাচার্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অফিসের একটি লোক একটি খামে করে এক হাজার টাকা দিয়ে রসিদে স্বাক্ষর করিয়ে নিল।

মিনতির ফ্ল্যাটের দক্ষিণমুখী ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে বসে বসে প্রফেসার ভট্টাচার্য আজকের ঘটনাবলির কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, তাঁর স্ত্রী সুচেতা যখন বেঁচে ছিল, সে বহু বছর আগেকার কথা, তখন এই রকম পরিবেশ অনুভব করতেন। কলেজ থেকে ফেরার আগে পরিষ্কার পায়জামা ও গেঞ্জি বাথরুমে সাজানো থাকত। স্নান করে এসে তিনি টিফিন করতেন। আশ্চর্য, মিনতিও সেই রকম টিফিন করেছে— লুচি, বেগুনভাজা আর দুটো সন্দেশ। এমন পরিবেশের জীবনের লোভে, 'ওল্ড এজ হোম'-এ যাবার চিন্তা করতেও প্রস্তুত নন তিনি।

এক সময় মিনতি এসে জিজ্ঞেস করল— 'রাত্রে কী খান? ভাত না রুটি?

— যা তোমার খুশি। তুমি তো বাড়ি ফিরে যেতে দিলে না। তা, ঠিকই করেছ। আমি সত্যি আজ ভীষণ ক্লান্ত। তুমি বসবে না? তোমার কথা শুনি?

মিনতি একটু হেসে বলল— বসব। রান্না ঘরে একটু কাজ আছে। আপনি ততক্ষণে বিশ্রাম নিন। ওঘরে বিছানা পেতে এসেছি।

প্রফেসার ভট্টাচার্য জানিয়ে রাখতে হল, তিনি অল্পাহারী। কাজেই রান্নার বিশেষ আয়োজনের কোনও দরকার নেই। বললেন— শোনো মিনতি, আমি কিন্তু নিরামিশাষীও।

মিনতি অবাক। একটু হেসে বলল— আমিও। কিন্তু কী করে মিলে গেল ব্যাপারটা?

মিনতি রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে মোড়া নিয়ে ব্যালকনিতে বসতে বসতে বলল— ম্যানাসক্রিপ্ট দেখলাম। বইটি স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছেন। উনি কবে মারা গেছেন?

প্রফেসার ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেন, মিনতি অতি বুদ্ধিমতী। বললেন— প্রায় পনেরো বছর।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বোধহয় বিয়েই করোনি। কেন?

মিনতি একটু হেসে বলল—আমিও জানি না। আমাদের অনেক কিছু জানার মধ্যে, অনেক কিছু ঘটে যায়।

— হ্যাঁ, তা ঘটে, এবং ঘটে বলেই জীবন আজও একটা বিস্ময় হয়ে আছে। কিন্তু জানো? জীবন এত বিস্ময় সব সময় সহ্য করতে পারে না। এই যেমন, আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। আমি কি কখনও জানতাম, এই বৃদ্ধ বয়সে এত নিঃসঙ্গতা, এত একাকিত্ব, আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। জীবন একটা 'রিয়েলিটি' তার বাস্তব চাহিদাও খুব কম নয়। কাজের মেয়ের হাতে খাওয়া-দাওয়া, তার লোভ, তার অপরিচ্ছন্নতা সহ্যের বাইরে চলে গেছে। তবু মেনে নিতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষের নিজের মৃত্যু কামনা ছাড়া আর কোনও বিশেষ কামনা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনতি কেন যেন হঠাৎ উঠে চলে গেল। প্রফেসার ভট্টাচার্য চুপ করে বসে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, মানুষের জীবনে কতটুকু চাহিদা? তাঁর জমিজমা বাড়িঘর নিতে চায় প্রোমোটার। এতদিন ভাবেননি। এবার রাজি হয়ে যাবেন। এখন তাঁর যা চাই তা হলো নিরাপত্তা। কারও লায়েবিলিটি না হয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া। এই যেমন যা কিছু মূল্যবান জিনিস নিরাপদ লকারে রেখেছেন ... কিন্তু জীবন তো সবচেয়ে মূল্যবান তাই না? মিনতির মধ্যে রয়েছে শান্ত মর্যাদাবোধ, ফলবান বৃক্ষের মতো এক পবিত্র পরিপূর্ণতা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সুন্দর দুটি চোখে যৌবনের অতল স্মৃতি ভগ্নাবশেষে। দীর্ঘ গ্রীবায় একটি সরু সোনার হার। শরীর এখনও সাবলীল। নিটোল হাতের দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন আঙুলে স্নেহের মাধুর্য। সব কিছু মিলে তিনি কোথায় যেন এক ধরনের ভালোবাসার নিঃশব্দ নিমন্ত্রণ অনুভব করছেন এবং তা এই বয়সেও। যা ভাবতে লজ্জা হয়।

বুলেভার্ডে গাছগুলোর ওপর জ্যোৎস্না। ট্রাফিক কমে আসছে। শুধু মাঝে মাঝে বজবজের ট্রেনের শব্দ আসে। সে শব্দ থেমে গেলে আবার সব নীরব।

বর্তমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুড়িঘন্ট

মানব চক্রবর্তী

পাশের বাড়ির বাগানে গোল একটা প্লাস্টিকের টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। সন্ধে লাগতেই তমাল এগুলো সাজিয়ে রাখে। তার পর বাগানের বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। বেশ লাগে। পরিষ্কার বাগানের এক পাশে একটা গোল টেবিল তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। এর পর আর একটু সময় গড়ালে তমাল পাজামা পাঞ্জাবি পরে ফুলবাবুটি সেজে একটা চেয়ারে বসে। ওর বউ আসে। বসে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তারাও এসে বসে। কাজের মহিলা চা দিয়ে যায়। ওরা চা খায়। গল্প করে। হাসে। নিচু স্বরে কথা কয়।

একটু পরেই মেয়েটা উঠে যায়। বোধ হয় পড়তে গেল। তার পর ছেলেটাও। সেও বোধ হয় পড়তে বা টিভি দেখতে গেল। তমাল আর তার বউ মুখোমুখি বসে থাকে। চৈত্রের শুরু হলেও এ বারে গরম তেমন পড়েনি। বেশ সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। আলোর মধ্যে চারটে চেয়ার। একটা টেবিল। সব ক'টা সাদা রঙের। আপাতত দু'জন মানুষ। বেশ লাগে দেখতে।

পাশের বাড়ির রতন তার পেয়ারা গাছটার আড়ালে বসে সন্ধে থেকে এই সব দেখে। তার সময়টা বেশ কেটে যায়। তারও বাগানে অনেকটা জায়গা আছে। আসলে রেলের কোয়ার্টার্স তো, বাড়ির সঙ্গে একটুকরো বাগানের জায়গা ফ্রি। যে পার ফসল ফলাও। ফুল ফোটাও। সব্জি লাগাও। অনেকে বাগানের পিছনে বাড়তি জলের কল বসিয়ে নিয়েছে। লম্বা সরু পাইপ লাগিয়ে বাগানের গাছে সকাল সন্ধ্যা জল দেয়।

রতনের বাগান তেমন নয়। বলা ভাল এক অর্থে সেটা কোনও বাগানই নয়। এক কালে সে একটা পেয়ারা গাছ লাগিয়েছিল, পুজোর ফুলের জন্যই দুটো জবা গাছ, ব্যস। আর একটা বড় ঝাঁকড়া কুলগাছ আছে। সেটা বহু দিনকার। রতন এই আবাসে আসার আগে থেকেই আছে। কুলগাছে প্রচুর কুল হয়। সকালে গাছের তলায় পাকা কুল পড়ে থাকে। অত কুল দিয়ে সে কী করবে? আচার তো আর শুধু কুলে হয় না। তেল চাই, মশলা চাই, বয়াম চাই। রতনের বউয়ের অত সময় কোথায়! অসীমা স্থানীয় হাসপাতালের নার্স। খুব দায়িত্বের কাজ। ফলে রতনই কুল কুড়িয়ে, রোদে শুকিয়ে, একে তাকে শুধিয়ে কুলের আচারে আর কী কী মশলা লাগে, সেটা জেনে নিয়ে অল্প কিছুটা আচার বানায়। রতনের হাতে আচার খেয়ে পাঠক এক অভীন্দ্র [illegible] থেকে আচার কিনে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

আনলেই তো হয়। অত হ্যাপা বইবার কী দরকার? সেখানে কত রকমের ভাল ভাল আচার পাওয়া যায়।

পেয়ারা গাছে ফুল এসেছে। সাদা গোল ফুল। রতন সেখানে বসে দেখতে পায় তমালের বাড়ির গেটে সামনে একটা ঝকছকে চেরি রঙের গাড়ি এসে থামে। তমাল দ্রুত উঠে যায়। গাড়ির দরজা খুলতেই দুই কিশোর কিশোরী, ঝলমলে পোশাকে 'মণিদি মণিদি ... অপুদা' বলেই ছুটে যায় সোজা ঘরে। তমালের ছেলেমেয়ের ডাক নাম বোধ হয় অপু আর মণি। ওদের কলরোলে ঝকঝকে আলো জ্বালা বাগানসমেত বাড়িটা যেন হেসে ওঠে।

রতন দেখে তার পরই ধীর পায়ে নেমে আসে দু'জন। অবশ্যই স্বামী স্ত্রী। যে ভাবে গায়ে গা ঠেকিয়ে যাচ্ছে, তাতে স্বামী স্ত্রী হওয়াই স্বাভাবিক।

এ বারে ফের চারটে সাদা চেয়ার পূর্ণ হয়।

অন্ধকারে রতনের পায়ে মশা কামড়ায়। সে পরনের লুঙ্গিটা আর একটু নামিয়ে পায়ের পাতা ঢাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু এত মশার উৎপাত যে বলার নয়। আসলে পেয়ারা গাছের পাতা, কুলগাছের পাতা, বড় বড় ঘাস সব মিলে বাগানটা বড্ড অপরিষ্কার। মাঝে আবার ছোট ছোট জংলা ঝোপও আছে কিছু।

ফলে মশার কামড় খেয়েও রতন বসে থাকে। অন্ধকারে বসে আলোর মাঝে মানুষ দেখতে বেশ লাগে।

তমালের কাজের মহিলা এ বারে ফের আসে। হাতে প্লেট। স্বাভাবিক। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন। ঘরে এলে সবাই মিষ্টি নোনতা দিয়ে আপ্যায়ন করে। তার পর চা।

ওদের আলোচনা বেশ শোনা যায়। আগন্তুক ভদ্রমহিলা বলে, এ বারে তোমরা একটা গাড়ি কেনো। মোটর বাইকে আর কত দিন। চার জনে একসঙ্গে ঘুরবে বেড়াবে।

তমালের বউ জবাব দেয়, কিনে তো ফেলতাম কবেই, তবে আমার ওই যে শখ, এক বারই তো কিনব, একটু দামি গাড়ি কিনব।

—তাই বুঝি। বেশ বেশ ... খুব ভাল ... তা কী গাড়ি?

—স্যুইফ্‌ট ডিজায়ার ... ভীষণ পছন্দ আমার। কথাটা শেষ করে তমালের বউ মিষ্টি শব্দে হাসে। তার পর ফের বলে, আমরা তো গত সপ্তাহেই বুক করে এসেছি। কিন্তু ওই মডেলটার এত ডিমান্ড যে কমপক্ষে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে ...

তমালের বন্ধু ওর পিঠে বন্ধুত্বপূর্ণ চাপড় মেরে বলে, বাপ রে তলে তলে এত, কিছুই বলিসনি যে ... তবে একটা পার্টি দে ...

তমাল হেসে বলে, হবে হবে ... আগে গাড়িটা ঘরে ঢুকুক ...

তমালের বন্ধুপত্নী সুরেলা গলায় হেসে বলে, আমার তো মাটন বিরিয়ানি খাইয়েছিলাম, তোমাদের তার চেয়েও ভাল কিছু অ্যারেঞ্জ করতে হবে ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কেন?

— বাঃ রে, তোমাদের গাড়ি দামি গাড়ি, আমাদের চেয়ে ...

কথাটায় তমালের বউ মনে হয় খুব প্রীত হয়, সে খিলখিল শব্দে হাসতে থাকে, তার পর এক সময় হাত তুলে অভয় মুদ্রায় বলে, হবে, নিশ্চয়ই হবে, ভাল করেই হবে ...

রতনেরও খুব আনন্দ হয়। সত্যি তো, মানুষের স্বপ্ন সফল হলে তখন গলার স্বর ঝর্না জলের মতো হয়ে যায়, হাসিতে নিবিড় আন্তরিকতা। সে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘহীন আকাশে কত তারা। ঘাড় উঁচু করে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না রতন। ব্যথা হয়। কে জানে স্পন্ডিলাইসিস হচ্ছে কিনা! বয়েস তো আর কম হল না।

খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব সেরে তমালের বাড়ির অতিথিরা চলে যায়। তমালের বউ ঘরে ঢোকে। ওদের কাজের লোক রান্না করলেও একটু তো সামনে দাঁড়াতে হয়, তেলটা, মশলাটা এগিয়ে দিতে হয়, নির্দেশ দিতে হয়, এমনি এমনি কি পদ স্বাদু হয়? আলোকিত রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় তমালের বউ হাত নেড়ে কী যেন বলছে।

তমাল সিগারেট ধরায়। তার সামনে পাশে তিনটে সাদা চেয়ার। ফাঁকা। সিগারেটের গন্ধটা ভেসে আসে। রতনের ধোঁয়া তেষ্টা জেগে ওঠে। সে একটা বিড়ি বার করে। পেটটা একটু টেপে। কিন্তু ধরায় না। নিজের ঘরের দিকে তাকায়। তারপর নিঃশব্দে চৌকাঠ অবধি হেঁটে আসে। দেখতে পায় টিভি বন্ধ করে অসীমা এ বার হারমোনিয়ামের সামনে বসেছে। যাক, ঘন্টা দুয়েক সে নিশ্চিন্ত। প্রথমে রেওয়াজ সারবে অসীমা। তার পর তোলা গানগুলো গাইবে। খুব ভাল গলা অসীমার। কিন্তু হাসপাতালের কাজ আর মেয়েকে পড়ানো—এই দুইয়ের জাঁতাকলে গানের পাট উঠতে বসেছিল।

ভাগ্যি ভাল ওঠেনি। অনেক বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও বছর দুয়েকের নিরলস চেষ্টায় সে ফিরে পেয়েছে গলা, সুরতালের স্বাচ্ছন্দ্য। গান নিয়ে দিব্যি আছে সে। নিজে বলেও সে কথা, গানের মধ্যে ডুবে গেলে আমার কোনও একাকিত্ব নেই।

নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরায় রতন। দেশলাইয়ের আলোয় দেখতে পায় পেয়ারার সাদা ফুলে ভ্রমরের গুনগুন। এক ফুল থেকে উড়ে অন্য ফুলে। এ ভাবেই তো নাকি পরাগমিলন ঘটে।

একটা মোটরবাইক দ্রুত গতিতে এসে থামে তমালের বাড়ির সামনে। গেট থেকেই ডাক দেয়, তমালদা ...

অত জোরে ডাকার কী আছে শুনি। তমাল তো বাগানের চেয়ারে। রতন ভাবে জরুরি প্রয়োজন থাকলে মানুষের গলা নিজের অজান্তেই চড়া হয়।

— দু'বোতল বি-গ্রুপের ব্লাড লাগবে। ট্রাকশান মোটরের বিশুর বউ হাসপাতালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর্তি ... ইমিডিয়েট দরকার ...

তমাল হেসে বলে, পজিটিভ না নেগেটিভ গ্রুপ?

— পজিটিভ

— ওটা আবার কোনও ব্যাপার নাকি। আমি 'পুনর্জন্ম' ভবনে ফোন করে দিচ্ছি, ওখানে বাবু আছে। ও জোগাড় করে দেবে।

— পাব তো?

— ওহ ... গিয়েই দেখ না। কথা শেষ করেই তমাল মোবাইল টিপে ফোন করে।

দু'মিনিট কথা হয়। প্রবলেম সলভড। হেসে বলে, যাও বাবু ওদের রেজিস্টার দেখে দু'জন লোককে ডাকিয়ে রাখছে।

— থ্যাঙ্ক ইউ তমালদা ...

— এতে আবার ধন্যবাদের কী আছে। মানুষের জন্য কাজ। তা আমার মেয়ের ফিজিক্সের মাস্টারের ব্যাপারটা কী হল?

আগন্তুক ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক করে ফেলেছি। সব্যসাচী মুখার্জি। দুর্দান্ত ফিজিক্স পড়ায়। কিন্তু কিছুতেই প্রাইভেট টিউশনি করবে না। অনেক অনুরোধ করে তবে রাজি করিয়েছি। তিন দিনের ছুটিতে সব্যদা বাড়ি গিয়েছে, জয়েন করলেই আপনাকে ফোনে সরাসরি কথা বলিয়ে দেব ...

যেমন স্পিডে এসেছিল তেমন স্পিডে চলে যায় ছেলেটা।

অন্ধকারে বসে বিড়ি টানতে টানতে রতন ভ্রমরের গুনগুন শুনতে পায়। জানলার ফাঁক দিয়ে অসীমার সুরেলা গান ভেসে আসে 'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ ...'

রতনের নজরে পড়ে বাগানের চেয়ার থেকে উঠে যাচ্ছে তমাল। যেখানে বসে রতন গানটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তাতে তমালেরও শোনার কথা। এত ভাল গান এত সুরেলা গলা, তমাল উঠে গেল! পরক্ষণেই রতনের মনে হয়, ছিঃ, কী অন্যায্য ভাবনায় সে ডুবে আছে। হয়তো তমালের কানে সত্যিই পৌঁছয়নি ওই গান। বা তার কোনও কাজ মনে পড়েছে। সন্ধে থেকে বসে আছে এক বারও কি উঠবে না? সেটা হয় নাকি। মানুষের তো কত প্রয়োজন থাকে।

গানের আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে যায় রতনের। তাতে মনে হয় দৃষ্টির পরিধি বেড়ে যায়। অন্ধকারে শুকনো পাতায় খসখস শব্দ হয়। বেড়ার ধারে একটা করবী ফুলের গাছ। সে দিক থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে। তার ওপারে তমালের আলোকিত বাগান। চারটে চেয়ার একটা টেবিল ফাঁকা।

কিন্তু ও বেশিক্ষণ ফাঁকা থাকার বস্তু নয়। ফের তমালের লোহার গেট খোলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ হয়। রতন ঘাড় তুলে দেখে খগেন কর্মকার। সে ডোর বেল টিপতেই তমাল বেরিয়ে আসে—কী ব্যাপার খগেনদা?

— এই এলাম আর কী। পাড়ায় তেমন একটা লোক পাইনে, যেখানে বসে দুটো গল্প করা যায়। শুধু তুমি ছাড়া।

খুশি হয়ে তমাল বলে, বসুন ... বসুন ...

ওদের গল্প শুরু হয়। স্পেকট্রাম কেলেংকারি, বিধানসভার ভোটযুদ্ধ, আই পি এল, আন্না হাজারে সব জায়গায় ওরা ঘোরে। অক্লান্ত সে ভ্রমণ। রাগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আশা-হতাশার শেষে কুঞ্জভঙ্গ।

রতনের কানে কিছু আসে। কিছু আসে না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার বাড়ি কেউ আসে না। হায়। আর পাশের বাড়ির চেয়ার খালি থাকে না। ওরা কত বিস্তৃত। সে কত সীমিত। ছোট্টর ছোট্ট সে একটা বিন্দুতে লীন।

রতনের 'ছোট-বাইরে' পায়। সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু দু'পা গিয়েই মনে হয় তাকে ভেতরের বাথরুমে যেতে হলে অসীমাকে উঠে দরজাটা খুলতে হবে। তা কী করে সম্ভব? অসীমা নতুন গান ধরেছে— 'আকাশ আমায় ভরল আলোয় আকাশ আমি ভরব গানে ...' এ সময় তার মগ্নতা ভঙ্গ করা অপরাধ। রতনের মন বহু দূরে চলে যায়। সে স্পন্দনহীন বসে থাকে। বসেই থাকে। তার সব প্রয়োজন থেমে গিয়েছে। এ বারে তমালের বাগানের বাতি নেভে। পাকাপাকি। আজ রাতের জন্য। চেয়ার-টেবিল উঠে যায়।

খেয়েদেয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় রতন শুয়ে পড়ে। লো-ভলিউমে অসীমা তখন টিভি দেখে। দু'জনের দুটো ঘর। মাঝে ড্রইংরুম। শুয়ে শুয়ে রতন অসীমার 'আলোয় ভরা আকাশ'-এর সন্ধান পেতে চেষ্টা করে। তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন কত রাত কে জানে। অসীমার হাসি আর কথায় ঘুম ভেঙে যায়।

রতন কান খাড়া করে শোনে। মাথার পাশে রাখা মোবাইল টিপে সময় দেখে। রাত তিনটে। তখনই ফের কানে আসে 'মুড়িঘন্ট' শব্দটা। অসীমা হাসছে। হো হো করে। মোবাইলে বলছে, কী বললি? পাঠাতে ইচ্ছে করছে? ফের হাসি।

রতন টের পায় অসীমার আকাশ আলোয় ভরে উঠেছে। মোবাইল বন্ধ করে কিছুক্ষণ পরেই অসীমা রতনের ঘরে ঢোকে—শুনছ, ঘুমিয়ে পড়েছ?

— না, ঘুম ভেঙে গিয়েছে ... তোমার কথা শুনছিলাম।

— পাগল মেয়ে। মুড়িঘন্ট রান্না করেছে। খেয়েছে, বন্ধুদেরও খাইয়েছে। সবাই বলেছে নাকি দারুণ হয়েছে। পম্পি ফোন করেছিল হার্টফোর্ডশায়ার থেকে, বলেছে, তোমাকে পাঠাতে খুব ইচ্ছে করছে মা ... যা ডিলিশাস হয়েছে না!

রতন হেসে বলে, মুড়িঘন্ট রান্না কী সোজা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে অসীমা। এক সময় ভারী গলায় বলে, লন্ডন যাওয়ার আগে হাত ধরে চা বানানো, ওমলেট করা শিখিয়েছিলাম। সে এখন মুড়িঘন্ট রেঁধে খাচ্ছে। খাওয়াচ্ছে।

অসীমা খিলখিল করে হেসে ওঠে, তারপর হাসতে হাসতেই মাঝের দরজা বন্ধ করে। রতন স্পষ্ট শুনতে পায় অসীমার গুনগুন—আকাশ আমায় ভরল আলোয়...

গোটা ঘরটা এখন অন্ধকার। কিন্তু তার মধ্যেও একটা আলো আছে। আছেই। সেটা যে যে ভাবে দেখে। যেমন অসীমা দেখছে রতন দেখছে মুড়িঘন্টের আলো এক মহাদেশ ছাড়িয়ে অন্য মহাদেশের দুরবর্তী প্রত্যন্ত এক শহরের অন্ধকার আকাশ আলো করে রেখেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মে ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্খার শরীর

মণিশঙ্কর দেবনাথ

পারিধীর কানে মোবাইল গোঁজা, চোখ মেট্রোর প্ল্যাটফর্মে। যাকে সে খুঁজছে, তার দেখা পাচ্ছে না। আশ্চর্য! কী বিভ্রমই না হয়েছিল সেদিন, তাড়াহুড়োয় তার নতুন মোবাইলের নম্বরটা নেওয়া হয়নি। বাড়ি কিংবা অফিসের ঠিকানাটাও জানে না সে। এখন ভাবছে, টেলিপ্যাথি করে যদি তার দেখা পাওয়া যায়! এই মেট্রো রেলেই যেতে যেতে দেখেছিল তাকে। চেহারাটা বেশ। মাথা ভর্তি মিশকালো চুল। শরীরটা পুরুষালি, হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করে টরে। আসলে আলাপ করে জেনেছিল টিভি সিরিয়াল তো দূরে থাক, এফএমের ডিস্ক জকির নামই শোনে নি সে। রেডিও, টিভির সঙ্গে সম্পর্ক কোনওকালেই ছিল না। একসময় ফুটবল খেলতো। এখন সারাদিনই কম্পিউটার নিয়ে পড়ে আছে। বিদেশ টিদেশে যাবে কোনওদিন। এত সুন্দর কথা বলে, ভালো না লেগে যায় না। কোনও কায়দা কেতা নেই। কথায় কথায় অহঙ্কারী যুবকের মতো কাঁধ শ্রাগ করে ওঠে না। পুরুষ এত শ্লীল হতে পারে, পারিধীর কোনও ধারণাই ছিল না।

পারিধী যেন এমন একজনকেই এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বলা যায়, এই সেই কাঙ্খিত পুরুষ, যার জন্য কয়েকটা জীবন অপেক্ষা করা যায়। সেদিন ইচ্ছে হচ্ছিল একটার পর একটা ট্রেন মিস করে তার সঙ্গে গল্পে গল্পে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু খুব তাড়া ছিল তার। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। এমন একটা উশখুশ ভাব, যেন একটা ট্রেন মিস করলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে তার। অথচ, পারিধী সেদিন ভাবছিল মাঝেমাঝেই তো যান্ত্রিক গোলযোগ হয় মেট্রোয়। জীবন সম্পর্কে হতাশ কেউ জীবন শেষ করে দিতে মেট্রোয় গলা দিতে গিয়ে বেজায় ঝামেলা করে ফেলে। এমন ঘটনা ঘটলে ঘণ্টা খানেক সময় পেয়ে যেতো। তারপরই মনে হয়েছিল, না, কেউ আত্মহত্যা করুক, এটা নেতিবাচক একটা ব্যাপার। কারও সর্বনাশ ঘটিয়ে নিজের আনন্দ উপভোগ করা অন্যায়। যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটুক, তাহলেও মনোস্কামনা সিদ্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু কোনও গোলযোগ ঘটেনি। ট্রেন এসেছিল কিছু পরেই। ওই তাড়াহুড়োয় তার নতুন মোবাইলের নম্বরটা চেয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল পারিধী। এখন তাই মনে মনে পস্তাচ্ছে। নিজের মোবাইলটার দিকে তাকিয়ে তার অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল। কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা মন ভেঙে যাওয়া। মনে মনে ঠোঁট কামড়ায় সে। ইচ্ছে হচ্ছিল মোবাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভেঙে গুড়িয়ে ধুলোয় মিশে যাক হতচ্ছাড়া যন্ত্রটা। অপেক্ষমাণ দুনিয়ার পাঠকদের হতাশ করে মড়িয়ে মিলিয়ে দিক সেটা।

AMARBOI.COM

~ www.amarboi.com ~

বারোটা দশে দুটো ট্রেন পাস করে গেল। আজ বেশ গরম পড়েছে। বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠের দিকে এগোচ্ছে দিনরাত্রি। পৃথিবী এসময় তেতে পুড়ে আংরা হয়ে যায়। ঝাঁঝরা হয়ে যায় দুনিয়াটা। এ শহরও যেন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সব রূপ রস গন্ধ মুছে একটা দাউদাউ ভাব জেগে ওঠে। পারিধী ব্যাগ খুলে জলের বোতলটা বার করে। গলাটা সামান্য ভিজিয়ে নেয়। একটায় তার নতুন অফিসে ঢোকার কথা। ক্যামাক স্ট্রিটে অফিস। বেশ ঝকঝকে তকতকে অফিস। ভেতরে শীতাতপের হিমেল হাওয়ার বিলি কাটা। সেখানে কয়েকঘন্টা রোজ তাকে কাটাতে হয়। হাল্কা কাজ, ঝামেলা তেমন নেই। অফিস নিয়ে পারিধী বেশ সুখী। তবু কদিন হল চোরা এক হুতাশে ভুগছে সে। একটা আফশোস কুরেকুরে খাচ্ছে তাকে। একেকটা মানুষকে হঠাৎ করে এত ভালো লেগে যে যায়! কেন যে ভালো লাগে, কে জানে! চেনা নেই, শোনা নেই। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা হয়ে যায় দুটো অপরিচিত মানুষের। মনে হয়, চিনি চিনি, এই মানুষটাকে খুব চিনি। কতকালের চেনা ছিল যেন দুজন। তাকে দেখেও এমনটাই মনে হয়েছিল পারিধীর। মনে হয়েছিল সে যদি বিনা অনুমতিতে তাকে হঠাৎই নিবিড় করে টেনে নিয়ে ঠোঁটে চুমুর আল্পনা এঁকে দেয়, সে প্রতিবাদ করবে না। এক একটা মানুষের কাছে মেয়েরা বিনাকারণে আত্মসমর্পণ করে ফেলে। সেখানে কোনও প্রতিবাদ চলে না। এ যেন তেমনই কিছু।

অফিস থেকে বেরোবার পর তার কিছু ভালো লাগছিল না। কীরকম শ্রান্ত, ক্লান্ত। অবসাদে হাত পা ভেঙে আসছিল। অফিসে তার পাশে বসা ছেলেটা একইসঙ্গে নীচে নেমে এল। পারিধী তা টের পেয়েছিল। সন্ধের ভিড়ে চুপচাপ হেঁটেই আসছিল। ছেলেটার নাম যেন কী একটা। সারাক্ষণই ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে। কোনও অজুহাত পেলে কাছ ঘেঁষে আসে। পারিধীর এসব ভালো লাগে না বলেই মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটা দিয়েছিল।

— ম্যাডাম কি ডিরেক্টলি বাড়ি ফিরবে? পারিধী যেমনটা ভয় করছিল, সেরকমই হল। ছেলেটা কানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল।

— হুঁ। পারিধী ছোট্ট জবাব দেয়।

— দাঁড়াও, একটা করে সফট ড্রিঙ্কস নিই। বড্ড গরম। খাবে তো?

— না, আমি কোল্ড কিছু পছন্দ করি না।

— কোনও প্রোব্লেম আছে?

— না, আমি পছন্দ করি না।

— অবশ্য এসব খেলে শরীরটায় নানা প্রোব্লেম হয়। কার্বোনেট শরীরের খুব ক্ষতি করে।

— জানিনা।

— মেট্রো ধরবে?

— হুঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— ছ'টা পাঁচেরটা পাবে না। আমিও তো ভবানীপুরে নামবো।

তুমি কোথায়?

— টালিগঞ্জে।

— উই আর ইন সেম ওয়ে। স্মার্ট কার্ড আছে?

— না।

— তুমি খুব রিজার্ভড। সারাদিনে এত কম কথা বলো কেন?

পারিধীর এতক্ষণের গাম্ভীর্য ধ্বসে যায়। সে তো কখনও এমনটা ভাবেনি। সত্যিই কি সে খুব কম কথা বলে? অফিসের ছেলেটা, এইবার তার নাম মনে পড়ছে, শুভব্রত। নিত্যনতুন শার্ট পরে আসে। সারাক্ষণই হাসি হাসি মুখ। সেই শুভব্রতর দিকে তাকিয়ে প্রায় শব্দহীন হাসি হেসে ওঠে পারিধী, কই, আমার তো তা মনে হয় না। কী জানি, হয়তো হতেও পারে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় দুজনে চলে এসেছিল। রাস্তায় বেশ ট্রাফিক জ্যাম। বিকেল শেষে যাত্রীদের ক্লান্তি ভরে নিয়ে বাস মিনি গাড়িগুলি সবুজ আলোর অপেক্ষায়। এখন লাল আলো জ্বলছে। থমথমে রাস্তাটা। লাল নিভে গিয়ে সবুজ আলো মানেই এই অস্বস্তিকর বাহুপাশ থেকে মুক্তি। একটু শ্বাস নেওয়া যাবে। সেদিন শুভব্রত বলে উঠেছিল, কিছু ভালো লাগে না জানো। কেন সারাদিন কেরিয়ারের পেছনে দৌড়াচ্ছি, বুঝতে পারি না। একটা টার্গেট নিয়ে সবাই এগোয়। কেন এগোয়, জানি না। টার্গেটটা একদিন ছুঁয়ে ফেললে মানুষ ফুরিয়ে যায়। এ'জস্টেড হয়ে পড়ে।

পারিধী বেশ মজা পেয়ে গিয়েছিল শুভব্রতের কথা শুনে। তারপরই মনে পড়েছিল সেও তো একটা টার্গেটে পৌছবার চেষ্টা করছে। মেট্রো রেলে সেই মানুষটাকে খুঁজে পাওয়ার টার্গেট। কিন্তু খুঁজে পেয়ে গেলেই তো টার্গেট শেষ হয়ে যাবে, তার বুকের ভেতর লাবডুব শব্দটা থেমে যাবে। যতক্ষণ হাতের কাছে না আসে, ততক্ষণই তো পাবো পাবো বলে পাগলের মতো করতে ইচ্ছে করে।

— স্টেটসে চান্স পেলে যাবে না? এখানে থেকে কী করতে পারবে তুমি? শুভব্রত বলে উঠেছিল।

— অতদূর ভাবছি না। ছটা পাঁচের পর কটায় মেট্রো আছে?

ছটা পনেরো। প্রচণ্ড ভিড় কিন্তু। পোলট্রি মতো গাদাগাদি ভিড়। আজকাল আবার খুব ইভ টিজিংও হচ্ছে।

পারিধী জানে সত্যিই ভিড়ে এসময় মেট্রোয় ওঠা দায়। সবাই এখন বাড়িমুখো। অজস্র মানুষ তার মতো এসময় বাড়ি ফেরে। আসলে কাজ ফুরিয়ে গেলে সবাইকে বাড়ি ফিরতে হয়। সারাদিনের পর একটা বাসস্টপের মতো এই বাড়ি ফেরাটা। তার বাড়ির সামনে বটগাছটায় প্রতিদিনই বাড়ি ফেরে পাখিরা। সারাক্ষণই কিচির মিচির। সারাদিন আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায় তারা। কিন্তু দিনের আলো মুছে গেলে তাদের সবাই বাড়ি ফিরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, সেও তো বাড়ি ফেরে নিশ্চয়। তারও ঘরবাড়ি আছে হয়তো। হয়তো বিশাল বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট নয়। মেসেও থাকতে পারে। পারিধী দেখেছিল তার উশখুশভাব। হয়তো বাড়ি ফেরার জন্য ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল সে। তারও হয়তো একটুকরো থাকার জায়গা আছে। মাথার ওপর ছাদ। চারপাশে দেওয়াল, জানালা।

শুভব্রতই সেদিন জোর করে টিকিট কেটেছিল। সঙ্গে মেয়েরা থাকলে তারা টিকিট কাটলে ছেলেদের সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। কটা টাকারই বা মামলা। কিন্তু টিকিট কাটার মধ্যে একধরনের পৌরুষ আছে। ছেলেরা সবসময় আপারহ্যাণ্ড থাকতে ভালোবাসে। পৃথিবীতে কত থিওরি এখনও পুরনো হচ্ছে না। যেমন এটা। মেট্রোয় উঠে পারিধী তাকে খুঁজেছিল। ভিড়ের ফাঁকে, ক্লান্ত হাতের কিংবা কিশোরীর চুলের কাছ ছুঁয়ে যে মৃদু ব্যবধান ছিল, সেখান থেকে।

পাশাপাশি বসেছিল তারা। পারিধী বেশ গম্ভীর। শুভব্রতই জোর করে কথা বলছিল। নতুন নতুন খবর তার মুখস্থ। পারিধী জানে, এসব আসলে শুভব্রতের গল্প করার অছিলা। পারিধীর সবকথা শুনতে ভালো লাগছিল না। মনে হয়েছিল, হয়তো আগের মেট্রোতেই সে চলে গিয়েছে। কিংবা পরের মেট্রো ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও তাকে খুঁজছে। যেমন তাকে খুঁজছে পারিধী। আসলে দুজনের খোঁজার মধ্যে কোথাও একটা গরমিল রয়েছে, তাই দুজন দুজনকে খুঁজে পাচ্ছে না। হয়তো সময়ের হেরফেরে এমন কানামাছি খেলা চলছে। তার মনে হচ্ছিল সে যদি শুভব্রতের সঙ্গে না গিয়ে আরও দু একটা মেট্রোর জন্য অপেক্ষা করতো, তাহলে ঠিক ঠিক দেখা হয়ে যেতো।

প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঠিকঠাক দেখা হয় না কেন? যাকে ভালো লাগে না, সে এসে পাশে বসে। যাকে খুঁজে যায়, সে আগের কিংবা পরের ট্রেনে চলে যায়। কিংবা দুজনেই শহরের দুদিকে ঘুরে বেড়ায়। অথচ দুজনের সঙ্গে দুজনের দেখা হয় না। সে হয়তো একই সময়েই উল্টোডাঙ্গায়, আর অন্যজন গড়িয়াহাটের ব্রিজের নীচে মিনিবাসের অপেক্ষা করছে। মানুষের জীবনে এমন ভুলভাল ব্যাপার কেন ঘটে, কে জানে!

সেদিন খুব মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল পারিধী। জামাকাপড় পাল্টে বারান্দায় এসে চেয়ারটায় চুপচাপ করে বসেছিল সে। এখান থেকে চাঁদ টাঁদ দেখা যাচ্ছিল না। এখন অবশ্য চাঁদ টাঁদ দেখা বিলাসিতা। মানুষ এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে টিভি খুলে বসে। টিভিই এখন মনের আকাশে চাঁদ। টিভি খুললেও সেই বস্তাপচা সিরিয়াল কিংবা বহুবার দেখা নায়ক-নায়িকাদের নাচগানমার্কা মাথা ধরিয়ে দেওয়া কোনও ছবি। যেটুকু সময় টিভির সামনে থাকে, বারবার রিমোট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দৃশ্যান্তর ঘটায়। সেইতো একই চর্বিত চর্বণ। পৃথিবীতে নতুন কিছুর আর জন্ম হবে না। সব কিছুই আবিষ্কার হয়ে গেছে। বারান্দায় বসে পারিধীর মনে হচ্ছিল শুভব্রতর এই গাড়ে পড়া ভাবটা এড়ানোই তার কাছে এখন বড় ব্যাপার। মানুষ আজকাল পারপাস ছাড়া কিছু করে না। কে যেন বলেছিল কথাটা? তার বন্ধু অনুমিতাই তো বলেছিল কথাটা। পৃথিবীতে এখন নাকি সবকিছুই অন্ধে চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে বারান্দায় সে বসে আছে, তার গায়ে মৃদু হাওয়া এসে লাগছে এবং সে তার কথা ভাবছে, আপশোস করছে, তার পিছনেও নাকি অঙ্ক আছে। পৃথিবীতে আজকাল নাকি ভালোবাসা বলে কিছু নেই। সবটাই অঙ্ক-অ্যালজেবরা।

মোবাইলটা বাজছে। কার ফোন? তার নয়তো? কিন্তু তাকে কী মোবাইল নম্বরটা সে দিয়েছিল? না, দেওয়া হয় নি, সবে তো প্রথম দুচার বার দেখা। বরং ছেলেরাই প্রথম আলাপে জোর করে মোবাইল নম্বর গুঁজে দেয়। মেয়েরা অনেক সাবধানী। তারা সহজে ফোন নম্বর দেয় না। অনেকে জোর করেই ফোন নম্বরটা নিয়ে নেয়। যেমন অফিসের শুভব্রত। প্রমাদ গোনে পারিধী। এটা বুঝি শুভব্রতের ফোন। ঠিক তাই।

মোবাইলে শুভব্রতের গলাটা শোনা গেল, শুভব্রত বলছি।

— বলুন। পারিধী বলে, হঠাৎ কী মনে করে?

— শোনো, সন্ধ্যেবেলায় যখন রিল্যা' করছো, তখন ফোনটা ভালো লাগছে না নিশ্চয়। শুভব্রতর সেই বিরক্তি উৎপাদনকারী গলা।

— চটপট খুলেই বলো। পারিধী চাপা বিরক্তি প্রকাশ করে।

— ইফ ইউ থিংক মি এ ফ্রে', একটা কথা বলতে পারি।

— কলিগ কখনও বন্ধু হয়? সব কলিগই পরস্পর গোপন বলতে পারো।

— আই ডোন্ট থিংক সো।

— তুমি কী কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছো?

— তুমি পার্টটাইমে গোয়েন্দা এজেন্সি নিয়েছো নাকি? পারিধী মেকি কৌতূহল দেখায়।

— না, না। সেদিন মেট্রো স্টেশনে তোমার অ্যাটিচ্যুড দেখে আমি গেস করেছি।

— তাই নাকি? তুমি তাহলে আমাকে মাইন্যুটলি স্টাডি করছো দেখছি। আমরা কাউকে না কাউকে তো খুঁজেই বেড়াই। তুমিও হয়তো কাউকে খুঁজছো। নাথিং নিউ। পারিধী এবার চাপা হাসে। মনে মনে বলে, খুঁজছি, ভীষণভাবে খুঁজছি কাউকে। মনে হয় সারাজীবনই এই খোঁজাটা চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো এমন একদিনে সেই খোঁজাটা শেষ হবে, যেদিন, পৃথিবীটা বুড়ো মানুষের মতো ধুঁকবে।

সে জানে, শুভব্রত আসলে কিছু একটা বলার জন্য ছুঁতো খুঁজছে। পুরুষরা বোধহয় এরমকই। সেও কী এমন ডিসগাস্টিং? পারিধীর মনটা ফের খারাপ হয়ে যায়।

— আমার জন্য তোমাকে হাহুতাশ করতে হবে না। আই নিড নো সিমপ্যাথি। পারিধী ফোনটা রাখতে রাখতে বলে।

তারপর বারান্দা ছেড়ে ঘরে এল সে। যে উত্তেজনাটা এতক্ষণ তাকে জ্বালিয়ে মারছিল, সেটা এখন আর নেই।

অরুন্ধতী ওঘরে ছিলেন। এক কাপ চা করে এনে রাখেন টেবিলে। তারপর পারিধীর দিকে তাকিয়ে বলেন, শরীরটা খারাপ নাকি?

— কই নাতো। পারিধী হঠাৎ বেশ শব্দ করে হেসে ওঠে। যেন নিজেকে স্বাভাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাতে এর চেয়ে অন্য কোনও রাস্তা নেই। অরুন্ধতী তার দিকে তাকিয়ে বলেন, নতুন চাকরি ভালো লাগছে না?

— ও, ফাইন। আজ এনজয় ইট। পারিধী চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, সব চাকরিই অবসাদ তৈরি করে, মা। ওসব নিয়ে আমি ভাবিই না!

— কার ফোন এসেছিল? বন্ধুর?

— অফিসের।

— কাজ নিয়ে কিছু বলল নাকি?

— ও তুমি বুঝবে না। অফিসে কতরকম ক্যারেক্টর আছে।

— কাউকে ভালো লাগছে নাকি? অরুন্ধতী বন্ধুর মতোই তার সঙ্গে আচরণ করে থাকেন। সেই কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকেই। মা-মেয়েতে অনেকরকম কথা হয়।

অরুন্ধতী হাসেন, এবার তো একটা জায়গায় তোকে নোঙর বাঁধতে হবে। তিরিশের আগেই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলিস।

— বিয়ে না করে বুঝি জীবনটা কাটানো যায় না? তোমরা যে কীসব ধারণা নিয়ে বেঁচে আছো। তারপরই তার মনে হয়, যদি তার সঙ্গে কখনও দেখা হয় তাহলে অন্যরকমভাবে বাঁচা নিয়ে একটা এ'পেরিমেন্ট করবে। এক ছাদের নীচে একসঙ্গে থাকা, যতদিন কাটানো যায়, ততদিন কাটাবে।

অরুন্ধতী বলেন, কেরিয়ারে কতদূর এগোবি, সেটা তোর ব্যাপার। তবে কোথাও একটা টার্মিনাস দরকার। দেখিস না বাসগুলোও সারাদিন দৌড়োদৌড়ি করে বিশ্রাম নেয়। সবারই শেলটার দরকার।

— তেমন কাউকে পেলে তো ভাববো। তেমন কারো দেখা পাচ্ছিনা, মা।

— পেপারে অ্যাড দিলে তো অজস্র রেসপন্স পাবি। ওখান থেকে কাউকে পছন্দ করে নিতে পারিস।

— জীবনটা তোমার কী সহজে ভেবে নিতে পারো। ওই সিস্টেমটা আমার ভালো লাগে না। ভালোবাসা খোলামকুচি নাকি যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুর না মিললে কীসের লাইফ? ইটস অ্যান মেয়ারলি অ্যাডজাস্টমেন্ট। অনেকটা ধর্ষণের মতো। জোর করে প্রতিরোধহীনভাবে মেনে নেওয়া।

— একসঙ্গে থাকতে থাকতেই একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। বোঝাপড়া থেকেই ভালোবাসা জন্ম নেয়। অরুন্ধতী বলেন, সবাইকে কোথাও না কোথাও থামতেই হয়।

অরুন্ধতী ঘর ছেড়ে চলে যান। পারিধী এইসময় একা থাকতেই ভালোবাসে। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে লাইটটা নিভিয়ে দেয়। তার অন্ধকার বেশ ভালো লাগে। অন্ধকার মানেই চোখ বুজে সেই মুখটা খুঁটে খুঁটে বের করা। তারপর সে কোনও এক অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে। এভাবেই চলে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলা। যদি তাকে সে পায়ও, তাহলে সারাজীবনও যদি ধরে রাখতে না পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিনের মতো ধরে রাখবে এক ছাদের তলায়। জানে, অবাধ্য পুরুষ শিকল ছিঁড়তেই ভালোবাসে।

ভালোবাসা ঔষধি গাছের মতো। একবার ফল দিয়েই মরে যায়। পারিধী জানে, কাঙ্খিতপুরুষকে এক জীবনে নাও পাওয়া যেতে পারে। হয়ত অনেকগুলো আকাঙ্খার শরীর থেকে একটু একটু করে নিয়ে একটা অবয়ব তৈরি হয়। নারী তাই নিজের করে কাউকেই পায় না। সবটাই ছিন্নভিন্ন আকাঙ্খা দিয়ে গড়া একটা চেহারা।

তারপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। দিন যায়। পারিধী অফিসে যায়, অফিস করে এবং অফিস থেকে ফেরে। শুভব্রত তার পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। ভালো লাগে না তার। শুভব্রতই নিজে থেকে তাকে খুব ভালো করে সফটওয়ার ম্যানেজমেন্ট শিখিয়ে দেয়। হাসতে হাসতেই বলে, দেখো একদিন কাজে লেগে যাবে। তখন এই বদমাশ ছোঁড়াটাকে মনেও থাকবে না। দুনিয়াটা এখন কাজের জায়গা হয়ে গেছে ম্যাডাম। কেজো মানুষের ভিড় পৃথিবী জুড়ে। শুভব্রত এখন সন্ধ্যেবেলায় মেট্রোরেলে তার সঙ্গী। বেচারা জানেই না খামোখা পারিধীর পিছনে সময় নষ্ট করছে। তার স্টপেজ আসার আগে অনবরত গল্প করে যায়। পারিধী তার কাছ থেকে জেনে নেয় সফটওয়ার, আর কেরিয়ারের নাড়িনক্ষত্র। এই কেরিয়ারের কতটা ওপরে ওঠা যাবে, এইসব। তারপর একদিন ছেলেটা ওয়েবসাইট থেকে বিজ্ঞাপন বার করে পারিধীকে দেয়। লুক্রেটিভ অফার। পারিধী তো ভারী আশ্চর্য। পুরুষেরা যে এত পরোপকারী, জানা ছিল না তার। শুভব্রত হাসতে হাসতেই বলে, একদিন যদি আমার কথা মনে পড়ে, এটুকু ভেবো আমার ভালো বন্ধু ছিলাম। দ্যাটস এনাফ। আচ্ছা, শুভ, তুমি একটা কাজ কী পারো? আমার জীবনে হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে খুঁজে বের করে দিতে পারো? শুভব্রত হয়তো বলবে, না, পারিধী। তুমি যাকে খুঁজছো, তাকে আমি খুঁজে পাবো কী করে? আমি যাকে খুঁজছি, তুমিও তাকে যেমন খুঁজে বের করে দিতে পারবে না। সেরকমই তুমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাকে আমি খুঁজে বার করবো কী করে? সন্ধ্যেবেলায় তাকে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে মেট্রো স্টেশনে যায়। শুভব্রতকে পাশে রেখে চোরা চোখ চালিয়ে সেই মুখটাকে খুঁজে বেড়ায়। সে বোঝে, সারাজীবনই তাকে খুঁজে যেতে হবে। মেট্রো রেল, পার্ক, শপিং মল আর শহরের গোলকধাঁধায় তাকে খুঁজতে খুঁজতেই সে শুভব্রতের হাত ধরে সফটওয়ার ম্যানেজমেন্টটা আরও ভালোভাবে শিখে নেবে। এখন থেকে আর ছেলেটার প্রতি অকারণ কঠিন হবে না সে। হয়তো সে তার এই অহর্নিশ খুঁজে বেড়ানোর সঙ্গী হতে পারে।

সে ভাবে এই-ই ভালো হল। এমন একজনকে পাওয়া গেল যে স্বেচ্ছায় তার কাছে নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। তাকে সঙ্গ দিয়ে কিছু তো লাভ তার হয়েছে। সফটওয়ারটা ভালোভাবে শিখে নিয়েছে। স্টেটসে গেলে ভালো চাকরিও জুটেযাবে। তার জীবনে মেট্রোর ভিড়ে মিশে থাকা মুখটা বেঁচে থাক। বেঁচে থাক শুভব্রতও। পৃথিবীতে কিছুই ফেলা যায় না। মেয়েদের জীবনে একটা কী দুটো নির্দোষ সম্পর্ক বেঁচে থাকে। তারা শুধু ডিভিডে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে যায়। শুভব্রত সেইরকমই কিছু একটা। একজনকে সারাজীবনই হয়তো খুঁজে পাবে না। আরেকজন টিকে থাকবে হেল্পলাইন হিসেবে। পারিধী জানে, ভালোবাসা অনেক পুরনো কনসেপ্ট হয়ে গিয়েছে। আগামীদিনের পৃথিবীতে অদ্ভুত ভারসাম্যের অঙ্ক আছে। বড় কঠিন সে অঙ্কটা। সেদিন অফিসেই শুভব্রতকে বলেছিল,

মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মে তাকে আর খোঁজে না পারিধী। এ পৃথিবী যেন আজ বড় বেশি নির্জন হয়ে পড়েছে। এ পৃথিবী যেন আজ বড় বেশি নির্জন হয়ে পড়েছে। এখন সন্ধ্যের ওই প্ল্যাটফর্মটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। দু পারের ট্রেন আসে, একটু থামে। মানুষ নামে, মানুষ ওঠে। তারপর চলেও যায় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। শহরে রাত নামে, রাত ফুরিয়ে দিনও আসে।

পারিধী আগের মতোই অফিস যায়। বাড়ি যখন ফেরে তখন বাড়ির সামনের গাছটায় পাখিরা বাসায় ফিরে কলকাকলিতে ভরিয়ে দেয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে পারিধী।

পাখিরা ঘরে ফেরে, মানুষও। সবাইয়েরই নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা রয়েছে। কেউ কেউ আবার ঠিকানাহীন। তার আজকাল এসব খুব মনে হয়।

সে জানে, একটা জীবন মানুষের কাছে যথেষ্ট নয়। সামান্য সময়ে অনেক কিছু করা যায়, আবার অনেককিছু করাও যায় না। যেমন, তীব্র অপেক্ষার পরও শূন্য হাতে ফিরতে হয় কাউকে কাউকে। ছিঁটেফোঁটা যা পাওয়া যায়, তাতে কাঙ্খিত তেমন কিছুই থাকে না। শুধু আকাঙ্খার তেষ্টাটা বাড়িয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৭ জুন ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝরে গেল চেরি

মনোজ দে নিয়োগী

পাহাড়ের মাথায় জল ঢাললে সে জল তরতর করে নীচে নামে। ঠিক সেরকম সহজে গড়ে ওঠে সম্পর্ক; স্বচ্ছ জলের মতোই তার স্বচ্ছতা। জলের স্রোতের মতোই বাধা-বন্ধনহীন তার এগোনো।

/সম্পর্ক গড়ে ওঠে মানুষের সাথে প্রকৃতির; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। মানষের সঙ্গে জড়ের। একই মাসি-মায়ের বিভিন্ন সন্তান, তাদের নিজেদের পরস্পরের অমোঘ বাঁধনে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে—তা স্বতোৎসারিত। মুশকিল হল বাইরের লোক তা বোঝে না। কোনও একপক্ষের আত্মীয় সেজে পুরনো, সনাতন সম্পর্ককে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু সম্পর্ক যে সহজে ভাঙা যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে ঘটনার, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার একটা নিরন্তর সম্পর্কের স্রোত বয়ে চলে। তাজউদ্দিনের রিকশায় বাঁধা ঘোড়ার গলার ঘণ্টার ঠং ঠং বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টসোনার জুতো-মোজা পরার একটা সম্পর্ক আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে। দেখা যায় কোনও কারণে ছোট্টসোনা যদি জুতো-মোজা পরতে দেরি করে রিকশার ঘন্টাও বাজে দেরিতে। যদিও কোনও পক্ষই অন্যকে জানিয়ে দেরি করে না।

আগে আরতি একদিকে ছোট্ট সোনাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে, তাকে দাঁত মাজিয়ে, খাইয়ে, জামা-প্যান্ট-জুতো-মোজা পরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ছেলেকে রিকশায় বসিয়ে আসত। তারও আগে ছেলের সঙ্গে নিজেও রিকশায় চেপে বসত। এখন অবশ্য তার কাজ অনেক কমে গিয়েছে। ছোট্টসোনাই নিজে দাঁত মাজে, খায়, চুল আঁচড়ায়—জুতো-মোজা পরে রিকশায় উঠতে যাবে। —আরতি বইয়ের ব্যাগ হাতে রিকশার সামনে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের হাসি বিনিময় হয়। তাজের সঙ্গে ছোট্টসোনার, ছোট্টসোনার সঙ্গে আরতির, আরতির সঙ্গে তাজের; তার পর যে-যার মতো বিদায় নেয়। স্কুলের এই রাস্তাটি মাদারীহাটের কাছে। এর একটি শাখা শহরে নেমে পড়েছে। অন্যটি সোজা গিয়ে জাতীয় সড়কে পড়েছে। পাহাড়ি পথ। এ পথের সমান্তরালে কিছু দূর দিয়ে তোর্সা বয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সের এই অংশে পথ অল্পবিস্তর হালকা জঙ্গলের বুক চিরে গিয়েছে। এঁকে বেঁকে। এলোমেলো সরীসৃপের মতো। পথে চড়াই-উতরাই আছে। শহরের কর্মব্যস্ততা এ পথে নেই। তাই এ-পথ সহজেই হালকা একটা সৌন্দর্য নিয়ে পথিকের অপেক্ষা করে। যানবাহনের। পথের দু'পাশে শাল, সেগুন, বহেরা, খয়ের, শিশু, শিমূল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কোথাও বা ওদাল, বনকাঁঠাল, টুন, ল্যুসনি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর বাংলার ডুয়ার্সের এই অরণ্যের বৈচিত্র্য প্রকাশ করছে। কিছু দূরে

পাহাড়ের গায়ে-গায়ে সুন্দর, সুশোভিত চা-বাগান। পথের দু'পাশের আকাশছোঁয়া গাছ তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে যেন এক সুদূর-বিন্যস্ত তোরণে তৈরি করেছে। মাথার উপর তাকালে মনে হয় গাছেদের দেশে কত কত টংঘর বানানো আছে। রহস্যময় সে সব ঘর—তাদের বাসিন্দারাও রহস্যময়। কাঠঠোকরা, মুনিয়া, বনটিয়া, চন্দনা—কোথাও কোথাও পণ্ডিতমন্য ধনেশকে দেখা যায়। আর কত যে পরিযায়ী পাখি এখানে। করকর করে এ-গাছ, সে-গাছ করে জঙ্গল ব্যবলারের দল! কোথাও হরিয়াল, জলতরঙ্গ, হুইসলিং টিল ...। ছোট্টসোনার অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে যদি কোনও বন্ধু শালিক অথবা হরিয়ালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সহজ অথচ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পথের দু'ধারে তাকাতে তাকাতে যায় ছোট্টসোনা। কোনও সময় যদি কোনও মাদরাঙা কিংবা বনটিয়াকে তার সঙ্গে সমান্তরালে ডানা মেলে উড়তে দেখে রিকশায় দাঁড়িএয় পড়ে সে। তাজকে অবধি ছোট্টসোনার সঙ্গে, পাখিদের সঙ্গে আনন্দের খেলায় মাততে হয়। রিকশার পিছনে মুগুরের মতো একটা ছোট কাঠের গুঁড়ি আটকানো থাকে। সেটাকে নামিয়ে কায়দা করে খোঁটার মতো রিকশার পিছনে রাস্তার সঙ্গে আটকে দেয়। গলার গামছা খুলে সামনের চাকার সঙ্গে হ্যান্ডেলটা বাঁধে। তার পর পাখিগুলির ডানা বিস্তারের মতো দু'হাত অনুভূমিক ভাবে ছড়িয়ে যেন সে শূন্যে সাঁতার কাটে। এত সুন্দর তার আঙুলের বিক্ষেপ ঠিক মনে হয় কথক নাচছে—হাসিতে ফেটে পড়ে দু'জনে। বৃদ্ধ তাজউদ্দিন—শ্বেতশুভ্র চুল, গোঁফ-দাড়ি—ছোট্টসোনা তাকে পাখিদাদু বলে ডাকে। স্কুলে যেতে যেতে কত মজার মজার গল্পই যে শোনায়। মন দিয়ে শোনে ছোট্ট সোনা—কোনওটা না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করে।

আজ বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। আকাশ বাদুড়ে মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি নেই—এই রক্ষে। একটা গুমোট ভাব শিশু সকালকে পরিণত বৃদ্ধের মেজাজে নামিয়ে আনে। পথের দু'পাশে এলিফ্যান্ট ঘাস খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। তারা নড়ে না-চড়ে না। অন্যদিন ওরাও দুই শিশুর সঙ্গে আনন্দের নাচ জুড়ে দিত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নিয়ে আনন্দে মশগুল থাকত। আসলে ছোট্টসোনার এই পথটাই প্রধান স্কুল। সহপাঠী এই তাজ, এই লম্বা গাছেরা, পাখিরা। ... এলিফ্যান্ট ঘাসেরা। আকাশ আর পাহাড় অবশ্য বাদ যায় না।

এপথ যেখানে শুরু হয়েছে, সেটা ছোট্টসোনাদের গ্রাম। তার পর মফস্বল শহর ছুঁয়ে জাতীয় সড়ক একত্রিশে। ছোট্টসোনার গ্রামে মানুষের বসত বেশ হালকা। ধানি জমিতে কিছু লোক চাষ-আবাদ করে। আবার পার্বত্য মানুষেরা, পাশের রাজ্য থেকে আসা মানুষেরা চা-বাগানে কাজ করে। ছোট্টসোনার বাবা কলকাতায় আধা সরকারি অফিসের চাকুরে। তাই আরতি-ই বাবা-মা উভয়ের দায়িত্বে।

স্বামী তার আসে কালেভদ্রে। আরতিকে এ-পথ ধরে কতবার যে যাওয়া-আসা করতে হয়। পথটি তাই তার কাছেও বড় পরিচিত বন্ধু। চৈত্রশেষের লম্বা পাতাহীন কাঠগোলাপ গাছের শাখা-প্রশাখার মতো শহরে এসে ছোট ছোট রাস্তায় পথটি এঁকে বেঁকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট রাস্তায় পথটি এঁকে বেঁকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট পথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওটির মোড়ে পড়ে স্কুল, অফিস-কাছারি। কোথাও দোকান, বাজার, হাট—কিছু দূরে হাসপাতাল। একবার একটা শাখা রাস্তায় ঢুকে পড়লে অন্য রাস্তায় যাওয়া বেশ অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। মফস্বল শহরের যে প্রান্তে প্রধান রাস্তাটি পড়ে সেখানে সাধারণ জনবসতি বড় একটা নেই। এখানকার বাড়ি-ঘরদোরগুলো কেমন কেমন। এটি একটি নিষিদ্ধ পল্লি। বুনোকুলের মতো মেয়েরা কটকটে লাল-নীল পোশাকে, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক মেখে চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। এখানকার পথঘাট কাদা কাদা। বড় পিছল—সেটা বৃষ্টির জলে না গ্রাম থেকে আসা গাঁজানো তাড়ির রসে বোঝা যায় না।

আরতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে একটা জড়তায় আড়ষ্ট থাকে কিছুক্ষণ। ভোরে তার প্রথম কাজ ছেলেকে জাগানো যেদিন স্কুল থাকে। যেদিন স্কুল থাকে না সেদিন তাকে একটু বেশিক্ষন ঘুমোতে দেয়। যেদিন স্কুল থাকে সেদিনও আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসে ছেলেকে পাঠাবে কি পাঠাবে না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় মনটা কেঁপে ওঠে। যদি ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। যদি হঠাৎ পৃথিবীটা কাঁপতে থাকে। তার পর আকাশের নিলীমা থেকে যেন একটা অভয়বাণী আসে। মনকে শক্ত করে। চটপট সিদ্ধান্ত নেয় ছেলেকে স্কুল পাঠানোর। আজ ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। তাজেরও। তাই ঘোড়ার গলার ঘন্টা যখন ঠং-ঠাং শব্দের তরঙ্গ পাঠায় ছোট্টসোনাও জুতোয় মোজা পরা পা দুটো ঢুকিয়ে তৈরি হয়ে যায়।

কাল রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে তাজ। মনটা তার ভারী। স্বপ্নের রেশ মনের মধ্যে একটা প্যাটপ্যাচে কাদার মতো দুঃসহ অবস্থা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছে। তাই গাড়ি চালানো বেশ কষ্টকর লাগছে আজ। প্রতিদিন যেমন সাবলীল ভাবে রিকশা টানে গুনাগুন করে গান গাইতে গাইতে আজ কিছুতেই তেমনভাবে পারছে না। বারবার ব্যাহত হয় এগিয়ে চলা। বার বার থেমে থেমে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে হয়। একে তো পাহাড়ি রাস্তা—চড়াই-উতরাই। তার পর বাদুড়ে মেঘে ঢাকা আকাশ মেঘে ঢাকা আকাশে। গাছগুলো আনন্দের অভিব্যক্তিহীন—ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। এলিফ্যান্ট ঘাস অনড়, অচল। একটাও পাখি নেই। কোথায় যে তারা ঘাপটি মেরে বসে ...। আজ কেমন ভয় ভয় করে তাজের। একটা অদৃশ্য ব্রেক যেন তার দুটো পা-কে প্রতিপদে আটকে দেয়। কিছুতেই এগোতে দেয় না। হঠাৎ ছোট্টসোনার দিক থেকে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা শব্দ শোনা যায়—বড় যন্ত্রণা মেশানো—কেঁপে উঠে পিছনে চায় তাজ। ছোট্টসোনার চোখদু'টো বোজা—মাথাটা সিটের পিছনে হেলানো—দেহটা টান টান। বুক কেঁপে ওঠে।— কী হল—কী হল—তবে কি স্বপ্নটাই সত্যি হতে চলেছে—চারদিক নিঃশব্দতায় চিৎকার করে কেঁদে উঠতে যায়—পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়! এখন কি করে ... লোকে তো বলবে এ তার নিজের কেউ নয় ... তাকেই দোষী সাজাবে ... সে যাক্ ... ছেলেটাকে কীভাবে বাঁচায় ... আকাশে তাকিয়ে খোদাতালার কাছে করুণ মিনতে করে ... বাঁচাও যে-করে হোক বাচ্চাটিকে ... দরকার হয় তার নিজের জান আছে ... পাল্টাপাল্টি করো ... ওঃ আজকে বাড়ি থেকে না বেরলে কি হত। নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দিন স্কুল কামাই হত। কী করে এখন ... স্কুলে যাবে, না লোক ডাকবে ... সামনে কোথাও ডাক্তারখানা চোখে পড়ে না ... হাসপাতাল সেও বেশ খনিকটা দূরে। প্রথম যে বসতি পাওয়া যায় সেটা নিষিদ্ধ পল্লি। অন্তত একটা লোক দরকার যে বাচ্চাটিকে ধরে বসবে রিকশাতে। বসতিতে ঢোকে তাজ। তাকে কাউকে ডাকতে হয় না। একটি মেয়ের চোখ পড়ে বাচ্চাটির দিকে। চিৎকার করে সে। অনেক লোক জড়ো হয়। সকলে চিৎকার করতে থাকে, কি করলি তুই ছেলেটার?

মেয়েটি ছোট্টসোনাকে কোলে করে দাওয়ায় মাদুরের উপর শুইয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়। লোকগুলো তাজকে চেপে ধরে ... বাচ্চাটার নাম কি রে...?

— অর্পণ, বাবু ...

ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনও টিভির এক ক্যামেরাম্যানকে দেখা যায় পটাপট ছবি তুলতে। একজন হোমরাচোমরা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রশ্নবাণে তাজকে জর্জরিত করে।

— কি করেছিস তুই ছেলেটার ...?

— রোজ যেমন স্কুলে আনি তেমনই আনছিলুম বাবু ... আল্লার কসম ... ও আমার জান বাবু ...

না মারলে মুখ খুলবে না—ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে—বিপদে পড়লে সকলেই সম্পর্ক খোঁজে ... আমার জান ... জান না কচু ...

এবার দু'হাত বুকে জোড় করে তাজ কাঁকিয়ে ওঠে ... বাবু, আমাকে মারার যথেষ্ট সময় পাবেন ... আগে আমার বাচ্চাকে হাসপাতালে নিতে দিন ... আপনারাও আসুন ... বাচ্চাটা মরে যাবে, বাবু ...

— না... তোকে ছাড়ান নেই... অন্য একটা রিকশা ডাক তো...

— তাই হোক... আমাকে ধরার তো সময় পালিয়ে যাচ্ছে না... বাবু...

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে ওঠে... ওকে তালাবন্ধ রাখ...

তাজ তালাবন্ধ থাকে। অন্য একটা রিকশা আসে। এ গলি... ও গলি... সে গলি... সোজা রাস্তাটা কেউ ধরে না। এতগুলো লোকের মাথায় সোজা রাস্তার নিশানা আসে না। ঘুরে ঘুরে যখন হাসপাতালে পৌঁছনো গেল... ডাক্তার নেই। হাসপাতালের উঠোন ছাতিম গাছের পাতা... কৃষ্ণচূড়ার ফুল-পাতায় ভর্তি... কাদায় ল্যাপটানো। বেড নেই। মাটিতেই একটা চাটাই পেতে শুইয়ে দেওয়া হল ছোট্টসোনাকে। ঠোঁটের দু'কোণে গ্যাঁজলা ওঠা। শরীরটা নীল হয়ে গিয়েছে। ব্যথায় কোঁকড়ানো, দোমড়ানো, মোচড়ানো শরীর। অবশেষে ডাক্তার এল। সামান্য একটু নাড়িতে আঙুল ছুঁইয়েই চিৎকার করে ওঠে ডাক্তরবাবু... বাচ্চাটাকে তো মেরে এনেছেন...

— কিন্তু কীভাবে ... কিভাবে মারা গেল? একজন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে... ওকে কি বিষ দেওয়া হয়েছে।

— হ্যাঁ, বিষেরই তো চিহ্ন...

AMARBOI.COM

— ঠিক ধরেছি আমরা... বাবা-মা বিশ্বাস করে তোর হাতে একলা ছেড়ে দেয় আর তুই এই করলি... একজন বলে ওঠে... কি সাঙঘাতিক... কি সাঙঘাতিক... ওইটুকু দুধের বাচ্চাকে কেউ বিষ খাওয়াতে পারে...?

এমন সময় আরতিকে দেখা যায়। ভিড় ঠেলে পাগলিনীর মতো চিৎকার করতে করতে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে...। ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন চিৎকার করে ওঠে... ওই হারামির বাচ্চাটাকে ধরে আন—ওর দাড়ি ওপড়াবো...। সারা হাসপাতাল চত্বর লোকে লোকরণ্য। জিঘাংসা যেন বাতাসে ভাসছে... আরতি বোঝে ইঙ্গিতটা... তার কিন্তু অন্য কোনওদিকে হুঁশ নেই... সে একবার ডাক্তারের পায়ে পড়ে... নার্সের পায়ে পড়ে...

আমার ছেলেটাকে বাঁচাও ডাক্তারবাবু... সারাজীবন তোমার দাসীবাঁদি হয়ে কাটাবো গো... অমন জলজ্যান্ত ছেলেটাকে স্কুলে পাঠালাম... হে ভগবান... একটু মুখ তুলে চাও...।

বুকের কাছে তার ননীপুতুল নিয়ে যত্নে তার জামা খোলে... প্যান্ট খোলে... পায়ের জুতো জোড়া...

চোখের নিমেষে একটা কুচকুচে কালো ছোট্টমতো সাক্ষাৎ যমদূতের বাচ্চা লাফিয়ে জুতো থেকে ছিটকে বেরয়। একলাফে সকলে সভয়ে পিছিয়ে আসে। পালায় সেটা। একটা শিশুকে খুন করে আর এতগুলো বুড়ো লোকের মাথার সমস্ত বিষকে প্রশমিত করে।

সংবাদ প্রতিদিন, ২২ জুলাই ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকন্যা

মনন মুখোপাধ্যায়

একটানা ঝিঁঝির ডাক। ঝোপে ঝাড়ে মুঠো মুঠো জোনাকি জ্বলছে নিভছে। বংশীর সামনে পিছনে, কোথায় মাথা সমান, বুক সমান হড়চক বন। খড়খড় করে পায়ের কাছে শুকনো পাতার শব্দ। পায়ের ওপর গিয়ে একটা ঠান্ডা প্রবাহ চলে গেল। বুক হিম হয়ে যায় টর্চটা হাতের তালুতে চেপে ক্ষীণ আলোতে সে দেখে তার দিকে ফণা তুলে একটা গোখরো। খুব ভালো করে জানে নড়াচড়া মানেই মরণ ছোবল মৃত্যুকে ডেকে আনা। সে নিথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল মৃত্যুর দূত। দূরে মারমুখী জনতার চিৎকার অনেক আগেই থেমে গেছে। শিয়াল কাঁটার আঘাতে বংশীর শরীরের বেশ কিছু জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত রক্ত পড়ছে। কয়েকটা জোঁক মওকা বুঝে শুষে নিচ্ছিল শরীরের রক্ত, হাত-পা নেড়ে তাড়াতে পারেনি সে। পটলের মতো ফুলে গিয়ে টুপটাপ খসে পড়ছে। আরেকটু হলেই চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যার নিকুচি হচ্ছিল আর কি। যাই হোক ভাগ্যের জোরে এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছে সে। কিন্তু সন্ন্যেসী খুড়োর কী হোল? সাকরেদ চিন্তার কুড় খুঁজে পায় না। এত জ্বলে কি গায়ের লোকের হাতে ধরা পড়ে আঁশ ছড়ানো হচ্ছে! তবে একটা সান্ত্বনা সন্ন্যেসী খুড়ো তিন পীড়ি ধরে ঘাগি চোর। আশেপাশে যত চোর আর সিঁদেল আছে সবাই তার হাতে গড়া চেলা। অতো সহজে খুড়ো পড়বে ধরা? অসম্ভব। আজকের নিজের আহম্মকের মতো কাজের জন্য পস্তায় বংশী। ছি ছি অনাথ মাস্টারের ঘুমন্ত মেয়েটাকে কেন যে দেখে সে অমন আনমনা হয়ে গেল? মাল হাপিস তো দূরের কথা পরাণটাই যেতে বসে ছিল। বিকেল গড়াতে মুখ আঁধারে সন্ধ্যেবেলা সন্ন্যেসী খুড়ো যেমন পুকুর ধার ঝাপসি আস্‌সেওড়া গাছের নিচে চাপা গলায় বলেছিল, জোর খবর আছে বংশী উত্তর রাইপুরের অনাথ মাস্টারের মেয়ের বে লাগলো বলে। এই সুযোগে একবার আজ রেতেই টু মারতে হবে। কাল কেনাকাটা করতে ওরা কলকাতা যাবে। আজ রাত ঠিক একটা শ একটার সময় এই গাছ তলায় চলে এস্‌বি। যদি এই দাঁটা মারতে পারি মাস ছয়েক একা বারে নিশ্চিন্ত।

খুড়ো আমার কেমন ভয় ভয় করছে। অনাথ মাস্টারের যা ষন্ডামার্কা দুটো ব্যাটা। দেখলে ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়।

আরে ভয় কী? এখুনি সত্যপির তলায় আট আনার ধূপ জ্বালিয়ে আর ষোল আনার পুজো দিয়ে এইচি। বাবার দয়ায় আজ পর্যন্ত আমার টিকি কেউ ছুতে পেরেছে? একথা বলে খেঁক শেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ছিল খুড়ো।

তবে গর্ব করা খুড়োর সাজে বটে। সন্ন্যেসী খুড়ো তিন পিড়ীর সিঁদেল চোর। খুড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সিঁদকাঠিটা সযত্নে তেল মাখিয়ে আড় কাঠার ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছে। ইট সিমেন্টের গাঁথা ঘরে এটা আর কাজে আসে না।

রাত দেড়টায় দুই চোর অনাথ মাস্টারের ঘরের টালি ফেঁড়ে একেবারে মাটগুদামে এসে উপস্থিত। কয়েকদিন সন্ন্যেসী খুড়ো নানা অছিলায় অনাথ মাষ্টারের ঘরের আশে পাশের অলি, গলি, রাস্তা একাবারে নিঁখুত করে বুঝে নিয়েছে। পাঁচ কামরার ইটের গাঁথুনি পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। অনাথ মাস্টার ঠিক করে রেখেছে মেয়ের বিয়ে হলেই ঘরে ছাত ফেলবেন। বাড়ীর সব কিছু সন্ন্যাসী বংশীকে বুঝিয়ে রেখেছে। তার বয়সটা একটু ভারি তার ওপর উঁচু নিচু হতে একটু কষ্ট এই যা আর মনের জোরটাও একটু কমেছে না হলে ওই বংশী ছোড়াটাকে পায়ে তেল মাখাতে তার বয়েই গেছে। সন্ন্যাসী ভেবে খানিক সাহস পায় এ লাইনে সে বিশ পঁচিশ বছর আছে একমাত্র বিষ্ঠু অধিকারির বাড়িতে একবার চুরি করতে গিয়ে পিঠে বল্লমের খোঁচা খেয়েছিল সেটা কী আর আজকের ঘটনা। বংশীকে আগে থেকে পাখি পড়ানো পড়িয়ে রেখেছে সন্ন্যেসী। বংশী বলেছিল, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন খুড়ো, তোমার মতো ওস্তাদ যার, তার আবার ভয় কী?

বংশী খুড়োর কথাগুলো আরেকবার কানে ভাসিয়ে নেয়। পয়লা ঘরের হুড়কো খুলে রাখবি তারপর খেল শুরু করবি। পেতল, কাঁসার, কাপড়চোপড় যাবতীয় কাপড়ে বাঁধবি, টাকা কড়ি সোনাদানা পকেটে পুরবি। সটান ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের ভেতরের খিড়কি দরজা খুলে বাঁশবন দিয়ে চম্পট দিবি।

বংশী ধীরে ধীরে মাটগুদামের ছোট ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেতে নামে দড়ি বেয়ে। ওপরে সন্ন্যেসী শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে ধরে। বংশীর হাঁটাচলা ভূতের মতোন। অন্ধকারে দুহাত দূরের লোক তা বুঝতে পারে না। হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতে তার দৃষ্টি পড়ে খাটের ওপর। দৃষ্টি সে আর ফেরাতে পারে না। তার এই জীবনে, ঘুমের মধ্যে, থাকা এতো সুন্দরী মেয়ে সে কোনও দিনই দেখেনি। অপলক দৃষ্টিতে সেই সুষমাকে সে দু চোখে পান করে। বংশী রাজকন্যের গল্প শুনে ছিল। তার দুঃখিনি মায়ের কাছে সেই কত দিন আগে রাজকন্যার চাপা ফুলের মতোন গায়ের রঙ মেঘের মতোন চুল। ডালিমের দানার মতো টকটকে ঠোঁট। সেই রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে সোনার পালঙ্কে। রাজকন্যার মাথায় সোনার কাঠি ছোঁয়ালে তবেই ভাঙবে তার ঘুম। রূপোর কাঠি ঠেকালে সে পড়বে ঘুমিয়ে। এক দিনের কথা বংশীর মনে আছে সুস্পষ্ট। দরজায় দমাদম লাথি। বাইরে গর্জন, দরজা খোলো থানা থেকে আসছি। মা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল। দুজন খাকি পোষাকের লোক ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করতে শুরু করল। একজন ভারি গলায় জিজ্ঞেস করে বলে, তোমার স্বামী কোথায়? মা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে। এক জন অফিসার গোছের লোক বলে ওঠে। এই রুলটা সঠিক জায়গায় পুশ করলেই আসল কথাটা বের হয়ে আসবে। পাশের একজন বলে উঠেছিল। মিস্টার নিয়োগি এতো একসাইটেড হবেন না। আফটার অল আমরা সর্বহারা দলের সরকারের পুলিশ। আমাদের এত রাগ মানায় না। শোনো তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে। ওকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থানায় সারেন্ডার করতে বলো, না হলে। বাবাকে আর কোনদিনই সে দেখেনি। বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরা লাস উদ্ধার করা হয়েছিল একটা খাল থেকে। মাও ভাল পথে থাকতে পারেনি। সে শুধু এই টুকু জানে মা-টাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে কখনও কাজ নিয়েছে মিষ্টির দোকান, কখনও মুদিখানার দোকানে। কখনও জুটেছে প্রহার, কখনও অনাহার। সেই রাজকন্যা এখনও চোখে ভাসে। মায়ের কাছে শোনা হয়নি আর রাজকন্যার কথা। তারপর হয়েছে একটা পাকা চোর। খপ্পরে পড়েছে সন্ন্যাসী খুড়োর।

অনাদি মাস্টারের মেয়ের মেঘের মতো রাশী রাশী চুল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এখনও ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরা ধরেনি। দুদিনপরে যাবে শ্বশুর বাড়ি। বুকের কাছটাও খোলা দুটো বিল্বফলের পয়োধর নিশ্বাসের সঙ্গে ছন্দের তালে ওঠানামা করছে। বংশীর সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়। গলায় চিকচিক করছে সোনার হারগাছা। ওপর থেকে সন্ন্যেসী ফিস ফিস করে বলে, মেয়েটার গলা থেকে হারটা খুলে নে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বংশী তখন রূপ সাগরে ভাসছে। সে ভোগ করছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য। সে হারিয়ে ফেলেছে বাহ্য জ্ঞান। সন্ন্যেসী কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ফিসফিসিয়ে বলে। হায় হায় আমি কি ভুলটাই না করেছি। বাবা গুঞ্জর মালিক ষোল আনার গাঁজা মানসিক করছি বাবা বংশীর হুঁস ফেরাও বাবা! কি ভুল করে একটা আই বুড়ো ছোকরাকে এ কাজে ভেড়ালুম রে বাবা। তার মনে হচ্ছিল নিচে নেমে বংশীর মুখে শুনে শুনে সাত ঘা লাথি মারে।

বংশী তখনও সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠি রাজকন্যা। সে রাজকন্যার ডালিমের মতো টকটকে লাল ঠোঁট দুটোতে যদি তার ঠোঁট দিয়ে একবার শুধু স্পর্শ করতে পারত। শুধু ছোট্ট একটা হালকা স্পর্শ। ভাবছে তো ভাবছে। তার দু'চোখ জুড়িয়ে দেখছে রাজকন্যাকে।

সন্ন্যেসী খানিকটা বুড়ো হয়েছে, শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণও আলগা। ওপরে আর থাকতে না পেরে নামতে গেল ঘরে মেঝেতে। সে গিয়ে পড়লো একগাদা বিয়ের কেনা কাঁসার বাসনের ওপর। ঝন ঝন করে বিরাট শব্দ। অনাথ মাস্টারের মেয়ের ঘুম গেল ভেঙ্গে। সামনে দুই মূর্তিমান চোর। সে চিৎকার করে উঠলো, চোর! চোর! চোর! এতক্ষণ পরে বংশীর সম্বিৎ ফিরলো। ভাগ্যিস ঘরের হুড়কোটা আগে খুলে রেখেছিল। দুইচোর উর্দ্ধশ্বাসে খিড়কির দরজার দিকে ছুটলো। দু'জন বুঝতে পারে প্রায় গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের পেছনে। বংশী খালে ঝাঁপ মেরে ডুব সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে ওঠে। তারপর বনজঙ্গল ভেঙ্গে একেবারে গাঙ পার শ্মশানের কাছে হড়কচের জঙ্গলে। দিনেমানে সেখানে মানুষ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। সন্ন্যেসী খুড়ো বাঁচলো না মলো তার কুল কিনারা করতে পারলো না বংশী। সে ভাবলে, না আর নয়, একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। হারানো রাজকন্যার স্মৃতিটুকু নিয়ে ঘরে ফিরবে সে।

ভোরের বার্তা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাযাত্রার রথ

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

মনার একটা পোশাকি নাম ছিল কিন্তু সে নামে কেউ ওকে ডাকে না। আমাদের নাটকের গ্রুপে ও স্টেজ সাজাত আর ছোটখাটো রোলে অভিনয়ও করত। মঞ্চসজ্জা ছাড়াও আর একটা কাজে দক্ষতা ছিল মনার। ও খুব ভাল খাট সাজাতে পারত।

শুনে হঠাৎ মনে হবে বুঝি ফুলশয্যার খাট। অবশ্য তাও সাজাত মনা। কারণ সংসারে একা মানুষ হলেও বাঁচতে টাকা লাগে। স্টেজ সাজিয়ে কতই বা পায়? শো-প্রতি খুব বেশি হলে আটশো-হাজার। আমাদের অভিনয়েও তাও পেত না, উলটে ওকেও চাঁদা দিতে হত। তাই বাধ্য হয়ে টাকার জন্যে বিয়েতে ফুলশয্যার খাটও সাজিয়ে আসত। সেটা ছিল মনার সেকেন্ড প্রফেশন।

কিন্তু মহাযাত্রার খাট সাজাতে গিয়ে মনা কোনওদিন টাকা নিত না। তাই চেনাশোনার বাইরেও দূর-দূরান্ত থেকে ওর ডাক আসত। খাট সাজানো নয়, মনার কাছে এক-একটা নতুন-নতুন নাটকের স্টেজক্র্যাফ্‌ট। তাই একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও মিল থাকত না।

কাজ শুরু করার আগে একবার মৃতদেহ দেখে নিয়ে মনে মনে ও একটা নকশা তৈরি করে নিত। তার পর ফুল আর লতাপাতা নিয়ে তন্ময় শিল্পী বসে যেত মহাযাত্রার রথ সাজাতে। ওর মুখে তখন একের পর এক সিগারেট পুড়ছে, কান্নাকাটি হৈ-চৈ, কোনও দিকেই তন্ময়-শিল্পীর ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

এই মহাযাত্রার রথ সাজিয়ে টাকাপয়সা না নিলেও সেটা উশুল করে নিত ফুলশয্যার খাট সাজিয়ে। তা বলে ও যে সোমা হালদারের বিয়েতে খাট সাজাতে যাবে—কেউ ভাবতে পারেনি। সোমা একবার বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। আর কাজ করে ভালো টাকাও নিল। টাকা নেবার পক্ষে মনার যুক্তি—এটা ওর প্রফেশন। কিন্তু ওকে কে বোঝাবে, প্রশ্নটা টাকা নেওয়া না নেওয়ার নয়। প্রশ্নটা আত্মমর্যাদার।

সোমা হালদারের একটা ভূমিকা আছে। একসময় অন্য একটা দল থেকে সোমা আমাদের গ্রুপে এল। আর তখন থেকেই সোমার সঙ্গে মনার একটু বেশিরকম মাখামাখি।

সোমা থাকত বারাসাতে। রিহার্সালের পর মনাই ওকে ট্রেনে তুলে দিতে যায়। এতে আপত্তির কিছু ছিল না। কারণ, মনা থাকে স্টেশন পাড়ায়। মাঝে মাঝে সোমা রিহার্সাল কামাই করলে মনাকেও সেই-সেই দিন গ্রুপে পাওয়া যেত না। দৃষ্টিকটু ঠেকলেও এক্ষেত্রেও আপত্তির কিছু ছিল না। [illegible] কামাকাটি [illegible] না থাকলে গ্রুপ থেকে [illegible] নেওয়ার অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সকলের আছে। গণতান্ত্রিক অধিকার।

কিন্তু বছরখানেক বাদে মনা নিজেই ঘোষণা করে দিল ওরা খুব শিগগিরি বিয়ে করছে। রিহার্সালের মাঝে তখন টি-ব্রেক। ঘোষণা শুনে একমাত্র প্রিয়নাথ ছাড়া সকলেই হই-হই করে ওদের শুভেচ্ছা জানাল।

সেদিন রিহার্সালের পর প্রিয়নাথকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার হে? মনে হচ্ছে ওরা বিয়ে করছে শুনে তুমি খুশি হলে না।

শুনে প্রিয়নাথ ফোঁস করে উঠল।

কী বলছ, খুশি হব? তুমি জানো না সোমা কী বাজে মেয়ে! বিয়ে করবে না ছাই, দেখ কিছুদিন মনাকে নাচিয়ে অন্য কাউকে—আগের গ্রুপেও এই কীর্তি করেছে।

ছ'মাসের মধ্যেই প্রিয়নাথের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। প্রথম খবর পেলাম আমার স্ত্রীর কাছে। অফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছি হঠাৎ ভদ্রমহিলা ভগ্নদূতের মতো এই দুঃসংবাদটি শোনালেন।

শুনেছ, মনা-সোমাদের বিয়েটা হচ্ছে না। আজ সকালে মনা এসে কান্নাকাটি করে গেল।

ঘটনা খুবই সাদামাটা। সাবেককালের। সোমার এক জামাইবাবু ওর জন্যে ভাল পাত্রের সন্ধান আনায় মনা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ভাল পাত্র বলতে অবশ্য টাকাপয়সা, গাড়ি-বাড়ি তার সঙ্গে পারিবারিক সোনার ব্যবসা।

এই সোমা হালদারের ফুলশয্যার খাটও সাজাতে গেছল দু'কান কাটা মনা। মনার যুক্তি ছিল—দু'কান কাটা নয়, সে না কি হাইলি প্রফেশনাল।

এর বছর খানেক বাদেই মনা হঠাৎ কাউকে না কিছু জানিয়ে বিয়ে করে বসল। আর বিয়ে করল এমনই একজনকে যে ওর চেয়ে বয়সে সাত-আট বছরের বড়।

মেয়েটা আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে। বাড়িওয়ালা বলতে যে বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা রিহার্সাল করি। কবে যে ওদের আলাপ হল আর কবেই বা ওরা বিয়ে করার মতো একটা জায়গায় এসে গেল জানি না। তবে একদিন গ্রুপে এসে মনা আমাকে দুম করে একটা প্রণাম করে ঘোষণা করল, সে বিয়ে করেছে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বলেই একটা মেয়েকে আমার সামনে এনে বলল, আশীর্বাদ কর দাদা, এ শর্মিলা। বাড়িওয়ালার মেয়ে।

এর আগেও মেয়েটাকে দেখেছি। আমাদের রিহার্সালের সময় ওদের বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে উল বুনছে। একবার আমাদের কোনও একটা নাটকের ক্লাইম্যা'-দৃশ্যের মাঝখানে সহসা হাততালি দিয়েছিল বলে ওকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলাম। শুনেছি সেই থেকে মেয়েটা না কি আমাকে খুব ভয় করে।

মনা বাড়িওয়ালার মেয়ে শর্মিলাকে বিয়ে করেছে শুনে প্রিয়নাথ মন্তব্য করল, গ্রুপের জন্যে মনা তা হলে একটা কাজের কাজই করল। এটা হয়তো আমাদের সকলেরই মনের কথা ছিল।

মনা বাড়িওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে হয়তো এবার থেকে খিটকেল বুড়োটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়া বাকির অপরাধে যখন-তখন রিহার্সাল ঘরে তালা ঝোলাবার ভয় দেখাতে আসবে না।

বাস্তবে ঘটল ঠিক বিপরীত। ওদের বিয়ে নিয়ে শর্মিলার বাবা রীতিমতো হৈ-চৈ বাধিয়ে বসলেন। সব অপরাধ চাপানো হল আমাদের গ্রুপের ঘাড়ে।

অভিযোগ, আমরা এ বাড়িতে থিয়েটারের আখড়া না বসালে এমন অঘটন কখনওই ঘটত না।

সেই অপরাধে প্রথমেই আমাদের ঘর ছাড়ার মৌখিক নোটিস দেওয়া হল, আর ভাড়া বাকির দায়ে শোয়ের ক'দিন আগেই রিহার্সাল ঘরে একটা ধুমসো তালা ঝুলে গেল।

ঠিক তখনই শান্ত বোকা-বোকা শর্মিলা মেয়েটার দেখা গেল আর এক রূপ। যাকে বলে মাতঙ্গিনী হাজরা। মেয়ের সেই মূর্তি দেখে বাড়িওয়ালা বাবা একেবারে চুপসে জল-খই। ওদের বিয়েটা মেনে নেওয়া ছাড়াও আমাদের ঘরভাড়ার কিছুটা মকুব হয়ে গেল।

এর পর থেকে সব কিছু ভালভাবেই চলছিল, হঠাৎ বিপদ এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। বিয়ের বছর খানেক বাদে একদিন সকালে চা খেতে খেতে শর্মিলা বলল, শোনো মনা তোমাকে ক'দিন থেকেই একটা কথা বলব-বলব ভাবছি—

অতি উৎসাহে ওকে থামিয়ে দিয়ে মনা জানতে চায়, কী কথা গো বল না। ভাল কথা না মন্দ কথা?

শর্মিলা বলল, ভাল-মন্দ সে তোমার কাছে। তবে এখন থেকে তুমি আর মড়ার খাটিয়া সাজাতে যাবে না। বিয়ের আগে যা করেছ, করেছ, এখন থেকে শুধুই স্টেজ-ক্র্যাফ্‌ট—নো মড়ার খাটিয়া ক্র্যাফ্‌ট।

শুনে মনা বলল, স্টেজ-ক্র্যাফ্‌ট করি পেটের দায়ে ওটা আমার প্রফেশন। কিন্তু কেউ মহাযাত্রার খাট সাজাতে ডাকলে না করতে পারি না—এটা আমার নেশা।

এর পর মনা ছোটখাটো একটা ভাষণ দিয়ে বসল। বললে, তুমি হয়তো জানো না, একাজে আমার কত নাম-ডাক। আজকাল আমাদের এই মফস্বল শহরেও মঞ্চ-সাজাবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু আমার মতো মহাযাত্রার রথ সাজাতে কেউ পারে না। এতদিন এটা নিয়ে কেউ ভাবেনি। ভাবেনি যে এটা নিয়েও একটা শিল্প হতে পারে। অবশ্য আজকাল যেভাবে কাচের গাড়িতে করে ডেডবডি শ্মশানে যাচ্ছে আর কিছুদিন বাদে মহাযাত্রার রথ সাজাবার প্রয়োজন হবে না। খাট কাঁধে নিয়ে শবানুগমনের দৃশ্য শেষ কবে দেখেছি মনে পড়ে না। এখন যাচ্ছে লরিতে, খাট সাজিয়ে, কিছুদিন বাদে তাও বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কাচের গাড়িতে তুলে হুশ করে বেরিয়ে যাবে। তাই মহাযাত্রার রথ সাজাবার দরকার হবে না। মনার এই দীর্ঘ ভাষণের উত্তরে শর্মিলা কেবল বলল, মহাযাত্রার রথ নয়, বলো মড়ার খাটিয়া।

শুনেই মনা ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। শর্মিলাও চায়ের কাপ মাটিতে ফেলে দুপদাপ পায়ে বেরিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছন থেকে মনা ডেকে বলল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল শর্মিলা। বললে, মরলে খুশি তো?

চড় খেয়ে শর্মিলা বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। দেখা হবার ভয়ে মনাও ক'দিন গ্রুপে এল না। অবশেষে মনার শ্বশুর ওকে ডেকে দু'জনের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিলেন। তবে শ্বশুরের কাছে মনাকে শপথ নিতে হল—আর কোনওদিন সে মড়ার খাট সাজাবে না।

মনা কি সহজে রাজি হয়? শেষে শ্বশুর যখন গোপন কথা শুনিয়ে বললেন—তোমার তো কোনওদিকেই হুঁশ নেই বাবা! আজ ক'মাস হল শর্মি সন্তানসম্ভবা। তুমি মড়ার খাট সাজিয়ে ঘরে আসো। না স্নান, না মাথায় একটু গঙ্গাজল। তোমরা তো জানো না, পোয়াতি মেয়ের গায়ে এই সময় কতরকমের বাতাস লাগে?

শুনে আকাশ থেকে পড়ল মনা। বলল, কী বললেন—

হ্যাঁ বাবা! আজ তিন মাস। ওর মা থাকলে—যাক সে কথা। লজ্জায় ও তোমাকে পারেনি।

এর পরেই মনা গড়গড় করে শপথবাক্য উচ্চারণ করে গেল।

/আমি আজ থেকে আর কোনও দিন মহাযাত্রার রথ সাজাতে যাব না।*

এর কিছুদিন বাদেই কুন্তু অয়েল মিলের হাঁদু এসেছিল ওর মায়ের খাট সাজাবার আবেদন নিয়ে। ওর মায়ের না কি এটাই শেষ ইচ্ছে—'মনা তার মহাযাত্রার খাট সাজাবে।'

কিন্তু অনেক অনুরোধেও রাজি করাতে না পেরে যেই না হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট ধরাল, অমনি মনার সে কী মারমুখো দুর্বাসা মূর্তি। ওর পাঞ্জাবির বুকের কাছটা খামচে ধরে বলল, আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছিস হাঁদু? ভুলে গেলি এই মনাই তোর বাবার খাট সাজিয়ে এসেছিল, একটা পয়সাও হাতে করেছে?

পুরনো কথা উঠতে মনার দুটি হাত ধরে কেঁদে ফেলল হাঁদু। বললে, অমন করে বোলো না মনাদা, কখনও সে কথা ভুলতে পারি? খাটে শোয়া বাবার ছবি আছে ঠাকুরঘরে। মা রোজ দু-বেলা ছবির সামনে ধূপ-ধুনো দিতেন। কাল সকালেও দিয়েছেন, হঠাৎ যে কী হল—আমার ইচ্ছে মায়ের খাটখানাও তোমাকে দিয়ে সাজিয়ে সেই ছবি বাবার পাশে টাঙিয়ে রাখব।

এর পর মনার কান্নার পালা। হাঁদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে, শ্বশুরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু আমি যে স্ত্রীর কাছে আমাদের সন্তানের নামে শপথ করেছি আর কোনওদিন—

এই কথা শুনে হাঁদু ওকে আর জোরজারি করেনি। তবে শুনেছি খাটিয়ার বদলে ও কাচের গাড়িতে করেই মাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। হাঁদুর মায়ের দৌলতে আমাদের ও অঞ্চলে এই প্রথম চলল শববাহী কাচের গাড়ি। মহাযাত্রার রথ।

এর মাসখানেক বাদেই ছেলে হল শর্মিলার। আটমাসেই পৃথিবীর আলো দেখল ছেলেটা। আর তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় মারা গেল শর্মিলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল একটাই সান্ত্বনা ছেলেটাকে বাঁচানো গিয়েছে।

নার্সের কোলে তোয়ালে মোড়া একটা পুতুল-পুতুল ছেলে দেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছিল মনা। হঠাৎ পেছন থেকে শর্মিলার বাবা ডাকেন, বাবাজি তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

মনার দু-চোখে ভ্রূকুটি।

বলুন, কী করতে হবে?

মনার শ্বশুর ওর দুটি হাত ধরে মিনতি জানায়, শর্মির শেষ অনুরোধটা তোমাকে রাখতে হবে।

মনার চোখের ভ্রূকুটি আরও প্রকট হয়।

বলুন, কী করতে হবে?

নার্স বলছিল, কিছুক্ষণ জ্ঞান ফেরার পর শর্মি না কি ওকে বলে গেছে, /যদি মরে যাই মনাকে আমার মহাযাত্রার খাটখানা সাজাতে বোলো।*

খবর শুনেই আমরা গ্রুপ থেকে কিছু ফুল নিয়ে মনার বাড়ি গেলাম। দেখলাম, উঠোনে বসে শর্মিলার মহাযাত্রার খাট সাজাচ্ছে মনা। কোনও দিকে লক্ষ নেই। যেন নতুন নাটকের স্টেজ-ক্র্যাফ্‌ট করছে। আমাকে দেখে একবার কেবল মুখের দিকে তাকাল। তার পর প্রায় স্বগতোক্তির মতোই কথাগুলি বলে গেল, কী করব এটা তো শর্মিলার শেষ ইচ্ছে। একদিন আমিই সোমার ফুলশয্যার খাট সাজিয়ে এসেছিলাম, আজ সেই হাতেই শর্মিলার মহাযাত্রার খাট সাজাচ্ছি। দুটো শিল্পই তো আমার কাছে সমান, তাই না?

AMARBOI.COM

সংবাদ প্রতিদিন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণমুক্তি

রমেন্দ্রনারায়ণ দে

বুক পকেটে ফোনটা কেঁপে উঠল। সুজন রিংটোন পছন্দ করে না বলে ফোনটাকে ভাইব্রেশন মোডে রাখে। বুকপকেটে এমন কাঁপুনিতেই সে অভ্যস্ত। পকেট থেকে ফোনটা বের করে সুজন দেখল। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে ওটা নাম দেখে ভুরু কুঁচকে গেল সঙ্গে সঙ্গে, হিরার ফোন। কেন ফোন করছে হিরা? গত পাঁচ মাসে তো কোনও যোগাযোগ ছেল না। পাঁচ মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের পর আজ হঠাৎ ফোন কেন?

পাঁচ মাস আগে আড়ম্বর করে হিরা, ওরফে নিহিরা, 'ভাদুড়ি' থেকে 'সান্যাল' হয়েছে। নতুন জীবনে হাজার কাজে হিরা নিশ্চয়ই বেজায় ব্যস্ত। তার ওপর আছে বিদেশ যাওয়ার তোড়জোড়। তার মধ্যে হিরা ফোন করল? সময় পেল? মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল সুজনের। যেমন হয়ে উঠত পাঁচ মাস আগে। ফোনটা কি ধরবে? নাকি ধরবে না? এই টালবাহানার মধ্যে কাঁপা থেমে গেল। যাক, লাইনটা কেটে দিয়েছে হিরা। হাঁফ ছাড়ল সুজন, কিন্তু ফোনটা রাখার আগেই আবার কাঁপুনি।

"হ্যালো..."

"কী হল, ফোনটা ধরছিলি না কেন?"

"ধরলাম তো।"

"কী করছিস এখন?"

"যাই করি, কেন?"

"আচ্ছা, কাল কী করছিস?"

"কাল? জানি না, কোনও প্ল্যান নেই। কেন বল তো?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হিরা বলল, "না, আসলে কালকে তো জন্মাষ্টমী, কাল তো তোর অফিস নেই।"

সুজনের সেটা খেয়াল আছে। বলল, "তাতে কী হল?"

"না, না, কাল সারাদিন কী করছিস?"

"কেন বল তো?"

"আমি ভাবছিলাম..."

কথা অসম্পূর্ণ রেখে থামল হিরা। যতই দেখা কিনা [illegible] গলায় সুজন বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

"কী? কী ভাবছিস? আর আমাকেই বা সেটা বলছিস কেন?"

"বাব্বা! কী ক্যাটক্যাট করে কথা বলছিস! অত রেগে আছিস কেন আমার উপর?"

এর উত্তরে কী বলবে সুজন? রাগ যে কেন? সেটা হিরার থেকে ভাল আর কে জানে! তবে হিরা যেটা জানে না, তা হল, রাগ হয়েছিল কিন্তু তা আর নেই। অবশ্য রাগ থাকুক বা না থাকুক, রাগের কারণটা কি হিরার অজানা? ন্যাকামো করে ও সেটা জিজ্ঞেস করল কী করে! বিরক্তিতে কিছু আর বলল না সুজন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হিরা আবার বলল, "বলছিলাম, তোর যদি বিশেষ কোনও কাজ না থাকে, তা হলে কাল কি আমার সঙ্গে একটু বেরোতে পারবি?

হিরার সঙ্গে বেরনো! প্রস্তাবটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সুজন। আবার সেই পুরনো বইয়ের পাতা ওলটানো! হঠাৎ হিরার এ-খেয়াল হল কেন? বিরক্তি সত্ত্বেও সুজন পুরনো দিনে ফিরে গেল যেন। কলেজের তিন বছর, আর চাকরির দু'বছর তো ওরা সারাক্ষণ একসঙ্গে। দিনে-দিনে তো একজনের উপর আর একজনের দায়িত্ব আর অধিকার, দুই-ই বেড়ে চলেছিল, হিরার মা করবী মাসিমার হাজার আপত্তি আছে, তা জেনেও। কিন্তু এ-ও সত্যি যে, শেষ দিন পর্যন্ত দুজনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে কোনও কথা হয়নি। নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কোনও মৌখিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসতে পারেনি ওরা।

হিরা ফের কথা বলল, "আসলে হয়েছে কী জানিস, আমার টুকটাক কিছু জিনিস কিনতে হবে। দুদিন পরেই তো আমার ফ্ল্যাইট। কেনাকাটা অনেক করেছি, কিন্তু গোছাতে গিয়ে দেখছি, খুচখাচ কিছু জিনিস বাকি।"

"তো কিনে নে," নিস্পৃহ গলায় সুজন বলল, "আমাকে সেজন্য সঙ্গে থাকতে হবে কেন?"

"এমন করে বলিস না সুজন, "হিরার গলায় পুরনো আবদার, "আমি একা-একা বাজার করতে পারি না, তুই সেটা জানিস।"

"নিয়ে নে বাড়ির কাউকে সঙ্গে।"

"ধুত, আমার আর কাউকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছে না। আমার তোকেই চাই।"

সেই পুরনো স্বর হিরার। এই সোহাগভরা স্বরে কতবার সুজনের অভিমান ভাঙিয়েছে হিরা। সুজন অবাক হয়ে গেল। কত সহজে পুরনো জানা অস্ত্র বের করে ফেলেছে হিরা। কী করে এমন পারে মেয়েরা! কী করে হিরা এখন এমন বলতে পারছে! ওদের দু'জনের মাঝখানে যে একটা পুরো পৃথিবীর ফারাক এসে গিয়েছে সেটা কি কিছু না!

অবশ্য এই ফারাকে হিরার নাকি আহ্লাদের শেষ নেই। এদিক-সেদিক থেকে খুচখাচ শুনছে সুজন। ওদের কমন বন্ধুরা খবর দিত বা খোঁচা দিত। উপযাচক হয়ে কেউ-কেউ বলে যাচ্ছে, বিদেশে পাড়ি দেওয়ার তাড়ায় হিরার ছটফটানি কতটা। এতদিনের স্বপ্ন সফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে তার। কলকাতার পচাধচা সব পিছনে ফেলে ঝকঝকে আমেরিকায় চলে যাবে, এতে তার উত্তেজনার শেষ নেই।

হিরার সঙ্গে সম্পর্কের বিশেষত্ব নিয়ে কোনও বন্ধুর সঙ্গে সুজন কোনওদিন কোনও কথা বলেনি বলে বন্ধুদের মধ্যে একটা বিরূপ ভাব আছে। তারা সুজন-হিরার এই স্বীকারহীন সখ্যতা বুঝতে পারেনি, মানতেও পারেনি। এই তো সেদিন সুরজিৎ এসে বলল, "হিরাটা মাইরি একা-একা দৌড়ঝাপ করে নাজেহাল।"

"কেন?" প্রবাল জানতে চাইল, "এত দৌড়ঝাঁপ করার কী হল?"

সুরজিৎ বলল, "ওর বরটা তো বিয়ে করে হাওয়া। এখন পাসপোর্ট ভিসার যত্ত কাজ বেচারিকে একলা করতে হচ্ছে।"

শুক্লা বলল, "আরে ছাড় তো হিরার কথা। এই দৌড়াদৌড়িতে ওর আহ্লাদের শেষ আছে নাকি।"

সুজনের মুশকিল। একদম কিছু না বললে ওরা ভাববে সে হাফসোল খেয়েছে বলে বাক্রহিত। বেশি বললে ভাববে কথা দিয়ে ব্যথা ঢাকছে। সুজন তাই আলগা করে বলল, "সে তো একটু এক্সাইটমেন্ট হবেই, আমেরিকা যাচ্ছে বলে কথা। আমার তোর হলেও এমন হত।"

"না, হত না," ঝাঁঝিয়ে উঠল শুক্লা। "অত ছটফটানি আমার হত না। হুঁ, দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। সারাক্ষণ খালি হাফাচ্ছে।"

তারপর প্রসঙ্গ বদলে গেল। ওদিকে উত্তেজনার ঝড়, এদিকে দম বন্ধ করা গুমোট। সুজনকে এই গুমোটের মধ্যেই শ্বাস নিতে হয়েছে। কী করে এসব ভুলে যাচ্ছে হিরা। কী করে এমন আবদার করে বলতে পারছে আর কাউকে না, হিরার ওকেই চাই! আস্তে করে সুজন বলল, "ভেবে বলছিস? না জাস্ট মুখের কথা, বলে ফেলেছিস?"

"না রে... একদম তা নয়," খুব অন্তরঙ্গ গলায় হিরা বলল, "অনেক ভেবে, অনেক বল সঞ্চয় করে, আজ তোকে ফোন করেছি। আমার তো আর সময় নেই সুজন।"

"আমি জানি। বললি তো, দুদিন পরেই প্লেনে উঠছিস তুই।"

"হুম...জাস্ট কাল আর পরশুদিনটা হাতে আছে।"

"মাই বেস্ট উইশেস..."

হিরা আবার বলল, "যাওয়ার আগে একবার তোর সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাই। আর কোনওদিন তোর সঙ্গে দেখা করতে পারব কি না কে জানে!"

এই ধরনেক কথায় মনে চাপ পড়ে বইকি। ঢোক গিলে মুখ খুলল সুজন, "একটা নতুন জায়গায়, নতুন জীবনে যাওয়ার আগে, কেন অযথা এসব আজেবাজে চিন্তা করছিস?"

"তুই আসবি না সুজন? থাকবি না আমার সঙ্গে একটু? প্লিজ এমন করিস না। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো শেষবার।"

"শেষবার-টেশবার আবার কী?"

"প্লিজ সুজন, প্লিজ..."

"আমি কি ফোনটা রেখে দেব?"

"ফোনটা কাটিস না। প্লিজ..."

আর কীভাবে 'না' বলা যায়, সুজন ভেবে পেল না। ঠিক আছে, এই একবার ওকে মিট করে সুজন জানিয়ে দেবে, শেষবার কাকে বলে। হাল্কা গলায় বলল, "কখন বেরবি? কোথায় যাবি?"

" তা হলে তুই আসছিস।" ঝরঝরে খুশিতে ভরে গেল হিরার গলা। হড়বড় করে বলল, "সকাল-সকাল চলে আয়। এই দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ চলে আয় গড়িয়াহাটে।"

"অত সকালে পারব না। তোর তো বাড়ির কাছে। আমাকে এই টালিগঞ্জ থেকে উজিয়ে যেতে হবে অতটা।"

"বাড়ির থেকেও কাছে। আমি তো এখন ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের পিছনে আমার শ্বশুরবাড়িতে আছি।"

"ও।"

"কাল সন্ধ্যায় চলে যাব মা'র কাছে। তার আগে দুপুরে তোর সঙ্গে ঘুরে শপিং সেরে ফেলব। ঠিক আছে, তুই এগারোটা নাগাদ চলে আয় প্লিজ। দেরি করিস না।"

ফোনটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ থম মেরে রইল সুজন। মনে-মনে হিসেব করে দেখল, আজ ঠিক পাঁচ মাস এগারো দিন পরে কথা হল হিরার সঙ্গে। এতটা সময় কেটে গেছে, কিন্তু কথায় তো কোনও ফাঁক নেই। মনে হল যেন রোজই কথা হচ্ছে। অদ্ভুত!

আগেই বুঝতে পেরেছিল সুজন। হিরা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুদের গল্প-আড্ডায় থেকেও যেন নেই। সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছিল। তবে কেন যেন সুজন বুঝতে পেরেও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি হিরাকে। অনিন্দিতাই প্রথম খবরটা দিয়েছিল। বলেছিল, "শ্রীমতী নিহিরার খবরটা কি তোরা কেউ জানিস না?"

"হিরার খবর? কী খবর?"

"ওর বিয়ে পাকা।"

সুজনের বুকে ধাক্কা লেগেছিল বটে, কিন্তু চোখমুখ নির্বিকার। শুক্লার কৌতূহল, "তাই নাকি? কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে? তুই জানিস ঠিক?"

"যা শুনেছি তা তো ঠিক বলেই মনে হয়।"

প্রবাল বলেছিল, "আরে বাবা, ঝেড়ে কাশ না! কী শুনেছিস পুরোটা বল।"

"শুনেছি হিরার বিয়ের কথা হচ্ছে কোনও এনআরআইয়ের সঙ্গে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ধাক্কা। সুজন বুক ভরা অক্সিজেন টেনে নিয়ে মাথাটাকে হাল্কা রাখে কোনওরকমে।

"বটে!" সুরজিৎ বলল, "এই একটা ভাল খবর দিলি।"

অনিন্দিতা বলল, "সব এনআরআই ভাল নয় রে।"

প্রবাল মাথা দুলিয়ে বলল, "সেটাও ঠিক। যাই হোক, এটার জন্যেও হিরাকে ক'দিন গম্ভীর-গম্ভীর দেখছি।"

সেই মন্তব্যের পিঠে কে যেন কী বলল। তার পিঠে আবার আর একজন কী বলল। সকলের ঠোঁটের নড়ন-চড়ন দেখতে পাচ্ছে সুজন, কিন্তু কারও কোনও কথা কানে আর ঢুকছে না।

কেটে গিয়েছিল আরও ক'দিন। যে হিরার সঙ্গে রোজ দেখা হত, রোজ কথা হত, তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই প্রায় চার-পাঁচ দিন। সুজন কি ফোন করে জিজ্ঞেস করবে? নাহ্, থাক। কিছু বলার হলে হিরা-ই বলবে, সে ভাবে। এর মধ্যে একদিন হিরার মাসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। অলকামাসি হাসি-হাসি মুখে বললেন, "তুমি তো নিশ্চয়ই সুখবরটা জান সুজন? খুব ভাল সম্বন্ধটা পেয়েছে দিদি।"

সুজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

"চেষ্টা তো সব মা-ই করে," ঠোঁট উল্টে অলকামাসি বললেন, "ক'জন এমন পায়!" কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সুজন বলল, "মাসি, আমার একটু তাড়া আছে। এখন আমি যাই, কেমন?"

AMARBOI.COM

তারপর এসেছিল সেই দিনটা। কফিশপের আড্ডায় বন্ধুরা সকলে মশগুল। সে সময় পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল হিরা। ওকে দেখেই প্রবালের উচ্ছ্বাস, "এই যে কন্যে, বিবাহের আগেই ডুমুরের পুষ্প হয়ে গেলে!"

" না রে, এদিক-সেদিক যাচ্ছি তো নানা কাজে," হিরার ধীর উত্তর।

"কী অত কাজ তোর?" শুক্লার প্রশ্ন।

"আরে বাবা, বিয়ের বাজার করা সহজ কাজ নাকি!" অনিন্দিতা বলল।

"সে সব তো আছেই," হিরা বলল, "তা ছাড়া নেমন্তন্ন করতে হচ্ছে না বাড়ি-বাড়ি গিয়ে? এই তো এখন এসেছি তোদের ইনভিটেশন কার্ড দিতে।"

"আরে আমাদের কার্ড দিতে হবে নাকি!" সুরজিৎ হাসতে-হাসতে বলল, "তুই না বললেও আমরা গিয়ে কবজি ডুবিয়ে খাব।"

"সে আমি জানি। তবুও নিমন্ত্রণ তো আমাকে করতে হবে," বলে ব্যাগ খেরে কার্ড বের করে একে-একে সকলকে দিল হিরা। সুজনকেও দিল।

তারপর সেদিন সন্ধ্যায় ফোন। পাঁচ মাস এগারো দিন আগের লাস্ট ফোন। ফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরতে ওপাশ থেকে ক্ষীণ গলায় হিরা বলেছিল, "সকলের সঙ্গে তোকেও কার্ড দিতে হল সুজন।"

সুজন নিরুত্তর। হিরা আবার বলেছিল, "কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দে সুজন। তোকে এই অনুষ্ঠানে আসতে হবে না। আসিস না তুই। আমি তোর সামনে ড্যাং-ড্যাং করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারব না।"

দূর থেকে ধীর পায়ে হিরাকে আসতে দেখল সুজন। তুঁতে রঙের শাড়ি পরেছে। প্রতিটি স্টেপে কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে নামা শাড়ির প্লিটগুলো যেন ছোট-ছোট লাফে এগিয়ে আসছে। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা চামড়ার ব্যাগ। সামান্য একটু ভারী হয়েছে কি হিরা? মনে হয়। কথায় তো বলে বিয়ের জল গায়ে পড়া। কাছে এসে দাঁড়াল হিরা। মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলল, "আমি কিন্তু আজকে দেরি করিনি।"

সুজন ভাল করে তাকাল হিরার দিকে। পাঁচ মাস এগারো দিন পরে সে হিরাকে দেখছে আজ। হিরা যেন আরও সুন্দরী হয়েছে। এমনিতেই সুন্দরী সে ছিল, এখন যেন তার ওপরে পড়েছে একটা লাবণ্যের পালিশ। বড় বড় চোখের উপরে সুচারু ভুরুর মাঝখানে একটা লাল টিপ। ছোট কপালের ওপর মাঝখানে সিঁথিতে সিঁদুরের সরু একটা লাইন। সুজনের দৃষ্টি খেয়াল করে মিষ্টি হাসল হিরা। বলল, "কী দেখছিস অমন করে? মোটা হয়ে গিয়েছি, না?"

নিজেকে গুছিয়ে নিল সুজন। সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, "কোন দিকে যাবি বল।"

হিরা বলল, "প্রথমে একটা শাড়ির জন্য ম্যাচিং ব্লাউজ পিস কিনতে হবে।"

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার উল্টো দিকেই ব্লাউজ পিসের দোকান। সেদিকে তাকিয়ে সুজন বলল, "দু'দিন পরেই চলে যাবি, আজ ব্লাউজ পিস কিনে কী হবে? কে বানিয়ে দেবে দু'দিনে?"

"দেখি কে দেয়! আসলে হয়েছে কী জানিস? আমার বড় ননদ কাল এসে এই শাড়িটা দিল। এমনিতে যে আমাকে খুব লাইক করে তা নয়। তবে বিদেশে চলে যাচ্ছি তো। আর ওদের বাড়িতে আজ নারায়ণ পুজো, শাশুড়ি মাকে নিয়ে যাবে। তাই এসেছিল। আসছেই যখন খালি হাতে কী করে আসে? আমার একটা শাড়ি হয়ে গেল।"

এসব সাংসারিক কথায় সুজন কী বলবে, চুপ করেই রইল। তবে কাছাকাছি রঙের ব্লাউজ পিসের মধ্যে কোনটার রং শাড়িটার সঙ্গে ঠিকঠাক যাচ্ছে, সেটা নিয়ে গুচ্ছের প্রশ্নের জবাব দিতে হল যথারীতি।

এ সুজনের জানা রুটিন। কলেজে যাওয়ার পর গত পাঁচ-ছ'বছরে কোনও শাড়ি-ব্লাউজ, জিন্স-টপ, কোনও সালোয়ার কামিজ, কোনও হাতব্যাগ, কোনও স্যান্ডাল বা সাজগোজের জিনিস হিরা কেনেনি সুজনের মত ছাড়া। বেশিরভাগ সময়ই হিরার ঘুরে ঘুরে বাজার করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় সুজন ছিল সঙ্গী। এটা ম্যাচ করছে কিনা ওটা ঠিক ডিজাইনের হল কিনা? হাতাটি ছোট করব না থ্রি কোয়ার্টার? এমনই হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে সুজনকে।

কোথাও হয়তো বেড়াতে যাচ্ছে, হিরা জিজ্ঞাসা করে বসল, "এই সুজন, বলতো পেঁয়াজ রঙের শাড়িটা পরব, না ওই কচি কলাপাতা রঙেরটা?"

হিরার এ ধরনের প্রশ্নে করবীমাসি বিরক্ত হতেন। বলতেন, "এসব তুই সুজনকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? ও কী বোঝে? কেন ওকে অযথা ব্যতিব্যস্ত করছিস।"

হেসে উড়িয়ে দিত হিরা। বলত, "সুজন কী বোঝে তা নিয়ে তোমার কোনও আইডিয়া নেই। তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাল বোঝে।"

এমন কথা শুনে কোন মা স্বস্তিতে থাকতে পারে? যুবতী মেয়েকে নিয়ে সব মা-ই চিন্তায় থাকেন, আর হিরা তো উড়নচণ্ডী, স্বাধীনচেতা মেয়ে। এই সুজন ছেলেটাকে নিয়ে কী যে সে ভাবে, কী যে করে বসবে, কে জানে। করবী দুশ্চিন্তায় ভুগছেন এসব নিয়ে, তা সুজন বুঝতেই পারত। ওর সম্পর্কে হিরার মায়ের চিন্তা ওদের বন্ধুত্বের গোড়া থেকেই। টিউটোরিয়ালে পড়তে এসে হিরার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুজনের। তারপর সুজনকে বাড়িতে এনে মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল হিরা। সুজন বুঝেছিল তাতে করবীমাসি খুশি নন। তখন ওরা ক্লাস টেন-এ পড়ে। স্কুল থেকে সোজা টিউটোরিয়াল হোমে আসত সুজন আর হিরা। কী করে যেন সুজনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল হিরার। কিন্তু উঠতে বসতে তার মা বলতেন, "ধেই ধেই করে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাটা এবার একটু কমাও। বড় যে হচ্ছ সেটা খেয়াল থাকে না?" মার ধমকের জন্য সজাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু হিরা খেয়াল করেছিল ছেলেদের কাছে ওর কদর ক্রমশই বাড়ছে। এই অ্যাটেনশন হয়তো হিরার খারাপ লাগত না। বরং বেশ উপভোগই করত। একদিন টিউটোরিয়াল হোম থেকে একসঙ্গে ফিরছিল ওরা। হিরাকে বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে যাবে সুজন। বাড়ির পিছনে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখে সেখানে ঢুকে পড়েছিল হিরা। ঢুকেই দাবি, "এই ছোটন, আমাকে একটু খেলতে দে।" জোর-জবরদস্তি করে ছোটনের হাত থেকে র‍্যাকেট নিয়ে খেলায় নেমে পড়েছিল হিরা। এর মধ্যে কোথা থেকে করবীমাসি হঠাৎ এসে হাজির। টিউটোরিয়াল হোম থেকে মেয়ের ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন, সে চিন্তায় তিনি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। হিরার গলা শুনতে পেয়ে গিয়ে দ্যাখেন, মেয়ে একপাল ছেলের সঙ্গে খেলতে নেমেছে। দেখে চেঁচামেচি করে উঠেছিলেন করবীমাসি। বাধ্য হয়ে খেলা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল হিরাকে। করবীমাসি বলেছিলেন, "তোকে এত বারণ করি তাও ওভাবে লাফাচ্ছিলি কেন?"

পরদিন টিউটোরিয়াল ক্লাসের পর ফেরার পথে সুজনকে ধরল হিরা।

"এই সুজন, কাল যখন আমি ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম তখন কি আমাকে দেখতে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ লাগছিল?"

"খারাপ? না তো। কেন?"

"বল না, আমার পোশাক কি ঠিকঠাক ছিল না?"

"পোশাক..." থমকে গিয়েছিল সুজন, এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে এই প্রশ্ন কেন। দু'দণ্ড পরে বলেছিল, "লাফালাফির খেলা তুই আর খেলিস না হিরা।"

মুহূর্তে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল হিরা। সুজনের পিঠে কিল মেরে চাপা গলায় বলেছিল, "তোরা ছেলেরা খুব অসভ্য।"

"কী অত ভাবছিস রে?"

প্রশ্নের সঙ্গে পাঁজরে খোঁচা খেয়ে সম্বিত ফিরে এল সুজনের। তাড়াতাড়ি বলল, "কই! কিছু ভাবছি না তো।"

"তা হলে কথা বলছিস না কেন?"

"কাজ শেষ হল? এবার আমি যেতে পারি?"

"এখন যাবি কী! আরও কত কাজ আছে।"

"আর কী কাজ?"

"এখন যাব কালীঘাটে।"

"কালীঘাটে? সেখানে আবার কী?"

"আছে, আছে, চল না।"

AMARBOI.COM

ট্যাক্সি করে গড়িয়াহাট থেকে কালীঘাট। তারপর খুঁজে-খুঁজে পুরনো ঘুপচি এক দোকানে এসে থামল হিরা। দোকানের গদিতে বসা বৃদ্ধ লোকটিকে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন ঠাকুরমশাই?"

মোটা চশমার ভিতর দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে হিরার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। বললেন, "চিনতে পারব না কেন! বালিগঞ্জের করবীমার মেয়ে তো তুমি।"

"এই তো চিনেছেন।"

"তা দিদি, তোমার তো দেখছি সিঁথি রাঙা হয়েছে। আমার মিঠাই কই?"

"আপনাকে মিঠাই খাবার পয়সা দেব বলেই তো আজ এসেছি। মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুরের প্যাকেট আছে না আপনার কাছে?"

"আছে দিদি, আছে। দিচ্ছি এনে ভিতর থেকে। তার আগে জামাই বাবাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?"

"জামাই বাবাজি!" হিরার মুখ আরক্ত, কিন্তু বৃদ্ধের ভুল সংশোধন করাল না। এক ঝলক সুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওহো...পরিচয় আর কী করাব...এই তো। একটু তাড়া আছে। একটা প্যাকেট ভিতর থেকে এনে দিন না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ ঠাকুরমশাই উঠে দোকানঘরের ভিতর গেলেন, নিয়ে এলেন এক প্যাকেট সিঁদুর। বললেন, "এক প্যাকেটের বেশি দিতে পারব না দিদি। মায়ের পায়ের সিঁদুর তো, সকলেই এটা চায়।"

"ঠিক আছে, এক প্যাকেটেই হবে," বলে কাঁধের ব্যাগ থেকে মানিব্যাগ বার করল হিরা। সেটা খুলে ঘাঁটাঘাটি করে দেখে বলল, "যাব্বাবা, খুচরো নেই দেখছি।" মুখ তুলে সুজনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই সুজন, তুই দু'টো একশো টাকার নোট দেতো ঠাকুরমশাইকে। আমি পরে টাকা ভাঙিয়ে তোকে দিয়ে দেব।"

সুজন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দু'টো একশো টাকার নোট ঠাকুরমশাইকে দিতেই তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। আশীর্বাদের হাত তুলে বলল, "দীর্ঘজীবী হও দিদি, চির এয়োস্ত্রী হও।"

গলি থেকে বেরিয়ে সুজন বলল, "এবার শেষ হয়েছে তো? এবার আমি যেতে পারি?"

"না মশাই," হিরার গলায় মজা, "আমার কাজ এখনও অনেক বাকি।"

"আর কী কিনবি?"

"এই তো কাছে, রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে মিউজিক স্টোরে চল। মনের মতো অনেকগুলো গানের সিডি কিনব।"

অগস্টের দুপুর। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চড়া রোদ। এ দোকানের সে দোকানের ঝাঁপের ছায়া ছুঁয়ে এঁকে-বেঁকে হেঁটে চলছে ওরা। টানা কথা বলে যাচ্ছে হিরা। কবে কোথায় ওরা কী মজা করেছিল, কখন কোনদিন সুজন ওকে কী বলেছিল, এসব হাজার কথা। মাঝে-মাঝেই সুজন কেন এসব স্মৃতিতে সায় দিচ্ছে না, সে নিয়ে অভিযোগ। সুজন হুঁ-হাঁ বলছে। এসি দোকানের ভেতর মনের আনন্দে সিডি বাছাই করল হিরা। সুজনকে বারবারই জিজ্ঞাসা করল এটা-সেটা নিয়ে। কম কথায় উত্তর দিয়ে কাজটা শেষ করল সুজন।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার উত্তপ্ত রাস্তা। সুজন বলল, "এবার শেষ হয়েছে তো তোর মিশন শপিং?"

"হ্যাঁ। আজ আর কিছু কিনব না।"

"এবার তাহলে আমি যাই?"

"যাবি? আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিবি না?"

"আবার পৌঁছে দিতে হবে? তোর বাড়ি তো অনেক দূর এখান থেকে।"

"আরে আমাদের বাড়ি না। বললাম না তোকে, এখন আমি শ্বশুরবাড়িতে আছি। এই তো কাছে, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের পিছনে। চল না, হাঁটতে-হাঁটতে যাই। একটু কথা বলি।"

অটোতে চলে যাওয়া যেত খুব সহজে, কিন্তু হিরার মুখ দিয়ে একবার যখন হাঁটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বেরিয়েছে...আবার সেই রোদ বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে হাঁটা। আবার সেই কথার ফুলঝুরি। ছোট একটা রাস্তায় ঢুকে কিছুটা এগিয়ে দোতলা একটা বাড়ির সামনে সামনে দাঁড়াল হিরা। বলল, "এই আমার শ্বশুরবাড়ি। আয়।"

"আবার আসব কি! বাড়ি পৌঁছে দিলাম তো। এবার আমি যাই।"

খপ করে সুজনের হাত ধরল হিরা। বলল, "ধ্যাৎ, এ হয় নাকি! প্রথমবার এলি, বাড়ির সামনে থেকে চলে যাবি? বাড়ির অকল্যাণ হবে না!"

"কল্যাণ, অকল্যাণ ওসব আবার কী? ছাড় তো এসব।"

"না, না, সুজন, এভাবে আমি তোকে চলে যেতে দেব না। জাস্ট একটু আয়। তারপর চলে যাস।"

"কী সব ঝামেলা করছিস বল তো? এ বাড়ির কাউকে আমি চিনি না। আবার পরিচয়-টরিচয় করা..."

"আরে বাবা, বাড়িতে কেউ নেই। বললাম না আমার বড় ননদ এসে আমার শাশুড়িকে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছে নারায়ণ পুজোর জন্য।"

"তাহলে তো আরও মুশকিল..."

"কোনও মুশকিল নেই সুজন। কেন ফ্যাকড়া করছিস? জাস্ট একটু বসে চলে যাস। আয়।"

বাড়িতে ঢুকে কী শান্তি! বাইরে গায়ে ফোস্কা পড়ার মতো তাপ, আর ভিতরটা কী শীতল ঠান্ডা! দরজা-জানলা সব বন্ধ বলে বাইরের গরম ঢুকতে পারেনি তেমন। বসার ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিল হিরা। বলল, "উফ! বাড়ির ভিতরটা কত কুল! বল?"

ওপাশের একটা জানলা খুলে দিয়ে বলল, "সব জানলা খুলব না, তাহলে ঘর গরম হয়ে যাবে। বোস। এখানে রিল্যাক্স করে বোস।"

"রিল্যাক্স-টিল্যাক্স করতে হবে না," দাঁড়ানো অবস্থাতেই সুজন বলল, 'ঢুকলাম তো তোর বাড়িতে, আর অকল্যাণের কিছু নেই। এবার আমি যাই।"

"বোস না, একটু বোস," বলে এক রকম জোর করেই সুজনের হাত ধরে ওকে বসাল হিরা। তারপর বলল, 'বেরনোর আগে কাজের মাসিটাকে বলে গিয়েছিলাম আম পোড়া সরবত বানিয়ে রাখতে। এই সরবতটা আমার ফ্যানটাস্টিক লাগে, বিশেষ করে এমন গরমের দিনে। দাঁড়া, দেখি ফ্রিজে রেখে গিয়েছে কিনা।"

ভিতরের ঘর থেকে দু'গ্লাস সরবত নিয়ে এল হিরা। একটা গ্লাস সুজনকে দিয়ে অন্যটা নিয়ে ডিভানে পাশে বসল। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "পাখাটা ফুল স্পিডে ঘুরলেও হাওয়া কী গরম রে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুজন দেখল বাস্তবিক ভাল সরবত। হিরা বলল, "কী, দারুণ না সরবতটা?"

"হুম...ভাল টেস্ট।"

"আমি জোর করে তোকে ভিতরে না আনলে তো এই টেস্টটাই পেতিস না।"

সরবত খেতে-খেতে সাধারণ কথা হল। সুজন উঠতে যাবে, গ্লাস দু'টো সেন্টার টেবিলে রেখে হিরা বলল, "আর একটু বোস। ঠান্ডা হয়ে নে।"

"না রে, এবার আমি যাই। সকাল থেকে অনেকটা সময় কাটালাম তো তোর সঙ্গে।"

"মানে? আমার সঙ্গে কাটানো সময়ের হিসাব করছিস আজ।"

এগিয়ে এসে সুজনের হাত ধরল হিরা। বলল, "আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার কোন তাড়া তো তোর কোনওদিন ছিল না। সব সময় তো আমার কাছেই থাকতে চাইতি। আমাকে কেবল আদর করতে চাইতি।"

আবার পুরনো পরিচ্ছেদের পাতা ওলটানো। এবং সেটা সুখের স্মৃতি নয়। সুজন ভিখারির মতো চাইত, হিরার দাপটের সঙ্গে না করত। সেটা শুধু একদিন নয়, অনেকদিন। অনেকবার। সুজনের অনুনয়ে কোনও কোনওদিন হাতটা ধরতে দিত হিরা, কোনওদিন তা-ও না। চোখটা নামিয়ে নিল সুজন। বলল, "তোকে কত না বিরক্ত করেছি, আয়্যাম সরি।"

"আজ সরি বলছিস, তখন তো কত রাগ করতি আমার উপর।"

"হ।" মেনে নিল সুজন। বলল, "কিন্তু আমার রাগের কোটা শেষ হিরা। সে অধিকার তো আর নেই।"

"তোর মনে আছে সেই সিনেমার টিকিট না পেয়ে আমাদের বাড়ি ফেরার পরের ঘটনা?"

এক লহমায় সুজনের মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। এমনই গরমের দিন ছিল। ঘামতে-ঘামতে বাড়ি ফিরে হিরার ঘরে বসে পাখা চালিয়ে ঠান্ডা হচ্ছিল ওরা। হিরা বলেছিল, "তুই একটু বোস, আমি চট করে গা-টা ধুয়ে আসি। গা ভীষণ চিটচিট করছে।"

হিরা বাথরুমে চলে গেলে কী একটা ম্যাগাজিন নিয়ে উলটে-পালটে দেখছিল সুজন। হিরাদের বাড়ির চাকর রাখাল এসে বলল, "দিদি কই গেল সুজনদা?"

"স্নান করতে গিয়েছে।"

"ও, আমি একটু তালতলা যাচ্ছি, আমার কাকার কাছে। দিদিকে বলে দেবেন।"

একটু পরে হিরা আসতে সুজন সেটা বলেছিল। হিরা বলল, "আমরা বাড়ি এসেছি তো, তাই তোকে বেরতে হবে। আমরা না ফিরলে কী করত?"

একটা লম্বা আলগা স্লিভলেস পোশাক পরে ছিল হিরা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে-বলতেই ঘাড়ে-গলায় পাউডার মাখল। পোশাকের প্লাঞ্জিং নেকলাইনের সুযোগ নিয়ে বুকেও পাউডার দিল যেন। তারপর বলল, "এই সুজন, পিছনে তো হাত নিতে পারি না, পিঠে একটু পাউডার মাখিয়ে দে তো।"

সুজন দেখছিল হিরার পাউডার মাখা। ফর্সা দু'টি হাত, বাহুমূলের গোলাপি আভাস, নিচু নেকলাইনের ফাঁকে বুকের লুকোচুরি দেখছিল। হিরার প্রস্তাবে চমকাল সুজন। দেখল, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে হিরা। পিঠের দিকে পোশাকটা চৌকো করে কাটা, বেশ অনেকটা নামানো। তার সামনে অল্প জলে ভেজা হিরার সুঠাম পিঠ। আর সামনে আয়নায় সে দেখতে পাচ্ছে তার বুকের স্পষ্ট বিভাজিকা। আস্তে করে কাছে গিয়ে পাউডারের পাফ হাতে নিয়েছিল সুজন। হিরার ফর্সা পিঠে পাউডার মাখাতে-মাখাতে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল তার, সে বুঝেছিল হিরা আজ অন্তর্বাস পরেনি। আধো-আধো গলায় বলেছিল, "বুকের বোতামটা একটু খুলে দিবি?"

"কী!"

"একবার একটু দে না হিরা, জাস্ট একবার।"

"খবরদার, একদম ফাজলামো করবি না সুজন।"

"ফাজলামো করছি না, সিরিয়াসলি চাইছি।" এই বলে পাফটা রেখে হিরার বুকের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সুজন। কোমর ধরে ওকে টেনে নিতে চেয়েছিল কাছে। ঝট করে সুজনের হাত ধরে হিরা বলেছিল, "সব সময় মাথায় বদ ধান্দা, না?"

"একটু আদর করলে কী হয়?"

"আসলে তুই আমাকে একটুও ভালবাসিস না। তুই ভালবাসিস কেবল আমার শরীরটাকে।"

"মোটেও তা না। আমি যে তোকে কতটা ভালবাসি সেটা তুই জানিস।"

"তাহলে সব সময় ঘনিষ্ঠতা চাস কেন?"

"আদর না করলে মন ভরে না, ভালবাসা পূর্ণ হয় না হিরা," সুজন বলেছিল, "আসলে তুই আমাকে ভাসবাসিস না তো, তাই প্রেমটা পুরো করার কোনও ইচ্ছে তোর হয় না।"

"আহা। বদমাইশি করার জন্য কী সুন্দর যুক্তি।"

"কীরে মনে নেই?" সুজনের ভাবনার পিঠে হিরার ফের প্রশ্ন।

"মনে থাকবে না কেন?" ধীর গলায় সুজন বলল, "মনে আছে।" তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "তোর কথাই ঠিক। আমি তোকে আসলে ভালবাসিনি, তাই ওরকম করতাম।"

ধরে থাকা সুজনের হাতে চাপ দিয়ে হিরা বলল, "মোটেও না। তোর কথাই ঠিক। আদর ছাড়া ভালবাসা পূর্ণ হয় না। আমাকে এখন একটু আদর কর।"

চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিল সুজন, বলল, "কী উল্টোপাল্টা কথা বলছিস হিরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তুই একজনের বিয়ে করা স্ত্রী। তার জন্য সিঁদুর তোর সিঁথিতে।"

"তাই তো তোর কাছ থেকেও সিঁদুর নিলাম আজ। যে সে সিঁদুর না, একেবারে মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর। এই সিঁদুরের টাকা আমি তোকে ফেরত দেব না।"

"সে না-হয় না-ই দিলি, তাই বলে এমন করবি।"

"কী করেছি?" একটা লোক, যাকে আমি জানি না, চিনি না, কোনওদিন আমাকে ভালবাসবে কিনা তাও জানি না, সে আমাকে জাস্ট সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে বলে আমার সব নিয়ে নিতে পারল, আর তুই আমাকে এতটা ভালবেসেও কিছুই পাবি না।"

"তবুও এই লোকটির জন্যই তুই নিজেকে তুলে রেখেছিস এতদিন। কোনওদিন মলিন করিসনি নিজেকে।"

"সেটা আমি জানি। সব সময় মনে হত, তোকে প্রশয় দিলে আমরা ভেসে যাব।"

"ঠিকই মনে হত তোর। তুই আমাকে আটকে ঠিকই করেছিস।"

"কিন্তু আজ আমি তেমন ভাবতে পারছি না সুজন। আজ যখন আমার শরীর আর অনাঘ্রাত নেই, তখন তোকে আমি সেটা দেব না কেন? ভেসে যাওয়ার ভয় আমার আর করছে না।" বলতে-বলতে আবার সুজনের হাত ধরল হিরা। তারপর চোখের পলকে হাতটা তুলে ধরে নিজের বুকে চেপে ধরে বলল, "আমাকে আদর কর।"

এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে এনে সুজন বলল, "কী করছিস হিরা! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোর।"

"হ্যাঁ, আমার মাথা খারাপই হয়ে গিয়েছে," বলে গাঢ় চোখে সুজনের চোখে তাকাল হিরা। তারপরে বুকের আঁচলটা ফেলে দিল।

চোখের সামনে যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে পারল না সুজন। স্থবির হয়ে গেল যেন। ব্লাউজের সব বোতাম খুলে ফেলল হিরা। ধবধবে সাদা ব্রায়ে বাঁধা ভরাট দু'টো স্তন। পিছনে হাত নিয়ে ব্রায়ের হুক খুলে দিল হিরা, আলগা করে সরিয়ে দিল অন্তর্বাসটা। সুজন পুরোপুরি অসাড়। এই সৌষ্ঠব দেখার জন্য হা-পিত্যেশ করেছে একদিন। এই অঙ্গ ছোঁয়ার জন্য অধীর হয়েছে কতবার। আজ, এখন, মনে হচ্ছে এ স্বপ্ন। স্পর্শ করতে গেলেই এ দৃশ্য বাতাসে মিলিয়ে যাবে। আবার হাত বাড়িয়ে সুজনের হাত ধরল হিরা, টেনে এনে বসিয়ে দিল জোড়া গোলকের একটির উপর।

আগুনে হাত লাগার মতো চমকে হাতটা সরাতে গেল সুজন। হিরা ছাড়বে না। সুজন যত ছাড়াতে চায়, তত জোরে চেপে ধরে হিরা। হাত বাড়িয়ে সুজনকে জড়িয়ে ধরে ডিভানের উপর গড়িয়ে পড়ল হিরা। সুজনের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, "কত-কত দিন চেয়েছিস আমাকে? আজ তোকে সব দেব আমি।"

"হিরা আ আ...!" সুজনের গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এল, "থাম প্লিজ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, থামব না। আজ তুই আমাকে অনেক-অনেক আদর কর। একেবারে পুরো নিয়ে নে আমাকে।"

হুঁশ ফিরে এল সুজনের। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অর্ধনগ্ন হিরার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল জোর করে। ধীর গলায় বলল, "নিজেকে ঢেকে নে হিরা।"

অধীর আর্তি বেরিয়ে এল হিরার গলা থেকে, "এদিকে তাকা সুজন, তাকা এদিকে। আমাকে নে, আদর কর।" গলা আরও শান্ত হয়ে গেল সুজনের। বলল, "সে সব দিন শেষ হয়ে গিয়েছে হিরা। এই সেই সুজনকে আর পাবি না।"

"তুই তো কিছু চাইছিস না, চাইছি আমি। একবার আমাকে নে, আমি তোর ভালবাসার ঋণ বয়ে জীবন কাটাতে পারব না।"

"অপূর্ণ ভালবাসার ঋণ হয় না।"

"ভালবাসাটা অপূর্ণ বলেই তো ঋণ।" দু'হাত সুজনের দিকে তুলে ধরে হিরা বলল, "আমি ঋণমুক্ত হতে চাই সুজন। আমি মুক্ত হয়ে এখান থেকে যেতে চাই।"

"আমার কাছে তোর কোনও ঋণ নেই।"

"আমার মনে তো আছে। তুই আমাকে ঋণমুক্ত করবে না সুজন?"

"তুই ঋণমুক্ত হলে ঋণী হয়ে যাব আমি।" সুদৃঢ় গলায় শেষ কথা বলে সামনে পা ফেলল সুজন।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, আর পিছনে তাকাল না।

এবেলা, ৭ অক্টোবর ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা

শক্তিপদ রাজগুরু

কদিন থেকেই এক নাগাড়ে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। ঝড়ো হাওয়ারও তার সঙ্গে বিরাম নেই। নির্জন বন-পাহাড়টা রাত্তিরের অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যেই বনোয়ারিলাল শেঠ-এর গাড়িটা এসে থামল ইনসাইড কোলিয়ারির সামনে। এককালে রূপানারায়ণ কোলিয়ারির বেশ নামডাক ছিল। এখনকার কয়লা ছিল এ গ্রেডেড। এক সময়ে এর মালিকের কাছ থেকে সরকার আইনবলে এটি অধিগ্রহণ করে। সে সময় এই কোলিয়ারি থেকে ভালো গুণমানের কয়লা পাওয়া যেত। পাশেই দামোদর। বেশ কিছুকাল পর এই কোলিয়ারির সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতে সরকার এই কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে এটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মাটির নিচে রয়েছে এই কালো হীরে। সরকারের কিছু কিছু লোক নিজেদের স্বার্থে নিজেদের খুশিমতো অনেক কোলিয়ারিকে আপত্তিজনক বলে কাজ বন্ধ করে দিয়ে চলে যায় অন্যত্র কয়লার সন্ধানে। আর এই সুযোগেই গজিয়ে উঠেছে বনোয়ারিলালের মতো অনেকেই, যারা এই পরিত্যক্ত কোলিয়ারি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু কর্মহীন বেকার গ্রামবাসীকে সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে এই মৃত্যুপুরীর খাদানে নামিয়ে টনটন কয়লা তুলে রাতের অন্ধকারে পাচার করে লাখ লাখ কামিয়ে সমাজের মাথা হয়ে উঠেছে। বনোয়ারিলাল এই জগতে তেমনই একটা দিনের আলোয় কালো নাম।

বনোয়ারিলাল এই অঞ্চলের নামকরা ব্যবসায়ী। তার বেশ কয়েকটা ছোট-মাঝারি লোহা কারখানা আছে। তবে তার ব্যবসার মূলভিত্তিই এই রাতের অন্ধকারে কয়লা পাচার। রাতের অন্ধকারে সে এইভাবেই লাখ লাখ টাকা আমদানি করে।

তার লোকেরা এইসব পরিত্যক্ত কোলিয়ারির জমাট কয়লা ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে কয়লা তোলে। এই কয়লার চাঙড় ফাটানোর সময় কয়লা ধসে পড়ে দু-চারজন লোকও মারা যায়। তাদের পরিবারে কিছু টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধকরে দেয়। কান্নার রোলও উঠতে দেয় না। মানুষগুলো এইভাবে চিরতরে হারিয়ে যায়, তবু বনোয়ারিলালের তৃষ্ণা মেটে না।

আজও এসেছে সে রাতের অন্ধকারে রূপনারায়ণ কোলিয়ারি অঞ্চলে। পরিত্যক্ত খাদান খানিকটা ভেঙে পড়েছে—চারদিকে ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ওদিকে তখন খনির মুখে কয়েকটা ছায়ামূর্তির ভিড়। ওরা এতকাল এই কোলিয়ারি অঞ্চলের শ্রমিক ছিল অনেকেই। এই কোলিয়ারি অঞ্চলের বাকি কিছু ওদের চেনা। ওদের সাথেই বনোয়ারি রাতের অন্ধকারে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

এইসব পরিত্যক্ত কোলিয়ারি থেকে টন টন কয়লা তোলে। ওরা এইসব কাজ করে প্রাণ হাতে নিয়ে। এদের অভাবে কারণে হোক বা স্বভাবের কারণেই হোক অনেকেই নিজেদের ভয়-ডর ত্যাগ করেছে।

তবু তারা আজ ভয়ই পাচ্ছে। বৃষ্টির রাত—খনির মুখ খোলা থাকায় নিচে জলও জমেছে। এখন এই পাতালপুরীর অতল থেকে পাম্প করে জল তোলা হয় না, আর বাইরে থেকে ফ্রেশ হাওয়াও পাঠানো হয় না। ফলে পাতালপুরীর অঞ্চলে জমতে থাকে এক ধরনের গ্যাস—মিথেন গ্যাস। কয়লা কাটার গাইতি দিয়ে কয়লা কাটাবার সময় যদি একটা স্ফুলিঙ্গ ওঠে তাহলে তাতেই সারা পাতালপুরীতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। ধসে পড়বে পাতালপুরীর কয়লার স্তর। আর সেই সময় যারা ওই পাতালপুরীতে থাকে—তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই ওরা বলে,

— আজ নিচে কাজে নামা ঠিক হবে না শেঠজি। এদিকে বনোয়ারিলাল তার অফিস থেকে এরমধ্যে বাইরের পার্টির কাছ থেকে অনেক টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছে। তাই আজই মাল নেওয়ার জন্য ট্রাকগুলোও এসে গেছে।

বনোয়ারি বলে— নাম, মাল তোল। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

ওদিকে খনির তলা তখন জলবন্দি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তাল দামোদর। বৃষ্টিতে ওই দামোদর আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ওরা বলে— বাবু, আজ দুর্যোগের রাত। খনির তলায় জল জমেছে আর মারণ গ্যাসের ভয়ও আছে। আজকের দিনটা ছেড়ে দিন।

বনোয়ারি রাতের অন্ধকারে গর্জে ওঠে—না নামলে সব কটাকে এখনই খতম করে দেব। যা নেমে কয়লা তুলে আন, নাহলে কাল থেকে তোদের কাজ বন্ধ। ওরা জানে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ওদের গরিবি জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তাই ওরা নিচে নামতে বাধ্য হয়।

নরু-সাধন-সুখরামকে ওদের সর্দার বলে— খুব হুঁশিয়ার। ভিটে মাটি। গাঁইতি মারার সময় খুব সাবধন।

ওরা জানে— কয়লা কাটার সময় গাঁইতির আঘাতে যদি স্ফুলিঙ্গ ওঠে আর তা মিথেন গ্যাসের সংস্পর্শে এলেই খনিতে বিস্ফোরণ ঘটবে। ওরা খনিতে নামতেই বুঝতে পারে খনির ভিতর যথেষ্ট মারণ গ্যাস অর্থাৎ মিথেন গ্যাস জমেছে।

ওদিকে খনিতে নামার চালু পথটাও ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে। দমবন্ধ করা পরিবেশ। এখানে বাইরের ঠা'া হাওয়া নেই।

নরু বলে— ভাইসব, দেখেশুনে গাঁইতি চালিও। হাওয়া গরম— মনে হয় গ্যাস জমেছে।

কিন্তু কিছু করার নেই। বনোয়ারিলালের হুকুম কয়লা তার চাই। এরাও বাধ্য হয়ে মৃত্যুপুরীর অতলে নেমেছে ওই লোকটার তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে।

মিথেন গ্যাস জলের চেয়ে হালকা-- তাই এই গ্যাস সহজেই উপরের দিকে জমতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে আর নিচে জল। খনি চালু থাকলে এই গ্যাস তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। কিন্তু এখন এই খনি বন্ধ— ওসব কাজও হয় না।

ওরা কয়লা কাটছে। ওরা যে কয়লা কাটছে বাইরের বাজার দর অনেক। ওরা গরমে ঘামছে—তেষ্টা পায়। তবু কয়লা তোলার বিরাম নেই। চলছে দঁড়ি ফেলে কয়লা তোলার কাজ। রাতের মধ্যে সবকটা ট্রাক কয়লা বোঝাই করতে হবে।

বনোয়ারিলালের লোক হুঙ্কার ছাড়ে—কী করছিস তোরা? মাল কাট। নে বারুদ লাগিয়ে তাড়াতাড়ি পাথর ফাটা।

— না আর্তনাদ করে ওঠে নরু। হাওয়া গরম। আজ বারুদ দিও না।

— কিছু হবে না। কথাটা শেষ করে বনোয়ারির পেটোয়া লোকটি কয়লার স্তরে সব কটা গর্তে বারুদ পুরছে। তারপর তা ফাটলেই বিরাট কয়লার স্তর ধসে পড়বে আর তাদের কয়লা তোলার পরিমাণ বাড়বে।

তারপরেই ঘটনা ঘটে যায়। এদিকে এই বারুদের কাজ শেষ করে ওদিকে ডিনামাইট চার্জ করতেই একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। মাটির নিচটা যেন কেঁপে ওঠে। ওই বিস্ফোরণের একটা স্ফুলিঙ্গ এদিকে জমে থাকা মিথেন গ্যাসে এসে লাগতেই—নিমেষের মধ্যে চারদিকের কয়লার স্তরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভিতরের সব কটা সুড়ঙ্গে মিথেনের প্রভাবে আগুন ধরে বাইরে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

ওদিকে বেশ কিছু লোক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধসে পড়া কয়লার নিচে এসে পড়েছে। পাতালপুরীতে যতটুকু অক্সিজেন নেওয়ার অবকাশ ছিল তার সবটাই ধীরে ধীরে কয়লার কালো ধোঁয়া আর লেলিহান শিখা অধিকার করেছে। ওরা তখন যে যেদিকে পারে ছুটছে—প্রাণভয়ে চিৎকার করছে। ওদিকে কয়লার ধসে বেশ কিছু মানুষও চাপা পড়েছে।

বনোয়ারিলালও ভাবতে পারেনি যে এমন একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে। রাতের অন্ধকারে তখনও যেন পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। ওদিকে পাতালপুরীর গহ্বর থেকে তখন শুধু আগুনের শিখা—কালো কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। নিচে তখন আগুন ওই রক্তমাংসের প্রাণগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। নিচে থেকে ভেসে আসে ওদের বাঁচার জন্য করুণ আর্তি। বৃষ্টির জল চুঁয়ে পড়ছে নিচের মাটিতে। ওদিকে পড়ে আছে নরু।

নরুর জ্ঞান নেই। ওর দুটো পা-ই থেঁতলে গেছে। কোনওমতে ধসের নিচ থেকে বেঁচে বের হয়ে এসেছিল। ওর সঙ্গীরাও ওর সঙ্গেই ছিল কাছাকাছি—তাদের কোনও খবর নেই। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে দামোদর। ওদিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জীর্ণ কয়লার স্তর ফেটে গেছে। এমন সুযোগ ছাড়তে নারাজ দামোদরও। জলের প্রবল স্রোত বাকি মানুষগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাতালপুরীতে।

বনোয়ারি গর্জে ওঠে—এগুলোকে তুলে ফেলে দে। এতগুলো মুর্দা লাশ পুলিশের চোখে পড়লে পিছনে পড়ে যাবে।

সর্দার মন্টু সিং বনোয়ারির পুরনো লোক। সে বলে, - ঠিক হ্যায় সাবজি। আপ ফিকর মাৎ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনোয়ারিলাল জানে এতে তার একটু ক্ষতি হবে—কিন্তু আজ এই ক্ষতি তার কাছে তেমন কিছু নয়। এমন ঘটনা এইসব কোলিয়ারি অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই ঘটে।

মন্টু সিং—এসব কাজে পারদর্শী। সেও এই লাশগায়েব করার জন্যে বনোয়ারির কাছ থেকে মোটা বাণ্ডিল পেয়েছে। রাতের অন্ধকারে চলেছে লাশভর্তি ট্রাকটা। ট্রাকের মেঝেতে দগ্ধ অর্ধদগ্ধ থেঁতলে যাওয়া লাশগুলো গাদা করে রাখা—তার মধ্যে নরুর দেহটাকেও তুলেছে ওরা। তখনও নরুর জ্ঞান ফেরেনি।

রাতের অন্ধকারে লাশভর্তি ট্রাকটা চলেছে সীমাহীন গতিতে। জ্ঞান ফেরে নরুর। সারা দেহে তীব্র অসহ্য যন্ত্রণা তাকে এতক্ষণ অজ্ঞান করে রেখেছিল। বৃষ্টির জল পড়ে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ খুলে দেখে তার চারদিকে বিকৃত-রক্তাক্ত নিথর লাশগুলোকে।

নরুর নজর পড়ে ট্রাক ড্রাইভারের সিটের দিকে। ভিতরের নীলাভ আলোয় দেখতে পায় মন্টু সিং-এর মুখটা। ওই শক্ত কঠিন মুখটা নরুর চেনা। একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। একই বস্তির ছেলে ওরা। ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে খেলেছে— বড় হয়েছে। নরু-র মনে হয় ওরা তাকে নিয়ে চলেছে কোনও হাসপাতালে।

নরু সর্বশক্তি দিয়ে একবার ডাকল—ম-ন্টু।

মন্টু সিং চমকে উঠে চাইল। মন্টু ভেবেছিল নরুও ওদের মতো মারা গেছে। ওকে হঠাৎ এই লাশের গাদায় বেঁচে থাকতে দেখে চাইল।

নরু অস্ফুট কণ্ঠে বলে চলেছে— জল, একটু জল, খুব তেষ্টা পেয়েছে।

মন্টু সিং দেখছে নরুকে— কি করবে ভাবছে মন্টু। তখনও ট্রাকটা ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে— বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। বনোয়ারীলালের দেওয়া মোটা টাকার বান্ডিলটা তখনও ওর পকেটে মজুত। চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে।

নরু তখনও অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে চলেছে জল। একটু জল। খুব তেষ্টা পেয়েছে।

মন্টু সিং ওর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। তখন ওর লাশবাহী ট্রাকটা এসে পড়েছে পাহাড়ি এলাকায়। পাহাড়ের নিচে বিশাল জলাধার। অতল তার জলরাশি। ট্রাকটা চলেছে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে। মন্টু সিং স্টিয়ারিং-এর উপর থেকে উঠে আসে। তারপর চলন্ত ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ে।

লাশবাহী ট্রাকটা এগিয়ে চলেছে সামনের খাদের দিকে। লাফ দিয়ে পড়ার সময়ও মন্টু নরু-র আর্তনাদ শুনতে পায়—এ-ক-টু জ-ল।

মন্টু দরজা খুলে লাফ দিয়ে পড়ামাত্র লাশবাহী ট্রাকটা কিছুটা এগিয়ে ছিটকে কয়েক হাজার ফুট নিচে পড়ে বিশাল জলধারায়। জলে পড়ে একটা শব্দ তুলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেটা।

মন্টু সিং বিড় বিড় করে বলে ওঠে—যা শালা—বুক ভরে জল খেয়ে তেষ্টা মেটা গে।

বর্তমান, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়নিকা আর চয়নিকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আচ্ছা, আমি কি এই বেঞ্চটার এই ধারে একটু বসতে পারি?

বসুন না, অসুবিধে কী? বেঞ্চ তো ফাঁকাই রয়েছে।

হ্যাঁ, তা ঠিক। রাতের দিকটায় লেকটা ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে। আর এ বার কলকাতায় শীতটাও পড়েছে জেঁকে, কী বলেন?

হুঁ, শীতকালে শীত তো পড়ারই কথা।

যা বলেছেন। কিন্তু যে সময়ে যা হওয়ার কথা, তা আর হচ্ছে কোথায় বলুন। বর্ষায় বৃষ্টি হচ্ছে না, শীতে ফি-বছর শীত পড়ছে না, উত্তর মেরু গলে যাচ্ছে, গ্রীষ্মকালে দিব্যি ফুলকপি, বাঁধাকপি ফলছে।

হুঁ, কথাটা ভাববার মতো।

কিছু মনে করবেন না, আপনি এক জন বেশ টাফ লুকিং ইয়ং ম্যান, রক্তের জোর আছে, মানছি। তবু আজ যা শীত পড়েছে তাতে আপনার আরও একটু প্রোটেকশন নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। আপনার গায়ে তো গরমজামার নামগন্ধও দেখছি না মশাই। শুধু শার্ট-প্যান্টে এই দারুণ ঠান্ডা সহ্য করছেন কী করে?

ওটা অভ্যাস বসতে পারেন। শীতের শীতভাবটা অনুভব করতে হলে বেশি গরমজামা পরলে হয় না।

আমার তো মশাই গায়ে দু'দুটো সোয়েটার, বাঁদুরে টুপি এবং কম্ফর্টারেও শীত সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

আপনি বেশ বয়স্ক মানুষ, আপনার কথা আলাদা। এই শীতে এত রাতে লেকের ধারে বসে থাকাটাও আপনার উচিত হচ্ছে না।

ঠিকই বলেছেন। যৌবনে শরীর বলে কিছু যে আছে, তা যেন টেরই পেতাম না। ব্যথাট্যথা পেলে বা অসুখ হলে অন্য কথা, নইলে নয়। কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব ক'টা প্রত্যঙ্গই যেন জানান দিচ্ছে যে, তারা আছে এবং তারা খুব একটা সুখে নেই। হাঁটু বলুন, ঘাড় বলুন, চোখ বলুন, হার্ট বলুন, লাংস বলুন— কেউই নালিশ করতে ছাড়ছে না। সারা শরীরে যেন সারাক্ষণ কোলাহল।

এত রাত অবধি আপনি বাইরে রয়েছেনই বা কেন? বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

না মশাই, সে উপায় নেই। রাস্তায় ঘাটে বা বাড়িতেও যদি হঠাৎ কিছু হয়, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে আমাকে এই বুড়ো মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছে। তাতে আবার ডিসট্রেস অ্যালার্ম সেটা করা আছে। বিপদ বুঝলেই একটা বোতামে চাপ দিলে আমার দুই ছেলে আর এক মেয়ের কাছে খবর চলে যাবে।

হ্যাঁ, কিন্তু বিপদকে ডেকে আনার দরকার কী আপনার? শীতকালে বয়স্ক মানুষদের প্রেশারজনিত বিপদ বেশ বেড়ে যায়। ঘাম হয় না বলে শীতকালটা একটু বিপজ্জনক।

আপনি ডাক্তার নাকি?

আজ্ঞে না। আজকাল এ সব ছোটখাটো ইনফর্মেশন সকলেই রাখে। আমার বাড়িতেও বয়স্ক মানুষ আছেন। ডাক্তারদের আসা-যাওয়া আছে।

তা তো ঠিকই। কিন্তু আমি সন্ধ্যের পর লেকের ধারে মোটেই থাকি না। বাড়ি ফিরে গিয়ে টিভি দেখি বা বই পড়ি। আজ বিশেষ কারণে যাইনি।

কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাকি কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন?

কোনওটাই নয়। আসলে আমি একটু ইনকুইজিটিভ টাইপের। ছেলেবেলা থেকেই আমার সব বিষয়ে একটা অনাবশ্যক কৌতূহল। সেটা অনেক সময়ে বিপদের কারণ হয়েছে।

কৌতূহল! সে তো ভাল জিনিস।

কৌতূহল থেকেই তো মানুষের সভ্যতা শুরু হয়েছিল!

সেটা তো অনেক বড় কথা মশাই। তবে কৌতূহল কখনও কখনও বিপজ্জনক হলেও সেটা থাকাই ভাল। নেসেসিটি যদি ইনভেনশনের মা হয়, তা হলে ইনকুইজিটিভনেস ইজ দ্য মাদার অফ নলেজ, কী বলেন?

কথাটা শুনতে মন্দ লাগল না। তা আপনার আজকের কৌতূহলটা কী নিয়ে?

আপনার জানবার কথা নয়, আমি মোটেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লেক এর চার পাশে রোজ ঘুরপাক খেতে আসি না। আমি আসি নানা রকম মানুষ দেখতে, আর তাদের মুখ ও ভাব-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে অনুমান করতে। এই যেমন লোকটা কেমন, তার আজ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়েছে কি না, ব্যতিকগ্রস্ত মানুষ কি না, বিড়বিড় করে কি না, পাগলাটে বা খ্যাপাটে কি না, মেয়েছেলে দেখলে ছুঁকছুঁক করে কি না, চোর-চোট্টা বা পকেটমার বা নেশাখোর বা গুণ্ডা-মাস্তান কি না—এই সব আর কী! মানুষের তো ভ্যারাইটির কোনও শেষ নেই। আর ওই অনুমান এবং ইনফারেন্স ড্র করা ওটাই আমার হবি।

বাঃ, বেশ ভাল। মানুষকে অবজার্ভ করা তো আমাদের সকলেরই হবি হওয়া উচিত। আর অবজার্ভেশনের জন্যই না শার্লক হোমসের অত কদর।

হেঃ হেঃ যা বলেছেন। আমি অবশ্য শার্লাক হোমস জাতীয় লোক নই। কারণ, কোনান ডয়েল হোমসের মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্থাপন করেছিলেন বলে আমার ধারণা। নইলে ও-রকম সূক্ষ্ম ডিকাকশন সম্ভব নয়। তবে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শার্লক হোমস নন, আপনি।

আমি! অবাক করলেন মশাই। আমি তো বসে থাকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবেই বুঝুন। এক জন শক্তপোক্ত চেহারার লম্বা-চওড়া লোক এবং বেশ অ্যাট্রাকটিভ ইয়ং ম্যান চুপচাপ দু'তিন ঘন্টা লেক-এর ধারে বসে থাকাটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আপনার কিন্তু এখন বাড়ি যাওয়া উচিত। টুপটাপ করে হিম পড়ছে, এবং বেশ ঘন কুয়াশা জমছে চার দিকে।

আজ আমাদের বাড়িতে ভোলা মাছ রান্না হয়েছে। ভোলা মাছ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। রাতে ওই ভোলা মাছের ঝোল দিয়ে রুটি খেতে হবে ভেবে আর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না।

তার মানে কি ভোলা মাছের ভয়ে আপনি আজ বাড়ি ফিরবেন না?

না মশাই, তা বলিনি। আসলে আজ বাড়ির দিকে টানটা এমনিতেই একটু কম। আর তার কারণ হল ভোলা মাছ।

বুঝেছি, কিন্তু ভোলা মাছ যে খেতে এত খারাপ তা আমার জানা ছিল না।

খারাপ নয়। আমি পছন্দ করি না বলেই জিনিসটা খারাপ হবে কেন? আমার গিন্নি, দুই ছেলে, বউমারা এবং আমার জামাইও ভোলা মাছ তোলা-তোলা করে খায়। আপনি কি ভোলা মাছের ভক্ত?

সেটা বলা শক্ত। বড় মাছের টুকরো আমার সবই এক রকম লাগে। কোনটা ভোলা, কোনটা রুই, তা বুঝবার মতো বিচক্ষণতা আমার নেই।

বেঁচে গেছেন মশাই। যাদের খাওয়া নিয়ে বায়নাক্কা নেই, তারা 'লক্ষ্মীপুরুষ' কথাটা প্রথম শুনলাম।

সব কথা ডিকশনারিতে পাবেন না মশাই, মানুষ নিত্য নানা রকম নতুন শব্দ সুবিধে মতো তৈরিও করে নিচ্ছে তো! এ কথাটা আমার গিন্নি ব্যবহার করেন, তবে আমার প্রসঙ্গে নয়। আমার প্রসঙ্গে তাঁর ভাল কথা কমই আসে।

মনে হচ্ছে আপনারা বেশ হ্যাপি ফ্যামিলি।

আনহ্যাপিও নয়। তবে আমার ফ্যামিলি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কিন্তু। আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন।

আচ্ছা বেশ। এ বার বরং আপনার কথাই শোন যাক।

আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

অবশ্যই। আমার নাম গন্ধর্ব মহাপাত্র। আমার নাম শতদ্রু বসুঠাকুর। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমি রোজ লেক-এ মোট চার বার চক্কর দিই। প্রথম চক্করে আমি আপনাকে দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় চক্কর থেকে আপনাকে আমি লক্ষ করতে শুরু করি। আমার মনে হল আপনিকারও জন্য অপেক্ষা করছেন। কোনও লেডি কি?

আরে না। এর মধ্যে আবার লেডি আনার কী দরকার।

আহা লজ্জা পাবেন না মশাই। ওতে লজ্জার কী আছে? আজকাল তো প্রেম-ভালবাসা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলভাত। আর কত সুবিধেও হয়ে গেছে বলুন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোটেল- রেস্তোরাঁ, ডিস্কো, মেলামেশায় কোনও বাধাই নেই। আর আমাদের আমলে শুধু এক বার চোখাচোখি ঘটাতেই কত কাঠখড় পোড়াতে হত। রেবার বাবা তো আমাকে এক বার ট্যাঁটা নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

রেবা কে?

সে ছিল এক দিন। পৃথিবীতে রেবা ওই এক পিসই এসেছিল। বাই দি বাই, ট্যাঁটা কাকে বলে জানেন?

আজ্ঞে না।

ডেঞ্জারাস জিনিস মশাই। বাঁশের ডগা চিরে সরু সরু একগুচ্ছ বল্লম বানানো হয়। তাই দিয়েই গেঁথে জল থেকে মাছ তোলে।

ও বাবা!

তবেই বঝুন, আমাদের আমলে প্রেম করাটাও কত বিপজ্জনক ছিল।

শেষঅবধি কি?

না, উনি পারেননি। ট্যাঁটাটা চালিয়েছিলেন ঠিকই, তবে আমি তখন দারুণ দৌড়বাজ ছিলুম। চারশো আর আটশো মিটারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ও ন্যাশনাল মিটে অল্পের জন্য সেকেন্ড হই।

সে কথা নয়, আমি রেবা দেবী সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।

না মশাই, শেষ অবধি রেবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। হল বরানগরের শ্রীমন্ত ঘোষের সঙ্গে। রেবা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। আর আমি পুরনো সবকথা আগলে পড়ে রইলুম। তবে আমার মনে হয়, আপনাদের সময়টাই বেশ ভাল। বিরহে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। এক জন রেবা হড়কে গেলেও তার জায়গায় কেয়া কি শ্রেয়া, কি সুদেষ্ণা কি চৈতালী— কেউ না কেউ ঠিক এসে জুটে যায়। মেয়েদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখলে অন্তত তাই মনে হয়। আমি অকপটে স্বীকার করি যে, আমাদের সময়টা ছিল যাচ্ছেতাই। চালের মন আট টাকা, সর্ষের তেল আড়াই টাকা সের, টাকায় কুড়িখানা ল্যাংড়া আম হলে কী হয়, লাইফ ওয়াজ নট ওয়ার্থ লিভিং। আজকে? আমাদের আলোচ্য বিষয় অবশ্য এই সব স্মৃতিচারণও নয়। আসল কথা হল, আপনি আজ যার জন্য বসেছিলেন তিনি আজ নির্দিষ্ট সময়ে আসেননি, তাই তো!

ব্যাপারটা ও-রকমই মনে হতে পারে বটে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আপনাকে আমি এক বারও মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখিনি। লেডিটির দেরি হচ্ছে কেন, কোথায় আটকে রইলেন, শরীর খারাপ হল কি না, এ সব জেনে নেওয়ার কোনও চেষ্টাই কেন করলেন না?

তাঁর মোবাইলের নম্বর আমার জানা নেই।

এঃ হেঃ, নতুন আলাপ বুঝি? আজকাল তো শুধু মোবাইল নম্বরটা হলেই হয়, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই দরকারই হয় না। একখানা খুদে মোবাইল থেকে কত কী হয়ে যাচ্ছে মশাই। লাখ লাখ টাকার ট্র্যানজ্যাকশন, রোমান্টিক প্রেম, রাস্তা হারালে পথের হদিশ, কত কী? আর আপনি সেই মোবাইল নম্বরটিই নিয়ে রাখেননি। তবে শেষ অবধি আমার মনে হল, মামলা এত সহজ নয়। লেডিটি আসেননি, এবং হয়তো আর আসবেনও না। তিনি হয়তো আমার রেবার মতোই আপনাকে বিরহ সংসারে ভাসিয়ে গেছেন। এবং আপনার মনের অবস্থা স্টেবল নেই। এমনকী আমার এমন ভয়ও হল, লেক নির্জন হয়ে গেলে আপনি হয়তো আত্মহত্যা করে বসতে পারেন। আর সেই জন্যই আমি আজকের ভয়ঙ্কর শীতকে গ্রাহ্য না করে আপনার ওপর নজর রাখছিলাম। আমার ডিডাকশনটা কি আপনার লজিক্যাল বলে মনে হচ্ছে না?

হচ্ছে। শুধু লজিক্যালই নয়, নির্ভুলও। দু'একটা জায়গায় একটু মেরামত করে নিলেই হবে।

যেমন?

যেমন লেডিটি আসেননি, এ কথাটা ঠিক নয়। তিনি এসেছেন এবং হয়তো এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সর্বনাশ। তিনি কোথায় বসে আছেন, সেটা কি খুঁজে দেখেছেন?

খোঁজার প্রয়োজন নেই। তিনি কোথায় বসে আছেন তা আমি জানি।

আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! এক জন লেডি এসে আপনার জন্য এই ঠান্ডায় বসে আছেন আর আপনার মোটে গা নেই? না, না, মেয়েদের অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা কষ্ট দেওয়াটা মোটেই পৌরুষের লক্ষণ নয় মশাই।

ব্যাপারটার মধ্যে একটা ঘাপলা আছে।

ঘাপলা? কী রকম ঘাপলা গন্ধর্ববাবু?

ঘাপলাটার নাম নয়নিকা।

একটু বুঝিয়ে বললে হয় না? আপনাদের ভোকাবুলারি—আমি বুড়ো মানুষ তো নাও বুঝে উঠতে পারি।

নয়নিকার পিছনে আমি আট বছর ঘুরেছি। নয়নিকা আমাকে কখনও প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ, কোনওটাই করেনি, হাতে রেখেছে মাত্র। আমি যখন মিলিটারি সার্ভিসে অরুণাচলের বর্ডারে ছিলাম, সেই সময়ে সে একটা বেসরকারি এয়ারলাইন্সে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করত। এক বার বিখ্যাত শিল্পপতির ছেলে অভিষেক মেহেরার সঙ্গে একটা ফ্লাইটে তার পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হয়। অভিষেক নয়নিকাকে বিয়ে করে সোজা লন্ডনে চলে যায়। সেখানেও মেহেরাদের বিরাট ব্যবসা। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট।

এ তো সেই রেবারই গল্প। তবে রেবা স্বেচ্ছায় শ্রীমন্তকে বিয়ে করেনি, তফাত এটুকুই। কিন্তু ফল আউট তো একই।

যে আজ্ঞে। তবে রেবার সঙ্গে নয়নিকার যুগোপযোগী একটু তফাত আছে। আগে মেয়েরা বিয়ে হওয়ার পর সেটল হয়ে যেত। আজকাল নানা রকম ফ্যাকড়া হয়। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরুণাচল থেকে ফিরে এলে হঠাৎ এক দিন চয়নিকা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

চয়নিকাটা কে? নয়নিকার বোন নাকি?

হ্যাঁ, ছয় বছরের ছোট। শি ইজ আ টিন এজার।

বুঝলাম, এর পর বলুন।

প্রথমটায় কথাই বলতে পারে না। ভীষণ নার্ভাস, ভীষণ অ্যাজিটেটেড। তিনটে আইসক্রিম খাইয়ে তাকে খানিকটা ঠান্ডা করার পর যে খুব সংকেতে, খানিক কথায়, খানিক চাউনিতে, খানিক চোখের জলে যা বলল, তাতে মনে হল, শি ইজ অর অলওয়েজ ওয়াজ হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ উইথ মি। কিন্তু দিদির জন্য সে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারেনি। তার দিদি আমাকে ডিচ করায় সে একটুও দুঃখ পায়নি।

বলেন কী মশাই, এ তো নভেল।

যে আজ্ঞে।

তা আপনি কী করলেন?

আমার মনের অবস্থা অনুমান করে নিন। নয়নিকা গন। আমি ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ায় ব্যর্থ চেষ্টা করছি, ঠিক এই সময়ে চয়নিকা ইজ নকিং অন দ্য ডোর। অ্যাকসেপ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক ঠিক। ও রকমই হয় বটে।

কিন্তু চয়নিকা হাল ছাড়ল না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে সে আমাকে কম্পানি দিয়েছে, এগজিবিশন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে গেছে। কবিতা শুনিয়েছে, গল্পের বই এবং ধর্মগ্রন্থ পড়তে দিয়েছে, গঙ্গার ধারে বা থেকেছে পাশে।

তবু কি মেয়েটার প্রতি আপনার মন নরম হল না?

হল, চয়নিকা নয়নিকার মতো অত সুন্দরী নয় ঠিকই, কিন্তু শি হ্যাজ আ চার্ম অফ হার ওন। স্মার্ট বা ছলবলে মেয়ে নয়। একটু ঘরোয়া, শান্ত। আস্তে আস্তে আমার মন নরম হচ্ছিল। এমন একটা সময় এল যে, আমার মনের মধ্যে নয়নিকা আর চয়নিকার একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। দু'জনেই আমার মনের দুটো দিক দখল করে দুটো বনবেড়ালের মতো ফুঁসছে।

না না গন্ধর্ববাবু, এই উপমাটা ঠিক জুতসই হল না। দু'জন লেডিকে বনবেড়ালের সঙ্গে তুলনা করাটা আনরোমান্টিক।

উপমাটা জুতসই হল না ঠিকই। তবে কথা আছে।

কী কথা।

ঠিক এই সময়ে নয়নিকা অভিষেক মেহেরাকে ডির্ভোস করে বিলেত থেকে দেশে ফিরে এল এবং এসেই হন্যে হয়ে সে তার পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে নেমে গেল। বাপের বাড়িতে পুরনো ঘর দখল করল, পুরনো চাকরি ফিরে পেল এবং পুরনো প্রেমিকের ওপর চড়াও হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে আপনি?

যে আজ্ঞে। ফলে দুই বোনের মধ্যে প্রবল প্রবলেম।

ভাগ্যবান লোক মশাই আপনি, দু'জন লেডি আপনাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে!

আমার তো উল্টোটাই মনে হয়। দোটানায় পড়ে আমার তো নিজেকে জরাসন্ধের মতোই লাগছে।

আহা, গল্পটা আপডেট করুন। এর পর কী হল?

সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। নয়নিকা আর চয়নিকাকে আমি বলে দিয়েছি তারা নিজেরা বসে একটা সিদ্ধান্ত নিক। আমি তাদের দু'জনকেই অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি, কিন্তু তা আইনে আটকায়। তবে আমার পক্ষপাত নেই। তারা যে সিদ্ধান্তই নিক, আমি মেনে নেব। হয় নয়নিকা, নয় চয়নিকা।

তা শেষ অবধি কী হল?

হল নয়, হচ্ছে। কাছেই দেশপ্রিয় পার্কে নয়নিকা আর চয়নিকা পাশাপাশি বসে একটা সেটলমেন্টে আসার চেষ্টা করছে। রায় যার পক্ষে যাবে সে এসে আমাকে জানাবে।

আর সেই জন্যই আপনি এই ঠান্ডায় বসে আছেন?

যে আজ্ঞে।

এ তো খুব টেনশনের ব্যাপার হল মশাই।

খুব।

তা রায়টা কার পক্ষে যাবে বলে আপনার মনে হয়?

আপনিই বলুন।

আমার ভোট চয়নিকা।

তাও হতে পারে।

তবে নয়নিকাও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। বড্ড মুশকিল হল গন্ধর্ববাবু। তবে আমি মশাই এখন বাড়ি যাচ্ছি না। এই চেপে বসে রইলাম। এর একটা হেস্তনেস্ত না দেখে বাড়ি গেলে রাতে আমার ঘুম হবে না।

ইউ আর ওয়েলকাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ নভেম্বর ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরামদায়ক মৃত্যুর কথায়

শেখর বসু

চাকরি থেকে অবসারপ্রাপ্ত তিন বন্ধু প্রতি বুধবার দক্ষিণ কলকাতার এই ক্লাবে এসে বসে। লনের এক ধারের তিনটে চেয়ার ধরতে গেলে এদের জন্যে নির্দিষ্টই থাকে। ওখানে বসে ঘণ্টা তিনেক গল্পগুজব করে। পরিমিত পরিমাণ হুইস্কিতে একটু বেশি পরিমাণ জল মিশিয়ে বহুক্ষণ ধরে খায়।

তিনজনেই একসময় কেন্দ্রীয় সরকারের বড় চাকুরে ছিল। পেনশনের টাকায় দিব্যি চলে যায় ওদের এখন। গুরুদায়িত্ব ওরা মোটামুটি ভালভাবেই পালন করেছে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে সুপাত্রে। ছোট, মাঝারি, কখনও কখনও দু-তিনটে বড় শখ মেটাতে কারুরই তেমন কোনও অসুবিধে হয় না। শরীরস্বাস্থ্য এখনও পর্যন্ত ভালই আছে। মাঝেমধ্যে একটু অনিদ্রা, একটু হাঁটু বা কোমরে ব্যথা, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। গাড়ি তিনজনেরই। পালা করে এক-এক বুধবার এক-একজন গাড়ি নিয়ে আসে। ফেরার পথে দুজনকে বাড়িতে নামিয়ে তৃতীয়জন ফেরে। ড্রাইভার গাড়ি চালায়। তিনজনেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। জীবনটা তো ভালই কেটে গেল।

হ্যাঁ, কিছু দুঃখকষ্ট, ব্যর্থতা কার জীবনে না থাকে। সেগুলোর কথা মনে না রাখলেই হল। কথায় বলে না—কাউন্ট ইওর ব্লেসিংস। শুধু ভালগুলোর কথাই মনে রাখো। ব্যস, তাহলেই তুমি সুখী। প্রতি বুধবার তিনজন সুখী মানুষ ক্লাবে আসে, এবং আরও একটু সুখী হয়ে বাড়ি ফেরে।

ব্যতিক্রম শুধু আজকের বুধবারটা। তিন বন্ধুই থেকে থেকে কিছুটা অসহিষ্ণু আর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। আর কেন জানে না, কোত্থেকে একটা বেয়াড়া ভয় উঠে এসে চেপে ধরছিল ওদের।

গৌর ভৌমিকের মৃত্যুর খবর ক্লাবে আসার সঙ্গে সঙ্গে অভিরূপই দিয়েছিল। শুনে বাকি দুই বন্ধু—নির্মাল্য আর কল্যাণ চমকে উঠেছিল খানিকটা। কয়েকদিন আগেই ওদের সঙ্গে চৌরঙ্গিতে দেখা হয়েছিল গৌরের। স্বভাব এবং চেহারায় রীতিমতো দাপুটে ছিল গৌর। এমন একটা লোক পট করে মরে গেল। কী হয়েছিল ওর?

ঠাট্টার গলায় জবাব দিয়েছিল অভিরূপ। 'কিচ্ছু হয়নি। বরাবরের মতো ফূর্তিফার্তা করে ভোররাত্তিরে বাড়ি ফিরেছিল। ফিরে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুম মেরেছিল টেনে। তারপর উঠে ঠেসে জলখাবার খেয়ে [illegible] নিয়ে [illegible] বসেছিল। মিনিট পাঁচেক

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

বাদে ওর বউ চাপের কাপ হাতে নিয়ে এসে দেখে ব্যাটা ফুটে গেছে।'

'হার্ট-অ্যাটাক?'

'তা ছাড়া আর কী। ম্যাসিভ অ্যাটাক। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তার এসে বলল, বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গিয়েছে। এক নম্বরের স্কাউন্ড্রেল এই গৌরটা। সারা জীবন ধরে কম নোংরামো করেছে। কিন্তু কী কপাল দেখ, শালাকে মৃত্যুযন্ত্রণা পর্যন্ত ভোগ করতে হল না।'

'মৃত্যুযন্ত্রণা ঠিকই ভোগ করতে হয়েছিল, তবে সেটা হয়ত দু-তিন মিনিটের।'

'এত বড় জীবনে দু-তিন মিনিট কোনও হিসেবের মধ্যে পড়ে না। কত লোক কত কাল ধরে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার পরে মরে।'

অভিরূপের এই কথাটা শুধু দুই স্রোতাকেই নয়, স্বয়ং বক্তাকেও বুঝি খানিকটা বিষণ্ণ করে তুলেছিল। তিনজনেরই এমন কয়েকজন চেনা মানুষের কথা মন পড়ে গিয়েছিল যারা দীর্ঘকাল ধরে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছে। দুররোগ্য অসুখ, সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, স্রেফ জড়পদার্থ হয়ে বেঁচে আছে তো আছেই।'

কল্যাণ বলল, 'আমার এক মাসতুতো বোনের শাশুড়ি, সাত বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছে। পুরো ভেজিটেবল। কোনও বোধবুদ্ধি নেই। শুধু প্রাণটা আছে। এ-সব ভাবলে সত্যিই ভয় লাগে। আমার কপালে কী আছে কে জানে।'

'অমন অবস্থায় পৌঁছবার আগেই আমি আত্মহত্যা করব।' নির্মাল্য কথাটা একটু জোর দিয়ে বলল এবং জোর গলায় হাসল। কিন্তু ওই হাসি বাকি দুই বন্ধুকে বুঝি ছুঁতেও পারল না।

এই ক্লাবের বেয়ারারা সাহেবদের অনেকদিন ধরেই চেনে। কে কী খায়, ভাল করে জানে। আমেদ তিনজনের জন্যে হুইস্কি নিয়ে এল আর বাকেটভর্তি টুকরো বরফ। স্যাঁকা পাপড়, দু প্লেট ফিশ ফিঙ্গার, চানাচুর, কুচোনো আদা-পেঁয়াজও দিয়ে গেল।

তিনজনেই কেমন যেন তৃষ্ণার্ত বোধ করছিল। সামান্য আগে-পরে তিনজনেই বড় মাপের চুমুক দিল গ্লাসে। তিনটে ডেক-চেয়ার আলো-আঁধারি লনের একেবারে ধারের দিকে। পাশেই পাতাবাহারের লম্বা সারি, তার পাশেই হেজ্। ঘাসপাতা আর বুনো ফুলের গন্ধ ভাসছিল বাতাসে।

অভিরূপ বলল, 'এই গৌরটা কী রেক্‌লেস লাইফ লিড করেছে সারা জীবন ধরে। ওর তো অনেক আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল।'

নির্মাল্যর ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটা হাসি খেলে গিয়েছিল। 'এরাই বেশি দিন বাঁচে। তবে ব্যাটা ভোগ করে গেছে বটে! তিন জায়গায় তিন-তিনটে বউ ছিল।'

'তিনটে বউ! কে বলেছে তোকে?'

'অভিরূপই বলেছে। ওই তো সেবার গৌরর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমাদের।'

'তখন তো জানতাম না কী চিজ্। মোটর ইনস্যুরেন্স, ফায়ার ইনস্যুরেন্স—হ্যানোত্যানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। ওকে একটু হেল্প করার জন্য শুধু তোদের সঙ্গে নয়, আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।'

'ওকে হঠাৎ হেল্প করতে গেলি কেন?'

'স্যান্যাল নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। বলল, একটা ছোটখাটো কোম্পানিতে ক্যাশিয়ারের চাকরি করত। মালিক তার এক আত্মীয়ের ছেলেকে ওখানে বসাবে বলে বিনা নোটিসে ওকে সরিয়ে দিয়েছে। তখন কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলাম। পরে শুনেছি, ক্যাশ ভেঙে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছিল গৌর। মালিককে ভাল বলতে হবে, ওটাকে জেলে পোরেনি।'

গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে নির্মাল্য বলল, 'তবে লোকটার একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে—লাইভলি টকার। যে কোনও বিষয় নিয়েই জমিয়ে গল্প করতে পারত।'

অভিরূপের গলা একটু ওপরে উঠেছিল। 'একজন পাক্কা সুইন্ডলারের যে-যে গুণ থাকা দরকার সে সবই ছিল ওর। কথার জাদুতে লোককে ভোলাতে না পারলে টুপি পরাবে কী করে! তখন, মানে বছর দশেক আগে ওর চেহারাটাও বেশ হ্যান্ডসাম ছিল। আমাদের চাইতে বছর দুই-তিনের ছোটই বোধহয়। কিন্তু এখনকার ওর চেহারাটা দেখছিস তো—মনে হত আমাদের চাইতে কমপক্ষে দশ বছরের বড়।'

'বাড়তি বউ দুটো টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত?'

'ছিল তো বটেই, হালে আরও একটা জুটিয়েছিল। এর ওপর বাজে বাজে জায়গায় যাতায়াত তো ছিলই।'

'খরচখরচা চালাতে কী করে? উল্টোপাল্টা ধান্দা ছিল নির্ঘাত?'

'ছিল, ইদানীং অবশ্য অবস্থা টাইট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কপাল করে এসেছিল তো, বাড়তি বউগুলো ওর সংসার চালাবার জন্য কিছু কিছু পয়সাকড়ি দিত।'

হিসহিস করে উঠেছিল কল্যাণ। 'ওর কুকীর্তিগুলো ফাঁস করে দেওয়ার কেউ কি ছিল না?'

'কারও ফাঁস করে দেওয়ার দরকার পড়েনি। নিজের কাণ্ডকারখানা ও নিজেই গলা উঁচিয়ে বলে বেড়াত সবাইকে।'

'ওই বউগুলোর কাছেও?'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।'

'বউগুলো কিছু বলত না?'

অভিরূপ গ্লাসে একটা বড় চুমুক মেরে দার্শনিকের গলায় বলেছিল, 'মুনি-ঋষিরা বলে গেছে না—পুরুষের ভাগ্য আর মেয়েদের চরিত্র—কিচ্ছু বোঝা যায় না। কথাটা এখন কিন্তু অর্ধেক সত্যি। আজকাল কেরিয়ারগ্রাফটাফ বানিয়ে একটা পুরুষের ভাগ্যের দৌড় মোটামুটি বুঝে ফেলা যায়। কিন্তু মেয়েদের চরিত্র। সেকেলে ওই মুনি-ঋষিদের রিডিং এখনও হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। এই চারটে বউ গৌরকে কী পরিমাণ সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছিল ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখ। মেয়েদের চরিত্র বোঝার বিদ্যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পরের মুনি-ঋষিরাও আয়ত্ত করে উঠতে পারবে না।'

'গৌরের আসল বউ—মানে এক নম্বর বউটা—ওই সব কাণ্ডকারখানা দেখে কখনও অশান্তি করত না?'

নির্মাল্যর প্রশ্ন শুনে অভিরূপের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। হাসিটা মুখে ফুটিয়ে রেখেই বলল, 'অশান্তি করত, তবে একেবারে গোড়ার দিকে। তার জবাবে গৌর একদিন একটা মেয়েছেলেকে বাড়িতে তুলে এনে বলেছিল—এর নিজের বলে কেউ নেই, এ আমাদের সঙ্গে থাকবে। সত্যি সত্যি কয়েকটা দিন ছিলও, তারপর কেটে পড়েছিল। ব্যস, ওই ঘটনার পর থেকে বউ আর অশান্তির মধ্যে যায়নি। আসলে, ওই ধরনের জঘন্য একটা লোকের স্বভাব তো পাল্টাবার নয়। ওর সঙ্গে যারা থাকবে, মানিয়ে চলার দায় তাদেরই। বউ, বুড়ি মা, ছোট ছেলেমেয়েরা লোকটাকে তাই বিশেষ ঘাঁটাত না।'

'ফুর্তির খরচ খরচা মেটাত কীভাবে?'

'হালে হঠাৎ বড়লোক এক বাবুর চামচা হয়েছিল। ব্যস, ফুর্তিফার্তা ফ্রি। বাবু দরাজ হাতে কালো টাকা ওড়াত। গৌর মরার আগের দিন সন্ধে থেকে সারা রাত বাবুর বাগানবাড়িতে ছিল। ফুর্তির বান ডেকেছিল ওখানে। মদ-গানা-ড্রিঙ্কস। ভোররাত্তিরে বাড়ি ফিরেছিল গৌর। ঘুম মেরেছিল সকাল ন'টা পর্যন্ত। তারপর জলখাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খেল খতম। কেউ টেরও পেল না। সত্যিই ভাগ্যবানের মৃত্যু।'

গ্লাসে আর একটা বড় চুমুক মেরে কল্যাণ বলল, 'শুনেছিলাম পুণ্যাত্মা, সাধুসন্তমার্কা লোকেরাই মরার আগে কষ্ট পায়। তা গৌর তা হলে সাধু! নো রোগভোগ, নাথিং। কী আরামের মৃত্যু!'

'আরাম বলে আরাম! আগের রাতের চূড়ান্ত ফুর্তির রেশ শরীরে মনে নিয়ে মরতে পারা তো বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার।'

অন্যান্য দিন এই সময়ের মধ্যে তিন বন্ধুর আড্ডা জমে উঠত দিব্যি। গল্পের মধ্যে থাকত একটু স্পোর্টস, একটু রাজনীতি, একটু দর্শন, একটু অশ্লীল রসিকতা—আড্ডা গড়াত তরতর করে। আজ ঠিক তার উল্টো ছবি। কথা ঘুরছিল ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে। সেই সঙ্গে ঘুরছিল অজানা একটা ভয়। ভয়ের চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু অদ্ভুত একটা শিরশিরানি তিনজনের মেরুদণ্ডে ছুটে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যেই।

অন্যান্য দিনের তুলনায় প্রথম রাউন্ডের ড্রিঙ্কস আজ একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুরনো বেয়ারা চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে, কাছাকাছি আসতেই চাপা একটা ধমকের গলায় অভিরূপ বলল, 'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। শোনো আমেদ, আরাম করে বাঁচার মতো আরাম করে মরাটাও খুব জরুরি। কী বুঝলে?'

আমেদ কিছুই বুঝল না, কিন্তু সমঝদারের ভঙ্গিতে শব্দ না করে হেসে ওখান থেকে সরে গেল। এখানে রাত বাড়লেই কিছু কিছু সাহেব চেনা বেয়ারার সঙ্গে খানিকটা রঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসিকতা জুড়ে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব রসিকতা বোঝা যায় না, কিন্তু বেয়ারারা সমঝদারের ভঙ্গিতে হাসতে ভোলে না কখনই। এখানে ওটাই দস্তুর।

দুপ্লেট ফিশ ফিঙ্গারের অর্ধেকের ওপর পড়ে আছে। চানাচুর, পাপড়, আদাপেয়াঁজের দিকে কেউ খুব একটা এগোয়নি। অথচ দ্বিতীয় রাউন্ড ড্রিঙ্কস সার্ভ করার অল্প সময়ের মধ্যেই তা ফুরিয়ে গেল।

আমেদ এবার আর চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়ায়নি, গ্লাস ফুরোতেই তৃতীয় রাউন্ড দিয়ে গিয়েছিল।

কথাবার্তা এখনও আগের সেই ছোট্ট জায়গাটা ঘিরেই চলছে। কল্যাণ বলল, 'হল্যান্ডে এই যে স্বেচ্ছামৃত্যু আইন পাস হয়ে গিয়েছে, খুবই ভাল হয়েছে। রোগভোগ যদি অসহ্য হয়, বাঁচার যদি কোনও আশা না থাকে, আর রোগী যদি তার মৃত্যু চায়—আইন আছে তার জন্যে। ডাক্তার স্ট্রং ডোজ সিডাটিভের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়। ব্যস, আরও কষ্ট পাওয়ার বদলে মানুষটা আরামের সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনেকটা ওই গৌর ভৌমিকের মতো। তবে এই লোকটাকে বিষ ইঞ্জেকশন নিতে হয়নি, এই যা তফাত।'

আজকাল, ৭ জানুয়ারি ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইন ওয়ান ওয়ান

শুভমানস ঘোষ

সকালে উঠে মন আনন্দে ভরে উঠল শান্তনুর। চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে। বছর সাত আমেরিকায় থাকার পর আজ বউ ছেলে নিয়ে দেশে ফিরে আসছে শান্তনুর ছেলে শঙ্খ। বছরখানেক আগে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একদম একা হয়ে গিয়েছিলেন শান্তনু, আবার বাড়িটা ভরে উঠবে, সকলকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটবে তাঁর, মরার সময় ছেলের হাতে মুখে আগুনটা জুটবে অন্তত। হুঁ, এটা সেলিব্রেট করার মতো ঘটনাই বটে।

শান্তনু বরাবরই নির্বিরোধ নিরীহ মানুষ। জীবনের টাকাকড়ি ভালই রোজগার করেছেন, একমাত্র ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ভাল ভাবে পাশ-টাশ করে শঙ্খ পালিয়ে গেল আমেরিকায়, এমনকী, স্ত্রীও তাঁকে ফেলে অকালে চলে গেলেন, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেছেন।

তবু স্ত্রীর কাজ মিটে যাওয়ার পর নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়েও নিজের নিঃসঙ্গ তার কথা বলে শান্তনু এক বার টোকা মেরে দেখেছিলেন শঙ্খকে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত শঙ্খের কলকাতায় ফিরে আসার কোনও প্ল্যানই ছিল না। উল্টে সে শান্তনুকে শুনিয়ে দিয়েছিল, একা এখানে পড়ে থাকার কী দরকার? সে স্পনসর করছে, এখানকার পাট তুলে দিয়ে বাবা আমেরিকায় চলে আসুন, প্রথমে গ্রিনকার্ড, কয়েক বছর পরে সিজিটেনশিপ পাকা। বেঁচে থাকা কাকে বলে ও দেশে না গেলে জানাই যায় না।

কথাটা অবশ্য নেহাত অত্যুক্তি নয়। ছেলের কাছে শুনেছেন, ও দেশে আইনকানুন খুব কড়া। পুলিশের ভয়ে বাড়িতে কেউ জোরে টিভি বা টেপ রেকর্ডার চালায় না, এমনকী, এক্সপ্রেসওয়েতে বেঁধে দেওয়া স্পিডের উপরে বা নীচে গাড়ি চালালেও পুলিশ কেস দিয়ে দেয়। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, নাইন ওয়ান ওয়ান বলে একটা টেলিফোন নাম্বার আছে, যে কোনও সমস্যায় ওটা ডায়াল করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ ছুটে আসে রেসকিউ করতে। এক বার খেলাচ্ছলে শঙ্খর ছেলে ডাকুন নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করে কী বিপদেই ফেলে দিয়েছিল শঙ্খকে, শেষে মোটা টাকা জরিমানা দিয়ে তবে ছাড় মেলে।

ঠিক আছে, তারা না-ই এল, ডাকুনটা তো থাকতে পারে শান্তনুর কাছে। শরীর তাঁর এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত, নিজের কাজ নিজে করে নিতে পারেন, রান্নাবান্না আর ঘরদোরের কাজ করার জন্যও [illegible] শঙ্খর স্ত্রী ভারতী

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল, এ দেশে থাকলে নাকি ডাকুনের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে। চার দিকে কিলবিল করছে মানুষ, তাদের না আছে মিনিমাম সিভিক সেন্স, না আছে প্রপার এডুকেশন, সস্তা পলিটিক্স ছাড়া কিছু জানে না, এখানে থাকা যায় না।

মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন শান্তনু। আমেরিকায় গিয়ে বেঁচে থাকার সুখ একটু বেশি পেয়ে গিয়েছে বউমা।

কিন্তু যত বড় সুখই হোক, তার মধ্যেও দুঃখের কাঁটা থাকে। ডাকুনের হালচাল দেখেই সেটা টের পেয়েছিলেন শান্তনু। মাত্র দশ বছর বয়েস ছেলেটার, কিন্তু এর মধ্যে কী রকম পাকা পাকা কথা, অসহিষ্ণু হাবভাব। আসলে বাবা-মা দু'জনেই চাকরি করে, সাতসকালে বেরিয়ে অনেক রাত করে ফেরে, ফলে তাদের সঙ্গ না পেয়েই ডাকুন এই রকম হয়ে গিয়েছে। তাই এ দেশে থাকার প্রস্তাবে সে তো লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাস্বতী তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু এত সবের পরেও শঙ্খকে চলে আসতে হচ্ছে। কেন? ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয় শান্তনুর কাছে। শুধু এইটুকু কানে এসেছিল তাঁর, কী একটা পুলিশ কেসে পড়ে গিয়েছিল সে।

প্লেন রাইট টাইমেই ফ্লাই করছে। সেলফোনে কথা সেরে সিটে গা এলিয়ে দিলেন শান্তনু। সুবল গাড়ি চালাতে চালাতে বড্ড কথা বলে, আজও বকে যাচ্ছিল, শান্তনু হাঁ-হাঁ করে যাচ্ছিলেন। প্রাইভেট গাড়ি, বাস আর লরি বোঝাই হয়ে লোক চলেছে ঝান্ডাফ্ল্যাগ হাতে। আজ এখানকার কাছারি মাঠে জবরদস্ত এক রাজনৈতিক দলের সভা, বড় বড় নেতারা আসবেন ভাষণ দিতে। অ্যাই রে, রাস্তায় আটকে-টাটকে যাবেন না তো?

কিন্তু না, কাছারি মাঠের মিটিং এখনও শুরুই হয়নি, প্রস্তুতি চলছে, তাই সামান্য জ্যাম হলেও সুবল সামলে নিল, কয়েকটা গাড়িকে ওভারটেক করে দক্ষ হাতে গাড়ি তুলে দিল ফাঁকা রাস্তায়। একটু বকবক করলেও ড্রাইভিং-এ হাতটা ভালই সুবলের। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শান্তনু বললেন, বেশ জোরদার মিটিং রে সুবল।

— হুঁ। সুবল বলল, সামনে ভোট তো, এখন রোজ রোজ মিটিং-মিছিল চলবে, কান ঝালাপালা করে দেবে জেঠু। আমেরিকায় তো ভালই ছিল শঙ্খদা, কেন যে ওখান থেকে চলে আসছে। দেখুন, আবার এখান এসে থাকতে পারে কি না।

কথাটায় যুক্তি আছে। বেঁচে থাকার হাই কোয়ালিটি দেখে আসার পরে এই খানাখন্দের আর জ্যামযন্ত্রণার জীবন সহ্য করতে পারবে তো শঙ্খ? তার উপর কী ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে তাই বা কে জানে। শান্তনু চিন্তা করতে থাকলেন।

আরও মিনিট কুড়ি লাগল, সুবল গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এয়ারপোর্টে।

এয়ারপোর্টে বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হল না, রাইট টাইমেই প্লেন ল্যান্ড করল, শঙ্খরা নেমে এল। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে শান্তনু দেখছিলেন ওদের। হুঁ, তিন জনেই বেশ গম্ভীর, থমথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে মুখ। তিনি হাত নাড়াতেও ঠিক ভাবে সাড়া দিল না কেউই। শান্তনুর চিন্তা বাড়ছিল।

মিনিট দশ কাটল। লাগেজ খালাস করে বউবাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে এল শঙ্খ। শঙ্খর পরনে পরিপাটি স্যুট, বড় বড় লাগেজ। হুঁ, পুরো সংসার তুলে আনছে, মাল তো হবেই। শান্তনু সেলফোনে পার্কিং থেকে গাড়ি এনে সুবলকে মালগাড়িতে তোলার কথা বলে ফিরলেন ছেলের দিকে, প্লেনে তোদের অসুবিধে হয়নি তো?

'না' বলে দায়সারা উত্তর দিয়ে শঙ্খ এগিয়ে গেল ডাকুনের দিকে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, রাগে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। কী করবে রে বাবা। ভাবতে ভাবতে ভূমিকার বালাই নেই, আচমকা ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল সে ডাকুনের গালে, ডাকুন গাল চেপে বসে পড়ল। এ আবারকী রকম নাটক।

— আরে আরে ওকে মারছিস কেন? শান্তনু ব্যস্ত হলেন।

শঙ্খ ফিরেও তাকাল না, হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, নাইন ওয়ান ওয়ান! এখানে কোন নাইন ওয়ান ওয়ান তোকে বাঁচাবে রে রাস্কেল?

ডাকুন চিৎকার জুড়ে দিল, শঙ্খ তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গর্জন ছাড়ল, একদম চেঁচাবি না! এর নাম ইন্ডিয়া, বুঝলি? তোকে মেরেই শেষ করে ফেলব।

— কী করছিস শঙ্খ, কী করছিস! ছাড় ওকে, ছাড়।

শঙ্খ এতক্ষণে ফিরল শান্তনুর দিকে, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস পড়ছে তার, বলল, দ্যাখো না ওর কী হাল করি। ওর জন্য আমায় বেইজ্জতের চরম হতে হয়েছে, লক আপে কাটাতে হয়েছে, জানো? এ সব ছেলের জন্য ইন্ডিয়াই ঠিক জায়গা, পুরো টিট থাকবে।

— অ্যাঁ সে কী কথা!

শঙ্খর স্ত্রী ভাস্বতী ঘাড় নাড়াল, হ্যাঁ বাবা, পড়াশোনার জন্য ও বকেছিল বলে নাইন ওয়ান ওয়ান রেসকিউয়ে ফোন করে পুলিশ ডেকে এনে বাবাকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিয়েছিল, বুঝুন, কী বদমাশ ছেলে।

— আবার! শান্তনু চমকে উঠলেন।

— হ্যাঁ আগের বারে টেস্ট করবার জন্য করেছিল, এ বার সত্যি সত্যি!

এই তা হলে পুলিশ কেসের ইতিহাস। শান্তনু হতবাক হয়ে গেলেন। শুধু পুলিশ ডেকেই ডাকুন শান্ত হয়নি, পুলিশ আসার পর রীতিমতো পাকা উকিলের মতো অভিযোগ আনে, তার বাবা তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছে। এ সব কেসে ও দেশের পুলিশ প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট, হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে শঙ্খকে থানায় নিয়ে গিয়ে সোজা লক আপে পুরে দেয়। এমনই ঠ্যাটা ছেলে, অনুশোচনা দূরে থাক, তার সাফ কথা, বাবা আমাকে বকল কেন?

হুঁ, ও দেশে সে বাবাকে লেসন দিয়েছে, এ বার এ দেশে এসে বাবা তাকে পাল্টা লেসন দিচ্ছে। কারণ এর নাম ইন্ডিয়া। কয়েক সেকেন্ড ব্যাপারটা স্থির মাথায় চিন্তা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎই শান্তনু রাগে ফেটে পড়লেন ছেলের উপর, তোদেরই তো দোষ। সে বার কত করে বললাম, ওকে এখানে রেখে যা, আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করুক, কথাটা কানেই তুললি না। কেন, তোর বাপ-ঠাকুর্দার দেশটা দেশ নয়, এখানে মানুষ থাকে না? ছাড় ওকে।

শঙ্খ কী রকম থতমত খেয়ে ডাকুনকে ছেড়ে দিল। ভাস্বতীও বলল, চলো চলো, যা হওয়ার হয়েছে, এখানে আর সিন ক্রিয়েট করতে হবে না।

ততক্ষণে গাড়িতে মাল তোলা হয়ে গিয়েছে, সুবল গাড়িতে স্টার্ট দি. ডাকছিল, গজগজ করতে করতে ডাকুনকে নিয়ে শান্তনু গাড়িতে উঠে পড়লেন। রাস্তার অবস্থা ভাল নয়, যত তাড়াতাড়ি হয় তিনি বেরিয়ে যেতে চাইছিলেন এখান থেকে। কিন্তু কে জানত, পথে তখন আর একটা নাটক অপেক্ষা করছিল। এক একটা দিনে নাটকের ছড়াছড়ি হয়ে যায়।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভালই চলল গাড়ি, তার পরেই জ্যাম, বিশাল এবং বীভৎস। সৌজন্য, কাছারি মাঠের মিটিং। সামনে গাড়ির লাইন, একটা পিঁপড়ে গলার জায়গা নেই, লোকজনে থই থই করছে কাছারি মাঠ, রকমারি দোকানপাট বসে গিয়েছে, হকাররা মাল ফিরি করছে, চা-বাদাম-ঝালমুরি-গ্যাসবেলুন—কী নেই। রীতিমতো মেলা বসে গিয়েছে। গলা শুকিয়ে এল শান্তনুর, সুবলকে বললেন, সুবল, কী হবে এ বার?

— কী আর হবে? সিটবেল্ট খুলে মাঠের এক দিকে আঙুল তুলে সুবল বলল, ওই তো উনুনে আঁচ পড়ে গিয়েছে, চলুন ওখানে গিয়ে দুপুরের খাওয়ার কুপন কেটে বসে পড়ি জেঠু।

—হুঁ। শঙ্খ সুবলের পাশে, বলল, মিটিং আর শীতের পিকনিক একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। হুঁ, এইবার ইন্ডিয়ায় এসে পড়েছি।

চশমাটা চোখের ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠলেন শান্তনু। মাঠের এক দিকে ঘাস ক্ষতবিক্ষত করে গাছের নীচে নীচে উনুন তৈরি করে আঁচ ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কোনও কোনও মিটিং পার্টির এর মধ্যে ভাতও নেমে গিয়েছে, গরম ফ্যান বেমালুম ঢেলে দিচ্ছে সবুজ ঘাসের উপর। সারাদিন ধরে এখন পুড়বে ঘাস, আগুনের তাতে ভাজা ভাজা হবে গাছের পাতা, দেখতে দেখতে মুক্ত শৌচালয়ে পরিণত হবে মাঠ।

— ইস, কী ভাবে নষ্ট করছে মাঠটা। শঙ্খ বিরক্ত হল, পাবলিক প্রপার্টির এই মিসইউজ কোনও সভ্য দেশে হয়? মাঠটা কি মিটিং করার জায়গা?

— শুধু মাঠ শঙ্খদা? সুবল জুড়ল, রাস্তাটাও এখন ওদের। মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ এখন অফিসে যেতে পারবে না, স্কুলে-কলেজে যেতে পারবে না, হাসপাতালে যেতে পারবে না, এখানে পড়বে এখানেই মরবে, কেউ দেখতেও আসবে না।

— স্ট্রেঞ্জ। ভাস্বতী আলোচনায় যোগ দিল, এ দেশে ল' অ্যান্ড অর্ডারের কী অবস্থা।

— ল' অ্যান্ড অর্ডার। শঙ্খ হাসল, এখন এরাই ল', এরাই অর্ডার। মহান গণতন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে এরা মানুষের ফান্ডামেন্টাল রাইট নিয়ে ছেলেখেলা করবে, নেতারা মঞ্চে এসে লেকচার মেরে তাদের এই অন্যায়কে শিলমোহর লাগিয়ে যাবে। শঙ্খ ঘাড় ঘুরিয়ে শান্তনুর দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল, এই তো আমার বাপ-ঠাকুরর্দার দেশ, এমনি এমনি কি পালিয়েছিলাম এখান থেকে?

শান্তনু গুম মেরে গেলেন। দেখতে দেখতে রোদ্দুর চড়ে যাচ্ছিল। গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়, পেট্রলের গন্ধ, তার উপর বিশাল এলাকা জুড়ে শব্দবিধির তোয়াক্কা না করে কান ফাটিয়ে মাইকে গান বাজছে, শান্তনু 'ধুত্তোর' বলে ডাকুনকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই পড়লেন।

সার সার বাড়ি অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক জন ভেড়াওয়ালা একগাদা ভেড়া নিয়ে আটকে পড়েছে। কী শাস্তি, কী শাস্তি! এ দেশে কোনও নাইন ওয়ান ওয়ান নেই যে এই যন্ত্রণার হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে ছুটে আসবে। একটু দূরে জটলা মতো, সেখান থেকে গোলমালের শব্দ ভেসে আসছিল, কৌতূহলী হয়ে শান্তনু ডাকুনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। গিয়ে যা শুনলেন মর্মান্তিক।

জ্যামে আটকে গিয়েছে একটা প্রাইভেট কার, তাতে একটা বাচ্চা মেয়ে, থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট, রক্ত নেওয়ার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছিল, পথে আটকে গিয়েছে। সারা শরীর জ্বলছে তার, ছটফট করে কাঁদছে, সিটে অনবরত গা ঘষছে। যতক্ষণ না ফ্রেশ রক্ত শরীরে যাচ্ছে, ততক্ষণ জ্বালা কমবে না তার। একে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিটিংয়ের আয়োজকদের বলা হয়েছিল, তারা 'দেখছি' বলে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছে একেবারে ডুব।

শান্তনু গুটিয়ে গেলেন। শঙ্খ আর বউমা চলে আসবে না তো এখানে? দেখেশুনে ক্ষোভে দুঃখে আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে না তো? যাও বা মরার পর ছেলের হাতে টাটকা টাটকা আগুন জোটার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেটাও যাবে। বেছে বেছে আজই মিটিংটা হতে হয়! শান্তনু তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে কাছারি মাঠে ঢুকে পড়লেন। যারা যত বড় দল বাঁধে অন্যায় ততটাই বুক ফুলিয়ে করে, এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল।

মানুষের পায়ে পায়ে তখন মাঠে ধূলোর ঝড় বইছে। তার মধ্যেই কাশতে কাশতে ডাকুন ছুটল গ্যাস বেলুনের দিকে। শান্তনু তাকে গ্যাস বেলুন কিনে দিলেন। তাতেই কী খুশি ছেলেটা! মাইকে গানের পালা শেষ শুরু হয়ে গিয়েছে বক্তৃতা। বড় নেতারা আসার আগে ছোট নেতারা আসর জমাতে গরমাগরম লেকচার জুড়ে দিয়েছেন, গুছিয়ে শ্রাদ্ধ করছেন আমেরিকার। এর চেয়ে মর্মান্তিক রসিকতা আর কী হয়!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাস্তার এক দিকে নজর চলে গেল শান্তনুর। রাস্তার জ্যামে আটকে আছে সৎকার সমিতির একটা গাড়ি। কাচের বাক্সে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ, একটি ছেলেকে মাঝে রেখে শুকনো মুখে রাস্তায় ঘুরছে বৃদ্ধের আত্মীয়স্বজন। ডাকুনেরও নজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটকে গিয়েছে সেদিকে, এক হাতে গ্যাস বেলুন, অন্য হাতে শান্তনুর পাঞ্জাবি আঁকড়ে ফিসফিস করে বলল, গ্র্যান্ড পা, ডেডবডি?

— ঠিক ধরেছ, ডেড বডি। শান্তনু ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, এই দেশটাই হল ডেডবডির দেশ। এখানে মানুষ থাকে না, কোটি কোটি ডেডবডি থাকে, কেন এলে এখানে দাদুন?

ডাকুন কথাটা বুঝল না, চেয়ে রইল। তার কাশি একটু কমেছে। শান্তনু তাকে টানতে টানতে চলে এলেন গাড়ির কাছে।

ততক্ষণে শঙ্খও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, প্রশ্ন করল, কিছু খবর পেলে বাবা?

হঠাৎ শান্তনু শঙ্খকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন, শোন শঙ্খ, তুই বরং আমেরিকায় ফিরে যা। কেন আবার ফিরতে গেলি এখানে? দেখছিস তো কী অবস্থা এখানকার, সিম্পলি হরিবল্!

— এই যে তোমার আদরের নাতি, ওর জন্যই তো। ওকে আর রিলাই করা যায় না, কী করতে আবার কী করবে ঠিক আছে। ভেবেছিলাম এখানে রেখে যাব, কিন্তু ওর মা তো আবার ওকে ছাড়া থাকবে না। বলতে বলতে শঙ্খ রেগে আগুন হয়ে গেল, আরও ওকে মাথায় তোলা তোমরা।

শঙ্খর মূর্তি দেখে ডাকুন ভয় পেয়ে গেল, হাত থেকে উড়ে গেল বেলুনটা, অন্য হাত শান্তনুর হাতে, ভিজে যাচ্ছিল ঘামে, এক বার কেশে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, গ্র্যান্ড পা আমি আমেরিকায় যাব না।

— যাবি না?

— ও নো। গ্র্যান্ড পা, প্লিজ আমায় যেতে বোলো না। ডাকুন শান্তনুর বুকে মুখ গুঁজে দিল, আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই, এইখানে, ইন্ডিয়ার, ইন্ডিয়ায়।

শান্তনু অভিভূত হয়ে গেলেন। গাছ যে ভাবে মাটিকে আঁকড়ে থাকে তার চেয়েও শক্ত করে ডাকুন চেপে ধরে আছে তাঁকে। তাঁরা মৃত মানুষ? নিছক ডেডবডি? শান্তনু টের পাচ্ছিলেন, আবার যেন বেঁচে উঠছেন তিনি। সুন্দর শিশুদের জন্যই তো চিরকাল বৃদ্ধদের বেঁচে উঠতে হয়, বেঁচে থাকতে হয়।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা। ডাকুনের মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তনু বললেন, তোকে কোথাও যেতে হবে না, হয়েছে?

ডাকুন আনন্দে কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কী যেন হয়ে গেল শান্তনুর, আরে কে কাঁদছে এটা? তাঁর নাতি ডাকুন, না ওই থ্যালামেসিয়ার পেশেন্ট বাচ্চা মেয়েটা? সব শিশুই কি একই রকম ভাবে কাঁদে? এ পোড়ার দেশে তাদের জন্য নাইন ওয়ান ওয়ান নেই, কিন্তু শান্তনুরা আছেন, আলবাত আছেন। জীবিত নাইন ওয়ান ওয়ান।

— আরে বোকা কেঁদেই গেল। মুখ তোল। তাকা আমার দিকে। শান্তনু বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— চোখ মোছ! চোখ মোছ! চল আমার সঙ্গে!

ডাকুন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছছে, কোথায়?

কোনও এক মরমি কবি পৃথিবীটাকে শিশুদের বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন না? আত্মবিশ্বাস গমগম করে উঠল শান্তনুর গলায়, মাঠে।

শঙ্খ ব্যস্ত হল, ধুলোয় ছেলেটা কাশছে, আবার মাঠে কী করতে যাবে বাবা?

হুঁ, বড্ড ধুলো! তার জন্যই তো যেতে হবে। আকাশে চোখ চলে গেল শান্তনুর, এত উঁচুতে উঠে গিয়েছে ডাকুনের বেলুনটা যে দেখতে ছোট হয়ে গিয়েছে, আস্তে আস্তে মুখ শক্ত হয়ে এল শান্তনুর, কঠিন গলায় বললেন, রাস্তা পরিষ্কার করতে। কী ভেবেছে এরা! একটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট পড়ে ছটফট করছে রাস্তায়, নাহ্, এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার, এক্ষুনি!

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ নভেম্বর ২০০৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়া-নল

শৈলেন সরকার

আমার দ্বারা যে কিছুই হওয়ার নয়, তা এক মা-ই জানত। বাবা বরং ভুল করে ভেবে বসত অনেক কিছু। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিল লোকটা। ভাবত, ছেলে হয়েছে যখন, বড় হয়ে পড়াশোনা করবে, চাকরি করবে। আর তাই রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে দেখামাত্রই পাগল হয়ে উঠত। একেবারে অসুর হয়ে মার শুরু করত। মারতে মারতে লোকটা হাঁপিয়ে পড়ত এক সময়। মা অবশ্য বাধা দিতে আসত না। মা জানত, এই মারে আমার কিছু হবে না। মা বরং বাবার জন্য ভয় পেত। রাতে বিছানায় শুয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলত, তোকে মারতে মারতেই না কিছু একটা হয় লোকটার।

কিছু একটা অবশ্য হল। তবে আমাকে মারতে মারতে নয়। আচমকাই। একেবারে বলা নেই, কওয়া নেই। এক রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় বসে বিড়ি ধরাবে, হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ। 'কী হল, কী হল গো—' বলে কাছে গিয়ে মা দেখে সাড়া নেই কোনও। অন্তত মা নাকি টের পায়নি কিছু। এর পর পাশের বাড়ির অমলদা, মন্টাদা করে ডাক্তার ডেকে এনে জানা গেল, মেরে গেছে লোকটা। সত্যি কথা বলতে কী, সেই একটা দিনেও আমার ভূমিকা ছিল না কোনও। মা ভুল করেও আমার নাম ধরে ডেকে ওঠেনি। এমনকী সেই রাতেই উঠোনে নামানোর পর লোকটার দেহ ঘিরে সবাই যখন তৈরি হচ্ছে শ্মশান যাওয়ার জন্য, সেখানেও নাম নেই আমার। মা এক বারের জন্যও বলেনি, 'তোমার তারণকে তুমি কার কাছে রেখে গেলে—'। বলেনি কেননা মা জানত, তারণ কারও কাছে নেই, ছিলও না কোনও দিন।

আর সেই আমি নাকি মার দিয়েছি মানসদাকে, মা বলল। মার দিয়েছি মানে মেরেছি। তাও নাকি একেবারে রক্ত বের করে দেওয়ার মতো। হ্যাঁ, মানসদার। পার্টির একেবারে দুই বা তিন। এই দুই তিনের আমি অবশ্য জানতাম না কিছু, জানলাম মার খেয়ে। লোকের কথা শুনে। আমার সেই মার খাওয়া নিয়ে মায়ের অবশ্য তাপ-উত্তাপ ছিল না কোনও। মা জানে, একমাত্র মা-ই জানে, এই সব মারে আমার হয় না কিছু। মানসদা ছিটকে পড়ে যাওয়ার পর পরই কে হাত লাগায়নি ভাবো। ঝন্টু, সুরজ থেকে শুরু করে—।

শেষমেশ মানসদা লোকটাই থামাল সবাইকে। পাশের দোকান থেকে জলের বোতল নিয়ে মুখ ধুয়ে সেই মানসদাই সরে দাঁড়াতে বলল সবাইকে। পরিচয় জানতে চাইল আমার। বিমল মাস্টারের [illegible] খুব [illegible] পড়ত এক সময়। কে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

যেন বলল, হাবা আছে একটু। '—হাবা?' মানসদা অবাক হল খুব। আমার একেবারে চোখের উপর চোখ রাখল লোকটা। এই প্রথম অন্য রকম একটা চোখ দেখলাম আমি। একেবারে অন্য রকম। একেবারে চোখের উপর চোখ রেখে লোকটা জানতে চাইল, 'মারলে কেন?' কী অদ্ভুত প্রশ্ন ভাবো, মারলে কেন? কেন মারলাম? ইচ্ছে হল তাই, আমার এই ইচ্ছের কথা শুধু মা-ই জানে, মা জানে, হঠাৎ হঠাৎ এমনি একটা ইচ্ছে হয় আমার, দু'কানের মাঝখানে হাওয়া যাওয়ার পথ হঠাৎ আটকে গেলেই। হ্যাঁ, মা জানে, আমি তখন আর সবার চেনা তারণ নই। এমনকী মা-ও তখন চেনে না আমাকে।

এই যেমন আজ, মানসদা যখন এক দল ছেলে নিয়ে এসে চায়ের অর্ডার দিল গোবিন্দদার দোকানে, একটি নীল ওড়নার মেয়ে তখন কিন্তু দোকানে দাঁড়িয়ে। কথা বলছে ওর বাবার সঙ্গে, আর ওর ওড়না তখন উড়ছে হাওয়ায়, জড়িয়ে যাচ্ছে আমার নাক আর মুখে। আমি গ্লাস ধুচ্ছি তখন। মেয়েটি এক বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আমাকে। তবু ওড়না সরাল না কিন্তু। মেয়েটি ওর বাবার কাছে চাইতে এসেছে কিছু। গোবিন্দদার কাছেই। হয়তো ওর মা পাঠিয়েছে। মানসদা হঠাৎ করেই ডাকল মেয়েটিকে। হাত দিয়ে ইশারা করল। আজ দেখা মাত্রই আমার কানের সেই নলে আটকে গেল কী যেন। আহ্! সেই নীল ওড়না। সেই নীল।

আমি তখন চেষ্টা করছি প্রাণপণ। আমি তখন দুহাত ধরে সেই নলটাকে টেনে— আমি তখন আমার মাথার ভিতর আটকে যাওয়া হাওয়া ছাড়ানোর চেষ্টায়—। সেই ছোটবেলা থেকেই। একমাত্র মা-ই জানে, সেই জন্ম থেকেই এক কান দিয়ে হাওয়া ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে আমার। একমাত্র মা-ই সেই হাওয়া-নলের খবর জানে। মা জানে, সারা দিন এক মনে আমি সেই হাওয়ার শব্দ শুনি। মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করা ধ্বনি। ধ্বনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা শব্দ। শব্দ, কথা গান। মা জানে, সারাটা দিন ধরে আমি ওই সব কথা আর গানের অর্থ করি। শুধু মাত্র আটকে গেলেই—সেই হাওয়া-নল আটকে গেলেই— মা জানে, মা তখন মাথাটাকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকিয়ে দু'বার নাম ধরে ডেকেই বলে উঠবে, 'ঠিক আছিস তো—। মা জানে শেষ পর্যন্ত আমি ঠিকই ঠিক হবে।

মা জানে, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক হয়। এই যেমন এ বারও ঠিক হয়ে গেল সব কিছু। ভিড় সরে গেল এক সময়, আর সেই সঙ্গে কাজটাও গেল আমার। মানে গ্লাস ধোওয়া আর দোকানে দোকানে চা দেওয়ার কাজটা চলেই গেল শেষ পর্যন্ত। মাকে একেবারে বাড়ি এসে গোবিন্দদা বলে গেল, 'কী করে রাখি বলুন বউদি—।' গোবিন্দদার কথায়, স্টেশন চত্বরে দোকান করে খেতে হবে তো আমাকে, এক বার না হয় হাবা বলে—।

মার খাওয়ার দু'দিন পরেই মা একটা লোকের কথা বলল। বলল, 'একটা লোকের হাতে তোকে ছেড়ে দিচ্ছি তারণ। লোকটাকে মানবি, যা বলে শুনবি।' বলল, 'আমি চোখ বুজলে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না তোকে।'

লোকটা কে বলুন তো? মানসদা। এত দিন গোবিন্দদার দোকানে গ্লাস মেজেছি। প্লেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুয়েছি, বেঞ্চ পরিষ্কার করেছি। খদ্দেরদের অর্ডার শুনেছি। এই প্রথম অর্ডার করতে পারলাম। পারলাম মানে ঠিক আমি নই অবশ্য। অর্ডার করবে আমাদের কেউ, আমার কাজ শুধু সঙ্গে যাওয়া। দাঁড়ানো। ঝন্টুদের কথায়, অত ভাল চেহারা যখন—। আসলে অর্ডারও তো ঠিক আমাদের নয়, মানসদার অর্ডারই। আমাদের কাজ হল গিয়ে বলা। বা বলাও না, গিয়ে শুধুমাত্র কে পাঠিয়েছে জানানো। মানসদার কথায়, 'একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া খুব শক্ত রে তারণ।' আমাকে নাকি দেখেই বুঝতে পেরেছে মানসদা। আমাকে বিশ্বাস করা যায়। বলল, 'ওই চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানে কাজ করে কেউ?'

মা এক দিন বিয়ের কথা তুলল। বলল, বউ আনতে হবে একটা। বউ মানে মেয়ে। একটা নাকি ঘর হবে আমার। আলাদা। রান্নাঘরের পাশে যে এক ফালি জায়গা, সেখানেই। টিভি আনতে হবে। খাট, আলমারি। মা নাকি ঘরের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করেছে কার সঙ্গে। এর পর মেয়ে দেখা। কিন্তু ঘর কি তুই করতে পারবি? নিজের মনে বলা কথাগুলি বলতে বলতে এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে মা।

আর আমি এর পর ফের মাথার মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকা হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে থাকি। কথা, গান, গল্প। গোবিন্দদা, গোবিন্দদার দোকান। মেয়ে। মেয়েটি চুড়িদার হয়ে ভাসতে ভাসতে হাওয়ার সঙ্গে কানের ফুটো দিয়ে আমার মাথায় ঢুকে পড়তে থাকে। কান খাড়া করে নতুন এই হাওয়ার কথা শোনার চেষ্টা করতেই টের পাই, আটকে গেছে। আটকে গেছে কোথাও। আমি জানি, আমি জানি—'মা—।' লাথির ধাক্কায় ছিটকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েও মা চিৎকার করে ওঠে না এতটুকু। বরং, 'কী হল, কী হল রে তারণ'—বলে উঠে দাঁড়ায়। লাইট জ্বালে। আমার মা সব জানে। মা কী বলবে এ বার আমি জানি। আমার দু'জনই সেই আমার জন্মের আগে থেকে জানি দু'জনকে। মা এ বার আমার মাথাটাকে জাপটে ধরবে। দু'কানের পাশে দুটো হাত রেখে খুব জোরে ঝাঁকাবে মাথাটাকে। ঝাঁকাবে আর নাম ধরে ডাকবে আমাকে। তারপর আস্তে আস্তে সেই নীল চুড়িদারটাকে আমার কানের ফুটো দিয়ে বের করে আনবে। তারপর—?

আমি জানতাম মা অবাক হবে। হয়তো অবাক হয়েই জানতে চাইবে, এটা কোত্থেকে পেলি তুই, নীল চুড়িদার? কিন্তু না তো। মা অবাক হল না একটুও। বরং চুড়িদারটাকে ছুঁড়ে দিল জানলায়, যেন ও কিছু নয়, যেন কোনও বাতাস ওকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল হঠাৎ করে। মা এর পর কখন ঘুমিয়ে পড়ে নিজের থেকে, কে জানে? এর পর আমি যেমন থাকি, জানলার বাইরে আকাশ, আকাশে ছড়ানো এলোমেলো আলো। আর বাতাস। বাতাস আমার একটা কান দিয়ে ঢুকে মগজের ভিতর খেলা শুরু করে। আর সেই খেলার মধ্যেও একটা কথা কেমন ওঠানামা করে খুব।

আমার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কোত্থেকে এল, কোত্থেকে এল এটা, মা? কোত্থেকে? জানলার রডে আটকে থাকা চুড়িদারটা নিয়ে উলটে-পালটে দেখি ভাল করে। কেমন অদ্ভুত এক গন্ধ না? আমার ফাঁকা হওয়া মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে দিই কানটাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকিয়ে দিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকি। পিছিয়ে পিছিয়ে সেই মায়ের পেটের খলবল-খলবল করা ধ্বনি। মায়ের মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। তবে কি মা-ই লুকিয়ে রেখেছে এত দিন ধরে? মা—?

ঝন্টু একদিন হঠাৎ দেখি আমার ঘরে। ঘরে মানে দরজার বাইরে অবশ্য। আমি তখন সবে ঘুম থেকে জেগে শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে মগজের ভিতরে হাতে থাকা শব্দটাকে ধরতে চাইছি। কানের মধ্য দিয়ে যে বাতাস ঢুকছে তার সবটুকু বেরোচ্ছে কি? মা উঠেছে অনেকক্ষণ। কোথায় গেছে কে জানে? আমাদের একটি মাত্র বিছানা। মা আর আমি। বিছানা পাতবে মা-ই। বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। এমনকী শীতের দিনে লেপটাও মা নিজের হাতে খুলে দেয় আমাকে। আমার শোওয়ার পর মা নিজের হাতে ছড়িয়ে দেয় আমার শরীরে। মা বোঝে সব। মা বোঝে আমার সময় নেই এত।

ঝন্টুর কাছে জানতে চাইনি কিছু, চাইবও না ঝন্টু জানে। তবু নিজের থেকেই কেন বলল কে জানে। বলল, তোর মাকে খুঁজছি। ঝন্টুকে এর পরও আমি বসতে বলিনি। বসতে বললে মা-ই বলুক। আর ওর বসার ইচ্ছে থাকলে বসুক। বসুক, কিন্তু বকবক না করে। মাথার মধ্যে এখন ছোট ছোট ধাক্কায় টুকরো টুকরো বাতাস ঢুকছে। আর এই ছোট ছোট ধাক্কার জন্যই দিনভর শোনা শব্দগুলির থেকে এ শব্দ অন্য রকম। অন্য রকম তো? আমি ফের কান ঢোকাই মাথার মধ্যে।

'—তোর ঘুম পায় না তারণ?' কী বলছে যেন ঝন্টু। যা খুশি বলুক। আমার চোখ এখন ছাদে। আর ছাদ অন্তত অবাক হবে না আমাকে দেখে। ভাববে না, ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আমি, ওর কথা কানে নিচ্ছি না কেন। মা আসা পর্যন্ত আমাকে তো শুয়ে থাকতে হয়। শুয়ে থাকতে হয় মানে, মা-ই বলে রেখেছে। বলে রেখেছে, 'উঠবি না তারণ।' মায়ের ধারণায়, বুড়ো বয়সেও বিছানায় হিসি করার রোগ আছে আমার। আছে কি না কে জানে? মায়ের বাতিকও হতে পারে। রোজ বিছানা থেকে নামিয়ে নিজের হাতে প্যান্ট খুলে নেবে আমার। নিজের হাতে প্যান্ট পরাবে একটা নতুন করে। এর পর চাদর পাল্টাবে বিছানার। মায়ের ধারণায় বুড়ো ধাড়ি কোনও ছেলের পেচ্ছাবে বিচ্ছিরি গন্ধ থাকে। বিছানায়, ঘরে। আর তাই হয়তো কিছুক্ষণ বসে থেকে ঝন্টু জানতে চাইল, কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ না? কীসের গন্ধ রে?

মা এল ঝন্টু চলে যাওয়ার পর। বেশ অনেকক্ষণ পরে। এসে অবশ্য জিজ্ঞেস করল না কিছু। উঠতে বলল আমাকে বিছানা ছেড়ে। তারপর বিছানায় কীসের দাগ দেখে বলল, 'আবার—উফ্।' আমি নাকি ফের হিসি করেছি।

এর পর আমার সোজা হয়ে দাঁড়ানো, প্যান্ট খোলা, নতুন প্যান্ট পরানো। এর পর ঘরের কোণে আমার একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের বিছানা পাল্টানো দেখা। মায়ের কথায় আমি নাকি বিছানা ভেজাই ভোরে। ভোরের দিকে মা যখন বিছানা ছেড়ে বাইরে যায়, আমি নাকি তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এক এক করে। কীসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন, কীসের স্বপ্ন গো মা? আমার এত জানতে ইচ্ছে করে। আমি প্রাণপণে হাতড়াতে থাকি, আমার দু'কানের ফুটো দিয়ে মগজের ভিতর তাকাতে থাকি, দেখতে ইচ্ছে করে খুব। কারা, কে কে? হাওয়া ছাড়া আর কী সেখানে খেলা করে? কী?

ঝন্টু নাকি কাজের কথা বলে গেছে একটা। মাকে বলে গেছে। কাজ নাকি মানসদারই। খুব বড় আর দরকারি। হয় এমন, মানসদা হয়তো বলে যায় ওকেই। ঝন্টু মানসদারএক নম্বর—। মানসদা বাড়ি থাকবে না আজ, আজ নাকি দিনের বেলা মানসদার বাড়ি না গেলেও হবে। গিয়ে কাজ নেই কোনও। তবে রাতে কাজ আছে। মানসদাই বলে গেছে। বলে গেছে, তারণ ছাড়া আর কেউ না—।

ঝন্টুর কথামত রাতে বেরোতে হল। মা-ই বলল। বলল, 'ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতেই হবে।' কোথায় যেতে হবে ঝন্টু অবশ্য দূর থেকে দেখিয়ে দিল। বাবার সেই প্রাইমারি স্কুল। পেছনে রেল লাইন।

কথা ছিল, স্কুলে প্রথম ঘর বাদ দিয়ে পরেরটায়। আর পাশের পাড়ায় যখন যাত্রাপালা, তখন কে আসবে এখানে। স্কুলের কোথাও কোনও লাইট নেই তখন। থাকার কথাও নয়। অন্ধকারে স্কুলে ঢোকামাত্র দেখি মগজের ভিতর সেই বাতাস হঠাৎ করে স্থির। চুপচাপ। কী হল রে তারণ? দাঁড়াই এক বার চুপ করে। বাবা কি আছে এখনও? সেই কালো মতো রোগা লোকটা, স্কুলের চেয়ারে বসে এখনও কি সেই 'দুই-এক্কে-দুই—।' বাবা কি এখনও আমাকে দেখলে—? কিন্তু আমি কী করি? মানসদা বললে আমি তো—ঝন্টুর কথায় খুব বড় কাজ, মানসদা বলেছে একমাত্র নাকি আমিই—,

চার পাশে তাকিয়ে দেখি ভাল করে। বাবা কি আছে কোথাও? থাকুক। আমি মানসদার কথা বলব। বলব, মা-ই তো বলল। ফের হাঁটা শুরু করি এক পা-দু পা করে। এর পর দুটো মাত্র ঘরের প্রথমটা বাদ দিয়ে একটি মাত্র ঘরের সামনে দাঁড়ানো। এরপর ফের মগজের ভিতর কান ঢুকিয়ে দেওয়া। বাবা কি আছে এখনও? দরজা খোলামাত্র যদি দেখি—। চার পাশটা ভাল করে দেখে দরজায় ঠেলা দেওয়া মাত্র শুধুই খুলে যাওয়া আর নতুন একটা হাওয়া।

দেখি রোজ ভোরে বিছানার পাশে আমার ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো করে দাঁড়ানো একটা শরীর। মোমের আলোয় কেঁপে কেঁপে ওঠা আর একটা, আরও একটা শরীর। শরীর শরীর। আমি তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। ঝন্টু আমাকে আসতে বলেছে। মানসদার কথায় একমাত্র আমিই নাকি—। আমাকে দেখতে পেয়ে মানসদা ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'তুই—।' আর বলা মাত্রই মেঝের উপর পড়ে থাকা নীল ওড়নাটা আমার চোখে পড়ে। শুধু আমার মা-ই জানে, শুধুমাত্র আমার মা থাকলে—।

আমার কান আটকে যেতে থাকে, আমার দু'কান জোড়া হাওয়া-নল আটকে যেতে থাকে, আমার মগজ, আমার শক্ত খুলির নীচে আমার মগজ, আর একটা কান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে বলে একটা কান দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাস—। আমি আসলে তখন মগজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে আটকে পড়া বাতাসটাকেই—ডান-হাত বাঁ-হাত দিয়ে একেবারে প্রাণ বাঁচানোর জন্যই—। বাবা কি দেখল কিছু? মা? মায়ের কাছেই ফিরব বলে ঘর ছেড়ে যখন ছুটতে শুরু করেছি, মানসদার ন্যাংটো আর ভেজা শরীর তখন একেবারে চুপ, মেঝের উপর আছড়ে পড়া শরীরে আর সাড় নেই কোনও।

সকালে জেগে উঠে মা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যেমন শুয়ে থাকার শুয়ে থাকি। মা আসে। আমি উঠে বসি। মা নামতে বললে বিছানা ছেড়ে নামি। এর পর মা নিজের হাতেই আমার প্যান্টের বোতাম—নিজের হাতেই আমার ভেজা প্যান্ট—।

কাল রাতে ঘরে ফেরার পর মা-ই পরিষ্কার করল নলটাকে। কানের ফুটো থেকে মগজের অনেকটা পর্যন্ত ঢুকে যাওয়া নীল সেই চুড়িদার। আমি আর অবাক হলাম না একটুও। মা-ও। মা বরং আগের বারের মতো চুড়িদারটাকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে না দিয়ে বিছানার উপর রাখল ভাঁজ করে।

বিছানা না পাল্টানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি। ন্যাংটো শরীরে কাঁপতে থাকি আমি। আমাকে নিয়ে সত্যিই মায়ের চিন্তা থাকে খুব। আমার ভবিষ্যৎ জীবন। মা মারা গেলে আমার খাওয়া-পরা। আমি শুধু আমার ফাঁকা মগজে ঘুরে মরতে থাকা বাতাসের আকুলি-বিকুলি অনুভব করার চেষ্টা করি।

বিছানা পাল্টে অন্য আর একটা শুকনো প্যান্ট পরাবে বলে মা ডাকল আমাকে। যেমন ডাকে অন্য দিন। যেমন বলে, আমি চোখ বুজলে—। এর পর রোজ যেমন মা আমাকে রোদে গিয়ে বসতে বলে, রোজ যেমন কোথায় কোথায় যাব বলে দেয়, কোন পথ দিয়ে যাব, কার কথা শুনব বলে মা যেমন বাতাসের সঙ্গে কিছু কিছু কথা মিশিয়ে দেয়, আজও সেই একইভাবে মা রাস্তার কথা বলে আর একটা। বলে, ঝন্টুকে চিনিস তো? হ্যাঁ, ডান দিকে সোজা গিয়ে বাঁ দিক, এরপর—। বলে, তোর মানসদা বেঁচে নেই আর, মার্ডার হয়েছে কাল রাতে—।

একমাত্র মা-ই চেনে আমাকে। শুধু মা-ই জানে আমার সব কিছু। মায়ের পেটের জলে থলবল সাঁতার কাটা দিনগুলো থেকে, মা জানে শুধুমাত্র মায়ের কথাগুলি আমি—। একটা বাঁ দিক না আসা পর্যন্ত সোজা ডান দিক বরাবরই শুধু হাঁটতে থাকি আমি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ আগষ্ট ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ও তার সেই কলম

শচীন দাশ

শেষ আলোটা ঘুরে যেতেই বাইরে থেরে হলের ভেতরে আবারও ঢুকে পড়ল রজতেশ। জনশূন্য হলঘরটার একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখল। ভেতরে এখন আর কেউ নেই। চেয়ারগুলো ফাঁকা। শুধু ওই দুটি ছেলে মাইকের তারটার ও ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম সব গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত। ডায়াসে একটা বড় টেবিল। তাতে বড় বড় দুটো ফ্লাওয়ার ভাস। ভাস দুটোতে ডাবল রজনীগন্ধার স্টিক। উদ্বোধনী প্রদীপটা জ্বলছে এখনও মিটমিট করে। সম্ভবত তার জ্বালানিতে টান ধরেছে। এ ছাড়া অতিথি-অভ্যাগতদের ফেলে রাখা কিছু এঁটো চায়ের প্লাস্টিক কাপ ও ফুলের স্তবক। স্তবক ক'টা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনা হয়েছিল। চারপাশে হলিহক, তার পাশে জিনিয়া, মাঝে গোলাপ। একবারে লাল টকটকে। যাওয়ার আগে অন্তত দু'জনের হাতে ধরিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিল রজতেশ, সঙ্গে নিয়ে যেও। এখানকার স্মৃতিচিহ্ন। তা মাথা নেড়ে হাতে নিয়েও ভুলে গেছেন তারা। আসলে সেই মুহূর্তে, যাওয়ার মুখে, অতিথি ক'জনই তখন ব্যস্ত যে যাঁর ব্যাগ গুছিয়ে নিতে, বেরোবার সুবিধের জন্য গেস্ট হাউস থেকে সকলেই অনুষ্ঠান হলের একটি ঘরে ব্যাগগুলো আনিয়ে রাখা হয়েছিল। যাওয়ার আগে তরুণ লেখকদের কাছ থেকে পাওয়া বইটইগুলো ঢুকিয়ে নিয়ে হচ্ছিল তাড়াহুড়ো করে। কেননা সন্ধের ট্রেন। ছ'টা কুড়ি। এটা মিস করলে আজ আর যাওয়াই হবে না এই শিল্পনগরী থেকে। ফলে অতিরিক্ত ব্যস্ততায় হয়ত স্তবক দুটো তুলে নিতে গিয়েও ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন, না গুরুত্ব দেননি। নাকি সত্যিই ভুল—। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ফাঁকা হলঘরটায় আবারও একবার চোখ রাখে রজতেশ।

যে কোনও অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটা বাড়তি উদ্যম থাকে, কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে তা ছড়ানো খইয়ের মতো। তুলে গুছিয়ে নিয়ে যে আবার ঠোঙায় ভরে রাখবে, সে খেয়ালও হয় না অনেকেরই। খেয়াল থাকলেও আবার লোক পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই শিল্পশহরে এসব কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বড় অভাব। উদ্যোগী মানুষেরও দেখা মেলা ভার। নিজের বৃত্তের বাইরে যেতে চাইলেও যাওয়া হয়ে ওঠে না আর। অফিস ও বাড়ি, কারখানা ও কোয়ার্টার, এর বাইরে ভাবনার বিকাশেও বড় জটিলতা। ফলে, বলবেই বা কাকে। অথচ সে যখন এসেছিল, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের এই শিল্পনগরীতে তখনও জঙ্গল। রজতেশের এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে কলকাতা থেকে এখানে এসেই প্রথম খুঁজতে শুরু করেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রাঢ় বাংলার এই জায়গাটা, যেখানে শিল্পশহর গড়ে উঠেছে সেখানে আগে কী ছিল, কারা ছিল, কোন কোন গ্রাম তলিয়ে গেছে, আর তলানির সেই সব মানুষজন, তারাই বা কোথায় এখন।

ওই খুঁজতে গিয়েই কত মানুষের সঙ্গে যে পরিচয়, কত পরিবারের সঙ্গে যে কী নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। তা রজতেশ ততদিনে এই লৌহনগরীর বলয়ে প্ল্যান্ট ও কোয়ার্টারের মাঝে মানবমনেরও চর্চা শুরু করে দিয়েছে। কঠিন এই শিল্পের বাইরেও যে আর একটি শিল্প আছে, তারই মননে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। আর করতে করতে যৌবনেরই তাড়নায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করতে শুরু করেছিল। তখন তার সঙ্গে যে কত নতুন প্রাণ, নতুন রক্ত। লিখছে, পড়ছে, পড়াচ্ছে ও বৃহত্তর দুনিয়ায় পৌঁছে দেওয়ার তাড়নায় মুদ্রিত হরফে তা প্রকাশিতও হয়ে চলেছে। এবং এই লৌহনগরী থেকে ওদিকে ওই কয়লানগরীর বৃত্তে রজতেশের যে তখন কত নাম, কি বিপুল খ্যাতি। আর নিজের খ্যাতির পাশাপাশি সঙ্গী অক্ষরকর্মীদেরও খ্যাতি জুটেছে এসব অঞ্চলে। কিন্তু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেই তো কেবল চলবে না। শিল্প-সংস্কৃতির মক্কা মহানগরী ওই কলকাতার বুকেও তো ছড়িয়ে দিতে হবে। অতএব যোগসূত্র গড় কলকাতার সঙ্গে।

তা সে কাজেও সাফল্য পেয়েছিল রজতেশ। কলকাতারই ছেলে। কলকাতা থেকেই চাকরি সূত্রে একদিন এসে উঠেছিল এই লৌহনগরীতে। কাজেই যোগাযোগ করতে আর দেরি হয়নি। মহানগরীর তরুণ তুর্কি লেখকদের সঙ্গে তাই অনিবার্যভাবেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। এবং তারপর বন্ধুত্ব। আর সে বন্ধুতার টানেই তারা এসেছে। আড্ডা মেরেছে। শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। আবার সেও গেছে কলকাতায়। সঙ্গে এই শিল্পনগরীরই দু-চারজন। কবি ও গল্পকার বন্ধুরা।

রজতেশ দা—রজতেশ দা—

রজতেশ চমকে উঠল, কে!

আমি!

ও প্রদীপ! রজতেশ ঠোঁটে একটু হাসি টানার চেষ্টা করে, ওদের সবাইকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলে—

হ্যাঁ। পৌঁছে দিয়ে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে তুলে দিয়ে এসেছি। ব্ল্যাক আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতাম। কিন্তু ওরাই দিল না। বলল সারাদিন যা ধকল গেছে...

হ্যাঁ—বোঝে তো ব্যাপারটা। রজতেশ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।

তা আপনি এখানে এখনও কী করছেন! বাড়ি যাবেন না?

রজতেশ মাথা নাড়ে, হ্যাঁ যাব। এই যাই—

যাই মানে। এতক্ষণে তো যাওয়া উচিত ছিল। সারাদিন বউদি একা বাড়িতে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না না, একা ঠিক নয়—। কাজের মাসিকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছি।

তা হলেও ... প্রদীপ চোখ তোলে, কাল থেকে নাকি শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে।

রজতেশের বুক থেকে চাপা একটা শ্বাস নেমে আসে, খারাপ বলতে ... কেমো চললে যা হয়—

প্রদীপ চুপ। সামান্য একটু নীরবতা। এর পরেই রজতেশ আবার কখন বলে উঠেছে, তা তুমি আবার এলে যে এখানে?

রাস্তায় খবর পেলাম, আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন—

কে দিল? রজতেশ অবাক।

প্রদীপের ঠোঁটে সামান্য একটু হাসি, ইলেকট্রিকের ছেলেটা। তা চলুন চলুন, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি—

না না, আমি বাসেই চলে যাব। তুমি যাও। দু'দিন ধরে যা খাটাখাটনি করেছ—

আহা চলুন না—

হলঘরের দরজা থেকে নিচে নেমে নিজের বাইকের দিকে এগিয়ে যায় প্রদীপ, আচ্ছা রজতেশদা আজকের অতিথি তিনজনই আপনার লেখক জীবনের প্রথম বন্ধু—না?

তিনজন নয়। দুজন। অনীশ আর শৌভিক।

ওরা তা হলে তখন আসতেন?

আসতেন মানে। দাপিয়ে বেড়াতেন। তা তখন তো এতসব কাগজ বেরোয়নি। আমাদের পত্রিকার জন্য গল্প লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আর গল্পটি শেষ করেই ছুটে এসেছেন তা দেওয়ার জন্য। ডাকে পাঠিয়ে দায় এড়াননি—

সত্যি, কী ভাল সময় যে ছিল তখন?

সময় এখন আরও ভাল প্রদীপ। অন্তত লেখক শিল্পীদের কাছে—

কেন!

কেন কী, লেখার কত মাল-মশলা ছড়িয়ে আছে বল তো? লেখক তো এটাই চায়—

রজতেশের এখনও মন পড়ে, সে সময়ে প্রায় বছর চল্লিশ আগেও এমনই একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্দেহ-ঘৃণা-অবিশ্বাস, মতদ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তরুণ লেখকদের কেবলই লেখাকে আঙ্গিকসর্বস্ব করে তোলা। এমনই একটা সময় কলম ধরে রজতেশরা অনুভব করেছিল, মূল স্রোতে ফেরার টান। ফিরতে হবে মাটিরই কাছে মানুষের কাছে। তা সে মানুষ যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। ফলে গল্পহবে 'তাহাদের', আখ্যানে উঠে আসবে সমাজ বাস্তবেরই প্রকৃত চিত্র। কিন্তু কী হল—।

রজতেশ তাকায়। প্রদীপ তার বাইককে জীবন্ত করার চেষ্টা করছে। এবং একটু পরেই বড় একটা গর্জনে সে কথা বলে উঠল। প্রদীপ মুখ ফেরাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কই, উঠুন রজতেশদা?

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা সামনে ডান-পাটা তুলে পেছনের সিটে বসল রজতেশ। এর পর হাতের আঙুল বাড়িয়ে ধরল সিটের হ্যান্ডেলটিকে। খানিকটা সাদা ধোঁয়া ছেড়ে বাইক ছুটল তখন সামনের বাঁকের মুখে।

আগে, বছর সাতেক আগেও এমন একটি বাহন ছিল তার। তবে সেটি অনেক হাল্কা প্রকৃতির। তাকে বাগে আনতেও কোনও কষ্ট ছিল না রজতেশের। কিন্তু রিটায়ারমেন্টের পরে, শিপ্রার অসুখটা ধরা পড়তেই কী জানি কেন আর ওটাকে সহ্য করতে পারত না শিপ্রা। রজতেশ তবু অনেক বুঝিয়েছিল। বলেছিল, এই শহরে এমন বাহনটি ছাড়া চলবে কেন শিপ্রা? বাজারহাট থেকে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ করা কি হেঁটে হয় নাকি! তা ছাড়া এ তো তোমার আর কলকাতা নয় যে, পা বাড়ালেই অটো-রিকশা বাস বা ট্রাম। কাজেই—

তা হোক তুমি ওটায় আর উঠবে না—

তা হলে যাতায়াত করব কী করে?

কী করে আবার! মিনি আছে, বাস আছে।

অগত্যা কী করা। প্রথম প্রথম লুকিয়েচুরিয়ে তাতে চড়লেও পরে আর পারল না। পড়ে থাকতে থাকতে শেষে একদিন বিক্রি করে দিল সেটাকে। অথচ বিয়ের পরে পরে শিপ্রারই ইচ্ছেয় সেটা কিনেছিল রজতেশ। শিপ্রাই সঙ্গে গিয়ে শো-রুম থেকে পছন্দ করেছিল। রঙটা একটু লালচে খয়েরি। তেজি ঘোড়ার শরীরের মতো। যেন তেল গড়িয়ে নামছে। অথচ...

রজতেশদা?

বিপরীতমুখী হাওয়ায় কথাগুলো ভাঙতে ভাঙতে আসছিল। রজতেশ তা টুকরো টুকরো অবস্থায় ধরল।

হ্যাঁ বল—

অর্ণবদা পুরস্কারটা নিতে এলেন না কেন?

রজতেশ একটু থমকে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে আবার, ওই তো নিকট এক আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ। সকালে খবরটা পেয়েই চলে যায়। না হলে কাল রাতেও তো কথা হল— আসছে।

কিন্তু—

কী।

না থাক।

রজতেশ টের পায়, কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ঠিক প্রদীপ। তা না পারারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা। কেন না রজতেশের প্রথম জীবনের বন্ধু। এক সঙ্গে ওঠাবসা, চাকরি, সাহিত্যচর্চা। জীবনের প্রথম তিরিশ বছরই তো কেটে গেছে এভাবে। সেই অর্ণব যে শেষ সময়ে এসে এভাবে শিবির বদলাবে তা ভাবতে না পারলেও আবার অবাক হয়নি। কেন না নীতি বা আদর্শের ব্যাপারে যে সবাই একই পথে চলবে সে-কথা ভাবার কারণ নেই। মতান্তর বা মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বা কেন চিড় ধরবে। কিংবা আদৌ ধরেছিল কি? না ধরলে সেদিনের কৃষি এবং শিল্পের আলোচনা সভার পরেই বা কেন অমন মুখ গম্ভীর করে চলে যাবে। ওই তারপর থেকেই তো অর্ণবকে ঠিক ধরতে পারছে না রজতেশ। দেখা হচ্ছে, কথাও হচ্ছে, কিন্তু সম্পর্কের সেতুতে কোথাও যেন একটা চিড়। চিড়টা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি রজতেশ, তবে অনুসন্ধান রয়েছে।

ঢাল খেয়ে যাওয়া কালো রাস্তাটা ধরে হু হু করে নেমে গিয়ে আবারও ওপরে উঠতে থাকে বাইকটা। কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা সরে গিয়েছিল, ব্যাগের হ্যান্ডেলটা আবার ঠিকঠাক কাঁধে তুলে সামনে তাকাল রজতেশ।

প্রদীপ, লেখাটা ঠিকঠাক চালিয়ে যাও। তোমার লেখার কথা কিন্তু এখন সবাইই বলছে—

কিন্তু এ বড় শক্তকাজ রজতেশদা।

শক্ত কাজ! কোনটা?

এই চালিয়ে যাওয়া—

কেন?

AMARBOI.COM

প্রদীপ হাওয়ায় কথা ভাসায়, কারখানার ডিউটি করে সংসার সামলে আর লেখার টেবিলেই বসা হচ্ছে না—

সে কি।

কী করব বলুন, একে প্ল্যান্টের চাপ তার ওপর ঘরে ফিরতে না ফিরতেই বউয়ের এটা, ছেলের সেটা তার ওপর মেয়েটাও এমন এসে হামলে পড়বে যে সব ভাবনা চৌপাট—

রজতেশ চমকে ওঠে। একটু কি কেঁপে গিয়েছিল? না হলে তিরিশ বছর আগের এমন এক জীবনের ছবি কেন-ই বা এমন করে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে ওর।

শিপ্রার সঙ্গে পরিচয় কলকাতায়। ওর একটা গল্প পড়ে নিজেই যেচে এসে আলাপ করেছিল একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। এরপরেই ঘনিষ্ঠতা। প্রেম। ভালবাসল দু'জন দু'জনকেই। ফলে বিয়ে করতেও আর দেরি হল না। বিয়ে করে শিপ্রাকে নিয়ে চলে এল এই শিল্পনগরীতে। তা প্রথম নতুন বউয়ের চলাফেরা ও শরীরী ঘ্রাণে বোধহয় একটু বেশি মাত্রায়ই রোমান্টিক হয়ে থাকবে কিন্তু শিপ্রাই তাতে রাশ টেনে ধরেছিল।

এই যে মশাই, শুধু বউয়ের কাছে ঘুরঘুর করলে চলবে। তোমার সঙ্গে আমার জড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াটা কিন্তু তোমার লেখালেখির সূত্রে। তা সে জগতের খবর কী। কলমে কালি আছে না শুকিয়ে গিয়েছে?

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল রজতেশ। ফলে দু'দিন বাদেই আবার পুরোপুরি লেখার ভেতরে। ডুবিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। এবং ওই তখনই আবার শিপ্রা।

আচ্ছা তোমাদের লেখায় এমন কাঠিন্য কেন বল তো?

কাঠিন্য?

হ্যাঁ।

কলকারখানায় শ্রমিক বা খনি অঞ্চলের খেটেখাওয়া মানুষ কিংবা রাঢ় এলাকার কঠিন বাস্তবটা, যা-ই নিয়ে লেখো না কেন, লিখতে গিয়ে এত আড়ষ্টতা এসে যায় কেন?

তাকিয়েছিল রজতেশ। এক সময় আবার বলেই উঠেছিল, কথাটা ঠিক বুঝলাম না কিন্তু—

লজ্জাই পেয়েছিল শিপ্রা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরিয়েও দিয়েছিল, না আমি বলতে চাইছি যত কঠিন জীবনই হোক, সে জীবনে আনন্দ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত আবার দুঃখও তেমনি। কিন্তু লিখতে গিয়ে এই জায়গাতেই তোমরা কেমন কঠিন হয়ে উঠছ। কেমন জড়িয়ে ফেলছ একটা কৃত্রিম আবরণে—

চমকে উঠেছিল রজতেশ। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছিল। ভাবতে ভাবতে সবাইকে বলেও ছিল আবার। ফলে রাতারাতি উন্নতি সমালোচক হিসেবে কেউ শিপ্রাকে সমীহও করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কী হল, ছেলেটা হওয়ার পরে পরে যেন সংসারের বৃত্তেই আটকে গেল শিপ্রা। এরপর মেয়ে হলে শিপ্রাকে আর সে বৃত্ত থেকে বের করে আনা গেল না। উল্টে রজতেশও যেন জড়িয়ে পড়ল। এরপর দিন গেল, মাস কাটল, বছর ঘুরল। এবং বছরের পর বছর। ছেলের লেখাপড়া, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট ও মেয়ের স্কুল কলেজ, এ সবের ভেতরে হাবুডুবু খেতে খেতে যখন বছর কুড়ি পার, সেই সময়ে আচমকাই একদিন রজতেশ আবিষ্কার করল, লেখালিখি থেকে সে সরে গেছে কখন এবং তার সঙ্গের লেখক বন্ধুরাও বহুদূরে। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। ইতিমধ্যে আরও পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটেছে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চেন্নাইয়ে পোস্টিং নিয়েছে। মেয়েও বিয়ের পরে আগরতলা। মেয়ে তবু বিয়ের পরে পরে আসত নিয়ম করে, তারপর আসতে না পারায় দু'দিন পরে পরেই নিয়মিত ফোন, কিন্তু ছেলের দিক থেকে সেটুকু সাড়াও পেল না। প্রথম প্রথম এলেও পরে একটি পাঞ্জাবি মেয়ে বিয়ে করে সেই যে দেশান্তরি হল আমেরিকায়, গিয়ে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এরই মধ্যে একদিন ধরা পড়ল শিপ্রার ওই দুরারোগ্য ব্যাধিটা।

বাস বাস—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে ভাবতে কখন যে একসময় পেছনে চলে গিয়েছিল কী মনে পড়াতে রজতেশই আবার বলে উঠল, বাস আমাকে এখানে নামিয়ে দাও প্রদীপ—

এখানে! পা বাড়িয়ে ভূমি স্পর্শ করেই বাইকটা থামাল প্রদীপ, বাড়ি তো এখান থেকে আরও খানিকটা—

তা হোক এটুকু হেঁটেই যাই।

হেঁটে যাবেন। বলতে গিয়েও প্রদীপ স্থির, ঠিক আছে—

কাল একবার এসো দীপেনের বাড়িতে। আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে তোমাদের মতামত শুনব—

আচ্ছা।

বলতে বলতেই প্রদীপ বাইক ঘোরায়। তারপর শব্দ তুলে একসময় আবার হাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে নিজের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রজতেশ।

মাসি দেখতে পেয়েছিল। দরজা খুলে দিয়েই রজতেশ এসে বসে শিপ্রার মাথার পাশে, এখন কেমন আছ?

শিপ্রা চুপ। রজতেশ তার হাতটা তুলে নেয় নিজের হাতে। এবং ওই তখনই ফিসফিস করে শিপ্রা শুধোয়, অর্ণবদা এসেছিল পুরস্কার নিতে?

না। হালকা করে মাথা নাড়ায় রজতেশ।

আমি জানতাম।

জানতে! রজতেশ অবাক, কী করে জানলে।

ঝুঁকে পড়ে শিপ্রার আরও কাছাকাছি মুখ নামিয়ে নেয় রজতেশ। শিপ্রা কোনও উত্তর করে না। রজতেশ জানে, এখন আর কিছু বলবে না সে। ইদানীং মেয়ের বিয়ে ও ছেলের বিদেশে চলে যাওয়ার পর থেকে রজতেশকে মাঝে মাঝেই আবার লেখার কথা বলত সে। বলত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তা বলতে বলতে যোগাযোগও করতে শুরু করেছিল রজতেশ। দু-একটা লেখার চেষ্টাও করেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎই এই ব্যাধিটা ধরা পড়ল শিপ্রার।

নিজে থেকেই অনেকক্ষণ আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে শিপ্রাকে বলার চেষ্টা করে রজতেশ। শিপ্রা শোনে কী শোনে না, ঠিক টের পায় না। তবে বোঝে সে কিছু বলবে।

একসময় শিপ্রা বলল, ফ্ল্যাস্কে চা করে রেখে গেছে রমলার মা। হাতমুখ ধুয়ে এসে খাও—

রজতেশ ওঠে। তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়। আরও খানিকক্ষণ শিপ্রার পাশে বসে থেকে একসময় সে উঠে পড়ে। এরপর প্রতিদিনের মতোই রাত। শিপ্রাকে খাওয়ায়। ওষুধ দেয় ও বাথরুমে যেতে সাহায্য করে। এরপর নিজে খেয়ে নিয়ে শিপ্রাকে একবার দেখে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজকার মতোই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতের আকাশের নক্ষত্রমালা পরীক্ষা করে।

পরীক্ষা করতে করতেই কখন আবার নিজের ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু ঢুকতেই চমকে উঠল। তার লেখার টেবিলে সেই কলমটি। বছর পঁচিশ আগের এক জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিল শিপ্রা। মাঝে বহু বছর সে খুঁজে পায়নি।

রজতেশ এগিয়ে যায়। পেনটা হাতে তোলে। কিন্তু তুলেই থমকে তাকায়। এত নোংরা আর পুরনো কালির গাদ জমে আছে সেখানে।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিবটা দেখতে থাকে রজতেশ। আর দেখতে দেখতেই আবিষ্কার করে, কেবল গাদ-ই নয় নিবের বুকে ছোট ছোট ক্ষত। যেন সময়ের ক্ষতচিহ্ন। এ চিহ্নগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে বের করে নিতে না পারলে এ কলমে আঁচড়ও কাটবে না আর।

কিন্তু রজতেশ কি তা পারবে?

আজকাল, ১০ জুন ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাতাবাহার

শৈবাল চক্রবর্তী

নগেন ভট্‌চাজ বললেন, 'ছাতা নিয়ে এক-একজনের খুব বাতিক থাকে।'

খগেশ বর্মন বলল, 'হ্যাঁ, আমার এক মামা আছে, সে জীবনে কোনওদিন ছাতা ব্যবহার করেনি।' কৃতান্ত শূর বলল, 'আমার ভাইপো মহানন্দকে তো দেখেছো তোমরা। দেখতে-শুনতে ভাল, স্কুল ফাইনালে তিনটে লেটার পেয়েছিল। তার এক দোষ ছাতা হারানো। একশো একুশটা ছাতা হারিয়েছে, যখন তার বয়স মোটে বাইশ।'

রথীন দত্ত হাটখোলায় থাকে। রোজ ট্যাক্সি ভাড়া করে এই আড্ডায় আসে। সে এতক্ষণ কাগজে সিগারেট পাকাচ্ছিল। এখন তাতে একটি টান দিয়ে বলে, 'আমার জ্যাঠার মতো এমন ছাতাপাগল মানুষ যদি দুটি থাকে। দেশে যতরকম ছাতা তৈরি হয়, তার সব নমুনা আছে তাঁর সংগ্রহে।'

খগেশ অবাক হয়ে বলে, 'বলো কী!'

ঢুলুঢুলু চোখে রথীন বলে, 'বলা নয়, দেখার জিনিস। একদিন সময় করে যেও জ্যাঠার তালতলার বাড়ি, দেখলে চক্ষু সার্থক হবে।'

নগেন ভট্‌চাজ বলেন, 'আমার মেসোর খুব বাতিক ছিল ছাতা নিয়ে।'

আবার কার কথায় তাঁর বক্তব্য চাপা পড়ে যায়।

শ্যামপুকুরের উদয়ন সঙ্ঘের ক্লাবঘরে আড্ডা বসেছে। রোজ সন্ধ্যায় এখানে কিছু বয়স্ক মানুষ জড়ো হন খোশগল্প করতে। সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত তুমুল আড্ডা চলে। জর্জ বুশের বৈদেশিক নীতি থেকে বাগ্দা চিংড়ির দর—কোনও প্রসঙ্গ বাদ যায় না। একদল আছে ঘরের এককোণে বসে তাস খেলে, বাকিরা আর—একদিকে বসে বাকযুদ্ধ চালিয়ে যায়। পাশে রঘুর দোকান থেকে দফায় দফায় চা আসে, গরম চা আর বেগুনি।

আজ ছাতা নিয়ে কথা উঠেছে। বর্ষার মরশুম, এখন লোকের হাতে-হাতে ছাতা ঘুরছে। এর মতো উপযুক্ত বিষয় এ সময় আর কোথায় পাওয়া যাবে! কাল খগেশ বর্মন ক্লাবে ছাতা ফেলে গিয়েছিলেন। আজ এসে সেটি ফিরে পেয়েছেন। সে ঘটনার কথা বলতেই ছাতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

নাকে এক টিপ নস্যি দিয়ে নগেন বলেন, 'আমার মেসোর ছাতা নিয়ে বাতিক ছিল। মানে, ছাতা ছাড়া তিনি কোথাও বেরোতেন না। বছরের সব ঋতুতে, সব দিনে তাঁর হাতে ছাতা থাকবেই। দুনিয়ার লোকের একোহেও [illegible] বাড়িতে গেছেন

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে, এখানে বলে রাখি, মেসো নগগ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন টানা কুড়ি বছর। সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালকে প্রধান অতিথি হওয়ার অনুরোধ করতে তাঁর কাছে যাওয়া। রাজ্যপাল যখন করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, মেসো তখন ডান হাত থেকে ছাতাটি বাঁ হাতে চালান করে তাঁর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে ছিলেন।'

'বলেন কী!' কৃতান্ত শূর অবাক হয়ে বলে।

তবে আর বলছি কী। তারপর রাজ্যপাল যখন তাঁকে বসতে বললেন, মেসো তখন আড়াআড়িভাবে ছাতাটি তাঁর কোলের ওপর রাখলেন। তাঁকে আগমনের উদ্দেশ্য বলার পর রাজ্যপাল যখন সানন্দে সম্মতি দিলেন তাঁদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য, তখন মেসো ছাতাটি কাঁধের ওপর রেখে গটগট করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন।

'ঠিক সৈন্যরা যেমন বন্দুক কাঁধে রেখে মার্চ করে?' রথীন দত্ত বলে।

'ঠিক তাই।' নগেন মাথা নাড়েন।

খগেশ বলতে যায়, 'আমার মামা'...

নগেন বলেন, 'তোমার মামাকে আপাতত ধামাচাপা দাও। আমি শুরু করেছিলাম আমার মেসোকে নিয়ে। সে গল্প আগে শেষ করি। শুনলে মনে হবে, এমন গল্প আগে কখনও শোনোনি।'

নগেন ভট্‌চাজই এ ক্লাবের আড্ডাধারীদের মধ্যে বয়সে সবার বড়। তাঁর বয়স সাতষট্টি, আর অন্যদের পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। নগেন ছোটখাটো আকৃতির মানুষ। মাথার কাঁচাপাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, পরেন হাতকাটা পাঞ্জাবি আর ধুতি। সব বিষয় ভাল করে বিচার-বিবেচনার পর তবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। লোকে বলে, যে-যত্ন নিয়ে নগেনবাবু মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করেন, বাজার থেকে মাছও কেনেন সেইরকম খুঁটিয়ে দেখে।

নগেন বলেন, 'আমার ধুর্জটি মেসো নবগ্রামের জন্য অনেক ভাল কাজ করে গেছেন। তাঁর নামে ওখানে রাস্তা আছে। লোকে তাঁকে কাজের জন্য যতটা জানে, প্রায় ততটাই চেনে তাঁর ছাতা ব্যবহারের বাড়াবাড়ির জন্য। মেসো বলতেন, ছাতা একটা পরম ভরসার জিনিস। ঈশ্বরের তৈরি আকাশের তলায় সে মানুষের হাতে-গড়া এক অপূর্ব আচ্ছাদন। ছাতা কেবল মানুষকে রোদ, বৃষ্টি থেকে বাঁচায় না, উটকো বিপদ থেকেও বাঁচায়। মেসো একবার এক ছিনতাইকারীকে ছাতার বাড়ি মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন।'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রথীন দত্ত বলে, 'সেই রজত জয়ন্তী উৎসবের কথা বলুন। রাজ্যপাল এসেছিলেন সে সভায়?'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রথীন দত্ত বলে, 'সেই রজত জয়ন্তী উৎসবের কথা বলুন। রাজ্যপাল এসেছিলেন সে সভায়?'

'এসেছিলেন মানে। এসে ধন্য ধন্য করে গিয়েছিলেন মেসোর। এত সুন্দর রাস্তাঘাট, স্কুলবাড়ি দেখে খুব তারিফ করলেন। মেসো আবার একটি নতুন ব্যাপার করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চায়েতে যে পঞ্চাশজন কর্মচারী ছিল, তাদের প্রত্যেককে দুটি করে ছাতা উপহার দিয়েছিলেন। কালোটি কর্মীভাইয়ের জন্য, লালটি তাদের গিন্নির। তারা তো এতে খুশি হয়েছিলই, এত বড় একটা অর্ডার পেয়ে ছাতা সাপ্লায়ার দত্ত কোম্পানি সেই অনুষ্ঠানের জলযোগের পুরো খরচ দিয়েছিল।'

'সেই মেসো তা আর নেই?' নগেন থামতে খগেশ জানতে চায়।

'না, মেসো নেই। দুঃখের কথা, তিনি মারা যাওয়ার সময় একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলেই এ-কাহিনীর সমাপ্তি টানতে চাই।' তার আগে নগেন কৃতান্ত শূরের দিকে তাকান, 'তোমার ভাইপোর কথাটা শুনে নিতে চাই। সে নাকি ছাতা হারানোর রেকর্ড করেছিল...?'

'প্রায় সেইরকম।' কৃতান্ত মাথা নাড়ে। 'একশো একুশটা ছাতা হারিয়েছিল ছেলে, মাত্র বাইশ বছর বয়সের মধ্যে। কাকা দেখলেন এভাবে ছাতা হারালে তো তাঁকে ফতুর হয়ে যেতে হবে, তাই তার বিয়ে দিলেন ছাতার দোকানের মালিকের মেয়ের সঙ্গে। এখন তার শ্বশুর তার সঙ্গে লোক দেয়, ফলে ছাতা হারানোর পথ বন্ধ।'

সবাই হেসে ওঠে একসঙ্গে।

নগেন বলেন, 'বাঃ বেশ। তা খগেশ, তোমার মামার বৃত্তান্তটা শুনি। তিনি নাকি জীবনে কখনও ছাতা ব্যবহার করেননি।'

'হ্যাঁ। শুনলে মনে হবে গল্প, কিন্তু ঘটনা এটাই। ছেলেবেলায় কবে একটা ছাতা হারিয়ে বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলেন, সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে কখন ছাতা ব্যবহার করবেন না। এখন বাষট্টি বছর হল, এখনও সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলছেন।'

রথীন দত্ত বলে, 'রোদে না হয় ছাতা না হলেও চালানো যায়, কিন্তু বৃষ্টিতেও তাঁর ছাতা লাগে না। খগেশ বলে, 'কতদিন দেখেছি ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরছেন, বেরোচ্ছেন বৃষ্টি মাথায় করে।'

খুব মুষলধারে বৃষ্টি হলে অবশ্য অন্য কথা। তেমন হলে বাড়ি থেকে বেরোন না বা রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে যান। একদিন ওইরকম পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে ছটা। সমানে বৃষ্টি পড়ছে—এমন সময় সে বাড়ির এক মহিলা জানলা দিয়ে তাঁকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ভেতরে ডাকলেন...তার পর আর কী।

কী হল? কী হল? রথীন ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে, প্রেম?

প্রেম শুধু নয়, খগেশ মুচকি হাসে। সেই মনোরমা ব্যানার্জিই এখন আমার মেজো মামি। ওই রকম এক বর্ষণমুখর সন্ধেয় তাঁর সদ্যবিবাহিত স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন চার বছর আগে। যাওয়ার তিন বছর পর তিনি চিঠি পান তাঁর কাছ থেকে। আমি অন্য রাজ্যে এসে অন্যভাবে জীবনযাপন করছি, তুমিও চাইলে অন্য কাউকে জীবনসঙ্গী করে তোমার মতো জীবননির্বাহ করতে পারো।

ভাল। নগেন ভট্‌চাজ বলেন, মানুষের জীবনে যে কত কী ঘটে তা আজ আমরা ছাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌলতে জানতে পারছি। সেদিন ওইভাবে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা না হলে বোধহয় তোমার মামা অবিবাহিতই থেকে যেতেন—

হ্যাঁ, মামার তো সেইরকম সঙ্কল্পই ছিল। খগেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে, প্রথম জীবনে একটি মেয়ে তাঁকে দাগা দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলে মালা দিয়েছিল অন্য লোকের গলায়। এখন আমার সেই মামা দুটি মেয়ের পিতা। একটির বিয়ে হয়ে গেছে, একটির বাকি।

বেশ, নগেন এক টিপ নস্যি নেন। এবার তোমার জেঠার গল্প শোনাও রবীন্দ্রনাথ—

আমার জেঠার তো ওই একটিই শখ। রথীন বলে, সিনেমা দেকেন না। থিয়েটার না। নিত্যনতুন ছাতার নমুনা জোগাড় করেন। আমাদের রাজ্যের তো বটেই দেশের অন্য জায়গার হরেকরকম ছাতা দেখা যায় তাঁর ছাতাশালায়। পেনশনের অর্ধেক টাকা তাঁর এই বাবদ খরচ হয়। ওঁর তালতলার বাড়িরপুরো একতলাটা জুড়ে ছাতার মিউজিয়াম। কত লোক দেখতে আসে। ছবিতুলে নিয়ে যায়। বিলেতের টাইম ম্যাগাজিনে একবার একটা বড় প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ছবিসমেত জেঠামশাইয়ের এই শখ নিয়ে। দশ হাজার টাকা পেয়েছিল বুড়ো সে জন্যে। চমৎকার, নগেন বলেন, 'একদিন যাব আমরা, তোমার জেঠামশাইয়ের এই ছাতাঘর দেখতে।'

এবার আপনার মেসোর গল্পটা বলুন দাদা, খগেশ বর্মন ঘড়ির দিকে তাকায়, নটা বাজতে চলল। গিন্নির বাতের ব্যথাটা বেড়েছে তার জন্যে ওষধু নিয়ে যেতে হবে।

কী একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর সময়। কৃতান্ত সুর তাকায় নগেনের মুখের দিকে।

ঘটেছিলই তো, নগেন মাথা নাড়েন, বিশ্রী ব্যাপারই বটে আর সেটা ওই ছাতা নিয়েই।

এক টিপ নস্যি নেন তিনি তার পর শুরু করেন, মেসোর ওই ছাতাপ্রেম নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করত। কেউ বলত ছাতাপাগল, কেউ ছাতাবাতিক। মাসিমাও এদের মধ্যে ছিল। তা মেসো একদিন মাসিকে ডেকে বললেন, 'হাসিঠাট্টা যা করছ করো ও সব আমি গায়ে মাখি না। কিন্তু একটা কথা বলে যাই সেটা খুব ভাল করে মনে রেখো। এই যে আমার ছাতা এটা আমি উপনয়ন উপলক্ষে আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। বুঝতেই পারছ এ আমার কতদিনের সঙ্গী। আমার একটিই অনুরোধ, আমার শেষযাত্রায় এটি আমার সঙ্গে দিতে যেন ভুল না হয়।

মানে? রথীন দত্ত একটু সরল প্রকৃতির মানুষ। সে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

আরে এটাও বুঝলে না? খগেশ মুখ খোলে। 'মেসোর মৃত্যুর পর তাঁকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাঁর ওই ছাতাটিও যেন সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়। কি তাই তো দাদা?' খগেশ নগেন ভট্চাজের মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, নগেন বলেন, বড় আদরের জিনিস তো ওটা ওঁর। তাই মেসো চাননি ওটা পেছনে ফেলে যেতে। মাসির দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন, মনে থাকে যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন সন্ধেবেলা কালীবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরেছেন মেসো। একাশি বছর বয়স তাঁর তখন, দূরে কোথাও যেতে পারেন না। সন্ধের সময় কালীবাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে বাড়ি ফিরে আসেন। সেদিনও ওইরকম বাড়িতে এসে বললেন, কই কোথায় গেলে সব। এসো এদিকে এসো। আমার ডাক এসে গেছে, আমি চললুম।

শুনে মাসিমা আর মেসোমশায়ের ছোট ভাইয়ের বউ পড়ি কী মরি করে ছুটে এসেছেন। মেসো এর মধ্যে তাঁর হাতের ছাতাটি দরজার পাশে রেখে বৈঠকখানা ঘরের চৌকির ওপর শুয়ে পড়েছেন। দেওয়ালে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর ছবি টাঙানো ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বলছেন, 'এতদিনে অধম সন্তানকে মনে পড়ল মা'—

মাসিমারা তখন তাঁর বিছানার পাশে। কাঁদো কাঁদো গলায় মাসি বলছেন, কী হল? কী হল? মেসো বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আবার হবে, আমার ছুটি হল।' বলে একটু হেসে চোখ বুজলেন।

আধঘন্টার মধ্যে সমস্ত পাড়া ভেঙে পড়ল তাঁর বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল ছুটে এলেন। বনদপ্তরের মন্ত্রীমেসোর ভায়রা তিনি লাল আলো লাগানো গাড়ি নিয়ে এলেন। রাজ্যপালের প্রতিনিধি এলেন ফুলের তোড়া হাতে। উন্নয়ন সমিতির কর্মচারীরা বিলাপ করে বললেন, 'আজ থেকে আমরা পিতৃহারা হলাম।'

শবদেহ বার করতে দু ঘন্টা সময় লাগল। তখন এরকম কাঁচঢাকা গাড়ির চল হয়নি। খাটে মড়া তুলে শ্মশানে নিয়ে যেত লোকে। মেসোমশাইকেও সেইভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামনে-পেছনে বিস্তর লোক, সবে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বে মিছিল, হঠাৎ মেসো খাটের ওপর উঠে বসে বললেন, এই থামা, থামা, আমায় বাড়ি নিয়ে চল।' বাহকেরা ভাবল বুড়ো বোধহয় মরেনি। ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা না করেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তড়িঘড়ি তারা খাটিয়া ফিরিয়ে নিয়ে চলল। মড়া আবার ফিরে আসছে দেখে বাড়ির লোক তো অবাক। কেউ কেউ আবার দুর্গানাম জপছে। খাচ নিচে নামাতে মেসো আবার উঠে বসলেন। সামনেই মাসিমা দাঁড়িয়ে, তাঁকে বললেন, 'এত করে বললুম, তবু ভুলে গেলে। দাও, আমার কেষ্টধনকে দাও', চোখ মুছতে মুছতে মাসি ভেতরে গিয়ে মেসোর ছাতাটা এনে তার হাতে দিলেন।

মেসো সেটি কপালে ঠেকিয়ে বাহকদের বললেন, নে এবার ওঠা, তারপর বুকের ওপর ছাতাটি রেখে শুয়ে পড়লেন। দু-একজন তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখল তাঁর শরীর বরফের মতো ঠান্ডা।

তখন আবার খাটিয়া কাঁধে উঠল, সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি শোনো গেল, 'বলো হরি, হরিবোল।'

আজকাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাকী

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

খবরটা পেয়েছি। ভেরি স্যাড। পরিচিত পেশেন্টকে দেখে নিউরোলজিস্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরটি অকপট। একটু অপেক্ষা করে বললেন, বসুন।

মহিলার চোখে নিঃস্ব মানুষের দৃষ্টি। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে অস্ফুটে বললেন, সবই আমার কপাল। কী বলব? একটুও সময় দিলেন না। কিচ্ছু বোঝবার আগেই—

শেষ কথাগুলো আর বলা হল না। সাদা আঁচলের আড়ালে নীরবে হারিয়ে গেল।

নিজের আসনে বসে বিশেষজ্ঞ ঘড়ি দেখলেন। নটা পঁচিশ।

মহিলার পাশের চেয়ারে বসেছে একটি সুবেশ তরুণ। নিখুঁত কামানো মুখ। পরিপাটি চুল। সম্ভবত জামাই। ছেলেও হতে পারে। আজকাল অশৌচান্তে মাথা মুড়ানোটা তেমন আবশ্যিক নয়।

তরুণের মুখে ফুটে রয়েছে চাপা অস্বস্তি। দেহের ভাষায় চোখে পড়ার মতো অস্থিরতা। ওর নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যাবার তাড়া আছে।

ডাক্তার মহিলাকে বললেন, এখানে এসে বসুন।

ডাক্তারের বাঁদিকে রিভলভিং টুল। পাশে পর্দাটানা ছোট একটা ঘর। সেখানে গদিমোড়া একফালি উঁচু বেড।

মহিলা আস্তে আস্তে উঠে এলেন। তরুণটি চেয়ারেই বসে রইল।

স্বামীটি বরাবর স্ত্রীকে ধরে ধরে নিয়ে এসে বসাতেন। পেশেন্টের চেয়ে তাঁর উদ্বেগ বেশি। গত একমাসের সামান্যতম কষ্ট, তুচ্ছতম বিচ্যুতির ফিরিস্তি অসামান্য দক্ষতায় বলে যেতেন পাশটিতে দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

প্রথমে বসিয়ে পরে বেডে শুইয়ে নানান পরীক্ষার পর খারাপ কিছু উপসর্গ হয়তো ধরা পড়েনি। সামান্য হলেও উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লিখলেন, রিপিট।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন, কেমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব?

ঠিকই আছে।

রোগ কি একটুও কমেনি?

বাইরে থেকে বুঝতে পারবেন না। রোগটাকে এখন আরেস্ট করার পালা চলছে। উনি ভালো হয়ে যাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন হবেন না? মেডিসিনের রেসপন্স পাচ্ছি।

বলছেন? ও সেরে উঠছে।

ওঠারই কথা। কিছু সময় লাগবে।

পুরোপুরি ঠিক হয়ে কতদিন লাগবে ডাক্তার সাহেব?

ধৈর্য রাখুন। মেডিসিনের সঙ্গে ফিজিওথেরাপিটা চালিয়ে যান। চিন্তার কিছু নেই।

চিন্তা তো হবেই ডাক্তার সাহেব। নিজের বলতে এখন তো আমার এই একজনই।

অত ভাববেন না। সি হ্যাজ স্টার্টেড ইমপ্রুভিং।

মাসে মাসে এইসব কথাবার্তার সূত্রে এম ডি ডি এম দম্পতিটির পরিচিত হয়ে ওঠেন। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক জেনে যান ওঁদের কিছু কিছু পারিবারিক বৃত্তান্ত।

পাঁচবছর হল ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। ওঁদের বয়সের তফাত একটু কম, আট বছর। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন অনেকদিন। সে এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে জামাই-এর সঙ্গে বিদেশে। ছেলেও নিজের পরিবার নিয়ে বাইরে। ওরা নমাসে ছমাসে আসে। নিজের তৈরি দোতলা বাড়িটিতে থাকেন এঁরা কেবল দুজন। একে অপরের নির্ভর। ভালোবাসার পুনর্জন্ম মনে হয় এই সময়টাতেই ঘটে। এখন যেটা দরকার তা হল দুজনের সুস্থ থাকা।

ভদ্রলোক বলেন, বুঝতেই পারছেন একজন শুয়ে পড়লে অন্যজনের চোখ অন্ধকার। ওকে আপনি সারিয়ে তুলবেন আশা করেই অতদূর থেকে নিয়ে চলে আসি।

ডাক্তার হাসেন, নাইনটি পারসেন্ট-ই তাই। বাড়াবাড়ি না হলে কজনই বা আসেন।

ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ বদলান, যাকে নিয়ে জীবন শুরু করেছি তাকে বাদ দিয়ে যে বাঁচার কথা ভাবতেই পারি না ডাক্তার সাহেব। ও ক্রিপলড হয়ে গেলে এই বয়সে আমি সেটা সহ্য করতে পারব না। অত শক্তি আমার নেই। আপনি তাড়াতাড়ি ওকে সুস্থ করে দিন।

বিশেষজ্ঞ অভয় দেন।

স্ত্রীর যাতে একটুও কষ্ট না তার জন্য ট্রেন বাস বাদ দিয়ে ভাড়া গাড়িতে আসা যাওয়া করেন ভদ্রলোক। চেম্বারে নিয়ে আসা থেকে বেরনোর সময় পর্যন্ত কত যত্নশীল। দুহাতে দু বাজু ধরে প্রায় জড়িয়ে নিয়ে চলতে চলতে ঘন ঘন নির্দেশ দিতেন, আস্তে, দেখে পা ফেলো। সামনেটা উঁচু আছে। হোঁচট খেয়ো না যেন।

ডাক্তারের দেখা হয়ে গেছে। প্রেসক্রিপশন লিখছেন। তরুণটি বলল, মা! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে তুমি ও ঘরে গিয়ে বসো। আমি ট্যাক্সি ধরে আনছি।

মায়ের সম্মতি নেবার সময়টুকুও নেই। পার্স আর মোবাইল সামলে ছেলে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মা অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন।

মহিলা আজ আগের চেয়ে বেশি জবুথবু। আরও যেন কুণ্ঠিত।

ডাক্তার বললেন, আপনি এ ঘরেই ওই চেয়ারে গিয়ে বসুন। আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের রোগীর জন্যে ডাক্তার এখনও বেল বাজায়নি।

চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার আঘাতে বিহ্বল মানুষটির প্রতি সামান্য একটু সহমর্মিতা। টেবিলের ড্রয়ার খুলে কয়েক পাতা ওষুধ বের করে প্রেসক্রিপশনের ওপর রাখলেন। ফিজিশিয়ান্স স্যাম্পল।

মহিলা যেন নিজের ভেতরে গুটিয়ে রয়েছেন। সংকোচ বোধ করছেন হয়তো। ডাক্তার বললেন, এইগুলোতে আপনার দশদিন চলে যাবে। তার মধ্যে মনে হয় কেনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাই তো?

মহিলা উত্তর দিলেন না। প্রেসক্রিপশন আর ফয়েলগুলো নিজের পার্সে ভরে নিয়ে সম্মোহিতের মতো টুল ছেড়ে উঠলেন। পা মেপে মেপে এসে সামনের চেয়ারে বসে কুয়াশামাখা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার বললেন, কোনও তাড়া নেই। ভালো করে বসুন।

ফোলা ফোলা চোখ দুটো এবার জলে ভরে গেল। ভাঙা গলায় বললেন, নিজের জন্যে কোনওদিন একফোঁটাও ভাবলেন না। সবসময় কেবল আমাকে নিয়েই ব্যস্ত। এখান থেকে ফেরার পথেই সমস্ত ওষুধ কিনে নিতেন। সেই ওষুধ নিয়ম করে খাওয়ানো। ফিজিওথেরাপিস্ট সময়ে না এসে পৌঁছালে খবর নেওয়া। এর ওপর নিজের যত কাজ। বললে শুনতেন না। বয়স তো বাড়ছিল।

ডাক্তার শুনছেন।

আমাকে তো রান্নাঘরে যেতেই দিতেন না। লোক রেখে দিয়েছেন। সে না এলে নিজেই। আমি করতে গেলে খুব রাগ করতেন। অত সুখ, এই পোড়াকপালে সইবে কেন বলুন?

ডাক্তার বাধা দিলেন না।

মহিলা বলে চলেছেন, একটু যদি নিজের যত্ন নিতেন! কোনওদিন একটা চেক আপ পর্যন্ত করালেন না। কয়েক মিনিটেই সব শেষ। আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে গেলেন।

বিশেষজ্ঞ সময় মাপছেন না। মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

মহিলা থামলেন। এতক্ষণে একটু হালকা হয়েছেন হয়তো। শূন্যতারও ভাব আছে। আকস্মিক শূন্যতার ভার আরও ভয়ংকর।

খানিক নীরবতার পর মহিলা বললেন, কাল ছেলেমেয়েরা সবাই চলে যাবে। তার আগে বলে বলে একটু সময় করে নিয়ে আপনার কাছে আসা। নইলে কবে কার সঙ্গে আসা হত জানি না। সবাই খুব ব্যস্ত।

আপনি কি কারও সঙ্গে যাচ্ছেন? ডাক্তার ডিগ্যেস করলেন।

না যাচ্ছি না। মহিলা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

বললেন, ছেলেমেয়ে দুজনেই সঙ্গে যাবার কথা বলেছিল। আমি না করে দিয়েছি। উনি বেশ কয়েকজনের পড়াশোনার খরচ দিতেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন অনেকের। অনেককে সাহায্যও করতেন। এতদিন ধরে যেগুলো উনি চালিয়ে এসেছেন, সেগুলো কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুট করে বন্ধ করে দেওয়া যায়? দূরে গিয়ে থাকলে ঠিকমতো চালাতেও পারব না। উপস্থিত তাই এখানেই থাকব ঠিক করেছি।

দরজার পর্দাটা একটু ফাঁক হল। ফাঁকে ছেলের মুখ। ফিরে এসে মাকে ডাকছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

ডাক্তারও উঠে দাঁড়ালেন। বিদায়ীকে বিশেষ সম্মাননা।

বললেন, তিনমাস পরে সুবিধেমতো একবার এসে দিখেয়ে যাবেন। ততদিন এই ওষুধগুলোই চলবে। এরমধ্যে কোনও অসুবিধে হলে ফোন করবেন। নম্বর দেওয়া আছে কাগজে।

ছেলে ভেতরে ঢোকেনি। পর্দা সরিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নমস্কার জানিয়ে মহিলা কাঁপা কাঁপা পায়ে দরজার দিকে এগোলেন। বেলের বোতামে হাত না ছুঁইয়ে ডাক্তার তখনও দাঁড়িয়ে।

তিনমাস পরে পেশেন্টকে দেখে বিশেষজ্ঞ খুশি। সঠিক বললে চমৎকৃত এবং গর্বিত।

মহিলা একা এসেছেন। শরীর প্রায় ঋজু। চোখ মুখ উজ্জ্বল। নিজে থেকে টুলে এসে বসলেন। চলা স্বচ্ছন্দ।

কথা বলতে বলতে সমস্ত চেক আপ সেরে নিয়ে ডাক্তার প্রশ্নোত্তর পর্বে এলেন। সব জবাব কোয়ালিফাইং। দেখাশোনা শেষ করে ডাক্তার বললেন, তিন মাসে আপনি তো দেখছি একেবারে মিরাকল ঘটিয়ে ফেলেছেন। রিয়েলি। ভাস্ট ইমপ্রুভমেন্ট।

ডাক্তারের গলায় প্রসন্নতা চাপা রইল না। পুরানো প্রেসক্রিপশন পাশে রেখে প্যাড টেনে নতুন কাগজে লিখতে শুরু করলেন।

মহিলা হাসিমুখে বললেন, আমিও লক্ষ করেছি। কিছুদিন ধরে অসুবিধেগুলো প্রায় নেই-ই।

লেখা শেষ।

ডাক্তার বললেন, ঠিক তাই। আপনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সব ডোজ কমিয়ে দিলাম। ব্যায়ামগুলো কিন্তু ছাড়বেন না। আবার তিনমাস পরে দেখব।

সাবলীল হাতে প্রেসক্রিপশনগুলো নিয়ে মহিলা বললেন, অসুস্থ থাকলে যে চলবে না ডাক্তারবাবু। আমাকে ফিট থাকতেই হবে। নইলে একটা কাজ-ও হবে না।

কী কাজ? ডাক্তার ঘরোয়া হলেন।

সে অনেক কাজ। মহিলা হাসিমুখে বললেন, বাড়িতে নীচের তলায় একটা বাচ্চাদের স্কুল খুলেছি, ক্রেস কাম ফা'ামেন্টাল ট্রেনিং। ভালো স্কুলে ভর্তি করাবার প্রিপারেশন। ওঁর অনুরাগী ছাত্রছাত্রীরাই সব পালা করে পড়ায়। ঠিকমতো দেখভাল করার জন্য দুজন সিস্টার আছেন। সন্ধেবেলা একজন সদ্য পাশ করা ডাক্তার এসে বসেন। নামমাত্র ফিজ। আস্তে আস্তে জমে উঠছে।

ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসছেন। শুনতে ভালো লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে একাকিত্বের হতাশা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। অকারণ সহানুভূতিতে এঁর আর কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের ওপর বিশ্বাসটা টিকিয়ে রাখাই এখন সবথেকে জরুরি।

মহিলার গলায় এবার কিছুটা লজ্জার আভাস, উনি তো আমায় কিছুই করতে দিতেন না। আগলে আগলে রাখতেন। যত ছোটাছুটি খাটাখাটি সব নিজে। ওঁর কাজগুলো এখন সঙ্গী সাথী জুটিয়ে আমি নিজের মতো করে চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

ডাক্তার বড় করে হাসলেন, খুব ভালো। তবে যতটা সইবে ঠিক ততটাই।

ঠিক আছে। মনে রাখব। মহিলা ঘড়ি দেখলেন, আজ আবার একজন নতুন টিচার জয়েন করার কথা। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা আসি। নমস্কার।

নমস্কার। ডাক্তার বসে থেকে ডানহাতটা একটু তুললেন, তিনমাস পরে আসবেন একবার।

মহিলার অনায়াস যাওয়ার দিকে একটু তাকিয়ে বিশেষজ্ঞ বেলের বোতামে চাপ দিলেন।

বর্তমান, ২৯ নভেম্বর ২০০৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা উঁচু করে যাওয়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সারারাত ঘুম হয়নি। এমনকী দু'চোখের পাতাও এক করতে পারেননি। এই এক হচ্ছে মুশকিল, বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে পারছেন না।

না ঘুমোলে কত রকম এলোমেলো চিন্তা আসে। দেশের কথা, প্রিয় মানুষদের কথা। কিন্তু মাঝে মাঝেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার যন্ত্রণার জন্য। কিছুতেই, এত ওষুধ খেয়েও, এই বিশ্রী ব্যথাটা যাচ্ছে না।

রাজা উঠে এসে দাঁড়ালেন, জানলার কাছে।

আজ কত তারিখ? একুশ, না বাইশ? সেপ্টেম্বর মাস। এই সময় ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর। দেশেও এখন শরৎকাল। কিন্তু আমাদের শরতে গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রচণ্ড দাপট পুরোপুরি কাটে না। এখানে এরই মধ্যে শীতের মৃদু পরশ পাওয়া যায় হাওয়ায়।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খুলে রাজা বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

এটা একটা প্রশস্ত বাগানবাড়ি। প্রচুর বৃক্ষ শোভিত। তাতে ফুটেছে অজস্র ফুল। সব ফুল তিনি চেনেন না। দেশ বিভেদে গাছপালাও অন্য রকম হয়। কিছু কিছু পাখিও ডাকছে। তার মধ্যে একটা পাখির ডাক চেনা মনে হয়। দেশের বুলবুলির মতন।

স্নিগ্ধ বাতাসে জুড়িয়ে গেল কপাল, বুজে এল চক্ষু। সারা রাত যে আরাম পাননি, এখন প্রকৃতি তাঁকে সেই শান্তি উপহার দিলেন।

রাজার ইচ্ছে হল, বারান্দা থেকে নেমে বাগানের ঘাসে একটু হাঁটবেন। কিন্তু খালি পা, তাঁকে ঠান্ডা লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে। মাথা ধরে আছে, এখন একটু সাবধানে থাকাই ভাল।

তিনি বসলেন সাদা লেস লাগানো একটি বেতের চেয়ারে।

দেশ থেকে আসবার আগে কয়েকজন তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, অত দূরে বিদেশে আবহাওয়া অন্য রকম, তা সহ্য না হতে পারে। হঠাৎ হঠাৎ শীত, তাতেই সান্নিপাতিক হবার খুব সম্ভাবনা।

তাঁরা এ সব জানলেন কী করে? নিজেরা তো কেউ সমুদ্র পাড়ি দেননি। শুনেছেন নাকি নাবিক-লস্করদের কাছ থেকে?

কয়েক জন ইংরেজ রাজপুরুষও সাবধান করতে চেয়েছিলেন। একমাত্র ডেভিড হেয়ার বলেছিলেন, যাও যাও, সব এসো। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ডেভিড হেয়ার অনেক সাহায্য করেছেন। চিঠি লিখে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। আর তাঁর বোনকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, সব সময় রাজার দেখাশুনো করত। তা সে মেয়েটি তো তাঁর এখানকার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। ভারী লক্ষীশ্রীযুক্তা নারী।

বেশ কিছু দিন তো কেটে গেল, তাঁর শরীরের কোনওই ক্ষতি হয়নি। বরং মনে হয়, এ দেশের জলবায়ু আরও স্বাস্থ্যকর। লন্ডনে প্রচুর মানুষের সঙ্গে দেখা হল। শুধু একটিই অসুবিধে, তিনি একা একা পথে বেরোতে পারেন না। পথচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি। শুধু কৌতূহলী নয়, তিনি বুঝতে পারেন কারও কারও দৃষ্টিতে অন্য কিছুও থাকে। আতঙ্ক কিংবা ঘৃণা? যেন তারা এক আজব প্রাণী দেখছে।

শুধু গায়ের রঙের তফাত, তার জন্যই এত দূরত্ব? মানুষেরই তো শরীর, মানুষেরই মস্তিষ্ক। তবে হ্যাঁ, অস্ত্রবলে ভারতীয়রা হেয়।

আবার এখানকার বিদ্বজ্জন সমাজে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হয়। যাঁরা তাঁর কথা আগে শোনেননি বা কিছুই জানেন না, তাঁরা তাঁর কথাবার্তা শুনে এমনই অবাক হন, যেন চক্ষু ঠেলে বেরিয়ে আসার মতন। এই নেটিভটি এমন ইংরেজি জানে? বাইবেল সম্পর্কে এত জ্ঞান?

দেশে থাকতে ইউনিটারিয়ান চার্চের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ওঁদের মতন তিনিও একেশ্বরবাদী। হিন্দুদের মূর্তি পূজায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন, একথা রাজা আগেই ঘোষণা করেছেন।

হঠাৎ রাজার চোখে পড়ল বাগানের এক প্রান্তে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় জোর সাত-আট বছর বয়েস। সাদা ফ্রক ও নীল সোয়েটার পরা। মাথার চুল সব সোনালি। কী যে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এক পরি।

তিনি মনে মনে হাসলেন। তিনি স্বর্গও মানেন না। পরিদের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী নন। তবু এ রকম উপমা মনে এসেই যায়।

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রাজা এক বার ভাবলেন, হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকবেন। কিন্তু এর দৃষ্টিতে কী আছে? কৌতূহল, না ভয়? ডাকলে যদি না আসে, যদি দৌড়ে পালিয়ে যায়? থাক, এই কাননের অজস্র ফুলের সমারোহের মধ্যে সে পরি হয়েই দাঁড়িয়ে থাক।

একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রামহরি। শশব্যস্ত হয়ে বলল, হুজুর, হুজুর, আপনি এই শীতের মধ্যে বসে আছেন। পায়ে ইস্টাকিন পারেননি। আপনার শরীরে ব্যাধি আছে।

রাজা রামহরির কথা শোনার পর কোনও উত্তর না দিয়ে আবার তাকালেন বাগানের কোণে। পরি অদৃশ্য।

ঠান্ডা লাগছে ঠিকই, তা হলে আর বাইরে বসার দরকার নেই।

রামহরি তাঁর হাতে ধরতে গেল, রাজা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ছাড়। আমার এমন কিছু ব্যাধি হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামহরি বলল, বাথ সেরে নিবেন? হট হবাটার নিয়ে আসি।

এই দু'বছরে নিরক্ষর রামহরি বেশ ইংরিজি শিখে নিচ্ছে শুনে শুনে। বিচিত্র তার উচ্চারণ। রাজা এক বার বলেছিলেন, আমার সামনে তোকে ইংরিজি বলতে হবে না। অন্য জায়গায় ফলাস যত পারিস।

পরে আবার তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। থাক, যতখানি পারে শিখুক, মন্দ কী।

বাথটাবে গরম জল ঢেলে দেবার পর তিনি রামহরিকে ইঙ্গিত করলেন বাইরে দাঁড়াতে। কিন্তু নিজে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, তার সারা শরীর কাঁপছে। অবসন্ন হয়ে পড়ছেন।

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এটা কী হচ্ছে? কেন এই দুর্বলতা। কয়েক দিন ধরেই হচ্ছে এ রকম। অথচ সে রকম কোনও রোগের কথা তো বলতে পারছেন না চিকিৎসকরা।

অতি কষ্টে নিজেই স্নানান্তে পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন তিনি। একটু পরেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসতে হবে। এ দেশে সুসজ্জিত হয়ে টেবিলে বসাই নিয়ম। রামহরি তাঁকে জোব্বাজুব্বি ও মাথায় পাগড়ি পরাল।

পাশের ঘরে শোয় রাজার পুত্র রাজারাম আর এক জন সঙ্গী রামরতন মুখোপাধ্যায়। তারাও জেগে উঠেছে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে ঘন্টা বাজে।

রামহরি সেবাদাসদের দলে, সে দাঁড়িয়ে রইল দূরে। অন্য দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে বসলেন রাজা। অন্য দিকে মিসেস হেয়ার আর এখানে যাঁরা আতিথ্য দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকে মিস কিডেল আর মিস কাসেল।

এ দেশের নারীদের স্বাবলম্বী অবস্থা দেখে রাজা হয়ে প্রায়ই ভাবেন, কবে দুর্ভাগা ভারতবর্ষে রমণীদের এমন সৌভাগ্য হবে। এ দেশের রমণীরা শিক্ষার সুযোগ পায়, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে, সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। হায় বঙ্গনারী!

খেতে খেতে শ্রীমতী কেডেল জিজ্ঞেস করলেন, রাজা, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করব? কয়েকদিন ধরেই খুব কৌতূহল হচ্ছে।

রাজা বললেন, অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন।

শ্রীমতী কেডেল সসঙ্কোচে বিনীত ভাবে বললেন, আপনারা যে চার জন এসেছেন, এ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় আমরা ব্রিস্টলে দেখিনি। আপনাদের চার জনেরই নাম রাম। ভারতীয়দের সকলেরই নাম কি রাম হয়?

রাজা সংযত হাস্য করলেন। কথাটা তো ঠিক।

তিনি বললেন, মিস কেডেল, আপনার যে খটকা লেগেছে, তা অত্যন্ত সংগত। এখানে আমাদের চার জনেরই নামে রাম রয়েছে বটে, তবে এটা পিয়োরলি কো-ইন্সিডেন্টাল। ভারতীয়দের আরও নানা প্রকার ও বিচিত্র নাম হয়। যেমন আমার বন্ধু দ্বারকানাথ, যেমন—

তাঁকে আর কিছু বলতে হল না, তাঁর সঙ্গীরাই গড় গড় করে অন্য ভারতীয় নাম বলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ-এ এক কামড় দিতেই রাজার এক বার হেঁচকি উঠল। এ রকম প্রায়ই হচ্ছে ইদানীং। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। অথচ ভোজনরসিক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

নাম প্রসঙ্গ এখনও চলছে। রাজা মনে মনে ভাবলেন, ইংরাজ পুরুষ বা রমণীদের নামের উচ্চারণে তাঁর কোনও অসুবিধে হয় না। অথচ শিক্ষিত ইংরাজরাও একটিও ভারতীয় শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে না। রামের মতন একটি অতি সহজ শব্দকে এরা উচ্চারণ করে র‍্যাম, যার অর্থ ভেড়া। এক জন বিশিষ্ট পাদ্রি তাঁর পুরো নাম উচ্চারণ করেছিলেন, এই ভাবে, ড্যামমোহন রায়। তা শুনে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। তার চেয়ে শুধু রাজাই ভাল, তাও অনেকের ওষ্ঠে হয়ে যায় র‍্যাজা! আমরা পারি, অথচ তোমরা পার না কেন? চেষ্টা করো না, নাকি জিভের দুর্বলতা?

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য রাজা বললেন, আজ ভোরবেলা একটি বালিকাকে দেখলাম বাগানের এক কোণে। অপরূপ তার মুখশ্রী, বোধ করি কোনও প্রতিবেশীর কন্যা।

মিস কেডেল বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন। পাশের বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন রেভালেন্ড জন ফস্টার, তিনি এক জন প্রবন্ধকার, ও বাড়িতো তো কোনও বালক বালিকা নেই।

রাজা তাঁর কথায় কোনও উত্তর পেলেন না, উত্তর আশাও করলেন না।

তাঁর তলপেটে বেদনা শুরু হয়েছে এবং সে কথা তিনি অন্যদের জানাতে চান না।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মাফ করবেন, আমি এখন কিছু সময় নিরিবিলিতে গ্রন্থ পাঠ করতে চাই।

তিনি নিজের কক্ষে এসে প্রথমে বসলেন আরাম কেদারায়, কয়েক মিনিট পরেই তাঁর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। এ রকম দুর্বলতার ওপর রাজা নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়েউঠলেন।

লন্ডনে দিনের পর দিন ব্যস্ততার পর ব্রিস্টলে এই আতিথেয়তার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

স্টেপলটন গ্রোভ নামে এই উদ্যানবাটিকাটি ব্রিস্টল শহর থেকে কিছু দূরে। অতি সুরম্য ভবন, ব্যবস্থাপনা এবং যত্নেরও কোনও ত্রুটি নেই। বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষে আদর্শ।

লন্ডনে তাঁকে অনেক সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। কৌতুকের বিষয় এই যে, অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ধর্ম সম্পর্কেই সকলের কৌতূহল বেশি। রাজা বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হিন্দু ধর্মের মূর্তিপূজা মানেন না। তিনি একেশ্বরবাদী। তিনি যিশুকে মহামানব এমনকী ঈশ্বরপ্রেরিত বলতেও দ্বিধা করেননি, তবু অনেক জায়গাতেই তাঁকে প্রশ্ন শুনতে হয় যিশুর জীবনের নানান অলৌকিক ঘটনা এবং পুনর্জাগরণও মানেন কি না। যুক্তিহীন অলৌকিকতা মানতে রাজার দ্বিধা আছে। ভক্তরা সবই মানতে পারে, তারা তো প্রমাণ খোঁজে না।

কেউ কেউ ইঙ্গিত দেয়, রাজা কেন খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করছেন না? তিনি সযত্নে সে প্রশ্ন এড়িয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে। তিনি সেই পরিচয়টাই বজায় রাখতে চান। তিনি যদিও জাতপাত মানেন না, তবু তিনি এক জন ব্রাহ্মণ পরিচারক সঙ্গে এনেছেন। তাঁর নিজের অঙ্গেও উপবীত আছে। দেশের লোক যেন না বলতে পারে ম্লেচ্ছদের দেশে এসে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জাত খুইয়েছেন। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে দেশে, এক বার যদি রটে যায় যে, তিনি জাত খুইয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে তাঁর অংশ বরবাদ হয়ে যাবে। তাঁর সন্তানরাও বঞ্চিত হবে। আগে সম্পত্তি, তার পর তো জাত।

কিন্তু এখানে এত আদর, আপ্যায়ন, বিশ্রামের অঢেল সুযোগ, তবু শরীরে কেন জোর পাচ্ছেন না। আলস্যের তো সময় নেই। সামনে কত কাজ।

হাউজ অব কমনস-এ ভারতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। রাজা সেখানে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এই বিষয়ে পার্লামেন্টে একটা বিলও পেশ হয়েছে। দেশে কৃষকদের অসহনীয় দুরবস্থার কথাও রাজা জানাতে চান। নারীগণের কথা ... বুকের মধ্যে কে যেন দুম দুম করে দু'বার ধাক্কা দিল।

রাজা চমকে উঠলেন। এ কি মৃত্যুর মুষ্ট্যাঘাত নাকি? মৃত্যু? এত মানুষ থাকতে তাঁর কাছে আসতে যাবে কেন? তাঁর উন্নত শরীর, অটুট স্বাস্থ্য, রোগভোগ বিশেষ নেই। পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিতে তাঁর বিশ্বাস নেই, তাই যম কিংবা যমদূতদের চেহারা তাঁর মনে এল না, তবু যেন একটা জ্যোতিপুঞ্জ, যেন মৃত্যুর প্রতীক হয়ে চেয়ে আছে, তাঁর মনে হল।

তিনি শ্লেষের সঙ্গে বললেন, কী, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ নাকি? এত ত্বরা কীসের? তেমন কোনও গুরুতর অপরাধ তো করিনি।

তার পর ধমক দিয়ে বসলেন, না না, যাও যাও। আমি এখন মোটেই প্রস্তুত নই। আমার অনেক কাজ বাকি। অনেক দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এরা শাসক জাতি, আমাদের দুখিনি দেশের তো কোনও ক্ষমতাই নেই, শুধু আবেদন নিবেদন করে যেটুকু দাক্ষিণ্য আদায় করা যায়। এদের মত ঐশ্বর্য, তা তো অনেকটা প্রাচ্য দেশ লুণ্ঠনেরই ফল।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে রাজা আবার বললেন না, আমি যাব না। আমি আবার উঠে দাঁড়াব। শরীরে যথেষ্ট বল আছে। বাহুতে, এই দ্যাখো, কতখানি গুলি ফোলাতে পারি। ডেখ, তোমার প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ রইল, তুমি কিছুতে আমাকে হারাতে পারবে না। যাও।

তিনি জোর করে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বভাবোচিত দর্পভরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে লাগলেন। আর মনে মনে বলতে লাগলেন, যাও, যাও, পারবে না!

কিন্তু কয়েকবার পায়চারি করার পরই রাজার বক্ষদেশ উত্তাল হয়ে উঠল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর পাল্‌স রেট অনেক বেড়ে গেছে।

আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কিছু খেতে ইচ্ছে করল না, তিনি উঠলেনও না। তিনি জ্ঞানও হারালেন না, ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসতে লাগলেন। তাঁর নিজেরই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতার জন্য রাগ হতে লাগল। তিনি হাঁটতে পারছেন না কেন? উঠতে তো হবেই, সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে হবে, আরও অনা কাজ, মৃত্যু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যাও, যাও।

পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টাতেও রাজার কোনও উন্নতি হল না। পরের রাতে রাজার সহচরদের সঙ্গে মিস হেয়ারও রোগীর ঘরে থাকবেন। এই প্রস্তাব শুনেই রাজা বললেন, না, না, ছি, ছি, এক অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে এক কুমারী এক কক্ষে রাত্রিবাস করবে, এ আবার হয় নাকি? তাঁর আপত্তি উড়িয়ে দেওয়া হল। এ দেশে কেউ এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপও করে না।

এক সময় দু'জন চিকিৎসক এসে তাঁকে দেখার পর একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগলেন, রাজা তাদের কথা শুনতে না পেলেও তাঁদের বিরস ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝে গেলেন, এই এত সভ্য ও উন্নত দেশের কোনও ঔষধই তাঁকে আর এই পীড়া থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। ওরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন।

রাজা উঠে বসে সহাস্য মুখে তাঁদের প্রচুর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন।

আবার শুয়ে পড়ার পর চোখ বুজে তিনি ভাবলেন, তা হলে বুঝি মরতেই হবে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে। তিনি জেদের সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে, যদি যেতেই হয় রাজার মতন মাথা উঁচু করে চলে যাব।

পরক্ষণেই তিনি আবার ভাবলেন, রাজা আবার কী? তাঁদের বংশে কেউ কখনও রাজা ছিল না। দিল্লির মুঘল বংশের নখদন্তহীন বর্তমান এক অসহায়, নামমাত্র বাদশা তাঁকে কিছু আর্থিক সুযোগসুবিধা দানের জন্য কাকুতিমিনতি করেছেন ক্ষমতাধর ইংরাজদের কাছে। রামমোহন এ দেশে আসছেন, তিনি অন্যান্য কিছুর সঙ্গে দিল্লির বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সেই জন্যই তাঁকে রাজা খেতাব দেওয়া হয়েছে। তার কতটুকু মূল্য?

আর মৃত্যুর কাছে তো রাজা আর প্রজা সবাই সমান।

ঠিক আছে, তবে সাধারণ মানুষও তো মাথা উঁচু করে যেতে পারে। কোনও দয়া ভিক্ষা নয় মৃত্যুর কাছে। কোনও সময় ভিক্ষা নয়।

রাজা এখনও তাঁর চলে যাওয়ার নিশ্চিততায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। কী এমন ব্যাধি হল তাঁর?

পর দিন তিনি জোর করে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেন। মেঝেতেই একটা জাজিম পেতে, ধরাধরি করে তাঁকে এনে শুইয়ে দেওয়া হল সেখানে। তাঁর একটা হাত ও পা অসাড়। পক্ষাঘাত। তিনি আর খাটে উঠতে পারবেন না।

কিন্তু মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সজাগ।

তিনি ভাবলেন, তা হলে এটাই মৃত্যু খেলা শুরু করল তাঁর সঙ্গে? তিনি অসহায় হয়ে শয্যায় পড়ে থাকবেন, অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে। দিনের পর দিন। পক্ষাঘাতে পঙ্গু মানুষটিকে করুণা করবে কাছাকাছি সকলে। কিছু দিন পর করুণাও শুকিয়ে যাবে, তার স্থান নেবে বিরক্তি।

তিনি, রাজা রামমোহন রায়, তাঁকে শক্তিহীন, পঙ্গু, হিসেবে দেখাতে চায় মৃত্যু।

তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। পারেননি জয়ী হতে। এখন আবার চ্যালেঞ্জ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালেন। তিনি মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে চলে যাবেন নিজেই। স্বেচ্ছামৃত্যু।

তিনি নিশ্বাস বন্ধ করে রাখলেন। এই অবস্থায় তাঁর চোখে ভেসে উঠল, কয়েক দিন আগে ভোরবেলা দেখা সেই বালিকাটির মুখ। এ এক এমনই রূপ, যা দেখলে বড় শান্তি হয়।

মেয়েটি যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। হাসিতে ঝলমল করছে সর্বাঙ্গ।

তা হলে এ মেয়েটি তাঁকে দেখে ভয় পায়নি? তাকে আপনজন বলে গ্রহণ করেছে। আঃ, এ যে কত বড় প্রাপ্তি, তা কে বুঝবে? আর না, এক বার আমাকে একটু ছুঁয়ে দে।

অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি মৃত্যুর উদ্দেশে বললেন, তুমি আমার আয়ু কেড়ে নিতে পার, কিন্তু তুমি আমার জীবনের গরিমা কেড়ে নিতে পারবে না।

রাজা বারবার নিশ্বাস বন্ধ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তা ছাড়তে বাধ্য হলেও পরের বার আরও বেশিক্ষণ শ্বাস রোধ করে রাখতে চাইলেন।

তার পর এক সময় বুক থেকে বেরিয়ে এল সমস্ত নিশ্বাস। এবং তাঁর প্রাণ।

চমৎকার শরতের রাত। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। জানলা দিয়ে সেই জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। রাজার সন্তান এবং দুই ইংরেজ বিবি নিচু গলায় কথা বলছেন ঘরের এক কোণে বসে। তাঁর কথা বলছেন খুব নিচু গলায়। এ দেশের আবহাওয়ায় এমন রাত কদাচিৎ আসে।

হঠাৎ ওদের এক জন তাকালেন রাজার শয্যার দিকে। চিৎ হয়ে সটান শুয়ে আছেন তিনি। ওষ্ঠে তাঁর ক্ষীণ হাসি। চক্ষু দু'টি খোলা। মৃত্যুর খেলা তিনি মেনে নেননি।

কী যেন একটা রাতপাখি ডাকছে তারস্বরে।

AMARBOI.COM

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ অক্টোবর ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইকে নিয়ে জীবনযাপন

সমরেশ মজুমদার

পোস্টকার্ডটি এসেছিল প্রকাশকের ঠিকানায়, তিনি খামে ভরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজকাল চিঠিপত্র লেখার চল নেই। পোস্টকার্ড অনেক দিন আসেনি। কিন্তু এই পোস্টকার্ড লিখেছেন বলরামকাকা, যাঁকে গত তিরিশ বছর আমি দেখিনি। গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন, 'স্নেহের অন্তু, কিছু দিন থেকে বোধ করছি এখানে তোমার উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়েছে। যদি কোনও টান অনুভব করো, তা হলে পত্রপাঠ চলে এসো। আশীর্বাদসহ বলরামকাকা।' ওপরে ঠিকানা দেওয়া আছে। প্লট নম্বর দুই, সোনাঝুরি জঙ্গল, পোস্ট অফিস ডুডুয়া, জেলা, জলপাইগুড়ি। দুষ্টুমিপনে নয়, কালিতে চিঠি লেখা হয়েছে।

বলরামকাকা আমার পিতামহের কনিষ্ঠ সন্তান। আমাদের চা-বাগানের বাড়িতে ছেলেবেলায় ওঁকে মাঝে মাঝে দেখেছি। আসতেন যেতেন। একটু বড় হয়ে শুনেছি বলরামকাকাকে নাকি সংসার টানে না। শান্তির খোঁজে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। পিতামহ বাধা দেননি। একে একে পিতামহ, বড়পিসিমা, বাবা এবং মা পৃথিবী থেকে চলে গেলে বলরামকাকা ফিরে এসে চা-বাগানের গায়ের জঙ্গলে জমি কিনে একাই বাস করছেন বলে শুনেছিলাম। সেখানে ছোটখাটো চাষবাস আর ছাগল-মুরগি পুষে লোক দিয়ে হাটে বিক্রি করে মোটামুটি বেঁচে আছেন বলে চা-বাগানের পরিচিত জনরা আমাকে বেশ কয়েক বছর আগে জানিয়েছিলেন। আসলে ওই মানুষটির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বলে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনও দিন।

ঠিকানায় লিখেছেন প্লট নম্বর দুই, সোনাঝুরি জঙ্গল। সোনাঝুরি জঙ্গলকে আমি কৈশোরকাল থেকে চিনি। হাইওয়ের পাশে গভীর জঙ্গল। মাঝে মাঝে বন্ধুরা মিলে সাইকেলে চেপে ওখানে যেতাম লুকিয়ে একটা সিগারেট ভাগাভাগি করে খাব বলে। সে সময় কোনও মানুষের বসতি সেখানে ছিল না।

এত বছর বাদে বলরামকে লিখেছেন আমার উপস্থিতি ওখানে জরুরি হয়ে পড়েছে। কোথায়? সোনাঝুরি জঙ্গলে তো আমি কখনও থাকিনি। থাকার উপায়ও ছিল না। তা হলে হঠাৎ জরুরি হবে কেন? দ্বিতীয়ত, যদি টান অনুভব করি তা হলে যেন পত্রপাঠ যাই। তার মানে না অনুভব করলে যাওয়ার দরকার নেই। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আজকাল সবাই দুমোয়াই পাঠিয়ে কথা বলার পাট তো কবে উঠে গেছে। মোবাইল নেই? থাকলে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

যদি নাম্বার পেতাম তা হলে ফোনেই জেনে নিতে পারতাম।

চিঠিটি সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে একটা খচখচানি ভাব থেকেই গেল। ঝাপসা মনে পড়ছে, দীর্ঘদিন বাদে বলরামকাকা বাড়ি ফিরেছেন আর বড় পিসিমা তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে বলছেন: 'ওরে, আর যাস না। আমাদের সঙ্গে থাক।'

পিতামহের গলা ভেসে এসেছিল, 'আঃ, যে যাতে শান্তি পায় তাকে তাই করতে দাও।' মাসখানেক বাদে বলরামকাকা আবার উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

পিতামহের মৃত্যুর পরে বড়পিসিমা কে জন তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাই কোথায় আছে? তান্ত্রিক বলেছিল, 'ফিরে আসবে, আসতেই হবে। ওর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না।'

'কীসের সাধনা?' বড়পিসিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'তন্ত্রসাধনা।'

মুখে মুখে রটে গেল বলরামকাকা তান্ত্রিক হয়ে গেছেন। বড়পিসিমা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বলরামকাকা এসেছিলেন। তাঁর পায়ে হাত রেখে বলরামকাকা বলেছিলেন, 'যাও। চিন্তাশূন্য মনে চলে যাও।' বড়পিসিমা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, পারেননি। বলরামকাকা মাথা নেড়েছিলেন, 'বেশ। তাই হবে। আমি এখানেই স্থিতু হব।' বড় পিসিমার মুখটায় যেন আরাম ছড়িয়ে পড়ল।

এসব তিরিশ বছর আগের কথা। বাবা-মা চলে এসেছিলেন চা-বাগানের চাকরি শেষ করে জলপাইগুড়ি শহরে। বলরামকাকা থেকে গিয়েছিলেন গঞ্জে ঘর ভাড়া করে। কী ভাবে তাঁর চলত আমার জানা নেই। বাবার মৃত্যুর পর অবশ্য মায়ের কাছে শুনেছি ছোট ভাইকে তিনি প্রতি মাসে সাহায্য করতেন।

একটা খচখচানি থেকে এ সব স্মৃতি হামাগুড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করল। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, তিস্তাতোর্সা ধরে ভোরবেলায় ধূপগুড়িতে নেমে সোনাঝুরিতে যাব। কথাবার্তা বলে সে-দিন বিকেলের ট্রেনটা ধরে কলকাতায় ফিরে আসব। তা হলেও খচখচানিটা দূর হবে।

পরের শনিবারের দুপুরে শিয়ালদা থেকে তিস্তাতোর্সায় উঠে যখন ধূপগুড়িতে নামলাম তখন ঈষৎ আলো ফুটেছে। স্টেশনটা শহর থেকে বেশ দূরে। কিছু গাড়ি এসেছে যাত্রীদের নিতে এবং ছাড়তে। হঠাৎ একটি ট্যাক্সির ড্রাইভার এগিয়ে এল 'অত্তদা, না?'

'হ্যাঁ। তোমাকে ঠিক ...।'

'আমি রতন। ছোটবেলায় দেখেছেন, মনে থাকার কথা নয়। আমার বাবার নাম জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত।' রতন বলল।

'ওঃ। তুমি জ্যোতিষকাকুর ছেলে? বহু দিন দেখিনি তো।'

'কোথায় যাবেন? চা-বাগানে? আসুন। আমি তো খালি গাড়ি নিয়ে ফিরব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর গাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা কেমন আছেন?'

'নেই। মা তার পরে গেল। চা বাগান বা গঞ্জের অনেকেই চলে গেছে।'

ধূপগুড়ির বাজার ছাড়িয়ে ট্যাক্সি এগোচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রতন, এখন সোনাঝুরির জঙ্গলে মানুষ বাস করে?'

'না তো।'

'ঠিক জানো?'

'ও। আপনি সন্ন্যাসীকাকার কথা বলছেন?'

'বলরামকাকা।'

'হ্যাঁ। এখানে সবাই ওঁকে সন্ন্যাসীকাকা বলে। অবশ্য উনি জঙ্গল থেকে বের হন না। একটা লোক ভ্যান রিকশায় সব্জি, ফল অথবা মুরগি, ছাগল চাপিয়ে মাঝে মাঝে হাটে এসে বিক্রি করে যায়।'

'উনি তা হলে সোনাঝুরি জঙ্গলেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। বহু দিন আগে ফরেস্টের এক জন ডি এফ ও জঙ্গলের ভেতরের খাসজমি ওঁকে লিজ দিয়েছিলেন। তার পর আর কাউকে দেওয়া হয়নি।'

'ওঁকেই বা লিজ দেওয়া হয়েছিল কেন?'

'ঠিক জানি না। উনি ওখানে গিয়ে থাকার পরে এ দিকের জঙ্গলে আর কাঠ চুরি হয় না। বোধ হয় সেই কারণে—।' রতন বলল, 'আপনি কি ওখানে যাবেন?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লাম।

'তা হলে আগে আমাদের বাড়িতে চলুন। মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নিন, আমি পৌঁছে দেব।' রতন আন্তরিকতার সঙ্গে বলল।

'তার দরকার নেই। তুমি আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দাও। আমার খুব তাড়া আছে।' গম্ভীর গলায় বললাম।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে তার দু'পাশে গভীর জঙ্গল। রতন গাড়ি থামিয়ে বলল, 'বাঁ দিকে দেখুন, পায়ে চলা পথ রয়েছে। ওটা দিয়ে এগিয়ে গেলে পেয়ে যাবেন। আপনি ক'দিন যদি থাকেন তা হলে...।'

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, 'না ভাই, আজই ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

রতনের গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলে আমি চার পাশে তাকালাম। এখন সবে রোদ উঠেছে। দু'পাশে লম্বা গাছ থাকায় রাস্তায় রোদ পড়েনি। পাখিরা চিৎকার করছে খুব। আর কোনও শব্দ নেই। বাস চলাচল নিশ্চয়ই একটু বাদে শুরু হবে। আমি পায়ে চলা পথ ধরলাম। বোধ হয় আমাকে দেখে পাখিদের চেঁচানি দ্বিগুণ হল। বুঝলাম, এই সময়ে কেউ এখান দিয়ে হেঁটে যায় না। মিনিট চারেক হাঁটার পর জঙ্গলের মধ্যে যেন বাড়ির আভাস পেলাম। কাছে যেতে টিনের গেটটা নজরে এল। সেটা খুলে ভেতরে ঢুকে

AMARBOI.COM

বেশ ভাল লাগল। এপাশে চারটে চার রকমের গাছ। বোঝাই যায় বেশ যত্নে ওরা আছে। তার পরে তিনটে কাঠের ঘর। নিচু গলায় ডাকলাম, 'বলরামকাকা!' কোনও সাড়া পেলাম না।

রতনের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আমি ভুল জায়গায় আসিনি। ঘরের দরজাগুলো ভেজানো। সে দিকে পা না বাড়িয়ে আমি বাঁ পাশে চলে এলাম। ফরেস্টের ঠিক এক পাশে তার দিয়ে ঘেরা বাউ'ারির মধ্যে এই বাড়ি। বাড়ির দু'পাশে এবং পেছনে শাকসব্জির চাষ, মুরগির খাঁচা এবং ঘেরা জায়গায় ছাগলেরা দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই সময় শাকসব্জির খেতের আড়াল থেকে খুরপি হাতে নিয়ে বলরামকাকা এগিয়ে এলেন। হ্যাঁ, বলরামকাকাই। আগে মাথাভর্তি বড় চুল ছিল, এখন সেখানে চকচকে টাক। গালের সাদা দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমেছে। কত বয়স হবে এখন? আশির কোঠায় তো বটেই। বলরামকাকার পেছনে একটা খাটো চেহারার লোক মাথায় ঝাঁকা নিয়ে এগিয়ে আসছে। নিজেকে বললাম, বলরামকাকাকে প্রণাম করা উচিত। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ইনিই এখনও জীবিত আছেন।

প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়লেন বলরামকাকা, 'অন্তু তো। বেশ মুটিয়ে গেছ দেখছি। শরীরের ওজন বাড়লে হাঁটু দুটো কী করে সইবে? তা নিশ্চয়ই ট্রেনে এলে। অসুবিধে হয়নি তো?'

'বিন্দুমাত্র নয়।'

'বিন্দুমাত্র!' হাসলেন বলরামকাকা। 'এই শব্দটি তোমার পিতামহ, মানে আমার পিতার লব্জ ছিল। চলো, ও-পাশে চলো।'

বাড়ির সামনে চলে এসে হাত তুলে বাঁ দিকের ঘরটি দেখিয়ে বললেন, 'ওটি তুমি ব্যবহার করবে। সব ব্যবস্থা করা আছে। নিশ্চয়ই হাঁটু মুড়তে পারো না?'

'হ্যাঁ। বয়স তো অনেক হল। তা ছাড়া ...।'

'তুমি আমার কুড়ি বছর পরে পৃথিবীতে এসেছ। যাকগে, আধুনিক চেহারার নয়, তবে কমোডের কাজ করবে পেছনের দ্বিতীয় টয়লেটে গেলে। পাশেই নলকূপ আছে। যাও হাতমুখ ধুয়ে এসো। কাঁধের ব্যাগে সে সব আছে?'

'আছে। কিন্তু বলরামকাকা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি বিকেল তিনটের তিস্তাতোর্সা ধরব। এখান থেকে দুটোর সময় বের হলেই চলবে।'

এই সময় গেট খুলে আর একটি খাটো চেহারার প্রৌঢ় ঢুকল যার হাতে একটা চটের থলি। বলরামকাকা বললেন, 'এসে গেছিস। বাঃ। নে, চটপট চা তৈরি কর। খাটু?' ও পাশ থেকে ঝাঁকা নিয়ে আসা বেঁটে লোকটি জবাব দিল, 'আসি।'

'স্নানটা করিয়ে দে।' বলরামকাকা হুকুম দিলেন।

'চার জনকেই করাব?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। শুধু বড়দিকে। কাল ওর গায়ে তেমন জল পড়েনি।' বলে বলরামকাকা আমার দিকে তাকালেন। 'পাঁচ সপ্তাহ এক ফোঁটা জল ঝরেনি আকাশ থেকে। তুমি সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ঘরে গিয়ে সহজ হও।'

মিনিট তিনেক বাদে পাজামা-গেঞ্জি পরে টুথব্রাশ হাতে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম খাটু নামের লোকটা ড্রাম থেকে পিচকারির ভেতরে জল টেনে একটা কাঁঠাল গাছের ডালে-পাতায় ছিটোচ্ছে।

বলরামকাকাকে দেখা গেল না। খাটুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বড়দি কোথায়?'

'এই তো।' কাঁঠালগাছটাকে দেখাল সে।

হকচকিয়ে গেলাম। বলরামকাকা ওকে বললেন বড়দিকে স্নান করিয়ে দিতে। এই কাঁঠালগাছটাকে উনি বড়দি বলেন নাকি।

খাটু জল ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'ওই যে লিচুগাছটা, ওর নাম বউদি।'

'বউদি?' আমি হতভম্ব।

খাটু আরও উৎসাহিত হল। জল দেওয়া বন্ধ করে কয়েক পা এগিয়ে আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে আমগাছ, বাবুর মতো আমরাও ওকে বাবা বলে ডাকি। পাশের বাতাবি লেবুর গাছটার নাম কী বলুন তো?' খাটু হাসল, 'দাদা।' তার পর হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'বাবা দাদা বড়দি বউদি। রোজ দেখতে হয় ওদের। সেই যখন এইটুকু ছিল তখন থেকে। এই চার জনের ডাল ভাঙা যাবে না। ফল ছেঁড়া চলবে না, খসে মাটিতে পড়লে নেওয়া যেতে পারে, নইলে পচে যদি পচুক বা পাখিতে খেয়ে যাক।'

খাটু চলে গেল। আমার শরীরের ভেতর আচমকা একটা তিরতিরে কাঁপুনি শুরু হল। বলরামকাকা বড়পিসিমাকে বড়দি বলতেন। অতএব পিতামহ তাঁর বাবা। আমার মা এবং বাবা তাঁর বউদি এবং দাদা। আমাদের পুরো পরিবারকে উনি এখানে সাজিয়ে রেখেছেন গাছের চেহারা দিয়ে। হেসে ফেললাম। কাঁঠাল এবং লিচু ছেলেবেলায় আমার প্রিয় ফল ছিল। অন্যায় করলে মায়ের মার থেকে বাঁচার জন্যে কাঁঠালগাছে উঠে বসতাম। তখন বড়পিসিমা আমাকে বাঁচাতেন। এখন এই সকালের ছিমছিমে বাতাসে গাছগুলোর পাতায় পাতায় দোল লেগেছে। কী রকম স্নেহময়ী বলে মনে হতে লাগল ওদের।

মুখ হাত ধুয়ে এসে দেখলাম উঠোনে চেয়ারটেবিল পাতা হয়েছে। বলরামকাকা বসে আছেন চেয়ারে। বললেন, 'এসো। তা হলে টান অনুভব করলে?'

হেসে চেয়ারটাতে বসে বললাম, 'আফটার অল মানুষ তো।'

'ভুল বললে। মানুষের বুক থেকে ওটা দ্রুত মুছে যায়।'

চা এল। বাঁটু দিয়ে গেল। ওই নামেই ওকে ডাকলেন বলরামকাকা সঙ্গে মুড়ির বাটি। এক মুঠো মুড়ি মুখে নিয়ে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি লিখেছেন এখানে আমার উপস্থিতি নাকি জরুরি হয়ে উঠেছে। যদি একটু খুলে বলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলরামকাকা মুখ তুলে তাঁর বড়দির দিকে তাকালেন। তার পর বললেন, 'ইদানীং শরীরের সব ক'টা অঙ্গ মস্তিষ্ককে খবর পাঠাচ্ছে, সময় নেই সময় নেই। এত দিন আমার কোনও পিছুটান ছিল না। সংসার করিনি। বাবা বড়দি দাদা বউদির সঙ্গে ওদের জীবিতকালে ঘনিষ্ঠ হইনি। তার জন্যে আমার কোনও আফসোস নেই। তার পর এই জায়গাটা পেয়ে গেলাম। ফসল ফলাই, মুরগির ডিম, মুরগি বিক্রি করি, চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক দিন মনে পড়ল বড়দি খুব কাঁঠাল পছন্দ করতেন। কাঁঠালের রস করে খাওয়াতেন। কাঁঠালের বিচির তরকারি। ভাল একটা চারা এনে লাগিয়ে দিলাম। তরতর করে বাড়তে লাগল সেটা। নাম দিলাম, বড়দি। সেটাই সর্বনাশ হল।'

'কী রকম?'

'সেই রাত্রে স্বপ্নে গলা শুনলাম। না, কাউকে দেখিনি। কিন্তু ওই গলা আমার চেনা। ধমকের গলায় তিনি বললেন, তোমার কি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি হবে না। বড়দিকে একা রেখেছ অথচ আমার বউমার কথা ভুলে গেলে? সঙ্গে সঙ্গে বড়দির গলা শুনতে পেলাম। আপনাদের বাদ দিচ্ছে কোন সাহসে? আপনারা কি শূন্যে ভেসে থাকবে? আমাকে শেকড় দিয়েছে যখন তখন আপনাদেরও মাটিতে রাখতে হবে।'

'পরের দিন লিচু, আম আর জামের চারা লাগালাম। বউদি, বাবা, দাদা। এদের নিয়ে বেশ ছিলাম। ঝড় হলে ওদের সামনে এসে লক্ষ রাখতাম যাতে ডাল না ভাঙে। কখনওই ভাঙেনি। এখন যাওয়ার সময় হল আমার। তোমার পক্ষে এদের দেখাশোনা করা সম্ভব নয় জানি। তোমাকে আসতে বলেছি যে কারণে, বলে খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'থাক। তুমি যখন চলেই যাবে আজ আর বলে কী হবে? যাই, বাঁধাকপির মাটি আলগা করে দিতে হবে।' বলরামকাকা চলে গেলেন।

ওই চারটে গাছ আমাকে টানতে লাগল। কাঁঠালগাছ, লিচুগাছের গায়ে হাত বোলালাম। কী শীতল স্পর্শ। হঠাৎ প্রশ্নটা বেরিয়ে এল, 'কেমন আছ?' আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বইল। ডালপাতারা নেচে উঠল। যেমন জবাব দিল, 'আছি, আছি।'

আর একটু ও পাশে দেখলাম মাটি খুঁড়ে ইট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বাঁটুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একগাল হাসল, 'ওখানে তালগাছ লাগানো হবে।'

'তালগাছ কেন?'

'অনেক তালগাছে ফল হয় না। বাবু তো বিয়ে করেননি, তাই এমন তালগাছ লাগাতে হবে পরে যাতে ফল ধরে না।' বাঁটু হেসে জানাল।

সে চলে গেলে গাছগুলোকে লক্ষ করছিলাম। কাঁঠালগাছ আর লিচুগাছ এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যে বড়পিসিমা এবং মাকে মনে পড়বেই। শুনেছি, বিয়ের পর মা যখন নতুন বউ হয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন তখন ওই বিধবা ননদই তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন সমালোচনা থেকে। এখন ওই কাঁঠালগাছ তার ডালপালা এমন ভাবে মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছে, যাতে ঝড় এলে লিচুগাছ আক্রান্ত না হয়। মনে হল, এরা তো সবাই চলে গেছেন, যিনি এখনও আছেন তাঁর মনে দুঃখ দিয়ে লাভ কী। দুপুরে খেতে বসে কথাটা বললাম।

বলরামকাকা বললেন, 'বেশ তো ভাল, কথা।'

'আমাকে কী বলবেন যেন—।'

'চলে যখন যাচ্ছ না তখন দুপুরে বিশ্রাম করো। কথা পরে বলা যাবে।'

সোনাঝুরি জঙ্গলের ভেতরে এমন একটা বাগান, মুরগি-ছাগলের চাষ এক জন মানুষ এত বছর ধরে করে চলেছেন দেখে খুব অবাক হচ্ছিলাম। বিকেলে চা খাওয়ার সময় কথাটা বলরামকাকাকে বলতেই তিনি মাথা নাড়লেন, 'একা কোথায়? ওঁরা তো আছেন। বড়দি বউদি বাবা দাদা। তুমি ভেবে দেখো, আমি যখন বছরের পর বছর বাড়ির বাইরে থাকতাম তখন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত না। বাড়িতে ফিরলেও বড়দির সঙ্গে যা বলার বলতাম, বাবার সঙ্গে কথাই হত না। কিন্তু জানতাম বাবা দাদা আছেন। আমি এখনও তাই জানি। ওঁরা আছেন, এটা এক বার জানা হয়ে গেলে আর একা লাগে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার এখানে আসাটাকে জরুরি কেন মনে করেছেন?'

'আমার কাছে যা জরুরি, তা তোমার কাছে নষ্ট হতে পারে। এই বাড়ি, জমিজমা, চাষের খেত, এ সব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভাবি না। এদের জন্য তুমি কলকাতা থেকে এখানে এসে থাকবে এমন প্রস্তাব দেওয়ার মতো মূর্খ আমি নই। ওগুলোর জন্যে বাঁটু আর খাটু আছে। তুমি যখন কলকাতায় কলেজে পড়তে তখন গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসে সবার সঙ্গে ক'দিন থাকতে। আমি চলে যাওয়ার পর বছরে দু'বার ক'দিনের জন্যে এখানে এসে ওঁদের সঙ্গে থাকতে পারবে কি?'

'চেষ্টা করব।'

'তা হলেই হবে।'

বললাম, 'এই বয়সে আপনি যে এত খাটাখাটুনি করতে পারছেন তা স্বাস্থ্য ভাল বলেই। চলে যাওয়ার কথা ভাবার কোনও কারণ নেই।'

সে রাতে সোনাঝুরির জঙ্গলে জ্যোৎস্নার বান বইছিল। দুধসাদা আলোয় স্নান করছে গাছগাছালিরা। সকাল সকাল ধূপগুড়ি থেকে কলকাতার ট্রেন ধরব বলে খাওয়াদাওয়া সেরে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। বিছানার পাশের জানলা দিয়ে দেখলাম চাষের খেতে চাঁদ মায়া বিলাচ্ছে। এ রকম দৃশ্য প্রতি মাসে পৃথিবীতে তৈরি হয় অথচ আমি কত কাল দেখিনি।

দেখতে দেখতে কখন জ্যোৎস্নার রং ফিকে নীল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। সেই নীল আর একটু ঘন হতেই তাদের দেখতে পেলাম। খানিকটা দূরত্ব রেখে চার জন ভেসে আছেন পা ঝুলিয়ে। তাঁদের সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে মোড়া। চার জনের মুখ ঘোমটায় ঢাকা সত্ত্বেও কাপড় পরার ধরন বলে দিচ্ছে বাঁ দিকের প্রথম দু'জন নারী। বাকি দু'জন পুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাদের কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। চোখে পড়ল পঞ্চম আসনটি খালি রয়েছে। আমি সেদিকে পা বাড়াতেই চার জনেই তীব্র আপত্তি জানালেন। না, কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়নি অথচ প্রতিবাদটা আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম। বাতাস বইতে দেখলাম প্রত্যেকের পেছনে বলরামকাকার লালিত গাছগুলো এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখ থেকে প্রশ্ন বের হল, 'তোমরা এখনও একসঙ্গে আছ?'

ঘোমটায় ঢাকা চারটে মাথা একসঙ্গে দুললো, হ্যাঁ।

'কোথায় আছ তোমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলোর ডালপাতা নেচে উঠল। তাতে যেন শব্দ বাজল। 'এখানে এখানে।'

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। দৌড়ে চলে এলাম উঠোনের পাশে গাছগুলোর সামনে। কাঁঠালগাছের নিচু ডালটাকে বাতাস এমন দুলিয়ে দিল যে সেটা আমার মাথা ছুঁয়ে গেল।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল আমার। শুভকাজে যাওয়ার সময় বড়পিসিমা মাথার ওই জায়গায় আঙুল ছুঁইয়ে জপ করে দিতেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তরাগ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অটো থেকে নেমে কয়েক সেকেন্ডে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সুজাতা। মনে মনে ঝালিয়ে নিল ঠিকানাটা। বীথি কাল যেমনটা বলেছিল তাতে তো বাসরাস্তা থেকে দূরে হওয়ার কথা নয়। হাঁটাপথে বড়জোর মিনিট পাঁচেক। একটা রিকশা নিয়ে নেবে? থাক গে, বয়স যাই হোক এখনও তো পা দুটো অচল হয়নি।

অঘ্রানের দুপুর। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। একটা মলিন রোদ বিছিয়ে আছে শহরের গায়ে। বাতাসে সামান্য শিরশিরে ভাব। তাঁতের শাড়ির আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুজাতা চলা শুরু করল। ক'পা গিয়ে ঘড়ি দেখল কব্জি উল্টে। অমনি মন খচখচ। আড়াইটে বাজে, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে নাতিনাতনি স্কুল থেকে ফিরবে হুড়মুড়িয়ে। ওই সময়টায় সুজাতার বাড়িতে না থাকাটা কি ঠিক হল? মাম্পি ভুতুমের অবশ্য ঠাম্মাকে আর তেমন প্রয়োজন হয় না, তাকে আর সে ভাবে ওরা আমলও দেয় না। ঠাম্মা নামের একটা মানুষ আদৌ ঘরে আছে কি নেই, সেটুকুও খেয়াল করবে কি না সন্দেহ। বৈকালিক জলখাবার বানিয়ে দেওয়ার জন্যে বাড়িতে মালতী মজুত, তড়িঘড়ি ইউনিফর্ম ছেড়ে, নাকেমুখে যা হোক গুঁজে, ভাইবোন তো ধাঁ মারবে যে যার মতো। মাম্পি যাবে টিউশন পড়তে, ভুতুম সামনের পার্কে। অতএব তাদের কথা ভেবে সুজাতার গৃহে অবস্থান করাটা তো নেহাতই মূল্যহীন, নয় কি?

তবু চিন্তা পিছু ছাড়ে কই। যদি কোনও কারণে সময় মতো না ফেরে ছেলেমেয়ে দুটো? যদি পথে স্কুলবাস খারাপ হয়? যদি অন্য কোনও সমস্যায় আটকা পড়ে স্কুলে? রুমা তো মাঝে মাঝেই চারটে নাগাদ ফোন করে অফিস থেকে, খোঁজখবর নেয় ছেলেমেয়ের। তখন যদি শোনে ওরা এখনও আসেনি, ও দিকে শাশুড়িঠাকরুন কোথাও একটা চরতে বেরিয়ে গিয়েছে, রুমা খুব প্রীত হবে কি? মুখে হয়তো বলবে না কিছু, তাও ...।

নাহ্, রুমাকে বোধ হয় সকালে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কী করবে, আজই যে বীথির ডেরায় ছুটবে এমন তো পরিকল্পনা ছিল না। বহু দিন পর কাল বীথির ফোনটা পেয়ে জোর চমকেছিল বটে, অবিলম্বে দেখা করার বাসনাও জেগেছিল, তারপর সন্ধেবেলা টিভি সিরিয়াল দেখতে বসে [illegible] ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে বাড়ি

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

ফাঁকা হতে ফের কৌতূহলটা এমন চাগাড় দিয়ে উঠল।

যাগ গে, মরুক গে, অত টেনশন করার কোনও মানেই হয় না। সুজাতার হাতে সংসারটা ছাড়া থাকে বলে তার কি ইচ্ছেমতো বেরোনোর স্বাধীনতাও নেই? রুমা কবে দেরিতে ফিরবে, বাবুন কবে অফিস টুরে বাইরে যাবে, কিছু কি আগে থেকে জানতে পারে সুজাতা? বলার প্রয়োজন বোধ করে কেউ? পরশুই তো দু'জনে কোন বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে গেল, রাত্তিরে যে তারা খাবে না, শুনতে হল কিনা মালতীর মুখ থেকে। তা হলে ...?

চিন্তা ছিঁড়ে গেল সহসা। শান্তিনীড় এসে গিয়েছে।

কালো গেটের গায়ে সাদা হরফে লেখা নাম-ঠিকানাটা চোখ কুঁচকে এক বার পড়ল সুজাতা। তার পর চশমা ঠিক করে ভেজানো গেট ঠেলে ঢুকেছে অন্দরে। সামনেই একফালি সবুজ। তিন ধারে তার মরশুমি ফুলের সমারোহ। গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, পমপম ...। কুঁড়ি এসেছে ডালিয়ায়, ছোট ছোট গাঁদা ঝিকঝিক হাসছে। মাঝখানে একটা তুলসীমঞ্চও আছে। বাঁধানো। বাগান ঘিরে ইউ শেপের দোতলা বাড়ি, টানা বারান্দাওয়ালা। সুজাতা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার ওপারেই বুঝি অফিসঘর। কারা যেন কাজ করছে সেখানে।

অদ্দুর অবধি অবশ্য যেতে হল না। তার আগেই এক বয়স্কা মহিলা একতলার সরু বারান্দায়—কাকে খুঁজছেন?

সুজাতা এক পা এগোল—বীথি ... মানে বীথিকা ঘোষাল ...?

—বীথি? একটু দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চটি মশমশিয়ে বীথির আবির্ভাব। সুজাতার মতো ভারিক্কি হয়নি শরীর, একই রকম রোগা আছে এখনও। একই রকম ঋজুও।

বীথির লম্বাটে মুখে একগাল হাসি—ওমা, তুই? আজই আসবি, কাল তো বললি না?

সুজাতা মিটিমিটি হাসছে—তুই একাই সারপ্রাইজ দিবি নাকি? ভাবলাম আমিও তোকে ...

— বেশি করেছিস। আয়।

হাত ধরে প্রায় কিশোরীর উচ্ছলতায় সুজাতাকে দোতলায় নিয়ে এল বীথি। যেতে যেতে বকে যাচ্ছে অবিরাম। এখন নাকি একতলার বড় ঘরে টিভি দেখছিল অনেকে মিলে। দুপুরের দিকে এই সময়টায় টিভি সিরিয়াল দেখা নাকি একটা ছল, দিবানিদ্রা এড়ানোর জন্য নাকি জড়ো হয়, নাম কা ওয়াস্তে টিভি চলে, যে যার মতো গল্প করে যায়। এতে নাকি দুপুরগুলো হুশহুশিয়ে কাটে।

টানা বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্ত নিজের ঘরখানায় সুজাতাকে এনে বসাল বীথি। ছোট্ট ঘর, মেরেকেটে দশ বাই দশ। তার মধ্যেই একটা সিঙ্গল বেড খাট, ছোট আলনা, বেঁটে আলমারি, এক সেট টেবিল-চেয়ার, খুদে টিভি স্ট্যান্ড। দেওয়ালে আয়না, দরজার ধারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট টুলে জলের কুঁজো। এত জিনিস ঢুকল কী করে এখানে? লাগোয়া একটি বাথরুমও আছে, আয়তনে ঘরের সঙ্গে মানানসই, শাওয়ার প্রায় কমোডের ওপর ঝুলছে।

পলকের জন্য বীথির শ্বশুরবাড়িখানা ভেসে উঠল সুজাতার চোখে। প্রাচীন বাড়ির একটা অংশে থাকত বটে, কিন্তু কী বিশাল বিশাল ঘর। কত বছর আগে গিয়েছিল সুজাতা, তবু এখনও মনে গেঁথে আছে। কী এমন হল, যাতে ঠাঁই নাড়া হয়ে বৃদ্ধাশ্রমের এই খপরিতে এসে মাথা গুঁজতে হল বীথিকে?

প্রশ্নটা জিভে এসে গিয়েছিল, তার আগেই বীথি জিজ্ঞেস করল—কী রে, চা খাবি তো?

—এখন ...? সুজাতা একটু আমতা আমতা করল—তোদের লোকজনরা বিশ্রাম করছে ...

—তুৎ। ঘরেই বানাব। ইলেকট্রিক কেটলি আছে।

— বানা তা হলে। আমি কিন্তু চিনি-দুধ খাই না।

—আমিও না। খাটের তলা থেকে বৈদ্যুতিক কেটলিখানা বার করল বীথি। বোর্ডে প্লাগ গুঁজে আন্দাজ মতো জল চড়িয়ে দিয়ে বলল, তোকেও কি শুগারে ধরেছে? আমার মতো?

— না রে, মুটিয়ে যাচ্ছি তো। বিছানায় বসল সুজাতা—আর দুধটা না খেলে অম্বলও কম হয়।

—ভালই করেছিস। চা-ই তো আসল। দুধ-চিনি তো বাহুল্য। বীথি মুচকি হাসল, আমার যেমন এই ঘরটুকুতেই কুলিয়ে যায়। ভবানীপুরের বাড়ির এত এত জায়গাকে এখন বাড়তি বলে মনে হয়।

কিছু যেন গোপন করছে বীথি। সন্দিগ্ধ স্বরে সুজাতা বলল, সেই জন্যই বুঝি চলে এসেছিস?

বীথি জবাব দিল না। জল ফুটে গিয়েছে, দেওয়ালের র‍্যাক থেকে চা-পাতা পাড়তে পাড়তে আনমনে বলল, কত দিন পর তোর সঙ্গে দেখা হল?

—তা প্রায় ষোলো বছর। সেই স্কুলের গোল্ডেন জুবিলিতে তুই গিয়েছিলি, বেশিক্ষণ থাকলি না ... তখনই বোধ হয় তোর বরের অসুখটা ...

—হুম্। তার চার মাস পরেই তো চলে গেল। বীথি ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম। সনু তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে, রাজা হায়ার সেকেন্ডারি দেবে ...।

এগারো বছর আগে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে চলে যাওয়া সেই নিজের মানুষটিকে যেন ঝলক দেখতে পেল সুজাতা। ব্যাঙ্কের ব্যস্ত অফিসার রিটায়ারমেন্টটাকে যেন মানতেই পারল

AMARBOI.COM

না। কী অদ্ভুত এক ছটফটানিতে ভুগত সারাক্ষণ। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মৃত্যু এসে সব চাঞ্চল্য ঘুচিয়ে দিল। তখন যে সুজাতার মনের ওপর দিয়ে কী ঝড় গিয়েছে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। এখনও কি থিতিয়েছে পুরোপুরি?

যেন বীথিকে নয়, যেন নিজেকে শুনিয়ে সুজাতা বলল, জানি রে। সহেলিদের মুখে শুনেছি তুই কারও সঙ্গে আর মিশতিস না, কোথাও যেতিস না ...

— ভাল লাগত না। কিচ্ছু ভাল লাগত না তখন। সারা দিন শুধু শুয়ে থাকতাম। কেমন জবুথবু মেরে গিয়েছিলাম। আমাকে চাঙ্গা করার জন্য সনু বোধ হয় তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলল। সুজাতাকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে ম্লান হাসল বীথি—কিন্তু লাভ কী হল? সনুর বউকে নতুন খেলনা ভেবে গড়েপিটে মানুষ করতে চাইলাম। তবে তাই কি হয়? সে এখনকার মেয়ে, সে মানবে কেন? হঠাৎ এক দিন শুনলাম, ছেলে চাকরি বদলে চলে যাচ্ছে দিল্লি। তখন বুঝিনি, ছেলে ছেলের বউকে চরম স্বার্থপর ভেবেছি। এখন টের পাই, আমার পুতুলখেলার বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা পালিয়েছে।

কাপে চুমুক দিয়ে চা'টা কেমন বিস্বাদ ঠেকল সুজাতার। বাবুন আর রুমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক এই ধরনের নয় ঠিকই, তবে বাবুনের বিয়ের জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছিল অনেকটা তো সেই কারণেই। বাবুনের বউ তার সঙ্গী হবে, তাকে একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেবে ...। চাকরি করা মেয়েকে বাবুন নিজে পছন্দ করে বিয়ে করল— সুজাতা যে একা সেই একাই। এখনও কি সে রুমাকে মন থেকে মানতে পেরেছে? মাঝখান থেকে সে বনে গিয়েছে বাবুন আর রুমার সংসারের পাহারাদার।

মনোবেদনা গোপন রেখে সুজাতা আলগোছে প্রশ্ন করল, তোর বড় ছেলে কি এখনও দিল্লিতে?

—নাহ্। আরও দূরে। দুবাই চলে গিয়েছে।

—আর ছোটটার কী খবর?

—এখানেই আছে। চাকরিবাকরি করছে।

—বিয়ে দিয়েছিস তো?

—আমি আর দেওয়াদেয়িতে ছিলাম না। নিজেরাই করেছে। বীথি খালি কাপ দু'খানা রাখল টেবিলে। কী যেন ভাবতে ভাবতে ছিটের পর্দা ঘেরা জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আপন মনে বলল, ঠিক করেছিলাম এ বার আর কোনও কিছুতে নাক গলাব না। যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকব। তাতেও কি স্বস্তি মিলল?

— কেন? অসুবিধে কী হল?

— সংসারে ওটাই তো আয়রনি রে। তুই ভাববি এক, লোকে তোকে বুঝবে আর এক। বীথি পায়ে পায়ে খাটে ফিরল। সুজাতার মুখোমুখি বসে বলল, রাজা আর রাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউয়ের মনে হতে লাগল ওদের আমি সহ্য করতে পারি না। নরম ভাবে কিছু বললে ভাবে প্যাঁচ কষছি। স্বর কড়া হলে তো কথাই নেই, দু'জনে হুলুস্থুল বাধিয়ে পাড়া মাথায় করবে। এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল, শামুকের মতো খোলে গুটিয়ে থাকি ...। তখনই ভেবে দেখলাম যৎসামান্য সঞ্চয় তো আছে, ফ্যামিলি পেনশনও কিছু খারাপ পাই না, ওই দিয়ে কোনও মতে যদি ...

—ওল্ড এজ হোমে চলে এলি?

—সহজে এন্ট্রি পাইনি। দরখাস্ত করে লাইন দিয়ে বসেছিলাম। কপাল ভাল, হঠাৎ দু'তিনটি সিট একসঙ্গে খালি হল এখানে ...

— ছেলে, ছেলের বউ আসতে দিল?

— প্রথমে খানিক গাঁইগুঁই করছিল। লোকের কাছে মুখ দেখানো বলেও একটা কথা আছে না? তবে আমার জেদের সঙ্গে পেরে উঠল না।

সুজাতা ক্ষণিক ভাবার চেষ্টা করল, সে যদি এ রকম চলে আসতে চায় কী প্রতিক্রিয়া হবে বাবুন-রুমার? মাম্পি ভুতুমও কি মেনে নিতে পারবে? প্রস্তাবটা পেড়ে এক বার পরখ করে দেখলে হয়।

হঠাৎ সুজাতার গা শিরশির করে উঠল। কেউ যে করল?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুই ছ'মাস হল এসেছিস, তাই না রে?

— একটু বেশি। সাত মাস।

— ওরা আসে দেখা করতে?

— ওই ... সময় সুযোগ পেলে ...।

আমিও যাই। মায়া বলে তো একটা ব্যাপার আছে, না কী? সেটাকেই বা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলি কী করে? এই তো, নাতনির জন্য মন কেমন করছিল বলে পুজোর পুরো একটা দিন ভবানীপুরে কাটিয়ে এলাম।

— এখানে তা হলে খুব সুখে নেই? কথাটা বলতে পেরে সুজাতা যেন একটা গোপন স্বস্তি বোধ করল। পলকা ঠাট্টার সুরে বলল, মন তা হলে খারাপ হয়?

— অবশ্যই। আমি তো পাথরের মানুষ নই। আর মনও তার নিজের নিয়মেই চলে। কপালে এক গাছি চুল এসে পড়েছিল, আঙুল দিয়ে সরাল বীথি। ঈষৎ কেঠো গলায় বলল, তবে একটা সত্যি কথা শুনে রাখ। আমি এখানে মোটেই খারাপ নেই। ইচ্ছে মতন খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, গল্পগুজব করছি, প্রাণ চাইলে বেরিয়েও পড়ি এ দিক ও দিক। কাজকম্মোও করছি না যে তা নয়। সেই স্কুলের মতো দল জুটিয়ে এখানেই ফাংশন চলছে। কবিতাপাঠ, গান, যে যা পারে শোনায়। সামনের বার বসন্তোৎসবও হবে। এছাড়া আলপনা দেওয়ার প্রতিযোগিতা, রান্নার কম্পিটিশন ...। এখন তো প্ল্যান করছি, পাশের বস্তির ছেলেমেয়েগুলোকে

AMARBOI.COM

লেখাপড়া শেখাব।

এ বার হাসি পেয়ে গেল সুজাতার। খানিক ব্যঙ্গের সুরে বলল, বুঝেছি।

বীথি চমকে তাকাল, কী? কী বুঝেছিস?

— এই সব সাতসতেরো নিয়ে নিজেদের একটু ব্যস্ত রাখিস, যাতে মনের কষ্টটা কম হয়।

— আমিও প্রথম প্রথম তাই ভাবতাম রে। এখন বুঝি, এটা অন্য কিছু।

— কী রকম?

— আমার জীবনটা তুই ভাব। বিয়ের পর থেকে বর আর দুই ছেলে ছাড়া আমার তো কোনও জগৎই ছিল না। বরও ততটা নয়, যতটা দুই ছেলে। তাদের পড়াশুনো, তাদের কেরিয়ার, তাদের যাতে ব্রাইট ফিউটার হয় তাই নিয়ে ভাবনা ... এতেই তো গড়িয়ে গেল বিশ-পঁচিশটা বছর। তার পর হঠাৎ এক দিন দেখলাম ওরা কেউ আর আমার আঁচলে নেই, ডানা মেলে যে যার মতো উড়ছে। তখন আমার আর কিছু করার নেই। জীবনটা বিলকুল ফাঁকা। তাই বোধ হয় ছেলের সংসারে বেশি বেশি করে জড়িয়ে পড়ছিলাম। জোর করে। সনু ঠোক্কর দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিল, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু আমার সংসারে তুমি অনুপ্রবেশকারী। সেটা এমনই মজ্জায় মিশে গেল, রাজার সংসারে আর স্বাভাবিক হতে পারলাম না। বীথি একটু দম নিল, এখানে এসে টের পাচ্ছি, আমি শুধু রাজা সনুর মা নই, প্রশান্ত ঘোষালের বউ নই, এর বাইরেও একটা বীথিকা ছিল। যাকে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। সেই বীথিকাটাই এখন এই শান্তিনীড়ে বাস করতে এসেছে। যদ্দিন শরীর সক্ষম থাকবে, কিংবা এখানকার দীপালিদি রত্নাদির মতো ভীমরতি ধরবে না, তদ্দিন তো নতুন বীথিকাটা তার মতো করে বাঁচুক।

সুজাতা আচ্ছন্নের মতো শুনছিল। অস্ফুটে বলল, তুই যে ভাল আছিস সেটা দেখানোর জন্যেই বুঝি আমায় ডাকলি?

— না রে, ঠিক তা নয়। মাঝে মাঝে ছোটবেলার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে তো, তারা কে কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করে। বীথি নির্মল হাসল, তুই নিশ্চয়ই খারাপ নেই চাকরিবাকরি করতিস, নিজের একটা পৃথিবী ছিল, ছেলেও তো শুনি খুব বুঝদার ...

বুকটা চিনচিন করে উঠল সুজাতার। সত্যি কি তার কোনও আলাদা ভুবন ছিল? আছে? ঘরোয়া গৃহবধূ বীথির সঙ্গে তার যাপিত জীবনে কতটুকুই বা তফাত? বাবুন-রুমা যথেষ্ট ভদ্র শালীন, মাকে খুব অযত্ন করে না, কিন্তু তাতে কি সুজাতার অবস্থানের কিছু অদলবদল ঘটেছে? এই যে হঠাৎ হঠাৎ হৃৎপিণ্ড দুকদুক করে উঠছে, অজান্তেই ঘড়ির কাঁটায় চোখ চলে যাচ্ছে বার বার, এটা কার উৎকণ্ঠা? মাম্পি-ভুতুমের ঠাম্মার? রুমার শাশুড়ির? বাবুনের মায়ের? অন্তত সুজাতার যে নয়, এ তো হলফ করে বলতে পারে সুজাতা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঘ্রানের দুপুর কখন বিকেলে মিশে গিয়েছে। একটানা বকবক করেই চলেছে বীথি। মুড়ি চানাচুর মেখে খাওয়াল। শোনাচ্ছে শান্তিনীড়ের আরও অনেকের গল্প। এই বোর্ডার, ওই বোর্ডার, এই দিদি সেই দিদি ...। ছেলেমেয়ে আসে না বলে কে সারাদিন গুমরে গুমরে কাঁদে, কে কবিরাজি কাটলেট কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়, কে যেন দিবারাত্র পুজোআর্চা নিয়ে পড়ে আছে, কারা দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যায়—কত গল্পই না বলছে রসিয়ে রসিয়ে।

কিছু শুনছিল সুজাতা। কিছু শুনেছিল না। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, না এলেই বুঝি ভাল হত। না এলেই তো ভাল হত।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমা চাইছি

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

একটা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে ড্রয়ারে একটা ভাঁজ করা কাগজ পেলাম। উপরে লেখা ক্ষমা চাইছি। ওটা আমিই লিখেছিলাম অনেক দিন আগে। রবিবাসরীয়র জন্য। লেখাটা খুলে আর এক বার পড়ি।

'ষোলো বছর আগে শিশুশ্রমিকদের উপর একটা ডকুমেন্টারি ছবি করেছিলাম। ওই ছবিতে চায়ের দোকানের বয়, কাগজকুড়োনি, গরু চরানো বাগাল, এদের ধরেছিলাম। আর একটা ছেলেকেও শ্যুট করেছিলাম। সে মাছ কাটত। আমাদের রহড়া বাজারে এক জন মাছ বিক্রেতা বছর দশেকের একটা ছেলেকে রেখেছিল। ছেলেটা ছিল খুব হাসিখুশি আর মজার। ইলিশকে বলত আহা, কোন বাগানের ফুল। আড়মাছকে বলত গ্র্যাজুয়েট মাছ। টিনের ট্রেতে রাখা চারাপোনাগুলোকে দেখিয়ে বলত, দেখুন সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে। খুব তাড়াতাড়ি মাছ কাটতে পারত ও। তাড়াতাড়ি মাছ কাটাকে ও বলত, ডিস্কো কাটিং। এক দিন ওকে শ্যুট করি। ক্যামেরাটা আমি নিজেই করে থাকি। ওকে বলি, ডিস্কো দেখাও তো খোকা ...। ছেলেটা সিনেমা হবে জেনে যতটা সম্ভব ডিস্কো কাটে। আমার ক্যামেরা ওর হাতের কায়দা নেয় ক্লোজ শটে। তখনই একটা আর্তনাদ। ছলকে পড়ে রক্ত। ছেলেটা হাত ঝাঁকায়। রক্ত ছলকে পড়ে লেন্সে। ছেলেটা চিৎকার করে ওঠে—আমার আঙুল? আমার বুড়ো আঙুলটা কই?

কাতলা মাছের লেজের কাছে নখ সমেত ওর আঙুলটা পড়ে আছে। ক্যামেরা ওটাও নেয়।

ওই বাজারে পর দিন থেকে যাইনি। কিছু দিন পর খড়দা ছেড়ে দমদম চলে আসি। ওই বালকটি এত দিনে নিশ্চয়ই যুবক। ও কী করছে, কেমন আছে জানি না। ওর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।'

আমি মূলত চাকরি করেই খাই। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটা নিয়ে টুকটাক ডকুমেন্টারি ছবিটবি করি। মোটামুটি নাম-যশও হয়েছে। কিন্তু সরকারি চাকরিটা ছাড়তে পারিনি। শিশু শ্রমিকদের নিয়ে করা আমার প্রথম ছবিটাই একটা জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গিয়েছিল। আমি তো জানি, ওই পুরস্কারটির জন্য দায়ী। ছিল এক বালকের একটি কাটা আঙুল। বালক জানে না। ওই 'ক্ষমা চাইছি' [illegible] ছিল। [illegible] ওই আঙুল

আমার বই.কম
সুমিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটা ছেলেটা হয়তো এটা পড়ত না। কিন্তু যারা আমার নাম জানে, তারা ভাবতেই পারত লোকটা কত বিবেকবান। ষোলো বছর আগেকার একটা ঘটনার জন্য এখনও বিবেক দংশন হচ্ছে। পাঠাব ভেবে খামটামও এনেছিলম, কিন্তু সে সময় মনে হয় আরও একটা ডকুমেন্টারি তৈরির ঘটনা। ওখানেও আর এক বার ক্ষমা চাইবার ব্যাপার এসে যায়। কত বার ক্ষমা চাইব?

ঘটনাটা বলি।

কয়েক বছর আগেকার কেস। আমার ওটা তৃতীয় ডকুমেন্টারি। এক জন পাখি-প্রেমিকের সন্ধান পেয়েছিলাম। ওকে নিয়েই একটা ডকুমেন্টারি করেছিলাম। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থেকে ৮-১০ কিলোমিটার দূরের একটা গ্রাম, ডিংলা, ওখানে সুশীল মাহাতো নামে এক জন মধ্যবয়সী মানুষ পরিযায়ী পাখিদের পরিচর্যা করত। ওর বসতবাড়ির আশেপাশের গাছগুলিতে পাখিগুলো রাতের বেলায় থাকত, বাসা বানাত। ডিম পাড়ত, ঝড়ে পাখির বাসা পড়ে গেল আবারতুলে দিয়ে আসত। পাহারাও দিত, যেন কেউ ওই পাখি শিকার করতে না পারে। স্থানীয় মানুষরা ওই পাখিকে বলত কেলে বক। মঙ্গোলিয়া-মাঞ্চুরিয়া থেকে ওই পাখির দল শীতকালে আসত, বসন্তে ফিরে যেত। প্রচুর শিমুল-পলাশের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা সমেত ফিরে যাওয়ার শট ছিল আমার ওই ডকুমেন্টারিতে। পাখির খবরটা দিয়েছিল আমার এক বিডিও বন্ধু। ও তখন রানিবাঁধের বিডিও ছিল। সুশীল মাহাতোর বাড়িতে আমি দু'বার গিয়েছিলাম। তখন এ রকম অশান্তি ছিল না ওখানে। হইহই করে শুট করেছি। কাঁসাই আর কুমারী নদী যেখানে মিলেছে, ওখানে ওই পাখিদের জলকেলি তুলেছি। নদী পার হয়ে অম্বিকানগরে গিয়েছি। দেবী অম্বিকার সিঁদুর লেপা পাথুরে মূর্তির ছবি তুলেছি। একটা সময় ছিল, যখন জৈন ধর্মের রমরমা ছিল। অম্বিকার মন্দিরটা আদিতে ছিল জৈন মন্দির। জৈনদের জীব-প্রেমের সঙ্গে সুশীল মাহাতোর পক্ষী-সেবা ন্যারেশনে মিলিয়ে দিয়েছি।

সুশীলদের গোটা পরিবার পাখিদের দেখভাল করতেন। সকাল বেলায় ভাত ছড়িয়ে দিত উঠোনে। ব্রেকফাস্ট। সুশীল মাহাতোর আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। মোটামুটি ভালই জমিজমা ছিল। নিজে হাতেও চাষ করত সুশীল, মুনিষও ছিল। সুশীলের উঠোনে ধানের গোলা ছিল না বটে, তবে একটা ঘরে বেশ কয়েক বস্তা চাল থাকে থাকে রাখা ছিল। ঘরময় শষ্যের গন্ধ। আমি যখন ওই ঘরে ডিপ ব্রিদ নিচ্ছিলাম, সুশীল মাহাতো বলেছিল— চাল গন্ধের নাই তুলনা/ফুলগন্ধ নারীগন্ধ এর কাছে কিছুই তো না। সুশীল একটু কবিও ছিল। ঝুমুর গান বাঁধত। ওর লেখা ঝুমুর অনেকেই গাইতেন।

সুশীল মাহাতো এক দিন বলেছিল, চলুন, এক জায়গায় যাই। লাচ দেখে আসি। ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়েই চলেন কেনে।

ওর মোপেডে বসিয়ে তিন চার কিলোমিটার দূরের পাশের গাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ঝুমুরের আসর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা গাইছে—

কৃষ্ণ হে তোমারে ভ'জে
কলঙ্কিনী হলাম ব্রজে
মুখ দেখাতে নারি সমাজ ভিতরে
পোড়ারমুখী কুলমজানি
আমায় বলে সব গোপিনী
তোমার কত নখের চিহ্ন আমার সারা শরীরে।

সুশীল বলল, ওটা আমার লেখা গান। ছবি নিলাম। নাচ শেষ হলে সুশীল আমাকে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। দূর থেকে বয়েস যা মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে বুঝলাম অনেকটাই বেশি। ওর নাম উল্লাসিনী। আলাপ করিয়ে দিল সুশীল। বলল, ইনি হলেন সিনিমাবাবু। আমাকে আর আমার পাখিগুলাকে লিয়ে সিনিমা করছেন। আমি ওর নামঠিকানা রেখে দিলাম। পরে বুঝেঝিলাম সুশীল মাহাতো ওর রসিক। মেয়েটা নাচনি। নাচনিদের সঙ্গে রসিকদের একটা জটিল সম্পর্ক থাকে। পরে এ নিয়ে পড়াশোনাও করেছি। মনে মনে একটা ইচ্ছে হয়েছিল নাচনিদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করব।

গত বছর কলকাতায় লোকসংস্কৃতি উৎসবে দুজন নাচনি এসেছিল পুরুলিয়া থেকে। তখন শ্যুট করেছিলাম। এক জন্য রসিককেও পেয়েছিলাম। ওরও ইন্টারভিউ রেখেছি। আরও কিছু ফুটেজ দরকার। নাচনিদের ঘরগৃহস্থালি, ওদের সামাজিক অবস্থা, এসবও তো ধরতে হবে। সেবার উল্লাসিনীর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। ভেবেছিলাম পরে কোনও এক সময়ে উল্লাসিনীর বাড়ি যাব।

সুশীল মাহাতোকে নিয়ে আমার সেই বিডিও বন্ধুটির কাছে গিয়েছিলাম পরদিন। বলেছিলাম ওর জন্য কিছু করো। নিজের ধান খরচ করে পাখিদের খাওয়ায়। সরকারি লেভেলে কোনও সাহায্য করা যায় কি না, তা ছাড়া নানা রকম সংগঠন আছে, যারা পরিবেশ প্রেমিকদের ইনসেনটিভ দেয়। ওদের চিঠি লেখা যায় কি না ...। বন্ধু বিডিও বলেছিল চেষ্টা করবে। সে দিনই পঞ্চায়েতের সভাপতির সঙ্গে সুশীলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বিডিও। উনি ব্লক স্তরের রাজনৈতিক নেতা। নামটা ভুলে গিয়েছি। সুশীল মাহাতোকে উনি বলেছিলেন এক দিন 'বসব'।

পাখিদের নিয়ে করা ডকুমেন্টারিটা বেশ ভালই হয়েছিল। ইন্ডিয়ান প্যানোরমাতে দেখানো হয়েছিল, তেহেরানের ফেস্টিভ্যালেও গিয়েছিল। ছবিটার নাম ছিল 'আওয়ার গেস্টস'। যে দিন প্রেস শো করেছিলাম, সে দিনই ভাল রি-অ্যাকশন পেয়েছিলাম। কিন্তু একটা অন্যায় হয়ে গিয়েছিল, সুশীল মাহাতোকেই খবর দেওয়া হয়নি। সুশীল আর তার পরিবার ছিল কুড়ি মিনিটের ছবিটা জুড়ে। কিন্তু ছবিটা বিদেশে গেল, সুনাম পেল, সুশীল জানে না। একটা পরিবেশবাদী এন জি ও ছবিটা কিনে নিয়েছে, সুশীল জানে না। বিডিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুটিকে কলকাতায় ট্রিট করেছিলাম, সুশীল জানে না। 'অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট'-এও ছবিটা দেখানো হয়েছিল, সুশীল জানে না। এই ব্যাপারটা নিয়েও আর একটা ক্ষমা চাইছি লেখা যেত। ও সব আর লিখিটিখিনি। এ সব কথা উঠল ভাঁজ করা ওই পুরনো ক্ষমা চাইছিটা হঠাৎ চোখে পড়াতে। কিন্তু এর সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে।

সম্প্রতি অন্য আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। উল্লাসিনীর সঙ্গে দেখা হল। মানে, আমি দেখা করলাম।

আগেই বলেছিলাম তো আমি সরকারি চাকরি করি। জলসম্পদ উন্নয়ন দফতরে। কাজের চাপ তেমন নেই বলেই আমি এ সব ছবিটবি করতে পেরেছি। অনেক কাজই তো করলে করা যায়। যেমন, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুরগুলি সংস্কার ক'রা, মাটির তলার জলস্তরের সামগ্রিক মানচিত্র তৈরি করা, এ রকম সব। কাজ হয় না, ফাইলগুলো ফুটেজে খায় শুধু। আমি এক জন ডিপ্লোমা পাশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মাঝারি ধরনের একটা পোস্টে আছি। ওপরওলারা কাজ না দিলে কাজ নেই। সম্প্রতি কিছুটা কাজের চাপ এল। জঙ্গলমহল জুড়ে অশান্তি, জনসাধারণের কমিটি, এ সব হল। বিদ্বজ্জন, উন্নয়ন, এই সব শব্দ খুব চাউর হল। তার পরই আমলাদের সঙ্গে মিন্ত্রীরা মিটিং করতে লাগলেন ঘনঘন। আমাদের দফতরেও তার প্রভাব পড়ল। হুকুম হল, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুরের দিঘিগুলোকে সংস্কার করার কাজ শুরু করতে হবে। বাঁকুড়া জেলার খাতরা, রাইপুর, রানিবাঁধ, আর সিমলাপাল ব্লকের ভার আমার উপর পড়ল। কাজটা করবে পঞ্চায়েত এবং বিডিও। উপদেশ দেবে আমাদের দফতর। আসল কাজটা তো অনেক পরের কথা। আগে তো ইন্সপেকশন। তার পর রিপোর্ট, তার পর প্রজেক্ট, তার পর অ্যাপ্রুভাল, তার পর ফিনান্স, তার পর ওয়ার্ক অর্ডার ...।

সিমলাপাল শুনেই তো বউ বলল যেতেই হবে না। ছুটি নিয়ে বসে থাকো। ক'দিন আগেই টিভিতে দেখলাম উপুড় হয়ে পড়ে রক্তমাখা মানুষ। ইস্! যেতে হবে না ও সব জায়গায়। আমি বলি, না গেলে চাকরি চলে যাবে। মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। বলে, চাকরি গেলে ভালই হবে। ফিচার ফিল্ম করতে পারবে। ডকুমেন্টারির কোনও গ্ল্যামার আছে? ধরো না, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। অ্যাড ফিল্ম নিয়ে পড়ে থাকলে ওকে কেউ চিনত? আমি বলি, ফিচার ফিল্ম হবে'খনে। এ রকম আরামের চাকরি ছাড়া যায়? আমার কোনও ভয় নেই। সার্কিট হাউসে থাকব, গাড়িতে ঘুরব। তা ছাড়া সঙ্গে তো ক্যামেরাটা নিয়েই যাচ্ছি। মাওবাদীরা তো ক্যামেরাতো পছন্দই করে। যদিও পিছন দিক থেকে পোজ দেয়।

শেষ অবধি যাই। যেতে হয়। উল্লাসিনীর ঠিকানাটাও খুঁজে বার করি। যদি সুযোগ হয় ওর ঘর-গৃহস্থালি শুটি করে নেব। ওই অঞ্চলের বড় বড় জলাশয়গুলির একটা লিস্ট আমাদের কাছে আছে। ম্যাপ আছে। রাইপুরেই একটা বড় দিঘি দেখলাম, নাম শিখরসায়র। কিংবদন্তি, কোনও এক চৌহান রাজা এই দিঘি কাটিয়েছিলেন। মারাঠারা আক্রমণ করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজপরিবারের সমস্ত মেয়েরা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন। দেখলাম জলে ভেসে আছে একটা শরীর। শরীরে বসেছে কালো কাক। পাড়ে কিছু মানুষ। শুনলাম জলে ডুবে মরেছে এক বউ। ক'দিন আগে বউটা বিধবা হয়েছিল। ওর স্বামী খুন হয়ে গেছে। কিছু শোকগ্রস্ত কচুরিপানা ওদের নীল ফুলের বিষণ্ণতা দিয়ে ঘিরে আছে মরা বউটিকে। আমি ক্যামেরা বার করিনি। পারিনি।

ওই অঞ্চলের আরও কয়েকটি মরা দিঘি দেখলাম। রানিবাঁধেও গেলাম। কাছেই উল্লাসিনীর ঘর। ঠিকানা বের করি।

উল্লাসিনী তখন ঘরের বাইরে মাটির সঙ্গে গোবর মাখছিল। শরীর ভেঙে গেলেও চেনা যায়। গাড়িটা থামতেই উল্লাসিনী ঘরের ভিতরে দ্রুত ছুটে গেল। আমি ডাকলাম, উল্লাসিনী। উল্লাসিনী। কোনও উত্তর আসে না। আমি উঠোনে তুলসীমঞ্চটার সামনে দাঁড়াই। আবার ডাকি। মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি, টিনের দরজা। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে উত্তর আসে, আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না বাবু।

একটা আমলকী গাছ সব পাতা ফেলে দিয়ে উঠোনে হতবাক দাঁড়িয়ে আছে। আমি আবার বলি, আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো সেই সিনেমার লোকটা। সুশীল মাহাতোর বন্ধু শেষ। বাক্যটা দু'তিন বার বলি।

দরজা খোলে উল্লাসিনী। আর একটা মরা জলাশয় যেন।

বলি, কেমন আছ?

দু'বার মাথা নাড়ে ধীরে।

বলি, এ ধারে কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।

উল্লাসিনী বলল, ঘরে আসুন।

একটা তক্তপোশ। মাদুর বিছানো। মাটির দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবি, আর মেডেল ঝুলছে কয়েকটা।

বলি, কাজকর্ম চলছে কেমন?

ও বলে, কোনও কাজ নেই। বনপার্টির ভয়, পুলিশের ভয়। কেউ বায়না করে না, খাওয়া জোটে না, বাবু।

আমি কী বলব ভেবে পাই না। ব্যাগে ক্যামেরা। বার করব? দড়িতে ঝুলছে গামছা। মলিন শাড়ি।

আমি মানিব্যাগ বার করি। দুটো একশো টাকার নোট বার করি। বলি, এটা রাখো।

উল্লাসিনী এ ধার ও ধার তাকায়। বলে, ইখন লাচতে নাইরর।

আমি বলি, তোমায় নাচতে হবে না, উল্লাসিনী। তোমার ঘরের ছবি তুলব। তোমার ঘরসংসারের ছবি তুলব। তোমার নিজের কথা বলবে দাওয়ায় বসে, এই আর কী।

উল্লাসিনী বলে, কী বলব বাবু। বলার কী ই বা আছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাটা বাড়াই। ও নেয়। ভাঁজ করে। আমি ক্যামেরা বার করি। ও তক্তপোশের তলা থেকে একটা টিনের ট্রাঙ্ক বের করে। মৃদু ধাতব শব্দ হয়। আমি ওখানে শব্দটা বাড়িয়ে আর্তনাদের মতো সাউন্ড এফেক্ট জুড়ে দেব। ট্রাঙ্কের ভিতরে একটা পাউডারের কৌটো যত্ন করে রাখা। একটা সাবানের বাক্স। চারটে শাড়ি। সবই চড়া রঙের সিন্থেটিক। সবুজ, লাল, সোনালি আর মেরুন। ক্যামেরা চলছে। শাড়ির তলা থেকে একটা কৌটো বের করল উল্লাসিনী। কৌটোর মধ্যে একটা লিপস্টিক, নকল গয়না। ওখানেই টাকাটা যত্ন করে রেখে দিল উল্লাসিনী।

এ বার গোবর মাটি মাখো। যা করছিলে।

উল্লাসিনী কথা শোনে।

ঘরটা লেপামোছা করবে এ বার? তুলসীমঞ্চটাও।

উল্লাসিনী কথা শোনে। ক্যামরা চলে।

তখন ঘড়িতে দুটো। বলি, ভাত খাবে না?

ও বলে, খাব।

— রান্না?

— সকালেই ফুটিয়ে নিয়েছি।

— তবে খেয়ে নাও।

— খাব'খনে।

— খাও না, ছবি তুলব। কী খাও, সেটা দেখাব।

ও ভাত বেড়ে নেয়। কাঁচালঙ্কা নেয়। দেখি, ভাতের রং কালো।

ভাত এত কালো কেন?

ও কিছু বলে না।

মিনিটখানেক ক্যামেরা চলে।

বলি, অনেক ধন্যবাদ উল্লাসিনী। এক বার সুশীলের বাড়িও যাব ভাবছি। কেমন আছে ও?

শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় উল্লাসিনী।

— আপনি জানেন না?

— না তো, কী হয়েছে?

— খুন। বারো দিন হয়ে গেল।

আর কথা বাড়াই না আমি। ড্রাইভারকে বলি চলো সার্কিট হাউস। পথেই ডিংলা গ্রামের কাঁচা পথ। সুশীলের বাড়ি যাব। কী বলব ওর স্ত্রীকে? গিয়ে কাজ নেই। মোড়ের চায়ের দোকানটা আছে। দোকানি আমাকে চিনতে পারল। চা খেতে খেতে জানলাম সুশীল রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিল। গত বার পঞ্চায়েতে জিতেও ছিল। বলল, ওর বাড়িতে

AMARBOI.COM

রাত্রে অ্যাটাক হলে চালের বস্তার ফাঁকে লুকোয়। সেখানেই ওকে গুলি করে ...।

চলো, সার্কিট হাউস চলো। দেখি রাস্তার কোথাও কোথাও পুলিশের টহল। বুকের মধ্যে বিচ্ছিরি একটা কাঁটা। সুশীলকে তো আমিই পার্টি নেতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তার পরই কি সুশীল জড়িয়ে গেল? ক্ষমা চাইছি! ক্ষমা চাইছি!

ফিরে এসে আমার এক বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম অন্য দরকারে। ও ফরেনসিকে কাজ করে। ও কিছু কালো চাল টেস্ট করছে।

জিজ্ঞাসা করি, চালগুলো কালো কেন?

ও বলে, রক্তমাখা। আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে এটা মানুষের রিক্ত কি না।

জিজ্ঞাসা করি, চালগুলো কালো কেন?

ও বলে, রক্তমাখা। আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে এটা মানুষের রক্ত কি না।

জিজ্ঞাসা করি, এই চাল সেদ্ধ করলে ভাতের রংও কি কালো হবে?

ও বলল, সম্ভবত কালোই থাকবে।

নাচনিটার এডিটিং চলছে। রাজনীতি এর মধ্যে রাখিনি। কিন্তু উল্লাসিনী খাচ্ছে কালো ভাত। রিভার্স করে দিলে ভাতের রং সাদা। কিন্তু উল্লাসিনী কালো। ভাতকে সাদা রাখতে গেলে উল্লাসিনীরা কালো হয়ে যায়।

আজ রবিবার। আপনারা সাদা ভাত খেয়েছেন। দুপুরে বিছানায় গড়িয়ে এটা পড়ছেন। আপনাদের মুড অফ করে দিলাম। ক্ষমা চাইছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ মার্চ ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধজনের সরস্বতী

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

হ্যাঁরে, তুই এত অপদার্থ কেন বল তো?' সুফি বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

'মানে?' আমিও পাল্টা ভুরু কুঁচকে সুফির দিকে তাকালাম।

'মানে আবার কী? কেন পলকের বাবার থেকে তুই পঁচিশ টাকা চাঁদা নিয়েছিস মাত্র?'

'ওঃ', বিরক্ত লাগল আমার, 'আবার সেই এক কথা! আর কত বার বলবি? বাকি টাকাটা আমি দিয়ে দেব বললাম তো।'

'অ্যাঃ, শালা টাকার গরম দেখাচ্ছিস? দেখ বাঁকা, তোর পলককে ভাল লাগে বলে তুই ওর বাবার থেকে কম চাঁদা নিবি? তোর প্রেমের জন্য পুজো সাফার করবে? নেহাত টুপ তোকে বাঁচাল, না হলে সে দিনি তোকে কেটিয়ে সোজা বানিয়ে দিতাম। শালা, পলক পলক করে হেদিয়ে মরছিস, আর সে তো তোকে পাত্তাই দেয় না। কাজের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাস না তুই? প্রেসবায়োপিয়া রোগ আছে? গামবাট একটা। মাংকি ক্যাপ ছাড়া সারভাইভ করতে পারে না, রোয়াব দেখাচ্ছে।' সুফি আমায় কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দূরের ভাঙা পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেল।

মাংকি ক্যাপ হল আমার কবচকুণ্ডল। জন্মের সময় থেকেই একটু ঠা'। পড়ল কী পড়ল না, ঠাকুমা আমায় মাংকি ক্যাপ পরিয়ে দিত। বলত, 'আগে শরীরটা ঠিক রাখতে হবে, বুঝলি বাঁকা?' আমি তো বুঝলাম ঠাকুমা, কিন্তু অন্যরা? অন্যরা তো বোঝে না।

এই যে বাঁকা, এটা নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাম। সেটা ক'জন বোঝে? পাড়ার সবাই এটা নিয়ে আমায় আঁকা-বাঁকা কথা বলে। ভুলে যায় যে, শৌর্যমান বলে আমার একটা ভাল নামও আছে। আসলে, তোমার কোনও কিছুতে অস্বস্তি হচ্ছে জানলে লোকে সেটাকে খুঁচিয়েই যে আনন্দ পায়, তার কাছে অন্য সব কিছু ফিকে।

'কী রে, তখন থেকে একা একা বসে কী করছিস?' একটা নরম গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরল আমার। টুপ।

আমি বললাম, 'তুই বাড়ি যাসনি? প্রায় রাত দেড়টা বাজে। বাড়ি যা, আমি আর সুফি আছি তো।'

'দেড়টা? তো?' টুপ আমার পাশে বসল, 'তোরা ছেলে বলে রাত জেগে সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল পাহারা দিবি, আর আমি মেয়ে বলে আমায় বাড়ি চলে যেতে হবে? হ্যালো, মধ্যযুগ কিন্তু [illegible] ভাল লাগছে না রে?

www.amarboi.com

এর মধ্যে এমন মাংকি ক্যাপ পরে বসে আছিস কেন?'

ওঃ, এ-ও আমার ক্যাপের পেছনে লেগেছে দেখি।

আমি কথা ঘোরাতে বললাম, 'তা টুপ, সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোন কথাটা?' সুফি ফিরে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

আমি ওকে পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'ওই যে রে টুপ, পলককে বলার ব্যাপারটা ... তোকে বলেছিলাম না ... সেই যে রে ...'

টুপ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল আকাশের দুর্বল চাঁদ, আমাদের সরস্বতী পুজোর সুন্দর প্যাণ্ডেল। ওর দেখাদেখি গম্ভীর হয়ে গেল কলকাতার সমস্ত হলুদ স্ট্রিট লাইট।

আমি ভয়ে ভয়ে বললম, 'কী রে টুপ, মানে ... আমি ...'

টুপ আমার দিকে ওর বিশাল বড় বড় চোখ দুটো তুলে বলল,'তুই আমায় আবার এ সব বলছিস? তুই অন্ধ?'

বায়োলজিক্যালি আমি যে অন্ধ নই, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, টুপ নিশ্চয়ই বায়োলজির টিচার নয়, তা হলেও এটা জানতে চাইলে কেন?

গত রাতের প্রশ্নটা সকালেও আমার মাথা ছাড়ল না। ভোরবেলা বাড়ি ফিরে আমি ভাবলাম ঘুমোব, কিন্তু টুপের কথাটা ক্রমাগত মাথায় হুল ফুটিয়ে গেল। আচ্ছা, আমি কি খুব বেশি কিছু বলতে বলেছিলাম টুপকে?

পলক আমাদের পাড়ায় বছর দুয়েক হল এসেছে। আর, এসেই প্রথম খুনটা করেছে আমায়। এঃ, খুব চিপ হয়ে গেল না কথাটা? কিন্তু, আমায় সত্যি খুন করল যে!

আমি কোনও দিনই মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা ফ্রি হতে পারি না। আগে কলেজে বা এখন অফিসে সব জায়গাতেই মেয়েদের দেখলেই কে যেন আমার ভেতরের সমস্ত কথা ডাস্টার দিয়ে মুছে দেয়। ফলে, মেয়েদের সঙ্গে ভাব করাটা আমার দ্বারা হবে না বুঝে আমি ও রাস্তায় হাঁটতাম না।

কিন্তু, পলক সব গণ্ডগোল করে দিল। ওকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমার অ্যাসিডিটি বাড়ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, শরীরের নানান জায়গায় বেশ কিছু টিউমার জন্মাচ্ছে। যেন হার্টবিট মাঝে মাঝেই মিস হচ্ছে। মাথা ঘোরানো, শ্বাসের কষ্ট আর ইনসমনিয়াও একে ক্রমশ জুটেছিল আমার শরীরে। ফলে, এক রাতে এ সব আমার সহ্য করতে না পেরে আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, এ বার পলককে বলতেই হবে।

সেই মতো এক রোববার বিকেলে পলককে ধরেছিলাম বড় রাস্তার কাছে। বলেছিলাম, 'ইয়ে, মানে দেশলাই আছে?'

'মানে দেশলাই?' পলকের এ বার অবাক হয়ে অপলক হওয়ার পালা, 'কোনও নতুন ব্র্যান্ড?' আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেছিলাম। আসলে কী ভাবে কথা শুরু করব, বুঝতে না পেরে নার্ভাস হয়ে অমন একটা কথা বলে ফেলেছিলাম আর কী! এ বার কী হবে?

'কী হল? মেয়েদের কাছে কেউ দেশলাই চায়? অসভ্যতা হচ্ছে?' মুখ চোখ লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পলক এ বার ধমক দিয়েছিল। কিন্তু, কিছু বলে আমি যে ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করব, তার আর উপায় ছিল না। কারণ ঠিক তখনই সিনে এন্ট্রি নিয়েছিল চিনার। এ ব্যাটা পলকের ভাই। আমাদের ঠেকে আসে। ভারী বদ ছেলে! আমায় কক্ষনও বাঁকা বলে না। সব সময় বলে, 'ক্ষুদ্র ও বাঁকা'। আমি বেঁটে বলেই কি? কে জানে!

চিনার বলেছিল, 'আরে দিদি, এই ক্ষু... মানে বাঁকা তোকে কী বলছে?'

'বাঁকা? বাঁকা মানে? ওর নাম?' পলক ভুরু বাঁকিয়ে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল, যেন আমায় নয় রাস্তার কোনও ঘিয়ে ভাজা কুকুর দেখছে।

কাল্পনিক লেজ গুটিয়ে আমি সেই দৃষ্টি থেকে যে কী ভাবে পালিয়েছিলাম, তা আমিই জানি। তবে, নানা রকমের রোগের প্রকোপ তার পর থেকে বেড়েছিল বই কমেনি। অমন পেনেলোপে ক্রুজ টাইপের মেয়েকে কেন যে ভগবান আমাদের পাড়ায় পাঠাল? আর, পাঠালেও আমার চোখে ফেলার কোনও মানে ছিল কি?

তবে, অনেক ভেবে একটা রাস্তা বের করেছিলাম আমি। টুপ। আমার ছোটবেলার বন্ধু। মানে বান্ধবী, কিন্তু, ফ্রেন্ডের তো আর জেন্ডার হয় না! আসলে, টুপ একমাত্র মেয়ে, যার সঙ্গে কথা বলতে আমার প্রবলেম হয় না। তাই টুপকে বলেছিলাম, 'প্লিজ, পলকের সঙ্গে এক বার কথা মানে ... আলাপ ... মানে ... উফ্, তুই বুঝতে পারছিস না?'

টুপ সে দিনও যেমন পাত্তা দেয়নি, গত কাল রাতেও পাত্তা দেয়নি। এ দিকে এমন চললে আমার চোখে যে তুলসী পাতা পড়বে, সেটা ওকে বোঝাই কী করে?

এ সব সাতপাঁচ ভেবে সকালটা কাটিয়ে দুপুরের দিকে প্যান্ডেলে গেলাম এক বার। এ সময়টা প্যান্ডেলে কেউ খুব একটা থাকে না। কিন্তু, এ কী! প্যান্ডেলের সামনে গিয়ে হঠাৎ যেন পা আটকে গেল আমার। আরে! পলক যে! ও এমন সময় এখানে? আর, সঙ্গে টুপ। টুপ কি আমার কথাই বলছে? এ বার আমি কী করব? বাড়ি ফিরে যাব? না, সামনে এগিয়ে যাব? কিন্তু, গিয়ে কী বলব? আমার ভেতরে সেই লোকটা যে আবার ডাস্টার হাতে পটাপট সব কথা মুছতে শুরু করেছে! কিন্তু, এমন সুবর্ণসুযোগ কি ছাড়া যায়? শুকনো জিভ, ড্রপ-খাওয়া হৃৎপিণ্ড আর লোভী পা নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পলক আমায় এক বার দেখে টুপকে বলল, 'আরে, এর নামই তো বোকা? না?'

আজ আলট্রামেরিন আকাশে আইসক্রিমের মতো
মেঘেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। ছেলেদের জিন্‌স, কারগো আর
ব্যান্ডানাগুলো পাল্টে সব পাজামা পাঞ্জাবি হয়ে গেছে।
মেয়েরাও ছোট টপ আর ক্যাপ্রি ছেড়ে দলে দলে হলুদ
বাসন্তী শাড়ি। আজ পাড়ার সব চেয়ে খিটখিটে ব্রজ
অ্যাঠাও কুকুরদের বিস্কিট খাওয়াচ্ছেন। ছোটরা ব্রাউন
পেপারে মলাট দেওয়া বইপত্তর হাতে চলেছে প্যান্ডেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে। অঞ্জলি দিতে গিয়ে ক্লাস টেনের ছোট্ট সব ফুল
কেন যে ঠাকুরের বদলে সামনে তিন ধাপ আগে
দাঁড়ানো মিষ্টির দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। আজ খিচুড়ির গন্ধ
ভাসছে পাড়ায়। রোদ উপচে উঠছে ভাঙা দেওয়ালের
সব চেয়ে স্যাঁতস্যাতে কোনায়। আজ সদ্য স্বামী হারানো
রিনা কাকিমাও বারান্দায় বেরিয়েছেন বহু দিন পরে।
আজ বহু দিন পরে সলিল চৌধুরী গাইছেন প্যারেলে।
পুঁচকি একটা হাওয়া কে জানে
কোত্থেকে নেমে এসে
বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের। আজ আমাদের
হাজার কষ্টের, হাজার মনখারাপের মাঝে এক টুকরো
আনন্দের দিন। আজ সরস্বতী পুজো।

'কী রে, কবিতা লিখবি?' আমি মুখ তুলে দেখলাম সুফি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও আবার বলল, 'সেই সকাল থেকে দেখছি, এক কোনায় ছেঁড়া ক্যালেন্ডারের মতো মুখ করে বসে আছিস। কেন রে? কী হয়েছে?'

আমি অত্যন্ত কাতর গলায় বললাম, 'জানিস, কাল দুপুরে পলক আমায় বোকা বলেছে।'

'দু' অক্ষর কম বলেছে, হাঁদা কোথাকার।' সুফি ধমক দিল, 'এমন সকালে সেই জন্য তুই মুখ হাঁড়ি করে বসে আছিস? তুই কি সত্যি পলকের ব্যাপারে সিরিয়াস? আরে, গাধা, আসল কেসটা দেখতে পাচ্ছিস না?'

'না তো। কী কেস? আর, তুই কি ভেবেছিস, এ ভাবে মন খারাপ করে বসে থাকা আমার হবি?'

সুফি কিছু বলতে গিয়েও থমকাল। আর, আমি জমে গেলাম। কারণ, আমাদের একদম সামনে টুপ আর চিনারের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে পলক।

'কী হবি তোর ক্ষু ... বাঁকা?' চিনার মুখ টিপে হাসছে। ছেলেটা আমার চেয়ে কম করে তিন চার বছরে ছোট। সে কী করে যে আমায় এমন করে বলে, কে জানে!

মনে হল চিনারকে পেঁদিয়ে ওর সমস্ত পাতা খসিয়ে দিই। কিন্তু, পলকের সামনে আমি কী বলব, ভেবে পেলাম না। ডাস্টার হাতে মালটা আবার ভেতরে কাজ শুরু করেছে।

'চুপ কর, সব সময় বাজে কথা বলবি না।' এ বার পলক ধমক দিল চিনারকে।

পলক ধমক দিল চিনারকে।। তাও আমার জন্য! আমার পেটের ভেতরে কুড়িটা শোল মাছ একসঙ্গে ঘাই দিল। আমি কিছু বলব বলে মুখ খুলতে গেলাম। কিন্তু, একটা কথাও মনে পড়ল না। এই সেরেছে! বাংলা ভুলে গেলাম না কি!

টুপ আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি দিয়ে কেমন যেন ঠাম্মা গলায় বলল, 'তোকে পলক একটা কথা বলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাত্র একটা?' আমি কোনও মতে বললাম।

'না তো কী? তোকে গোটা ডিকশনারি পড়ে শোনাবে?'

টুপ ওর ছোট্ট চুলগুলোকে ঝাপটা মারল। মেয়েটার বড় বড় চোখে এত রাগ কেন রে বাবা!

পলক হাসল। মা গো, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। মড়ার ওপর কেন খাঁড়ার ঘা দাও মা? এ সব হাসিগুলো বন্ধ ডেকে বন্ধ করে দেওয়া যায় না?

পলক বলল, 'আমার বাড়ির কম্পিউটারটা একটু ডিসটার্ব করছে। আজ কোনও লোক পাচ্ছি না। প্লিজ, যদি তুমি এক বার দেখে দাও।'

'আমি? কিন্তু, আমি কি পারব? আমি তো তেমন জানি না ...'

এ বার ধমক দিল সুফি, 'আবার ন্যাকামো করছিস? তুই তো এ সব কাজ ভাল জানিস। যা, করে দিয়ে আয়।'

'যাব?' আমার শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলো আবার বেগড়বাই শুরু করেছে।

'না তো কি এখানে বসে ...', সুফি অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে।

পলক বলল, 'আমি জানি, তুমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। এ সব সামান্য কাজ তোমার নয়। কিন্তু, এমন বিপদে পড়েছি না! একটা খুব দরকারি কাজ আছে। প্লিজ, হেল্প মি, না!'

আমায় কে হেল্প করে, তার ঠিক নেই, আমি করব পলককে হেল্প! আমি বললাম, 'দুপুরে গিয়ে কবে আসব। ডোন্ট ওরি।'

'তুমি না এলে আমি চিন্তা করব।' পলক চলে যাওয়ার আগে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, যে আমার হঠাৎ ভীষণ শীত করে উঠল। মনে পড়ল, ইস! যদি মাংকি ক্যাপটা থাকত!

শুনলাম চলে যেতে টুপ চাপা গলায় বলল, 'মুখ দিয়ে লালা পড়ছে যে! সত্যি, তোর কাছের দৃষ্টি যে এত খারাপ, জানতাম না তো!'

'সকল পল্লিবাসীকে জানানো হচ্ছে যে, আজ সন্ধ্যায় আমাদের পাড়ায় এক বিরাট ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে শঙ্খ ফুঁ থেকে মোমবাতি প্রজ্বলন, হাঁড়ি ভাঙা থেকে মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো নানান প্রতিযোগিতা হবে। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে, যে আপনারা সকলে প্যান্ডেলের সামনে জড়ো হয়ে আমাদের এই বিরাট ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করে একে সাফল্যমন্ডিত করে তুলুন'।

এই নিয়ে পাঁচ বার হল। আজ সুফি একাই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। খেয়ে না খেয়ে পেয়েছে একটা মাইক, আর তাতেই আমাদের পাড়ার এই অনুষ্ঠানটাকে অলিম্পিকের স্টেটাস দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে।

আজকাল এই হয়েছে এক কাণ্ড। আমরা অলিম্পিকে বিভিন্ন ইভেন্টে এত এত মেডেল এনে ফেলেছি যে, এ বার নতুন খেলা না হলে আর চলছেই না। তাই শঙ্খ ফুঁ, একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশলাই দিয়ে কে কত বেশি মোমবাতি জ্বালাবে, চোখ বেঁধে কে নির্দিষ্ট একটা হাঁড়ি ফাটাবে, ক'জন মোটা বউদি মিউজিক্যাল চেয়ারে জেতার লক্ষ্যে পিচের রাস্তায় উল্টে পড়ে ব্যথা ঢাকতে হেঁহেঁ করে হাসবে— এ সব খেলায় আমরা আরও গোটা তিরিশ পঁয়তিরিশ সোনা আনার তোড়জোড় শুরু করেছি। আজকাল সরস্বতী পুজো আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতিকেও দারুণ ভাবে ব্যাক করেছে।

প্রতি বার এই সব খেলাধুলো নিয়ে আমার এমন একটা সিনিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকেই। কারণ এই খেলাগুলোতেও আমি সুবিধে করতে পারি না। আর তাই, টু ক্রিটিকের মতো আমি নিজের ইগোকে এই ভাবে সামলাই। কিন্তু এ বার আর এ সব ঝামেলা নেই। কারণ আজ আমি হেব্বি খুশি। আজ দুপুরে পলকের কম্পিউটারটা আমি একদম রানিং কন্ডিশনে নিয়ে এসেছি। আর, তাতে খুশি হয়ে পলক আমায় চুমু ... খায়নি, কিন্তু হাত ধরেছে। তখনই মনে হচ্ছিল আর টুপের ভরসায় না থেকে আমার মনের কথাটা বলে দিই। আর, সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে, আজ আর ডাস্টার হাতে লোকটা আসেনি। মানে, দুপুরের থেকেই লোকটা আমার মনের কথাগুলোকে আর মোছার চেষ্টা করছে না। আজ আমার সব ঠিকঠাক মনে পড়ছে। সব প্রশ্ন, মনে হচ্ছে, কমন পড়বেই।

দুপুরে পারিনি, কিন্তু এখন আমায় পারতেই হবে। সেই বিকেল থেকে নশো নিরানব্বই বার 'পলক, আমি তোমায় খুব ভালবাসি' কথাটা রিহার্সাল দিয়েছি।এটাকে তো আর বিফল হতে দিতে পারি না। তা ছাড়া আজ পলকের কম্পিউটার ঠিক করে ওর কাছে নিজের একটা জায়গাও তৈরি করেছি। রোজ রোজ তো আর কম্পিউটার খারাপ হবে না। আর, রোজ রোজ এই সুযোগও আসবে না।

তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমি গুটি গুটি পায়ে প্যান্ডেলের পেছনের দিকে গেলাম। মিনিট দশেক আগে ওখানে একটা চেয়ার নিয়ে পলককে বসে থাকতে দেখেছি আমি। কিন্তু এ বার দূর থেকে আরও দুজনকে দেখে চমকে গেলাম। আরেব্বাস, পলকের সঙ্গে যে টুপ আর সুফিও রয়েছে। এরা তো আমার দলের লোক। ভালই হল। আমার কনফিডেন্স শরীর উপচে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আজ যা পারফরমেন্স দেব না! আমি মাথা থেকে মাংকি ক্যাপটা খুলে হাত দিয়ে চুলটা যথা সম্ভব পাট করে পলকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওরা তিন জন একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু, মুখ খুলল পলক, 'ইয়েস? কিছু বলবে?'

আমি কিছু বলতে গিয়েও থামলাম। মাইকে এখন সুফির জায়গা নিয়েছে চিনার। ও বলেছে যে, একটু পরেই হাঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতাটা শুরু হবে।

মাইক থামলে আমি মুখ খুললাম, 'মানে, পলক তোমায় একটা ইয়ের ইচ্ছে ছিল।'

'কী? ইয়ের ইচ্ছে মানে?' পলকের মুখ পলকে গম্ভীর হয়ে গেল। আর, সেই মুখ দেখে ডাস্টারওয়ালা হঠাৎ কোত্থেকে এসে বসল আমার ভেতর। সেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'না, মানে ইয়েটা খুব ... ভালবাসা তো খুব ভাল, মানে বিবেকানন্দ বলেছেন, জীবে প্রেম ... আমি তোমায় প্রেম ...'

'শাট আপ, ইউ ক্লাউন', দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসে গলায় বলল পলক, 'জীবে প্রেম? তুমি আমায় প্রেম? এক বার হাত ধরেছি বলে তোমার এত সাহস হয়েছে? কখনও নিজেকে ভাল করে অ্যানালিসিস করেছ? হাইপোকনড্রিয়াকে একটা। মাংকি ক্যাপের বরপুত্র। বেঁটে, তোতলা। প্রেম দেখাচ্ছ? লজ্জা করে না তোমার? প্রপোজ করতে এসেছ? নির্বোধ একটা। বোকা। কী হল, এখন চুপ করে কেন? উত্তর দাও।'

উত্তর কেন, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, আর কিচ্ছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। হাঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতায় নাম না দিয়েও পলক আমার হাঁড়ি যে ভাবে ফাটাল, তাতে ওর ফার্স্ট প্রাইজ বাঁধা। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পলক আবার বলল, 'আমার কথা বাদ দাও, পৃথিবীতে কোন মেয়ে পছন্দ করবে তোমায়? আছে কেউ?'

'আছে!' দৈববাণী হল যেন। যেন দেবী সরস্বতী স্বয়ং ভরসা দিলেন আমায়।

আমি চমকে উঠে সামনে তাকালাম। দেখলাম, প্যাঁ'লের পেছনের আবছা অন্ধকার ভেদ করে বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে টুপ।

পুঁচকি হাওয়াটা বসন্তের স্পর্শ নিয়ে যেন ফিরে এল আবার। গাছের মাথায় যেন ফিরে এল মুগ্ধ তারারা। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম টুপের দিকে।

কাছের দৃষ্টি। আমার, আমাদের কারও কারও কাছের দৃষ্টিটা সত্যিই খুব খারাপ!

AMARBOI.COM

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

আমি স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করি। এর জন্য নামমাত্র অনুশোচনা বা অপরাধ বোধ আমার নেই। না, কোনও দুরারোগ্য চিরস্থায়ী ব্যাধি আরতির, মানে আমার বউয়ের নেই। একঢাল কালো চুলের আরতি আজও স্নিগ্ধ-সুন্দরী। একটু হিমোগ্লোবিনের খামতি ছাড়া সে আমার চেয়ে অনেক সুস্থ। আমায় নিয়মিত প্রেশার এবং ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। তাই আমার কামনা সব সময়ই মাথা হেঁট করে থাকে ওর সুস্থতার সামনে। এখন কথা হচ্ছে, আমি কেন চাইছি আরতি মরে যাক? বিয়ের আগের দু'বছর এবং পরের পাঁচ বছর আরতিকে আমি কাচের পাত্রের মতো সম্ভ্রম করতাম। উৎসব-অনুষ্ঠানে নিয়ে গিলে মনে হত পাত্রটা বুঝি অন্যের হাতে দিয়েছি। আলতো একটা নজর রাখতামই। ক্রমশ এই পাহারাদারি আলগা পড়ে গেল। কারণটা আরতি নিজে। আমার বন্ধু এবং তাদের বউয়েরা আমাকে বহু বার বলেছে, একটা বউ বটে তোর বা আপনার। যে প্রসঙ্গেই কথা হোক, তোকে বা আপনাকে এক বার টেনে আনবেই।

AMARBOI.COM

আরতির এই পতিব্রতা স্বভাব মা-ও খুব পছন্দ করত। আরতিকে বলত, এখন নিজের মরে যাওয়া নিয়ে আর চিন্তা হয় না, আমার ছেলেকে যত্নেই রাখতে পারবে তুমি।

মা-বাবার আমি একমাত্র সন্তান। বাবা মারা গেছেন আমার তখন মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ার। মা গেল বছর চারেক হল। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করি। পৈতৃক বাড়িতে আমি, আরতি, দশ বছরের ছেলে জয়মাল্যকে নিয়ে আমাদের ছায়া ঘেরা পুকুরের মতো শান্ত সংসার। এ রকম একটা সুস্থির অবস্থায় থেকেও আমি কেন বউয়ের মৃত্যু কামনা করছি? প্রশ্নটা অনেকের কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে। তাদের বলি, আমার ধারণা দাম্পত্যের বয়স বারো- চোদ্দো বছর হয়ে গেলে প্রত্যেক দম্পতি কখনওসখনও একে অপরের মৃত্যু কামনা করে। অবশ্যই, আর্থিক ভাবে গাড্ডায় গিয়ে না পড়লে তবেই।

আমার আন্দাজ আরতিও আমার মৃত্যু কামনা করে। আর্থিক অনটনে পড়বে না, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইনশিয়োরেন্স মিলিয়ে ভালই পাবে। এক দিন ঠাট্টার ছলে আরতিকে বলেছিলাম, বুঝলে, হিসেব করে যা দেখছি, হঠাৎ করে মরে গেলে তুমি কিন্তু এখনকার থেকে সংসার চালানোর টাকা বেশিই পাবে।

এটা শোনার পর যে কোনও দজ্জাল বউ বলত। এ কথা বলার আগে থান কাপড় নিয়েই ঘরে ঢুকতে [illegible] তোর। তুমি কী মনে করো, টাকার

জন্যই তোমার কাছে পড়ে আছি! এতটা নীচ ভাবতে পারলে আমাকে! আরতি এই সব মন্তব্যের ধারপাশ মাড়াল না। কথাবার্তা স্বাভাবিক চালিয়ে গেল। রাতে খেলো না। পরের দিন সকালেও না খেতে দেখে, আমার ইয়ার্কির জন্য গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ করি। ক্ষমাও চাই। আরতি উপবাস ভাঙে।

আরতির এহেন আচরণে আমি যে খুব কনভিন্সড, তা মোটেই নয়। আমার মৃত্যুর প্রত্যাশা ও করেই, আমি ওর জন্য যতটা করি, তার চেয়ে হয়তো কম। বারো-চোদ্দো বছর গায়ে-পিঠে একটা মানুষকে সহ্য করা খুবই কঠিন কাজ। আমার হাই তোলা থেকে শুরু করে ক্ষণে ক্ষণে চশমা হারিয়ে ফেলা...সমস্তটাই ওর কাছে ভীষণ ক্লিশে। আমার কাছে ওর অভ্যেসগুলোও তাই। আমাদের সম্পর্ক এখন আউট হয়ে যাওয়া কোয়েশ্চেন পেপারের মতো। যৌনতার ভূমিকাও ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। অনেকে বলতে পারেন, আমি নিজের অবদমিত নোংরা বাসনাটা আরতির মনে চাপিয়ে দিচ্ছি। ও কখনওই আমার মৃত্যু কামনা করে না। হতে পারে, অস্বীকার করছি না। সত্যিই আমি তো আর আরতির মনের ভিতর বসে নেই। তবে খেয়াল রাখবেন, আমি যে ইচ্ছার কথা বলছি, তা নিতান্তই অফলদায়ী। আমি ভাবলাম আর আমার বউ মরে গেল, তা তো হওয়ার নয়। ভাবনাটা কেউ দেখতেও পাচ্ছে না। সমাজ পরিবারের নিন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই। আমি খুশিমতো এই ভাবনা ভাবতেই পারি। যেমন, আরতি মরে গেলে আমি তোর্সাকে বিয়ে করব। দরজা, জানলায় নতুন পর্দা লাগাবে তোর্সা। আমার অফিস বেরোনর সময় অনভ্যস্ত হাতে জিনিসপত্তর এগিয়ে দেবে। চোখেমুখে নার্ভাস ভাব। ক্লাস ফোর-এর জয়মাল্য ওর সৎমাকে মেনে নেবে না। হস্টেলে পাঠাতে হবে ওকে। বড় হলে বুঝবে, তেতাল্লিশে বিপত্নীক হয়ে যাওয়া মানুষের পুনরায় বিবাহ করা খুবই স্বাভাবিক। জয়মাল্যর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবে তোর্সার। ফের আমার সংসার সুখের হবে। এই বাসনাও নিষ্ফল! বাই চান্স আরতি যদি মরেও যায়, আমার মনে হয় না তোর্সা আমাকে বিয়ে করবে। আজও তোর্সাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। র্তোসা আমার প্রেমিকা। এখন র্তোসাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। দু'বছরে এই প্রথম বার। আজ হয়তো র্তোসাকে কিছুটা বোঝা যাবে। তোর্সা থাকে বেহালা, আমি মানিকতলা। ট্যাক্সিতে চলেছি, রবিবারের বিকেল। আরতি জানে আড্ডা মারতে যাচ্ছি সল্ট লেকে সুবিমলের বাড়িতে। সুবিমল আমার খুব কাছের বন্ধু। ওর অফিসেই দু'বছর আগে তোর্সার সঙ্গে আমার আলাপ। সুবিমল ছোটখাটো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির মালিক। ওর রিসেপশনিস্ট তোর্সা। মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখেই ভাল লেগেছিল। আগের মেয়েটা যথেষ্ট স্মার্ট, সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও কখনও চোখ টানেনি। আমি একটি মেয়ের রূপ ও ভঙ্গির মধ্যে যা যা খুঁজি অনেকগুলোই তোর্সার মধ্যে আছে। কথা বলছিল কাউন্টারে দাঁড়ানো এক জনের সঙ্গে। না তাকিয়েই মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা দিয়ে টের পেয়েছিল আমার থমকে যাওয়াটা মুগ্ধতার। বাইরে সেটা বুঝতে না দিয়ে শীতল অফিস সৌজন্যে বলেছিল, হোয়াট ক্যান আই ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর দিতে অশিষ্ট সময় নিয়েছিলাম আমি। সে-দিনই সুবিমলকে আমার ভাল লাগার কথাটা বলিনি। 'খুব পছন্দ' ব্যাপারটা মানুষ বেশ কিছু দিন নিজের কাছে রাখতে চায়। তার পর থেকে সুবিমলের অফিসে ঘনঘন যেতাম। এই যাওয়াটাকে সুবিমল সন্দেহের চোখে দেখেনি। কারণ, মহিলাপ্রীতি নিয়ে আমার কোনও দুর্নাম নেই। সেই ক'দিনে আমার মোহঘোর অবস্থাকে 'লাজুক অথচ ন্যাকা নয়' টাইপের হাসি দিয়ে স্বাগত জানায় তোর্সা। আলাপ হয়। সুবিমলের অগোচরে আমরা কয়েক দিন আউটিং-এও যাই। তোর্সার কাছে আমি কিছুই লুকাইনি। লুকানোর সুযোগ কম। সুদর্শন, ভদ্রস্থ রোজগেরে তেতাল্লিশের আমি বিয়ে করিনি বললে, বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তা ছাড়া এ ধরনের মিথ্যে বলে সম্পর্ক ক'দিনই বা বজায় রাখতে পারব। আরতি, জয়মাল্যর কথা সব বলেছি। তোর্সা বিয়ে করেনি। কেন করেনি? জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, করব। এর পর আর প্রশ্ন চলে না। অদৃশ্য বেড়া চলে আসে সম্পর্কের মাঝে। পরের বউ হবে, যতটা সম্ভব নিষ্কলুষ রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। তবু ধন্দ থেকে যায়। বিয়ের বাজারে রীতিমতো সুন্দরী মেয়েটি তিরিশ পেরিয়েও কেন বিয়ে করল না? পরের আউটিংগুলোয় প্রশ্নটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলেছি। নানা রকম উত্তর দিয়েছে, বিয়ে করে কী হয়? এখন যেমন আছি, তার চেয়ে যদি খারাপ থাকি। বিয়ে করার মতো একটা ছেলে পেলাম না। পেলে দেখা যাবে।

আমার মধ্যে কী পেলে যে, সহজেই ঘরে বেড়াতে পারছ? জিজ্ঞেস করেছিলাম। ফাজলামির হাসি হেসে তোর্সা বলেছিল, প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমার জমবে। ঠাট্টার আড়ালে থাকা অনুরাগটা ধরতে অসুবিধে হয়নি আমার। তোর্সা বলতে চেয়েছিল, আপনি আমার প্রতীক্ষার অবসান। আরও কয়েকটা কমপ্লিমেন্ট তোর্সা আমাকে দেয়। আপনি বেশ অকপট। ফ্ল্যাটারি যে করছেন, সেটাও বুঝিয়ে দেন। আমার মন পেতে চেয়ে অযথা বউদির নামে নিন্দেমন্দ করেন না। বেশির ভাগ অবৈধ প্রেমের এটাই হাতিয়ার।

তোর্সাকে বলেছিলাম, প্রেম কখনও অবৈধ হয় না।

আমাকে আপনার হঠাৎ এত পছন্দ হয়ে গেল কেন? জানতে চেয়েছিল তোর্সা।

বলেছিলাম, জানি না।

এত কথার পরে যেখানকার প্রশ্ন, সেখানেই রয়ে গিয়েছিল, ওর বিয়ে না করার কারণটা জানা যায়নি।

সুবিমল স্কুলবেলার বন্ধু। ওকে তোর্সার কথা বলেই ফেললাম। মিনিটখানেক অবাক হয়ে বসেছিল। বলল, আমি কিছুই টের পেলাম না! কত দূর এগিয়েছিস তোরা?

বললাম, বেশি দূর নয়। রাত কাটাইনি কোথাও। ওই ধরনের অ্যাপ্রোচ করার সিচুয়েশন তৈরি হয়নি। ট্যাক্সিতে বসলে হাতটাত ধরি। সিনেমা, থিয়েটার দেখতে গিয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শব্দভেদী বাণের আন্দাজে আচমকা চুমু খাই, প্রায়শই তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর দিক থেকে রেসপন্স কেমন? জানতে চেয়েছিল সুবিমল।

বলেছিলাম, মজা পায়। বাধা দেয় না। আগ বাড়িয়ে কিছু করে না। এমনকী ফোনও নয়। যোগাযোগ ব্যাপারটা আমি একতরফা রক্ষা করি। দেখি ও ফোন করে কি না, পরীক্ষা করতে গিয়ে এক বার কুড়ি দিন পার করেছি। ফোন সেই আমাকেই করতে হল, নয়তো সম্পর্কটা থাকতই না।

টাকাপয়সা খসায় কেমন, যখন বেরোসটেরোস?

খরচ আমিই করি। ও খেয়াল রাখে, সেটা যাতে বেশি না হয়ে যায়। বেচারি নিজে কিছু খরচ করে উঠতে পারে না। স্যালারি যা দিস, তাতে সম্ভবও নয়।

আমার খোঁচাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর মুখে বসে রইল সুবিমল। কপালে ভাঁজ ফেলে কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, মেয়েটা কি তোকে বিয়ে করতে চায়? তার আগে সব কিছু দিয়ে ফেলতে চাইছে না?

বললাম, বরং উল্টো। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই বলেছি। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসব। বউ-ছেলের খাওয়া-পরার সংস্থান থাকবে। তোর্সা এ সব কথা উড়িয়ে দিয়েছে। আমিও যে খুব একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রেপোজালটা দিয়েছিলাম, তা নয়। ওকে টেস্ট করার জন্যই বলা। তোর্সার বক্তব্য, কারও সংসার ভাঙতে আমি চাই না। এ সব বলার আগে আপনার নিজের ছেলের কথা ভাবা উচিত ছিল। ওর বয়সের সন্তান তার বাবাকে দুনিয়ার সব চেয়ে ভাল লোক বলে মনে করে। আমি বলেছিলাম, তা হলে আমাদের এই রিলেশনের মানে কী, পরিণতিই বা কী হতে যাচ্ছে? আমি তো তোমাকে সারাক্ষণের জন্য পেতে চাই। ভেবেছিলাম তোর্সা বলবে, এই সম্পর্কটা সুন্দর বন্ধুত্বের। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো দরকার পড়লেই প্রেমিক-প্রেমিকারা বন্ধু শব্দটাকে ব্যবহার করে। তোর্সা কিন্তু করল না। বলল, এটাকেই প্রেম বলে। প্রেমের পরিণতি সব সময় মিলন নয়। ... আমার কথা শেষ হতেই সুবিমল বলে উঠেছিল, অল বোগাস। মেয়েটা নির্ঘাৎ লেসবিয়ান, মাঝখান থেকে তোকে একটু নাচাচ্ছে। ছেলে নাচানো ওর কাছে অবসর বিনোদন।

সুবিমলের সঙ্গে সহমত হতে পারলাম না। বললাম, আমি চার-ছ'ঘন্টা হামেশাই ওর সঙ্গে কাটিয়েছি। বাড়ি থেকে ছাড়া ওর মোবাইলে অন্য কোনও ফোন আসেনি। সমকামী পার্টনার বা কোনও নৃত্যরত ছেলে থাকলে নিশ্চয়ই এক বার হলেও ফোন করত।

তা হলে অবশ্যই ওর কোনও অসুখ আছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। বিয়ের পক্ষে যা প্রধান অন্তরায়। তোর সঙ্গে গভীরতম সম্পর্কে মেয়েটা কোনও দিনই জড়াবে না। খামোখা অশান্তিতে মরবি। রিলেশনটা থেকে বেরিয়ে আয়।

সুবিমলের উপদেশ শোনার পর বললাম, আমি বোধ হয় আর বেরোতে পারব না রে। সত্যিই ওর প্রেমে পড়ে গেছি। বহু দিন আগে যেমন হত, তাকে একটুখানি দেখা, খানিকক্ষণ কাছাকাছি থাকতে পেরেই যেমন ধন্য হয়ে যেতাম। তোর্সার বেলাতেও তাই হয়। এক ধরনের তেষ্টা। সেটাও মোটেই তেমন শরীরকেন্দ্রিক নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিমল বলল, ও সব কিছুই না, পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়ে যাওয়া পুরুষদের ওরকম একটু হয়। পড়ন্ত যৌবনের সিনড্রোম। সংসার মন দে; বউ-ছেলের সঙ্গে সময় কাটা। দেখবি, ঠিক বেরিয়ে আসতে পারছিস।

সুবিমলের পরামর্শ ম্যাগাজিনের 'কানে কানে' বিভাগের মতো শোনাল। মোটেই গ্রহণ করলাম না। উল্টে রোখ চেপে গেল। অসুখ গোপন করে আমাকে নিয়ে এ ভাবে পুতুল খেলার কোনও মানে হয়। ঠকে যাওয়া মানুষ মনে হতে লাগল নিজেকে। আরতির বদলে তোর্সাকে নিয়ে ঘর করার বাসনাটা ইদানীং চরম বিদ্রূপের মতো ঠেকে। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই। তাই দেখে আরতি কপট সন্দেহে যখন জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, এত কী ভাবছ? কার কথা?

আরতির মিচকি হাসির পিছনে পরিহাসই দেখতে পাই। যেন বলছে, যতই ছটফট করো, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

ভিতর ভিতর ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি। তোর্সার সঙ্গে রিলেশনের একটা হেস্তনেস্ত চাই। আমি পড়ন্ত যৌবনের ভিখারী নই, যতটুকু দেবে, তাতেই কৃতার্থ হয়ে যাব। একই সঙ্গে এটাও জানি, তোর্সা যদি হঠাৎ রাজি হয়ে যায় আমাকে বিয়ে করতে, সংসার ছেড়ে সহজে বেরোতে পারব না। আমার কল্পনাবিলাস কতটা আরতি যদি মরে যায়, কতটা শোকপ্রাপ্ত হব, তারও কোনও নির্দিষ্ট ধারণা আমার নেই। এমনও হতে পারে, আরতির সঙ্গে কাটানো সকল মুহূর্ত পাথরের ওজন নিয়ে নেমে আসতে পারে বুকে। এ সব সত্ত্বেও আমাকে নিয়ে তোর্সার এই খেলাটা মেনে নেওয়া যায় না। কিছু দিন ধরেই ওকে তাই বলতে শুরু করেছিলাম, আমাদের এই সম্পর্কের কোথাও কোনও স্বীকৃতি নেই। কেমন যেন বেওয়ারিশ। কোনও বন্ধুকে জোর দিয়ে বলতে পারি না, তোমার সঙ্গে প্রেম আছে। বন্ধু যদি ভেরিফাই করতে যায় তোমার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করবে। অদ্ভুত একটা লক্ষণরেখা টেনে রেখেছে। তোমার জগতে আমাকে প্রবেশ করতে দাও না, আমার জগতেও আসতে চাও না। আমাদের প্রেম যেন আলো-বাতাসের আড়ালে রয়ে গিয়েছে। বন্ধু পরিচয় দিয়ে এক দিন আসতে পারো তো আমার বাড়ি। তোমার প্রিয় মানুষটি কোথায় শোয়, বসে। জানলাটা পশ্চিমে না দক্ষিণে ...

কথা কেড়ে তোর্সা বলেছিল, আমি বউদিকে ফেস করতে চাই না। আপনার ছেলেকেও না। নিজেকে বড় অপরাধী লাগবে। আপনি বরং আমাদের বাড়িতে আসুন। আপনার প্রেমিকা কোথায় দাঁড়িয়ে আনমনে আপনার কথা ভাবে ...

সেই সূত্রে আজ তোর্সার বাড়ি যাওয়া। বেহালা চৌরাস্তা এসে গেছে, তোর্সার নির্দেশ মতো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরতে বলি।

পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি তোর্সাদের। নীচের তলার বসার ঘরে বসেছি। তোর্সা ইতিমধ্যে দাদা, বউদি, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। পরিচয় দিয়েছে অফিসের সিনিয়র কলিগ বলে। সিনিয়র হঠাৎ জুনিয়রের বাড়িতে আড্ডা বেশ মারতে এসেছে, এর ব্যাখ্যাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা কী ভাবে করছে জানি না। আমার সঙ্গে অবশ্য সহজ ভাবেই কথা বলল। মায়ের সঙ্গে এখনও আলাপ করায়নি তোর্সা, সম্ভবত উনি এখন বাড়ি নেই। বউদির সঙ্গে অবিবাহিত ননদ তোর্সার ভালই সম্পর্ক মনে হল, বউদির গাল টিপে আদর করে তোর্সা আলাপ করাল, আমার মিষ্টি বউদি। জানি না এটা কোনও তোষামোদ কি না। আমি এখন ওদের বাড়ির আলবাম দেখছি। চা, স্ন্যাক্স খাওয়া হয়ে গেছে। ছোট বাইরে পাচ্ছে, টেনশনে অনেকক্ষণ করা হয়নি। তোর্সাকে বললাম, একটু টয়লেটে যাব।

আসুন না। বারান্দার শেষে যে দরজাটা, ওইটা।

জলবিয়োগ করতে করতে একটু যেন বেশিই নির্ভার লাগছে। যাক, ঘোলাটে ভাবে হলেও, আমাদের সম্পর্কটার কয়েকজন সাক্ষী রইল।

টয়লেট থেকে বেরোতেই থতমত খেলাম। নীল ম্যাক্সি পরা এক বৃদ্ধা আমার দু'হাত দূরে। একেবারে মুখোমুখি। শরীরী ভঙ্গিতে ঘোর অস্বাভাবিকতা। চাউনিতে অদ্ভুত আক্রোশ। বলে উঠলেন, এখানে কী চাই? কেন এখানে?

উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। কেমন যেন ঘরঘরে। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। পায়ে তেমন জোর পাচ্ছি না। অনেক দিন পর নির্ভেজাল একটা ভয় আমায় বিবশ করেছে।

নিস্তার পেলাম তোর্সার এসে পড়াতে। আমার দেরি দেখে হয়তো বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। ধমকের গলায় বলে উঠল, মা, ওঁকে আসতে দাও। ঘরে যাও তুমি। যাও বলছি।

সরে গেলেন মহিলা। তবে ঘরে গেলেন না। উল্টো দিকের দেওয়ালে হাফ বডি সাইজ আয়না। সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তখনই লক্ষ করলাম, তোর্সার মায়ের চুলে বিশাল জটা। যেন একটা গোসাপ ঝুলে আছে ঘাড়ে। আয়নার নীচের র‍্যাক থেকে চিরুনি তুলে নিলেন। তোর্সা আমাকে বলল, চলুন ঘরে চলুন।

ফের আগের জায়গায় এসে বললাম। ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারিনি। তোর্সা বলতে থাকল, মাকে নিয়েই সমস্যা। অফিস বাদে আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। দাদার বদলির চাকরি। যখন তখন অর্ডার এসে যেতে পারে। বউদিও চলে যাবে। তখন চাকরিটা কী করে চালাব ভাবছি। বাবার বয়স হচ্ছে, একা মাকে সামলাতে পারে না।

বউদিকে তোষামোদের কারণটা ধরতে পারছি। ধাতস্থ হয়েছি একটু। তোর্সাকে বলি, ওঁর কথা তো আমায় কিছু বলোনি। কবে থেকে এ রকম?

প্রায় পনেরো বছর। বাবা এক বার দেনার দায়ে আমাদের কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গিয়েছিল। ধারের ব্যাপারটাও আমরা জানতাম না। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বাবার নামে নানা রকম কথা বলতে লাগল। বেশির ভাগই খারাপ সম্ভাবনার কথা। সে সব সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেল না। বাবা ফিরে আসার পরও সুস্থ হয়ে গেল মা। বাবা ফিরে আসার পরও সুস্থ হল না।

বুঝলাম, অসুখ তা হলে এখানে।

ফিরে এসেছি বাড়ি। তোর্সাদের ওখান থেকে বেরোনর সময় দেখেছিলাম, বারান্দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব আগ্রহ ভরে চুল আঁচড়াচ্ছেন তোর্সার মা। চিরুনি ঘাড়ে এসে থেমে যাচ্ছে বার বার। বড় একটা সিঁদুরের টিপ পরলেন।

অন্যান্য দিন আরতি বিছানায় আসার আগে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ জেগে রয়েছি। আরতি এল। মশারি গুঁজে শুতে গিয়ে দেখে আমার চোখ খোলা। নাইট ল্যাম্পের আলোকে হারিয়ে দিয়ে মিলন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হল ওর মুখ। বুকে টেনে নিই আরতির মাথা। আঙুল চালিয়ে দিই ওর চুলে। থেমে যায় আঙুল। হঠাৎ যেন বুক ফাঁকা হয়ে যায় আমার। তোর্সার বাবার মতো আমি তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাইনি এখনও। জোর লাগাই আঙুলে। আরতি বলে, উফ্, লাগছে।

কথা শুনি না। বলি, এত জট কেন? কবে পাকালে? আরতি বলে, হবে না, সংসারে কত চিন্তা। মাথা থেকে উপচে চুলে জড়িয়ে যায়।

এই জট থেকে আমাকে বেরোতেই হবে। আঙুলগুলো যেন হরিণের প্রাণ পেয়েছে। জঙ্গলের লতাপাতায় আটকে গেছে শিং। খানিক দূরে আরতির মতো শান্ত টলটলে একটা হ্রদ। আমাকে পৌঁছতেই হবে ওখানে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারি ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবান

সিদ্ধার্থ সিংহ

বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে বাজার করতে গিয়ে কার কাছে যেন কথাটা শুনে ছেলের বাবা তো রেগে কাঁই। এত বড় সাহস? গজগজ করতে করতে বাড়িতে ঢুকলেন— যা আমাদের বংশে কেউ কোনও দিন করেনি, সেই কাজ কি না শেষ পর্যন্ত আমার ছেলে করতে যাচ্ছিল? প্রেম করে বিয়ে? এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। কিছুতেই না।

বউ এসে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতেই, পুরো রাগটা ঘুরে গেল তাঁর দিকে— যত নষ্টের গোড়া তুমি। তুমি নিশ্চয়ই সব জানতে। আমার কাছে গোপন করে গেছ। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। চোখের সামনে থেকে সরে যাও বলছি।

এ বোঝায় ও বোঝায় সে বোঝায়। কিন্তু কারও কথায় কান দিচ্ছেন না তিনি। তাঁর সাফ কথা, ও যদি এ বিয়ে করে, আমি ওর মুখদর্শন করব না। ত্যাজ্যপুত্র করব। প্রেম? আসুক আজকে। আমি ওর প্রেম করা ছোটাচ্ছি।

নিমন্ত্রণের জন্য যে ক'টা কার্ড তখনও বাকি ছিল, ব্যাগ থেকে বার করে ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচ্‌ করে ছিঁড়ে ফেললেন। ইতিমধ্যেই যাদের নিমন্তন্ন করেছিলেন, ফোন করে করে তাদের বলতে লাগলেন, ছেলের বিয়ে ক্যানসেল। বলেই লাইন কেটে দিচ্ছিলেন। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করা যাবে না। প্রচুর লোককে ফোন করতে হবে। তখন যদি আইনি-বিধি মেনে পঞ্চাশ জনকেই নিমন্ত্রণ করতেন, তা হলে এত ফোন করতে হত না।

ক্ষতি হলে হোক, যে টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে, সেটা ফেরত পাওয়া যাবে না জেনেও, ক্যাটারার থেকে ইলেকট্রিশিয়ান, বিয়েবাড়ি থেকে বরযাত্রীর বাস, একে একে প্রত্যেককেই জানিয়ে দিলেন, এ বিয়ে হচ্ছে না।

পঞ্চাশ-ষাটটা ফোন করার পর যখন একটু হাফ ছেড়েছেন, বড় বড় ক'টা শ্বাস নিয়ে চেয়ারে বসেছেন, খবর দেখার জন্য হাতে তুলে নিয়েছেন রিমোট, ঠিক তখনই বড় এক কাপ চা নিয়ে এসে বউ বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব?

— কী? চুপ করে থেকো না। বলো।

— বলছিলাম কি, তুমি কি সত্যি সত্যিই ওর বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছ?

হ্যাঁ, দিচ্ছি।

তা হলে দুনিয়ার ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM ~ www.amarboi.com ~

—না। হচ্ছে না। আর যদি হয়ও, এই মেয়ের সঙ্গে হবে না। সে দিন সকালে উঠে প্রথম যে মেয়ের মুখ দেখব, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেব। সে যদি কালো পেতনিও হয়, তাই সই। ও আমাকে চেনে না। আমি ভালর ভাল, খারাপের খারাপ। বলে দিও তোমার ছেলেকে, বুঝেছ? এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। যাও।

মুখ ঝামটা শুনে বউ চুপচাপ ফিরে এলেন পাশের ঘরে। তিনি তাঁর স্বামীকে চেনেন। উনি যা বলেন, তাই করেন। উনি যখন বলেছেন, ওই মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন না। তখন তাঁকে রাজি করানোর সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নেই। তবু উনি ফোন করলেন ছোট ভাইকে। ওর প্রখর বুদ্ধি। ও যদি কোনও পথ বার করতে পারে! ফোন করলেন বড়দিকে। বাদ দিলেন না বাবাকেও। শ্বশুরকে উনি খুব শ্রদ্ধা করেন। ছোট বেলায় বাপ-মা মারা যাবার পর অযত্নে-অবহেলায় মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। প্রচণ্ড জেদি ছিলেন। আর সেই জেদের জন্যই আজ উনি এখানে এসে পৌঁছেছেন। কী নেই তাঁর? রয়েছে দাপটে চাকরি। মধ্য কলকাতায় চারতলা বাড়ি। ঘরে ঘরে এসি। দুটি গাড়ি। বউয়ের নামে সাত অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট। আর ছেলে? তাকে উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তাঁরই নির্দেশে একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে সে এখন ডাবলিউ বি সি এস অফিসার। বাইরে যতই তার হুকুম চলুক, বাড়িতে ঢুকলেই কেঁচো। বাবা যা বলবেন তাই। এ হেন মানুষটা বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরকে নিজের বাবার মতো দেখেন।

সে দিনই সন্ধ্যায় শ্বশুরমশাই এসে তাঁকে বোঝাতে যেতেই জামাই তাঁর মুখের উপরে বলে দিলেন, বাবা আমাকে মাফ করবেন। এ নিয়ে আমি আর একটি কথাও বলতে চাই না। যা বলার বলে দিয়েছি।

জামাই তাঁর সঙ্গে আজ অবধি এ রকম আচরণ করেনি। মাথা নিচু করে তিনি সরে গেলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এলেন বউয়ের বড়দি। বড়দিকে উনি খুব মানেন। ভালওবাসেন। কোনও কিছু বললে না করতে পারেন না। তাঁর দু'-চারটে কথা শুনলেন ঠিকই, কিন্তু তার পরেই বললেন, জবান, জবান। আমি যখন একবার বলে দিয়েছি, তখন আর অন্যথা হবে না।

বাবার কথায় কাজ হয়নি। বড়দিও ফেল পড়েছেন। অগত্যা ছুটে এল ছোট ভাই। সে কিছু বলতে যাবার আগেই উনি তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, অন্য কথা বললে বলো। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমাকে কোনও রিকোয়েস্ট করতে এসো না।

জামাইবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে ভাগ্নের ঘরে গিয়ে দিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ শলাপরামর্শ করল সে। তার পর চলে গেল।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। আজই ছেলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে যাওয়ায় সব পণ্ড হয়ে গেছে। বউ বললেন, কী গো, বাজার যাবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই তো নেই।

চা-টা খেয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য সদর দরজা খুলতেই যেন ভূত দেখলেন তিনি— এ কী তুমি?

— হ্যাঁ, আমি।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই এ পাশ ও পাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ছোট শালা, বড় শালি আর শ্বশুরমশাই।

ওদের দেখে একদম থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। — কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

ছোট শালা বলল, আপনি তো দিদিকে বলেছিলেন, আজ সকালে উঠে প্রথম যে মেয়ের মুখ দেখবেন, তার সঙ্গেই আপনি আপনার ছেলের বিয়ে দেবেন। তা, সকালে উঠে তো প্রথম এই মেয়েটারই মুখ দেখলেন, না কি?

বড় শালি বললেন, তুমি তো বলেছিলে, জবান, জবান। তুমি যখন একবার বলে দিয়েছে, তার অন্যথা হবে না।

পেছন থেকে বউ বলে উঠলেন, ওনার কথার খুব দাম। যা বলেন, তাই করেন।

পিছন ফিরে বউকে দেখে উনি বলে উঠলেন, তা বলে এই মেয়ের সঙ্গে? যাকে ও প্রেম করে?

ছোট শালা বলল, বিয়ে তো প্রেম করেই হয়। আমি তো কোনও দিন শুনিনি কেউ ঝগড়া করে বিয়ে করেছে। তা প্রেম করলে দোষ কোথায়?

— দোষ কোথায় মানে? আমাদের বংশে কেউ কখনও প্রেম করে বিয়ে করেনি।

— সবাই বিয়ের পরে করেছে, তাই তো? তা, যেটা একদিন করবেই, সেটা একটু আগে করলে ক্ষতি কি?

আজ মাথা অনেক ঠান্ডা। শ্বশুরের কথা শুনে একটু দমে গেলেন তিনি। বড় শালি বললেন, সকালে উঠে যখন প্রথমেই এর মুখ দেখেছ, অন্তত নিজের কথার দাম রাখার জন্য ছেলের সঙ্গে এর বিয়েটা দিয়ে দাও।

আমতা আমতা করতে লাগলেন উনি—কী করে বিয়ে হবে। আমি যে সবাইকে বারণ করে দিয়েছি। বিয়েবাড়ি, ক্যাটারার, লাইটের লোককে ...

— ও সব আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি বারণ করে দিলেও, আমি যে দিন এসেছিলাম, সে দিনই দিদির কাছ থেকে ফোন নম্বর, ঠিকানা-টিকানা নিয়ে সবাইকেই ফের বলে দিয়েছিলাম, এ বিয়ে হচ্ছে। এবং তেরো তারিখেই হচ্ছে।

— তুমি কি হাত গুনতে পারো নাকি? এ বিয়ে কে হবে, তুমি জানতে?

জানতাম। কারণ, আপনাকে আমি চিনি।

ছোট শালার মুখে এ রকম কথা শুনে এই প্রথম হাসি ফুটল তাঁর। হঠাৎ খেয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল, শালা, শালি, শ্বশুর, এমনকী ভাবি পুত্রবধূকেও গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, এসো এসো, আসুন। ভেতরে আসুন। পিছন ফিরে বউয়ের চোখে চোখ পড়তেই বললেন, দেখছ আমার মাথার ঠিক নেই, একবার তো বলবে, ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ...

উনি যখন ভিতরে ঢুকছেন, বউ শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাঁকে দেখে তাঁর বড় মেয়েও উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। ভাবি পুত্রবধূর মনে হল, বিয়ে যখনই হোক, তার শাশুড়ি মা এখনই তাকে বরণ করে ঘরে তুলে নিচ্ছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই ২০১১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন বসন্ত

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত

স্টুডিওর বাইরে বসে মাথা ধরে যাচ্ছিল পারিজাতের। স্টুডিওর বাইরের দিকের ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। চমকদার নীলচে জয়পুরী সোফা। টেবিলের ওপর কাচের নীল ডলফিন। দেওয়ালে একান্নটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের একটা বড় অয়েল পেন্টিং। কিছু ম্যাগাজিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। স্টুডিওর দরজার মাথায় লাল আলোটা গম্ভীর ভাবে 'প্রবেশ নিষেধ' এর বার্তা জানাচ্ছে। টনটন করছে পারিজাতের কপালের দু'পাশের দুটো শিরা, অনেক দিনের পুরনো রোগ; পোষ মেনেছে ছোটবেলাতেই। অনেক পরামর্শের বিজ্ঞাপন এসেছে কানে— "নিশ্চয়ই মাইগ্রেন পারিজাতদা, ফেলে না রেখে এক্ষুনি ডাক্তারকে দেখিয়ে নাও।" কিংবা 'পুরনো সাইনাসাইটিস নয় রে পারিজাত। হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু ভাল ওষুধ আছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। পারিজাত অবশ্য কোন দিনই এসব পাত্তা দেয়নি তেমন। রোগ নিয়ে তেমন অসহ্য মাতামাতি করার কী? যদি তেমন অসহ্য হয় তখন দেখা যাবে। কিছু ব্যথা থাকা ভাল বাবা বলতেন একটু ব্যথাট্যাথা হওয়া ভাল 'পারজু'। তা হলে বোঝা যায় শরীরটা আছে, ঠিক কিংবা বেঠিক।" বলে হা-হা করে বুক খোলা হাসি হাসতেন ডাঃ স্বর্ণকমল মজুমদার। পারিজাত আজকাল বাবাকে বড্ড অনুভব করে; যত বড় ডাক্তার তার চাইতেও বড় খোলা মনের মানুষ।

স্টুডিওর লাল আলোটা এক বারও কি নিভবে না। লাল রংটা নিভলেই ঢুকতে পারা যাবে। রাস্তা তৈরি। জীবনের রাস্তায় কত রং বদল হল। কোথা থেকে কোথায় রাস্তা বেঁকে গেছে। ঝলসে উঠল কৈশোরের স্মৃতি। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন ম্যাটিনি ও ইভনিং দুটো শোয়ে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরেছিল বাবার আদরের 'পারজু'। বাড়ি ঢুকতেই মা শিউলি দেবী খুন্তি নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন। থামিয়ে দিয়েছিলেন বাবা।

—আঁচলে হলুদ নিয়ে ছেলের গায়ে হাত দিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় যে। ছেড়ে দাও ওকে।

তারপর কোনও কথা না বলে সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলেকে ডেকে বললেন, "পারজু, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ তো বাপু বাবা হবে যে দিন, সে দিন বুঝবে। তবে হ্যাঁ, ভাল রেজাল্ট করতেই হবে এমন কোন কথা তোমায় দিতে হবে না। ভাল রেজাল্ট না করলেও চলবে। কিন্তু ভাল মানুষ হয়ো, আর মনের জানালাটা খোলা রেখো।"

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন মাস পরে মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরনোর আগেই একটা হার্ট-অ্যাটাক ডাঃ স্বর্ণকমলকে পৃথিবীর চেনা পরিমণ্ডল ছেড়ে বহু দূরে নিয়ে গেল। অসময়ে পিতৃহীন পারিজাতের শুধু মনে হল, সত্যিই তো, রেজাল্টের তথা ভাল রেজাল্টের প্রত্যাশা বাবা প্রকৃতপক্ষেই করেননি।

স্টুডিওয় বসে লাল আলো নেভার অপেক্ষা করতে করতে পারিজাত ভাবছিল, ভাল মানুষ কি সত্যিই হতে পেরেছে সে? ভাল মানুষের সংজ্ঞা কী? পারিজাত চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে ভাল মানুষ হবার। মা শিউলি দেবী বড় খুশি আজ পারিজাতের সাফল্যে। রাত্রে খাওয়ার টেবিলে সারা দিনের কর্ম বৃত্তান্তর হিসেবে দেয় মাকে। বছরে বারোটা থেকে পনেরোটা অনুষ্ঠান করে পারিজাত বিনা পারিশ্রমিকে, অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত অনুষ্ঠানের জন্য। আজকের পারিজাত পৌঁছে গেছে আমজনতার ঘরে ঘরে; টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ, ক্যাসেট সিডি'র দৌলতে পারিজাত মজুমদার একটি তারার নাম। সাফল্য ছুঁয়ে গেছে তার প্রশস্ত ফরসা ললাটে, ভারী সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখে, গোঁফের মার্জিত রেখায়, বসবার বিনম্র ভঙ্গিতে। বারবার কপালকে ব্যাতিব্যস্ত করা একরাশ চঞ্চল চুল থেকে হরিণের চামড়ার পাদুকার রুচিশীলতা পর্যন্ত পুরোটাই সাফল্যের মোড়কে বাঁধা। তবু গ্ল্যামার-সর্বস্ব হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে কারণ, এত চাকচিক্যের মধ্যেও ডাঃ স্বর্ণকমলের মতো মনটাকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে করে রাখতে চেষ্টা করে সে। নিজেই টেলিফোন ধরে, "হ্যাঁ বলুন, আমি পারিজাত বলছি।" বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, কখনও দূরভাষ কখনও একত্র জড়ো হওয়া। ইচ্ছেরা এখনও সজীব ওর কাছে। ইচ্ছে করে রঙিন চশমা পরে ভিড়ে মিশে যেতে, ইচ্ছে করে পুজোর সময় অনেক জামাকাপড় কিনে একটা অচেনা ফুটপাথ ভরিয়ে দিয়ে কয়েকটা অসহায় মুখে কিছুক্ষণের হাসি ফোটাতে। কী চেয়েছিলেন স্বর্ণকমল? তাঁর ইচ্ছেগুলো কি বাসা বেঁধেছে ছেলের স্বপ্নে, ছেলের যত্নে, ছেলের জীবনের স্বরলিপিতে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য স্টুডিওর লাল আলো নিভল। 'যাক অপেক্ষার শেষ' ভেবে পারিজাত ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় মোবাইলে ফোন, ভেসে উঠল ডালিয়ার নম্বার। পারিজাত ভাবল স্টুডিওর ভেতরে তো সিগন্যাল পাওয়া যায় না। একটু পরে ঢোকা যাবে। কিন্তু দু'বার বেজেই রিং বন্ধ। মিস্‌ড কল। ডালিয়া বোধহয় কেটে দিল লাইনটা। ওর এই এক স্বভাব, দু-তিন বার কল করে ছেড়ে দেয়। চিরদিন ও এ রকম করে, চির দিন।

মাঝখান থেকে স্টুডিওর লাল আলোটা আবার নুতন উদ্যামে জ্বলে গেল। তার মানে অপেক্ষা অথবা ধৈর্যের পরীক্ষা। আজ রেকর্ডিংয়ে ঢুকতে একটু দেরি হয়ে গেছে পারিজাতের। ভেতরে কলকাতার সবচেয়ে নামী অ্যারেঞ্জার তৃণকুসুম চ্যাটার্জি কাজ করছেন। যেমন গুণী তেমনই কড়া ধাতের মানুষ তিনি। আশা ভোঁসলে বা কিশোরকুমারের মতো কিংবদন্তী শিল্পীদের রেকর্ডিং থাকলেও তিনি একই রকমের কড়া। পারিজাতের মুশকিল আজ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃণকুসুমদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কাজ করতে পারে না। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তৃণদাকে বলা হয় 'মিউজিশিয়ান অব দ্য মিউজিশিয়ানস্'। সরোদটা বাজান অসাধারণ, একই সঙ্গে স্যাক্সোফোন-এ ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল যা বাজান, যে কোনও মিউজিশিয়ানকে চমকে দিতে পারে। আশ্চর্যের কথা এই, শুধু স্যাক্সোফোনটা বাজিয়েই পৃথিবী বিখ্যাত হতে পারতেন। কিন্তু ওই প্রচণ্ড মুড আর 'কারও কাছে মাথা নোয়াব না' এই জেদ তৃণদাকে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছতে দিল না।

আবার টিপটিপ করছে মাথাটা পারিজাতের। সকাল সকাল ভি আই পি রোডের জ্যামে ফেঁসে গিয়ে এত দেরি আর তার জন্য এই লাল আলোর চোখ রাঙানি। দেরির কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল,—আমি তো সব সময়ই 'লেট'। দেরি করে ফেলার জন্য জীবনে কত কিছুই 'মিস' হল। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, স্কুলে প্রেয়ার লাইনে হঠাৎ ঢুকে পড়া, টিচারের বকুনি, দুর্গাপুজোয় অষ্টমীর দিন তৃতীয় ও শেষ বারের অঞ্জলি দেওয়া হত না দেরির জন্য; জীবনে প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ হাত থেকে ফসকে গেল, কারণ লেট। দেরীর জন্য ডালিয়াও জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, গিয়েছিল কেন, গেছেই তো। তবু এখনও ফোন করে ডালিয়া। কুশল জানায়, মিস্‌ড কল দেয়। এস এম এস করে। কেন? কীসের আশা ডালিয়ার? সেই কলেজে পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ পারিজাতের। ডালিয়া তখন সংগীত ভবনের ছাত্রী। প্রথিতযশা রবীন্দ্রগানের শিল্পী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদরের 'ডালি'। হ্যাঁ পারিজাত প্রেমে পড়েছিল ডালিয়ার, কিন্তু প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পায়নি। সেই সময় পারিজাত ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি করতে করতে ক্ল্যাসিক্যাল গান শিখছে গুরু চম্পকলাল মিশ্রজির কাছে, আর রবীন্দ্রসংগীত এবং আধুনিক গান বিখ্যাত শিল্পী আকন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। না, পারিজাত ভেবে পাচ্ছিল না, কী ভাবে ডালিয়াকে জানাবে তার অনুভূতির উত্তাপ। সঙ্গে সঙ্গে জানতেও চাইত, ডালিয়াও কি তাকে কখনও...? ঝকঝকে ঋজু রুচিশীলা সুন্দরী ডালিয়ার মন অন্য কারও স্বপ্ন রচনা করে না তো? বোলপুরের রাঙা রাস্তায় এক দিন দেখা করেছিল ডালিয়ার সঙ্গে। সে দিন ছিল পঁচিশে বৈশাখের কয়েক দিন আগের একটা দিন। অনর্গল কথা বলেছিল ডালিয়া, "আসুন না গৌড় প্রাঙ্গণে, আমাদের অনুষ্ঠানে সামনের শনিবার।"

গিয়ে ছিল পারিজাত। কিন্তু ঘরে ফিরেছিল একরাশ কেমন করা মন নিয়ে। অনুষ্ঠানে ডালিয়া ওর সহপাঠী অশ্বত্থর সঙ্গে ডুয়েট গান গাইল—"আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে" এবং "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে..."। কী যেন না-বলা কথা লুকিয়েছিল ওদের নিবেদনে। একটা অদ্ভুত সন্দেহ দানা বাঁধছিল পারিজাতের মনে কিংবা হয়তো, অযাচিত অভিমান। তবে কি ওরা দু'জনে কোনও অজানা সম্পর্কের পথের পথিক? গান তো অনেক কিছু বলে। শরীর মনের ঊর্ধ্বে এক অন্য লোকের কথা। সেই কথা কি ডালিয়া অশ্বত্থকে নতুন কোনও পথের সন্ধান দিল?

সারারাত ছটফট করেছিল পারিজাত। একটা গান খুব গাইতে ইচ্ছে করছিল ওর। 'নিশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পোহাতে জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও, প্রিয়া, তোমার অনল দিয়া'। শেষ রাতে একটা তিন লাইনের চিঠি লিখল—'প্রিয় ডালিয়া, তুমি কেমন আছ? আমি ভাল নেই। কিন্তু ভাল থাকতে চাই, আর তোমায় ভাল রাখতে চাই। পারিজাত খুব একা'। অনেক কাগজ ছিঁড়েকুটে এইটুকুই লিখল সে। এক বার ভাবল চিঠিটা কি একটু বোকা বোকা হয়ে গেল, কিন্তু বেশ পুরুষালি। পুরুষদের ঈশ্বর বোকা করে রাখতেই ভালবেসেছেন বরাবর। চিঠিটা বুকপকেটে পুরে জালিয়ার অপেক্ষায় 'সুবর্ণরেখা' বইয়ের দোকানের উল্টো দিকে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ ডালিয়ার আবির্ভাব। কনে দেখা আলোয় উজ্জ্বল শ্যামাবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী ডালিয়া লাল বাটিকের শাড়িতে জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু সে একা ছিল না। সঙ্গে অশ্বত্থ এবং তার উপস্থিতির মধ্যে একটা অহংকারী অধিকার বোধ লক্ষ করল পারিজাত। অশ্বত্থর সঙ্গে সাইকেল ছিল। এসেই বলল দুটি কথা, "সে দিন গান কেমন লাগল?" এবং "আমি এ বার যাব।" তক্ষুনি চলে গেল সে। কিন্তু রেখে গেল ডালিয়ার সারা মুখমণ্ডলে, ঠোঁটে, চোখের তারায়, ঈষৎ অসহিষ্ণু গ্রীবায় অশ্বত্থের অহংকারী উপস্থিতি। ডালিয়াই নীরবতা ভাঙল, "কী খবর" পারিজাত নিরুত্তর। আবার বলল ডালিয়া, "কিছুই কি বলার নেই"? এই বার পারিজাত বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করল শুধু। আচ্ছা, মেয়েরা কি সবজান্তা হয়? ডালিয়া বলল, "থাক, আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন। একেবারে চব্বিশ ঘন্টা লেট আপনার গাড়ি।" তখনও নিথর পারিজাত। "কী বুঝছেন? গত কাল থেকে আমরা মানে আমি আর অশ্বত্থ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অশ্বত্থ কয়েক দিন আগে আমাকে একটা প্রেমপত্র দিয়েছিল। আমি ঠিক প্রেমে বিশ্বাসী নই। আমরা সামাজিক ভাবে একসঙ্গে থাকব মানে বিয়ে করব।"

AMARBOI.COM

পারিজাতের মনে পড়ে গেল বাবার সেই কথা—ভাল রেজাল্ট করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই...শুধু মনের জানালাটা খোলা রেখো। এক মুহূর্তে নিজেকে ঠিক করে নিল। গত সপ্তাহে আকন্দদা একটা গান শিখিয়েছেন—'সহজ হবি সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি, কাছের জিনিস দূরে রাখে, তার থেকে তুই দূরে রবি।' থ্যাঙ্কয়ু আকন্দদা—মনে মনে বলল, আর একেবারে আকর্ণ বিস্তৃত হেসে একটু সময় নিল। অনেকেই বলে এ রকম হাসলে ওকে অনেকটা উত্তমকুমারের মতো দেখায়। 'কনগ্রাচুলেশন' হাত বাড়াল সে। কিন্তু ডালিয়া তার হাত বাড়াল না। যেন বলতে চাইল, কিছুই যখন দিতে পারব না তখন এটুকুও নাই বা দিলাম।

তার পর কেটে গেছে কতগুলো বছর, দিন রাতের নাগরদোলা, বয়স্ক করেছে মনকে, শরীরকে। ডালিয়ার বিয়ের পরও বেশ কয়েক বার দেখা হয়েছে।পারিজাত মজুমদার ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে শুধু কলকাতায় নয়। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই এবং বিদেশেও, আমন্ত্রণরা উড়ে আসে। খ্যাতির চূড়ায় বসার পর এক বার রবীন্দ্রসদনে তার একক অনুষ্ঠানে ডালিয়া এল, একা। পরনে ধূসর রঙের একটা কাঁথা কাজের সিল্ক শাড়ি। ছোট্ট মুক্তোর দুলে ঘেরা মুখটা একটু করুণ দেখাচ্ছিল। কিন্তু অপূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল পারিজাতের। দুঃখ মানুষকে মহৎ করে, আরও সুন্দর করে। কিন্তু কীসের দুঃখ ডালিয়ার? বুঝতে চেষ্টা করল পারিজাত। নাঃ, বেশি ভাবব না। নিজেকে শাসন করল সদাসংযত পারিজাত। আমাদের জীবনে চলে গেছে কুড়ি কুড়ি বছর আগে। পার করে এসেছি আবেগকে, অনেক দিল হল। আজ আর এসব ভাবনা না, এ সব দৃষ্টির কী মূল্য আছে? ক্ষণেকে সামলে নিল পারিজাত। মিঠে ভদ্রতার মুখোশটা পরে নিল চটজলদি। বলল, "তোমরা কেমন আছ? কী করছ?"

চিরকালের সহজ সাবলীল ডালিয়ার উত্তর, "আমি এখন একা থাকি। অশ্বত্থ আবার বিয়ে করেছে। কী জান? অশ্বত্থর মতো ছেলেরা অকপট মেয়েদের ভয় পায়। সেই ভয়টাই কাল হল। ওর বন্ধুর বোন, বোকাসোকা একটি আবেগহীন মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। আমি উদ্‌যোগ করে বিয়েটা দিয়ে দিলাম। ভাল করিনি?" পারিজাত মুখে কিছু বলল না। শুনল। আর মনে মনে বলল, আমি তোমার অকপট রূপটাকেই সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু সেই একটু দেরিই হয়ে গেল। এ বার মুখে বলল, "তা হলে এ বার গানের চর্চাটা আবার শুরু করে দাও। দেখবে নিজেকে নতুন করে চিনছ, জানছ। মনে শান্তি পাবে, দেখো...।" ডালিয়ার চটজলদি জবাব, "কিছু মনে করো না, আমার স্বামী এমন কিছু মহৎ ছিল না যে তার পরিবর্ত গান হতে পারে। গান আমার ভেতরে ছিল, আছে, থাকবেও। চলি।" পারিজাত চুপ করে দেখল ডালিয়ার চলে যাওয়া। আর মনে মনে ভাবল—বন্ধু, এ বারের মতো বসন্ত শুভ জীবনে।

ঘড়ি দেখল পারিজাত। ঠায় চল্লিশ মিনিট বসে আছে বাইরে। এক বারের জন্য লাল আলো নিভে আবার জ্বলে আছে। স্টুডিওর স্টাফ জবা বার দুয়েক র'চা দিয়ে গেছে। কিন্তু মাথাধরাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। সঙ্গের সাদাকালো বাটিকের শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে স্বরলিপি বার করল সে। সত্যি, রবীন্দ্রনাথ কখন এত গান লিখলেন কে জানে। কী ভাবে এত শোক, এত যন্ত্রণা, এত আঘাত; অন্তর থেকে বার করে অন্তরীক্ষে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনী ঝোলার থেকে বেরিয়ে আসা একটা সুতো পারিজাতের ডান হাতের হিরের আংটির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, এ ঝোলাটা পৌষমেলা থেকে কিনে দিয়েছিল ডালিয়া। এত পুরনো অথচ এত প্রিয় ঝোলাটা। সুতো আর আংটির জড়িয়ে পড়া যেন ডালিয়ার স্মৃতি তুলে ধরল। কোনও সম্পর্ক না থাকার একটা আশ্চর্য সম্পর্ক রেখে গেছে ও। একটা অদ্ভুত মায়া ওর মধ্যে...। অনেকে বলে, মানুষ নাকি আবার জন্মায়। পরের জন্মে যেন আবার তোমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কনে দেখা আলোয় দেখা হয় ডালি—তোমার সঙ্গে, কিন্তু অবশ্যই অশ্বত্থর সঙ্গে দেখা হবার আগে...। হেসে উঠল পারিজাত ভাবতে ভাবতে। অবশ্যই তো বাঁচিয়ে রাখে স্বপ্ন। স্বপ্ন বাঁচুক। কাঁদুক।

এ বার স্টুডিওর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তৃণকুসুমদা। "নাঃ, একটু ধূমপান না করলে চলছে না। সরি পারিজাত, আর এই পাঁচ সাত মিনিট। একটা বাঁশি আর ভায়োলিন নেব, তার পরই তোমায় ডাকছি। তোমার বোধহয় বাইরে থাকাই ভাল। কাঞ্চন ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাপমাত্রা এত কমিয়েছে মনে হচ্ছে, এ বার বরফ পড়বে। বাইরেই বসো। আমি ডেকে নেব। দারুণ একটা টি-শার্ট পরেছে তৃণদা। পারিজাত বলল, "দাদা তুমি তো আজ দক্ষিণী ছবির হিরো হয়ে আছ। আমার মাথাটা একটু ধরে আছে। জানি না কী গলা বেরোবে।" তৃণদার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিটা যে কোনও শিল্পীকে নব্বই ভাগ এগিয়ে দেয় সব সময়। সেই চেনা ভঙ্গী, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো আছি। খুব ভাল হবে। কনসেনট্রেট করো।"

এ বার পারিজাত কনসেনট্রেট করবে বলে মোবাইল ফোনের গেমস-এ চলে গেল। খেলতে খেলতে ভাবছিল, আমাদের জীবনটাও তো মোবাইলেরই মতো। অন্য কেউ আমাদের নিয়ে খেলে। আচ্ছা ডালিয়াও কি খেলে? গেমস খেলে? মোবাইল নিয়ে খেলা করে? তুমি খুব ভাল থেকো ডালিয়া, খুব ভাল থেকো, আনন্দে থেকো।

এ বার পারিজাতের ফোন বাজছে। কার ফোন? অচেনা নম্বর। রেকর্ডিং-এর আগে ধরব? ভাবতে ভাবতেই 'হ্যালো', ফোনটা ধরল পারিজাত। 'কে অপু?' পারিজাত গিন্নীর ফোন। "হাই অপরাজিতা, এটা কার নাম্বার? তোমার নিজের মোবাইল কোথায়? কোত্থেকে বলছ? তোমার কি শরীর খারাপ? কী বলছ? চলে যাচ্ছ? চলে যাচ্ছ মানে? কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাবে? আজ সকালেও কিছু বললে না। ব্রেকফাস্ট টেবিলেও তো কোনও কথাই বললে না তুমি। কার সঙ্গে? পাতাবাহার রায়? তোমার কলিগ পাতাবাহারের সঙ্গে যাচ্ছ? এর মানে কী? এক্ষুনি আমি রেকর্ডিংএ ঢুকব অপু। কী হচ্ছে এ সব? আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি মিসেস অপরাজিতা মজুমদার, হ্যাঁ তুমি তো তাই। আমার সঙ্গে থাকবে না তুমি? তা হলে কোথায় থাকবে? কিন্তু এ কথা তো বলনি কখনও? ভালবাসো ওকে? প্রকাশ করনি কেন? আমার সঙ্গে এক বার অন্তত কথা বলতে পারতে। আমার অযোগ্যতার বারমাস্যাটা তোমার মুখ থেকে শুনতাম। কী করব? আমি তো সবার মতো নই অপু। এক জন শিল্পী সবার মতো হয় না। তাদের সব কিছুই একটু অন্য জাতের হয়। তাদের বোধ, ভাললাগা সবার সঙ্গে মেলে না। সৃষ্টির আনন্দে থাকা তারা, তাই হয়তো সংসারে কাছের মানুষকে হিসেব মতো মাপতে পারে না। নিজেকেও ঠিক দেখাতে পারে না। কিন্তু অপু আমি তো ভাবতাম তুমি আমায় বোঝ? অন্তত চেষ্টা কর। ও, অসাধারণ হওয়া তা হলে তোমার চোখে অপরাধ। না, ভুল আমি মর্যাদা দিতে চেয়েছি তোমায়, বরাবর। মানুষ তো আমি। ত্রুটি তো থাকতেই পারে আমার। সুর কেটে গেছে? কী করে জানলে পাতাবাহার তোমার সব দেবে যা আমি দিতে পারিনি তোমায়? কী? গান ছাড়া সংসারে আমার কোন ভূমিকাই নেই? তুমি সব অস্বীকার করছ? সব ভুলে গেছ? আমি তোমায় কিছুই দিতে পারিনি? কেন, আমরা কি বন্ধু ছিলাম না? কিন্তু আমরা তো দু'জন পরিচিত মানুষ অপু। একটা কুকুর-বেড়াল বাড়িতে দু'দিন থাকলে তার ওপরেও মায়া পড়ে যায়, আর, আর আমরা দু-দুটো মানুষ এক ছাদের তলায় পনেরো বছরেও মায়া পড়ল না? বেশ তো তুমি অন্য ঘরে থেকো। তোমার মতো করে জীবনযাপন কোরো, আমি কিচ্ছু বলব না। শুধু এ ভাবে চলে যেও না। কী বলছ তুমি, যাবেই? তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলা নামাও অপরাজিতা। আস্তে কথা বলো, এ ভাবে যেতে পারো না তুমি। আমি কোর্টে যাব। দেখব কী করে তোমার পাতাবাহার রায়। কী? কী? ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিলাম। নিলাম ফিরিয়ে। কোনও ভয় নেই। প্লিজ আমাকে সুইসাইডের ভয় দেখিও না। যাও যেখানে খুশি। ভাল থেকো, খুশি থেকো। তুমি বাঁচতে চেয়েছ, ভাল ভাবে বাঁচো।

ফোনটা কেটে গেছে পারিজাতের। ফোনেরাও ঠিক মানুষের সম্পর্কের মতো, আয়ুর মতো, তারা ঠিক সময়ে কেটে যায়, ফুরিয়ে যায়। পারিজাত শার্টের কলার কাছের দুটো বোতাম খুলে দিল। খুব গরম লাগছে। অনেক বেড়ে গেল মাথার যন্ত্রণাটা। বাথরুমে গিয়ে একটু বমি করে নিলে বোধহয় একটু আরাম হত।

স্টুডিওর দরজার মাথার লাল আলোটা আর জ্বলছে না। তৃণকুসুমদা হই হই করে বেরিয়ে এলেন। "কী রে জবা, এ বারের চা-টা একটু ভাল করে কর মা। আর, তোর পারিজাতদাকে জমিয়ে এক কাপ করে দে। এসো পারিজাত, নোটেশনটা বার করো। প্রিল্যুড ইন্টারল্যুড মিউজিকগুলো শুনে নাও। গানের শেষ স্তবকটা একটু দরদ দিয়ে, যত্ন দিয়ে গেয়ো। কাঞ্চন, তোমার দাদার ডাবিং মাইকটা লাগাও, দাঁড়িয়ে নয়, পারিজাত বসে গাইবে।

পারিজাত অবসন্ন হাত দুটো নিয়ে ডালিয়ার দেওয়া শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে বইটা বার করে গানের শেষ স্তবকের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। সবাই বলে রবীন্দ্রনাথ সব মুহূর্তের জন্য গান বেঁধেছেন। তাই তিনি সেরা কমপোজার। পারিজাতের চোখ আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে চাইল। চোখ আর লেখা পড়তে চাইল না। মনে মনে গুন গুন করে উঠল পারিজাত তার গানের শেষ স্তবকটি...

"বসন্তের শেষ রাতে. এসেছি যে শূন্য হাতে,, এ বার গাঁথিনি মালা, কি, তোমারে করি দান, কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি, তোমার নয়নে ভাসে ছলো ছলো অভিমান। কখন যে বসন্ত গেল, এ বার হল না গান।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নাম

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত

ছোট্ট মেয়েটি কোনও দিন কারও চোখের দিকে তাকায়নি। এইটাই তো মেয়ের একমাত্র রোগ ছিল। এ রোগ কেমন করে সারবে? আসলে সে অন্যমনস্ক থাকত। এ কথাটাই কেউ বোঝেনি কোনও দিন। তার মন পড়ে থাকত কোথায় কে জানে! বিস্ফারিত চোখে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু ভাবত কী ভাবত না, কে জানে! ছোটদের মনে নাগাল পাওয়া কি অত সোজা? তখন মেয়ের বয়সটাই বা কত কে জানে—আট না বারো না পনেরো?

মেয়ে শুধু অন্যমনস্ক নয়, ছিল ভিতুও। মায়ের চোখের দিকে তাকালে ভয় করত তার। মায়ের রুদ্র রূপের ভ্রূকুটি দেখে সে ভয় পেয়েছে কত বার। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে না পারলে চড়-থাপ্পড়! মা বলে, "এই। অতেইনাকেই ভয় কি আমররর ওরেররর—এ রকম করে বলছিস কেন রে? ইংরেজ নাকি তুই? বাংলা জানিস না? ঠিক করে গা," বলেই এক গাঁট্টা। স্কুলের পড়া না বলতে পারলে সুরু ছড়ির দু'এক ঘা। পড়া না করতে পারলে দোষ কি তার? স্কুলের টিচাররা পড়া মুখস্থ চায়। হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি—চ্যাপ্টারের পর চ্যাপ্টার মুখস্থ বলতে হবে, এক একটা প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ বিদ্যাটাই ছিল তাদের কাছে আসল শিক্ষা। অত মুখস্থ করা যায়? তাই মার খেতে হত বেচারিকে। সরু ছড়ির দু'এক ঘা! এক বার মেয়ে নামতা মুখস্থ বলতে পারেনি, তাই তার হাত পা জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে সেই সরু ছড়ির প্রহার পেতে হয়েছে পিঠে। পরে অবিশ্যি তার মা পিঠে মলম মাখিয়ে দিয়েছে।

মেয়ের বাবা ছিল নির্বিকার প্রকৃতির মানুষ। গল্প লিখতে ভালবাসত। মেয়েকে নিয়ে ঝুটঝামেলায় বিশেষ জড়াতে চাইত না। পারতও না বেচারি। মায়ের দাপটেই সংসার তাজা থাকত। বাবার রোজগার কম ছিল। অত কম রোজগারে কী করে সংসার চালাত সেটাই রহস্য। বোধহয় বাঁচবার সাধ ছিল ষোলো আনা। আর ওই রোজগারেই কিন্তু ভাত ডাল দিত গরম গরম। সে ডালের কী স্বাদ। বাবা 'আঃ' বলে খুশি হয়ে খেতে অফিস চলে যেত। বাবাকে ঠিক 'নির্বিকার' বলাটা বোধহয় ভুল হবে, কারণ মেয়ে এক বার এক অপরাধ করেছিল—পাশের বাড়ির আমের ডালা থেকে আম চুরি করে খেয়েছিল। মা তাকে অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে সারা দুপুর বন্ধ করে রেখেছিল। একটু পরে বাবা কোমর করে সেই ভাঁড়ার

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

ঘরের ভাঙা জানলা আর একটু আলগা করে দিয়ে মেয়েকে চুপি চুপি দশ পয়সার আইসক্রিম খাইয়েছিল। তার পর সেই জানলা দিয়ে এক এক করে ঢুকেছিল 'রামদানা লইয়া', 'গঠিয়া' আর 'ললিপপ'—সব দশ দশ পয়সার। কী সুন্দর সবুজ রং ছিল সেই ললিপপের।

বাবা মাঝে মাঝে বলত, "এত ভিতু কেন রে তুই? রোজ এক গেলাস করে জল খাবি সকালবেলা খালি পেটে আর ভয়কে বলবি, যাঃ পালা! আমি টিপু সুলতান, মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছি।" ধ্যাৎ, তাই কি হয়? অমন বললেই কি আর ভয় পালায়?

মেয়েটি কিন্তু আসলে ভিতু ছিল না। তার এক বন্ধু ছিল, নাম খুন্নিবুড়ি। কী বিকট তার চেহারা। উস্কোখুস্কো চুল, শনের মতো, কালো মুখ, সাদা সাদা দাঁত আর পা দুটো ছিল উল্‌টো দিকে। এমন ভূতের মতো চেহারা কিন্তু একা মেয়েই দেখতে পেত। আর কেউ পেত না। মায়ের ভয় করত। 'এই অন্ধকারে কার সঙ্গে কথা বলছিস রে?" মেয়ে বলত, "ও তো খুন্নিবুড়ি, রোজ আমার সঙ্গে গল্প করে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। খুন্নি আছে, তুমি ভয় পেও না।" মা চিন্তিত হয়ে চলে যেত। মাঝে মাঝে 'রাম রাম'-ও বলত।

কিন্তু খুন্নিবুড়ি থাকলে মেয়ে অন্ধকারকে মোটেই ভয় পেত না। চোখে চোখ মিলিয়ে কত কথা বলত।

মেয়ের আর খুন্নিবুড়ির এক অদ্ভুত জগৎ ছিল। যেখানে আর কেউ যেতেই পারত না। তারা দু'জনে মিলে মাঝে মাঝে এক জঙ্গলে চলে যেত, গাছের পাতা খেয়ে থাকত। সেই জঙ্গলে কাঠকুটো আর পাতা দিয়ে ঘর বানিয়েছিল তারা। সেখানে খুন্নিবুড়ির এক দিদিও আসত, নাম বনবুড়ি। মেয়ে বনবুড়িকে খুব শাসন করত। লেখাপড়া শেখাত।

খুন্নিবুড়ির তো ছেঁড়া শাড়িতে চলে যেত। আর মেয়ের জামা মিলত, বছরে একটাই। তাও এক এক বছর নতুন জামার বদলে স্কুল ইউনিফর্ম হবে কি না তাই নিয়ে মেয়ে একটু চিন্তিত থাকত।—"খুন্নি, এ বছর বোধহয় পুজোর নতুন জামা হল না রে।" খুন্নি বলত "তুই আঁমার ছেঁড়া শাঁড়ীটা নিবি? মেয়ে নিজেই খুন্নির গলা নকল করে বলত। তারপর নিজেরই গায়ে এক চিমটি।

খুন্নি, তোর শাড়ি পরে আমি ঠাকুর দেখতে যাব?" মা আড়াল থেকে দেখত, শুনত আর ভাবত, মেয়েটা কি সত্যি কিছু দ্যাখে?

মেয়ে খুন্নিবুড়িকে যতই দুঃখ-কষ্টের কথা বলুক না কেন, মা-বাবাকে কিন্তু বলত না কিছুই। কিছু চাইতও না। এখনকার বাচ্চারা মা-বাবাদের কাছে কত কিছু চায়, কত কিছু পেয়ে যায়। কিন্তু সেই মেয়ে তার মা-বাবার কাছে কোনও দিন কিছু চায়নি—একটা পুতুলও না। বাঃ! চাইলেই কি তারা এনে দিতে পারত? টাকা লাগে না? টাকা কোথায়? নতুন জামা বা স্কুলের টিউনিক দর্জিকে দিয়ে সেলাই করবার ক্ষমতা ছিল না তাদের। মা একটা পুরনো নড়বড়ে সেলাইকলে নিজেই সেলাই করে দিত ওসব। মেয়ে সেই সেলাই করা জামা পরে, ভারী খুশি হয়ে, দৌড়ে গিয়ে খুন্নিবুড়িকে দেখাত। "খুন্নি, নতুন জামাটা কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে রে?—তুই না বড্ড বাজে কথা বলিস, কোথায় ঝুল বড় দেখলি? হাতায় কী সুন্দর ফ্রিল দিয়েছে মা। তুই পারিস এ রকম ফ্রিল দিয়ে জামা করতে?" চলল বচসা খুন্নির সঙ্গে, মান অভিমান, শাসন, আড়ি আর ভাব করা।

ওদের যতই অভাব থাকুক না কেন বাবা কিন্তু মেয়েকে মাসের গোড়ায় দুটি করে টাকা দিত। অনেক কষ্টে, তার প্রায় শূন্য পকেট থেকে বেরোত সেই টাকা। তা থেকে একটি করে টাকা একটা খালি পাউডারের কৌটোতে সে জমাত আর একটা টাকা দিয়ে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সার আইসক্রিম, হজমি, চকলেট সে নিজে খেত আর খাওয়াত—না খুন্নিবুড়িকে নয়, খুন্নি তো পাতা খেয়ে থাকত—এক শীর্ণকায়, ছেঁড়া জামা পরা রিকশাওয়ালাকে।

মেয়ে বুঝত না, সে কেন রোজ ওই রিকশাওয়ালার কাছে এক গাল হাসি নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যায়। তার গায়ে কী গন্ধ! বাঃ, গন্ধ তো হবেই! তার যে বাড়ি ছিল না, মা ছিল না, বাবা ছিল না। কে তাকে গায়ে মাখার সাবান কিনে দেবে? তার কিচ্ছু ছিল না। শুধু ছিল দুটো চোখ, যা দিয়ে ঠিকরে ঠিকরে হাসি ঝরে পড়ত, যখনই সে মেয়ের দিকে তাকাত। রিকশাওয়ালার নাম ছিল ভুল্‌ওয়া। নামের মতোই ভুলো মন ছিল তার। স্কুলে নিয়ে যেত মেয়েকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে একটা পার্কে চলে যেত।পার্কে দোলনা, সি-স আর স্লাইড ছিল, আর ছিল অনেক ফুল—গোলাপ, প্যাঞ্জি, গাঁদা, কুস্যানথিমাম। মেয়েকে দোলনায় বসাত ভুল্‌ওয়া। তারপর কত গল্প করত তারা। খুন্নির কথা একমাত্র ভুল্‌ওয়া-ই বুঝত, আর কেউ বুঝত না। "হ্যাঁ, ভুল্‌ওয়া দিদি, তহার খুন্নিবুড়ি বহুৎ অচ্ছি হ্যয়। পরি জ্যসি হ্যয় না" মেয়ে এই কথা শুনে খুব হাসত। "নাহি ভুল্‌ওয়া, খুন্নিবুড়ি কালি হ্যয়, লম্বে লম্বে বাল হ্যয়, মুহ টেঢ়া হ্যয়। বিলকুল পরি জ্যসি নহি হ্যয়। লেকিন বহুৎ অচ্ছি হ্যয়।" ভুল্‌ওয়া বুঝতে না পারলেও ঘাড় নেড়ে বলত, "হাঁ, হাঁ বহুৎ অচ্ছি হ্যয়, তোকা পয়ার করত হাঁয় না?"

ভুল্‌ওয়াকেও শাসন করতে মেয়ে। বইখাতা বের করে পড়া শেখাত। ভুল্‌ওয়া খ্যাক খ্যাক করে হাসত। মেয়ে বলে, "বোলো এ বি সি, বোলো।" ভুল্‌ওয়া বলে, 'এ বি ছি'। মেয়ে বলে, 'ছি নহি, সি'। ভুল্‌ওয়া বলে, "আরে দিদি, হমসে ছি উ বোলে ন বনি।" তার পর মেয়ে তার টিফিন বের করে অর্ধেক ভুল্‌ওয়াকে খাওয়ায় আর অর্ধেক নিজে খায়। ভুল্‌ওয়া বলে, "দিদি, আসমান মে উও জো উড়ৎ হ্যয়, উও চিড়িয়া হ্যয়কা মেয়ে বলে ধ্যাৎ ভুল্‌ওয়া! তুম কুছ নহি জান্তে। উও ত হওয়াই জহাজ হ্যয়। উসমে আদমি ব্যঠা হ্যয়।" তখন ভুল্‌ওয়া চোখ গোল গোল করে বলে, "আরে দিদি, আদমি কো ডর নহি লাগত হ্যয় কা?" মেয়ে খিল খিল করে হাসে।

কিন্তু রাত হলে মেয়ে ভয়ের কথা ভাবে। আচ্ছা, অত উঁচুতে গেলে ভয় করে না? পাখিরা কি ভয় পায়? মেয়ের বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। রাতে সে স্বপ্ন দেখে—তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা নেই, বাবা নেই।

পরদিন সকালে মা দেখল মেয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। মা জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে রে তোর? কাঁদতে বসলি কেন সকালবেলা? পেট ব্যথা করছে?" মেয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে 'না' বলল, আর কিছুই বলতে পারল না। ওটাই তো ওর রোগ, ভাল করে বুঝিয়ে কিচ্ছু বলতে পারে না। বাবা এসে বলল, "আহা, ওর শরীরটা বোধহয় খারাপ। আজ ওকে স্কুলে নাই বা পাঠালে।" মা মুখ ভেংচে মেয়েকে বলল, "ওরে আমার ছিঁচকাঁদুনি নেচে নেচে আয়, দুল দেব, বালা দেব, সোনার নূপুর পায়," বলেই মাথায় চটাং করে দিল এক চাটি। মেয়ে আড় চোখে মায়ের দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। মা বলল, "যাঃ, তোর আজ ছুটি।—ওহ! হাসি দেখ মেয়ের। ওমনি পেটের ব্যথা সেরে গেল না? যাঃ দূর হ।"

মেয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল ভুল্‌ওয়ার কাছে। ভুল্‌ওয়া তখন তার ঝুপড়িতে বসে ঢুলছিল। মেয়েকে দেখেই সে সজাগ হয়ে গেল, "আরে দিদি, ইস্কুল নহি হ্যয় কা?" মেয়ে বলল, "নহি। অচ্ছা ভুল্‌ওয়া, মেরে মা-বাবা মর্ যায়েঙ্গে কয়া?" ভুল্‌ওয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আরে নহি দিদি নহি, কব্‌ভি নহি মরেংগে।" মেয়ে নিশ্চিন্ত হল। হাতেই গলে যাওয়া চকলেটের অর্ধেকটা সে ভুল্‌ওয়াকে দিয়েছিল। ভুল্‌ওয়া চেটে চেটে চকলেট খেয়েছিল।

মেয়ের জীবনে 'স্কুল' নামের যে জায়গাটা ছিল সেখানে সাদা 'রোব' পরা 'মাদার'রা ঘুরে বেড়াত। ইংরেজ মাদার, জর্মন মাদার, হোমড়াই-চোমড়াই মাদারদের গর্জনে যেন পৃথিবী কাঁপত। স্কুল 'করিডরে' এক ফোঁটা কালি ফেলেছে কী মরেছ। সারা দিন একটা পাথর আর জল দিয়ে ঘষে ঘষে কালির দাগ তুলতে হত যতক্ষণ না মেঝে চকচক করে। অনেক নির্লজ্জ মেয়ে ছিল যারা পড়ায় ফাঁকি দেবে বলে ইচ্ছে করে কালি ফেলে দিত। কিন্তু এই মেয়ে যে ভিতু আর লাজুক। বলাই বাহুল্য, মেয়ের হাত থেকে প্রায়ই সব কিছু পড়ে যেত। বই-খাতা, পেন্সিল কলমের কালি। ওমনি মাদার 'সান্টাক্লস্' এসে মেয়ের গলায় একটা 'বোর্ড' ঝুলিয়ে দিত, তাতে লেখা, 'আই অ্যাম আ ক্লামজি ফুল'। তার পর এক ঘন্টা ধরে ছোট ছোট হাত দিয়ে পাথর ঘষা, মেঝে পরিষ্কার করা, আর সবচেয়ে লজ্জা, একদল দস্যি মেয়ের হাসির খোরাক হওয়া।

সান্টাক্লসের আসল নাম ছিল 'স্টানিস্‌লস'। কিন্তু তাকে সবাই কেন সান্টাক্লস্ বলে ডাকত সেটাই রহস্যের। সে মোটেই সান্টাক্লসের মতো গোলগাল, হাসিখুশি ছিল না। শুকনো কাঠের মতো রোগা আর খুব লম্বা ছিল সান্টা। মেয়েদের দেখলেই তার মুখ ভেটকে যেত। 'গুড মর্নিং মাদার' বললে কোনও উত্তর দিত না। 'নেচার স্টাডি'র নাম করে মেয়েদের দিয়ে মাটি কোপাত আর কথায় কথায় শাস্তি দিত। মেয়ের কাছে সান্টা ছিল 'যমরাজ'। ভুলেও তার মুখের দিকে তাকাত না কোনও দিন।

স্কুলে দু'এক জন বড় ছিল মেয়ের। কিন্তু একদল দস্যি মেয়ের একটা গুণ্ডাবাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, যারা দুর্বল কাউকে পেলেই ধেয়ে আসত তার দিকে। সব জায়গাতেই তো এ রকম থাকে, তাই না? তা মেয়ের যা দু'এক জন বন্ধু, মেয়ের বিপদের সময় তারাও কিন্তু সেই গুণ্ডা-বাহিনীতে যোগ দিত। বাঃ, ওদের ভয় করত না? গুণ্ডাদের কথা না শুনলে যদি তারা মারে? তাই মেয়ের কাছে বন্ধু থাকাও যা, না থাকাও তাই। আর মেয়ের যে দোষ একটাই—সে অন্যমনস্ক। গুণ্ডারা ভাবত মেয়ে খুব ভিতু নেড়ি কুকুরের মতো। মেয়েকে মজা দেখাবার জন্য ফন্দি আঁটত তারা। একটা 'লিডর' গোছের হুমদো মুখওয়ালা মেয়ে, নিজের মুখটা মেয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলত, "এই! দেখ মেরি আঁখোঁ মে, নহি তো কম্পস্ ভোঁক দুংগি" সকলের কী হাসি। কিন্তু মেয়ের দোষ সে কিছুতেই চোখেই দিকে তাকাবে না। মেয়ে এক জন মাদারকে খুব ভালবাসত—'মাদার এলিজাবেথ'। তার ছিল মিষ্টি হাসি আর একটা সুন্দর বাঁশি। কী মধুর সুর বেরোত সেই বাঁশি দিয়ে। 'বিঠোভেন', 'শপাঁ' বাজাতেন মাদার এলিজাবেথ। মেয়ে এক বার লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বাঁশির গায়ে হাত বুলিয়েছিল। সেই বাঁশিতে ঠোঁট দিয়ে ফুঁ দেবে, এই তার সাধ।

তার পর মেয়ের বড় হতে হতে হঠাৎ ভুল্‌ওয়া গেল হারিয়ে। এক দিন সে এল না। মেয়ে তাকে কত খুঁজল কত কাঁদল। বাবাও খুঁজতে গেল, কিন্তু পেল না। তার নামই কেউ শোনেনি কোনও দিন। আর মেয়ের জীবন থেকে ক্রমে ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল খুন্নিবুড়ির মুখ। মা আর ভয় পায় না, বাবা মাকে বুঝিয়েছিল, 'ইট ওয়জ জাস্ট আ ফিগমেন্ট অফ হার ইম্যাজিনেশন।"

মেয়ে কিন্তু খুন্নিকে ভোলেনি, ভুল্‌ওয়াকেও না।

মেয়ে স্কুল ফাইনালে অমন নম্বর পেয়েছিল কী করে সে নিজেও বোঝেনি। 'ফাইভ পয়েন্টস', 'স্টার মার্কস'। বোধহয় ভুল্‌ওয়ার জন্য। "দিদি, মন লাগায়কে পড়ো, সবেরে জলদি জলদি উঠো, হাঁ? স্কুল পহুঁচায় দেবে। তুহার খাতির চক্‌লেট লাউবে।" মেয়ে বলল, "জরুর লানা, ভুল না নহি।"

"হাঁ হাঁ দিদি, জরুর লাউবে, "আশ্বাস দিয়েছিল ভুল্‌ওয়া।

মেয়ে বড় হচ্ছে, তা মা-বাবা বাদ্যি বাজিয়ে তার জন্যে রাজপুত্র আনতে চায়। মেয়ে বুঝল তার জায়গা বদলের সময় হয়েছে। সেই রাতে সে স্বপ্ন দেখল, কে যেন অন্ধকার থেকে ছুটে আসছে। কী সুন্দর তার মুখ। হঠাৎ সে একটা পরিকে কোথা থেকে তুলে নিল। পরি হাসছে কিন্তু তার ডানা ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ দুটো ডানাই খসে পড়ল, পরির মুখ আর দেখা গেল না। শোনা গেল দূর থেকে কান্না ভেসে আসছে আর এক বাঁশির সুরে আকাশ-বাতাস ভরে যাচ্ছে।

কী করুণ সেই বাঁশির সুর, কী তীব্র। কান যেন ফেটে যায়। কান্নার আওয়াজ বাড়তে থাকে। কে কাঁদছে? মেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। শরীর থরথর করে কাঁপছে। বাঁশির সুর যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে। মেয়ে দেখল তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবে, সে কেন স্বপ্ন দেখল?—কিন্তু সে তো আর এক গল্প।

এই বার গল্পের শেষ। মেয়ে একদিন বাবার ঘুরে ঢুকে বই ঘাঁটছে, হঠাৎ সে দেখতে পেল তাকে এক কোণে একটা বাঁশি রাখা আছে। মেয়ে বাঁশিটা নিয়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ বাঁশিটা...'? বাবা বলল, "এ হে হে! ভুল্‌ওয়া তোর জন্য মেলা থেকে এনেছিল, আমি ভুলেই গেছি দিতে।"

মেয়ে আনন্দে পাগল হয়ে গেল। তার দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সে স্বতন্ত্র। এত ভালবাসা যাকে ঘিরে থাকে সে তো স্বতন্ত্রই! মেয়ে বুঝতে পারল মাদার সান্টাক্লস, গুণ্ডা বাহিনীর কষ্টে থাকে তো, তাই কষ্ট দেয়। কিন্তু সে কাউকে কষ্ট দেবে না। কারও চোখ এড়িয়ে যাবে না। তার হাতে রয়েছে তার জাদুকাঠি—তার স্বপ্নের বাঁশি।

গল্প শেষ। এত ক্ষণ মেয়ের নাম বলা হয়নি। এ তো তোমার আমার গল্প। তাই মেয়ের নাম—তোমারই নাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মজিজ্ঞাসায় রক্তের ঘ্রাণ

সুব্রত রাহা

সুদেব মাঝে মাঝেই ভাবে জীবনটা আপোস করতে করতে অন্যের পা-মোছা পাপোষ হয়ে গেল। এখন কোনও কিছুই মনে হয় না ঠিক হচ্ছে। শুধু নিজেদের নিরাপদ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সুবিধাজনক অস্তিত্ব ঠিক থাকলে যে কোনও অনৈতিক কাজও মেনে নিতে হয়। না মানলে বোধহয় অস্তিত্বের পায়ের তলার মাটিতে ফাটল ধরে। যাদের সঙ্গে এতদিন এক ছাতার তলায় আদর্শবোধের রাজনীতি করেছে বলে সুদেবের মনে হয় আজ তারা যে যার সুবিধা মতো একটা ব্যাখ্যা খাড়া করে কথা বলে। অনেকের প্রায় সব পাওয়া হয়ে গেছে। এখন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আখের গোছাতে ব্যস্ত, তাই খুন, জখম, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এমনকী শিশুহত্যারও একটা যৌক্তিকতা বার করে। কারণ পার্টি কোনও ভুল করে না, শুধু যা কিছু ঘটছে সবই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত, বিদেশি অর্থের প্ররোচনা কিংবা আরও গভীরে গিয়ে ঘাতকের আত্মপক্ষ সমর্থন 'মার্কিনি চক্রান্ত'। এখন অবশ্য সুদেব দীর্ঘদিন শুনতে পায় না 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'। তবু এসব রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও এখনও সুদেব পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তাছাড়া মণীষা পার্টির একনিষ্ঠ সদস্যা। এখনও তার বিশ্বাস পার্টি কোনও ভুল করেনি, নেতা মন্ত্রীরা যা করছেন সবই দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য। আজ একটু পরেই রণেশদা আসছেন। এখানে খাওয়া দাওয়া করে তাঁরা পূর্বমেদিনীপুর যাবেন জরুরি বৈঠকে। মণীষাও যাচ্ছে। তাকে বলেছিল, সুদেব অনীহা প্রকাশ করেছে। সুদেবের মনের জিজ্ঞাসাগুলো নিয়ে সে নিজে নিজে গুমরে গুমরে এক বিষাদ মলিন গোঁড়ামির পাঁচিলে মাথা খুড়ছে। একথা মনীষাও বুঝতে পারেনি। অবশ্য মণীষা সুদেবকে বুঝতে চায় না। এক এক সময় সুদেবের মনে হয় মণীষা পার্টি করছে কেরিয়ার বিল্ড করার জন্যে। রণেশদার ছায়াসঙ্গিনী হয়েছে কর্পোরেশন ইলেকশনে যদি নমিনেশন পাওয়া যায়।

রান্নাঘর থেকে ভালো তেলওয়ালা মাছ ভাজার ঘ্রাণ ভেসে আসছে। মণীষার আরেক বান্ধবী রীতাও মণীষার সঙ্গে রান্নাঘরে রণেশদার দলের ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা করছে। রীতা একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষয়িত্রী, সম্প্রতি পার্টির একটি ছেলের সঙ্গে কোর্টশিপ চালাচ্ছে। সেও ওদের সঙ্গে পূর্বমেদিনীপুর যাচ্ছে। যা কিছু ঘটছে খুন, জখম, ধর্ষণ সবই নাকি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। [illegible] মণীষাকে বুঝিয়ে দলে

AMARBOI.COM
www.amarboi.com

টানতে হবে। শিল্পায়ন না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। যেনতেন ভাবে শিল্পায়ন চাই। সেইদিন অনেক রাত পর্যন্ত মণীষার সঙ্গে তর্ক হয়েছিল সুদেবের। তারপর মণীষা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শেষ রাতে সুদেবের ঘুম ভেঙে গেলে এক অবদমিত কামনায়? বহুদিন পর মণীষার প্রায় বিবস্ত্র শরীরটাকে জড়িয়ে আদর করতে গিয়ে মণীষা পাগলের মতো চিৎকার করে সুদেবের আলিঙ্গনমুক্ত হয়। ঘুমের মধ্যে বলে 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত' ... 'চক্রান্ত' ... 'চক্রান্ত'। সুদেব নিজেই খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পাশের ঘরে লোটনের ঘুম ভেঙে যায়। ছুটে আসে, 'দিদির কী হয়েছে জামাইবাবু'। সুদেব কোনও কথার জবাব দেয় না। মণীষার দূর সম্পর্কের অবিবাহিতা বোন লোটন, সারাদিনের কাজকর্মের জন্যে সুদেব-মণীষার ফ্ল্যাটেই থাকে। মণীষা তার স্কুল, পার্টির কাজ সবদিক সামলাতে পারে না। আজ দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে সন্তানহীন দাম্পত্য দূরত্বের দুই দিগন্তে দু-জনকে নিয়ে গেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারা দুজনেই। প্রথম প্রথম ডাক্তারের কাছে গেছে সব পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত মণীষার বন্ধ্যাত্বই প্রমাণ হলেও, সুদেবই যেন এক অপরাধী মানসিকতার শিকার হয়ে একসঙ্গে একই ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রীর বিছানায় রাতের পর রাত কাটিয়েছে। শরীর ও মনে মণীষা স্থূল হয়ে পড়ছে।

লোটনকে বাঁকুড়ার দূর সম্পর্কের অভাবী আত্মীয়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল মণীষা। তার বিপদ উদ্ধার করতে। লোটন যখন সুদেব-মণীষার ফ্ল্যাটে আসে দরিদ্র পিতা-মাতার অবিবাহিত অন্তঃসত্ত্বা বিপন্ন কন্যা। আর একটু দেরি হলে বিপদটা ঘটে যেত। মহিলা সমিতির লেডি ডাক্তার লীলাদির নার্সিংহোমে লোটনের বিপদ উদ্ধার হয়েছিল। মণীষা শুধু সুদেবকে বলেছিল, 'সারাজীবন একটা কাজের মেয়ে পুষতে যত টাকা লাগে তার থেকে অনেক কমে হয়ে গেল।

— মানে?

— মানে, আবার কী? এটুকুও বুঝলে না। কী রাজনীতি কর। কলেজ পড়াও। কবিতা লেখ।

— তার সঙ্গে এর সম্পর্ক?

— সম্পর্ক আছে।

কথাটা বলে বিস্মৃতপ্রায় মণীষার কিশোরী বেলার সেই মোহিনী হাসিটা হেসেছিল। সুদেবের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল মণীষার সহজ সরল স্বভাবের কিশোরীবেলাকে। সেই সময় থেকেই তো সম্পর্ক শুরু তবে, সূত্রপাত মণীষার দাদা অমিতবাবুর মার্কসবাদে দীক্ষা পর্ব। পরে সেই অমিতবাবু নকশাল হয়ে যান, আজও নাকি তিনি নিরুদ্দেশ। মণীষাও দাদার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বোঝা যায় অসন্তুষ্ট হয়।

কি বুঝলে না কিছু।

নাহ্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এবার থেকে লোটন আমাদের সংসারের কেয়ারটেকার থাকবে। তুমিও পার্টি, লেখালিখি, কবিতা উৎসব নিয়ে ব্যস্ত, আমি সেমিনার, কনভোকেশান আর মহিলাদের স্বাধিকার রক্ষা আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। লোটনই ফুলটাইম সংসার দেখভাল করবে। কোনও মাইনে টাইনের বালাই নেই। শুধু খাওয়া আর জামা-কাপড়।

— তা আমাদের সংসারটা কোথায়? খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে দামি কোম্পানির ফ্রিজ। কাপড় চোপড় ধোওয়ার মেশিন আছে। ঘর মোছার মেশিনও আছে। আমরা দুজন রোবট দম্পতি। খাইদাই একই বিছানায় শুয়ে রাত কাটাই, কোনও সহবাস সঙ্গমের বালাই নেই। এমনকি কেউ কখনও ভুলেও একটা চুমুটুমু পর্যন্ত খাই না। কেবল তত্ত্বকথা আর তর্ক।

— চুপ, চুপ। মাত্রা ছাড়াবে না। ভুলে যেও না তুমি একজন অধ্যাপক, এক প্রগতিশীল কবি এবং মার্কসিস্ট। তোমার চিন্তাধারাটা রি-অ্যাকশানিদের মতো হয়ে যাচ্ছে।

— ওহো, তাই নাকি। ভুলে যেও না এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ রি-অ্যাকশন। আমার সত্যি কিছু ভালো লাগে না। সবই মনে হয় মিথ্যা। চারদিকে যা কিছু ঘটছে তা সব মানিয়ে নিতে পারছি না। সব মনে হচ্ছে হ্যালুসিনেশন।

— তাই নাকি!

একটা অর্থপূর্ণ হাসিতে সুদেবের মনের বিষাদ হালকা করে দিতে চায় মণীষা। মণীষা এখন উন্নয়নের নাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মেনে নিয়ে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করেছে। তাছাড়া রণেশদা এখন তাকে যেভাবে বোঝাতে চাইছে সেইভাবে সুদেব তার চিন্তা-চেতনা মেলাতে পারছে না। পুলিশি নির্যাতিত সেই সঙ্গে ক্যাডার বাহিনীর যৌথ সন্ত্রাস এখন যা বুর্জোয়া শ্রেণির সংবাদপত্র বলছে তা কি সত্যি? এমন একটা আত্মজিজ্ঞাসায় এখন সুদেব বিপর্যস্ত। কিন্তু পার্টি তো এখন ধনী শ্রেণির স্বার্থবাহী আমলা গোমস্তা হয়ে গেছে। কেন এই পুলিশি নির্যাতন, কেন এই খুন জখম, কেন কিশোরী ধর্ষণ, শিশুহত্যা নারী নির্যাতন! মার্কসবাদের নামে সবই একটা সুবিধাবাদী দর্শন খাড়া করা। সুদেব নিজের ভিতরে আলোড়িত হতে হতে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন একা হয়ে যাচ্ছে। পার্টি কমরেডরা তাকে অভিযুক্ত করছে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায় আক্রান্ত বলে, মণীষাও এখন তার আত্মজিজ্ঞাসাকে রি-অ্যাকশানারি বলে শনাক্ত করেছে। সুদেব কোনও বিতর্কে না গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গুম হয়ে সোফায় বসে ভাবতে থাকে। ভাবনার আকাশ-পাতাল এলোমেলো হাওয়া সুদেবকে নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। যৌবনের বিশ্বাস আদর্শবোধ এখন কতগুলো মাস্‌লম্যানের হাতের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। মার্কসবাদের ব্যাখ্যা এখন কার কাছ থেকে নিতে হবে। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সমাজতন্ত্র নয়, ধনতন্ত্রের পথে তাঁরা চলেছেন। এমন জ্ঞানপাপীর মতো স্বীকারোক্তি অথচ খুনিদের হাতে লাল পতাকা। এইসব নিষিদ্ধ চিন্তা করতে করতে সুদেব দিন-দুপুরে নিজের ঘরের সোফায় বসে ভীষণ আতঙ্কবোধ করে। রাস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তৈলাক্ত মাছ ভাজার ঘ্রাণ সমস্ত ফ্ল্যাটের বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই রণেশদার দলবল এসে হই হই করে খাওয়া দাওয়া করে সমস্ত ঘটনার একটা নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দেবে। সমস্ত বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের চক্রান্তকারী বলে সিদ্ধান্ত নেবে। মহাশ্বেতা দেবী, মেধা পাটেকরের মতো শ্রদ্ধেয়ারা হয়ে যাবেন প্রতিক্রিয়াশীল, তারপর পরম আত্মতুষ্টিতে পার্টির জরুরি বৈঠকে মেদিনীপুর চলে যাবে। সুদেব এদের এড়িয়েচলবে কিংবা কাজের অছিলায় বাড়ির বাইরে চলে যাবে। আজ কলেজও ছুটি। রবিবার। মণীষা, রীতা সকলের ছুটি।

লোটন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এককাপ চা সামনে ছোট টেবিলে রেখে যায়। রান্নাঘরে মণীষা ও রীতা বোধহয় নিজেদের জন্য চা বানিয়েছিল তাই এত বেলায় উপরি এককাপ চা পাওয়া গেল। সুদেব বিশৃঙ্খল ভাবনার মধ্যে চায়ের পেয়ালাটা তুলে চুমুক দেয়। সুদেবের মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা গোপন রেখে রণেশদা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আদর্শবোধ ও নীতির সঙ্গে আপোষ করতে হবে। যা কিছু ঘটছে, ঠিকঠাক ঘটছে। অনেক শ্রেণি শত্রুর রক্ত ঝরাতে হয়। হঠাৎ সুদেবের মনে হয় সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে যে কৃষক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে তারা কি শ্রেণিশত্রু। তেভাগার সেইসব সংগ্রামী কৃষকরা যদি সেইদিন জমির অধিকারের লড়াইয়ে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়ে থাকে, আজ এরাও তো জমির অধিকারে প্রাণ দিল। এরা তাহলে শ্রেণিশত্রু। সুদেবের চিন্তা ছেদ পড়ে বাইরে রণেশদার দলবলের এসে গেছে। কলিংবেলে তীব্র আওয়াজ। সকলেই বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে দরজার বাইরের কলকণ্ঠে।

রীত্র এসে রান্নাঘরে এলোমেলো পোশাকে দরজা খুলে দেয়। রীতার প্রেমিক শুভেন্দুও এসেছে। সকলেই হই হই করে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। সুদেব নিজের আত্মরক্ষার জন্যে বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

— মণীষা, সুদেব কোথায়। সে এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

মণীষা রান্নাঘর থেকে আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বলে, 'কেন, সুদেব তো বাইরের ঘরে বসেই লেখাপড়া করছিল। নেই?'

— নাহ্, গেল কোথায়!

— লোটন, অ্যাই লোটন জামাইবাবু কোথায় গেল রে?

— কেন, জামাইবাবু তো বাইরের ঘরে বসেই কাগজ পড়ছিল।

— দেখুন টয়লেটে কিনা। বাবুর তো মেজাজ কয়েকদিন ধরেই বেশ গুমরানো দেখছি। কথাবার্তা কম বলছে, — রুক্ষ মেজাজ হয়েছে চারদিকে যা ঘটছে সবই তার অসহ্য মনে হচ্ছে।

মণীষা রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে কমরেডদের বাইরের ঘরে বসার ব্যবস্থা করে। দুটো এক্সট্রা চেয়ার ডাইনিং টেবিল থেকে নিয়ে যায়। রণেশদা সোফায় বসেন তাঁর কাঁধেএকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাগ, আর একটা ঢাউস ব্যাগ হাতে। শুভেন্দু, অমিত, দীপক, হারাধন আর বীরেন সবাই ভাগাভাগি করে চেয়ার ও সোফায় বসে। সুদেব বাথরুমে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শাওয়ারের নিচে চুপচাপ বসে থাকে। বাইরের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে। রণেশ সেন এখন সব কমরেডের রণেশদা, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এখন রাইটার্স-এর যোগাযোগ সূত্র। কেবিনে মিনিস্টারদের সবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ। গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অনেক গোপন অপারেশনের প্ল্যানমেকার। এবার মেদিনীপুরের জরুরি বৈঠক বোধ হয় কোনও অপারেশনের প্রস্তুতি পর্ব। এবারকি সুদেব ভাবে তাদের নোংরা পা-গুলো তার এখানে পুছতে এসেছে। বাইরে শুরু হয়ে গেছে আলোচনা।

— আরে সেদিন আমাদেরই এক কালো মার্কসিস্ট লেখক এখন সিপিআই, দারুণ এক সত্য তথ্য ফাঁস করেছে।

কিছু নিঃশব্দ থাকবার পর প্রশ্ন, 'কী তথ্য?'

— এত বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেলে অত্যাচারের যেসব দৃশ্য দেখাচ্ছে। তা সব ক্যামেরার কারচুপি।

এসবই বামফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত। বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা-পয়সা পাচ্ছে, এর পিছনে অনেক রহস্য আছে। তবে টাটার মোটর কারখানা হবেই।

— বাবা, টাটা বলে কথা। প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পগোষ্ঠীরা টাটার মোটর কারখানা হলে বেকায়দায় পড়বে। পাততাড়ি গোটাতে হবে।

— টাকার হাতেই উন্নয়নের পরশ পাথর আছে।

— কত বেকারের কর্মসংস্থান হবে ভাবুন তো।

মণীষা ও রীতাও রান্নাঘর থেকে এসে আলোচনায় যোগ দিয়েছে।

— একটু চা আর পাঁপড় ভাজা হবে নাকি? মণীষা জিজ্ঞাসা করে। সকলেই সমস্বরে বলে ওঠে,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ে যাক।' কথাটা শুনে সুদেবের টিভি-র একটা বিজ্ঞাপনের ডায়লগের মতো মনে হল,—'হয়ে যাক আর একটা।'

সুদেব ভাবে নগ্ন শরীরে শওয়ারের তলায় বসে,—'হয়ে যাক আর একটা অপারেশন।'

অনেকক্ষণ পরে চোখ দুটো অতিরিক্ত স্নানে লাল করে সুদেব বাথরুম থেকে বাইরে আসে। সকলেই তখন খাওয়ার টেবিলে বসে পড়েছে। পাকা গিন্নির মতো কোমরে আঁচল জড়িয়ে মণীষা আর রীতা পরিবেশন করছে। হঠাৎ মণীষার কোমরে আঁচল জড়ানো পরিবেশনের ভঙ্গিটা দেখে মা-র কথা মনে পড়ে। মা ঠিক একসময় তাদের অনেকগুলো ভাই বোনকে এই ভঙ্গিতে পরিবেশন করতেন। তবে মাটিতে বসেই পাঁচ সাত ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজনের বৃহৎ পরিবারে তখনও পর্যন্ত টেবিল চেয়ারের প্রচলন হয়নি। মা-বাবাও ছিলেন সাবেকি মানুষ। আধুনিকতার নামে সবকিছু মেনে নিতে পারেননি। বাবা ইংরাজির কৃতী ছাত্র দীর্ঘদিন কলেজে পড়িয়েছেন, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে সনাতন ভাবধারার রক্ষণশীলতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসী। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু কখনওই ছেলেমেয়েদের কাছে আসেননি। মণীষা সুদেবের বাবা-মাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই একসময় বাবা-মাকে ভুলে মণীষার প্রেমের সঙ্গে আপোস করতে হয়েছে। আজ সেইসব ভাবলে ঘৃণাবোধ জাগে। মুহূর্তে বাথরুমের দরজা থেকে ঘরে ঢুকতে বাবা-মা স্মৃতি যেন সুদেবকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে।

এই যে কমরেড সুদেব এতক্ষণ ধরে চান করলে। সুদেব কোনও জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। মণীষা মনে মনে ভীষণ রুষ্ট হয়। মুখে চোখে বিরক্তি চাপতে সবাইকে আরও ভাত দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

— শুভেন্দু তুমি মনে হচ্ছে লজ্জা করে খাচ্ছো। অমিত আরও একটু ভাত। মাছটা কেমন হয়েছে? রীতার রেসিপি।

— নারে অসিত, সবই মণীষাদির রেসিপি। তবে আমি শুধু খুন্তি নেড়েছি।

রণেশদা সবাইকে প্রায় উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তৃণমূল, নকশাল, এস ইউ সি এছাড়াও হাজিবাজি যে সব দল ঘটনাটা ঘটাচ্ছে জনসংযোগ তৈরি করে আমাদের সব বরবাদ করে দিতে হবে। জনগণকে বোঝাতে হবে আমাদের বর্ষীয়ান কমরেডরা বলছেন।

— যা কিছু হচ্ছে সবই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। সুদেব তার ঘর থেকে সব কথাই শোনে একবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করে যা সব ঘটছে তার অর্থ কী? মার্কসবাদ-লেনিন বাদ আজ কৃষক শ্রেণির রক্তে নতুন পথের সন্ধান করছে। খুনিদের হাতে কারা এই লাল পতাকা তুলে মহান বিপ্লবী আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করছে। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসার কোনও উদাহরণ এখন দারুণ নিষিদ্ধ। এমনকী তার নিজের অর্জিত অর্থের ফ্ল্যাটে উদ্ধারণ করতে পারবে না। আত্মজিজ্ঞাসার কোনও স্থান উন্নয়নের পথে থাকতে পারে না। পার্টিতেও নেই।

— কি হে কমরেড সুদেব এমন চুপচাপ হয়ে গেলে কেন? মণীষা বলে, 'সিঙ্গুরের মরা মানুষগুলো কৃষকদরদীর মাথায় ভূত হয়ে উদ্ভট সব প্রশ্ন তুলছে।'

— কি, তোমার কি কোনও স্বচ্ছতার অভাব হচ্ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষক আর সেই আগের শোষিত কৃষক নেই। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়াই। উন্নয়নের পরিপন্থী। শিল্প কি মহাশূন্যে হবে। শিল্পের জন্য জমি চাই।

মনীষা আরেকটা বড় পেটি প্রত্যেক পাতে দেয়। মাছটা নাকি দারুন হয়েছে। রেসিপিটা কার? মনীষা না রিতার?

— আচ্ছা রনেশদা আমাদের ট্রেন ক'টায়?

— ট্রেন সেই সন্ধ্যায়। আমরা মাঝরাতে গিয়ে পৌঁছাব। পথে দু-একটা মিটিং সেরে বেশি রাতেই গ্রামে ঢুকব।

— আর একটু ভাত দিই।

— না, না, পেট ভীষণ ভরে গেছে। এখনই বিছানায় গেলে ঘুমিয়ে পড়ব।

তাই নাকি। তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেই হাসিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ার মতো অবস্থা। ঘরের ভেতর সুদেব পাজামা ও পাঞ্জাবি চাপিয়ে বেরিয়ে যায়। কারও সঙ্গেই কথা বলে না। সকলেই খুবই চুপচাপ হয়ে যায়। মণীষাও হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়ে। চোখে মুখে এখন বিরক্তির একটা ছায়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

— কী হল সুদেবদার।

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম রীতা কথা বলে। কেউ কোনও কথা বলে না। রান্নাঘরের দরজায় লোটন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সেও পুরোপুরি পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতায় কিছুটা বিমূঢ় হয়ে যায়। ইদানীং লোটন লক্ষ করছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা সামান্য কারণে মন কষাকষি হচ্ছে। কখনও ঝগড়াও। জামাইবাবু সুদেবদা একটা চাপা ক্রোধ নিয়ে মণীষাদির সঙ্গে সংসার করছে। লোটনের মনে পড়ে নিখিলকে। এতদিনে হয়ত সে বিয়ে থা করে ঘর সংসার করছে। কিন্তু নিখিল তো তার কোনও খোঁজ নেয়নি। লোটনের জটিল নিঃশব্দ পরিস্থিতির মধ্যে এখন নিজের অতীত জীবনকে ভীষণ মনে পড়ছে। মণীষাদি লোটনের মন থেকে নিখিলের সব স্মৃতি মুছে একটা ঘৃণার ভাব জাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। মহিলা সমিতির বড় বড় সব নেত্রীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল একসময় নিখিলের বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ নিতে। শুধু লোটন মুখ ফুটে প্রায় কিছুই বলতে চায়নি। নিখিলের বিরুদ্ধে সে মরে গেলেও কিছু বলবে না। নিখিল প্রতারক, নিখিল লম্পট তবু তাকে ভালবাসে লোটন।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর রণেশদা জিজ্ঞাসা করেন, 'সুদেবের হয়েছে কী, ডিপ্রেশান? কেন। সমস্ত পরিস্থিতিটা কী মানিয়ে নিতে পারছে না। যা ঘটছে তার একটা দ্বান্দ্বিকতা আছে, এটা বুঝছে না সুদেব।'

মণীষা গভীর বিষাদে বলে, 'ও রি-অ্যাকশানিদের খপ্পরে পড়েছে, ওর কিছু ভাবি বন্ধু আছে, তারা কেউ কমিটেড নয়, শুধু বামপন্থীদের সঙ্গে আছে সেমিনার, কবি সম্মেলন আর পুরস্কার টুরস্কার বাগাতে। হঠাৎ দীপক কথা বলে, 'কেন সুদেবদা তো এবার কবি সম্মেলনে দারুণ বৈপ্লবিক চেতনার একটা কবিতা পড়ল।'

— পড়লে কী হবে। ইদানীং সমস্ত ঘটনা ওকে ভীষণভাবে নাকি নাড়া দিচ্ছে। ও বলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হয় বাম জমানায়।

রণেশদা গম্ভীরভাবে বলেন, 'চিন্তা-চেতনায় স্বচ্ছতার অভাব।'

মণীষাই হঠাৎ এক তীব্র বিরক্তিতে বলে, 'বাদ দিন ওর কথা। ওর সব কথা আমি সব সময় পাত্তাই দিই না।'

— না, না মণীষা, অত হালকাভাবে ব্যাপারটাকে নিও না। কারণ সুদেব আমাদের পার্টির ইনটেলেকচুয়াল অ্যাসেট।

সবাই প্রায় একই সঙ্গে রণেশদার কথায় সায় দেয়। একসময় পার্টি পত্রিকায় অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখে সুদেব বেশ নাম করেছিল। এখন শুধু কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখে না। মণীষাও শুধু কবিতা লেখাটাকে সমর্থন করে না। মণীষার মনে হয় নিজেকে যত বয়স বাড়ছে, ততই যেন তাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি লোকটার আসক্তি বাড়ছে। সুদেব বলে, — তুমি মেধাবিনী নয়, দিন দিন মেদময়ী হয়ে যাচ্ছ। মণীষার মেদময়ী শব্দটাতে ভীষণ আপত্তি। খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ হয় সকলেই একটু সোফায় আর চেয়ারে গা এলিয়ে নেয়। বিকেলে চা খেয়ে দলবেঁধে বেরিয়ে পড়ে মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে। সারা দুপুর সুদেব বাড়ি ফেরেনি। তার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে মণীষা রীতা আর লোটন খেয়ে নেয়। যাওয়ার সময় মণীষা সব দায়িত্ব সংসার খরচের টাকা আর ভাড়ারের চাবি লোটনকে দিয়ে যায়। লোটন জানাত চায়, জামাইবাবু এলে কি কিছু বলতে হবে? মণীষা গম্ভীরভাবে বলে, 'না কিছুই বলতে হবে না।'

সারা দুপুর ও বিকেল সুদেব তার পুরনো বন্ধুদের বাড়িতে হানা দিয়ে কাটিয়ে দিল। ছুটির দিন বলে প্রায় সকলেই বাড়িতে ছিল। কেউ টিভি, আবার কেউ কেউ বউ ও খবরের কাগজ বিছানায় নিয়ে প্রায় সহাবস্থানে সহবাস করে কাটিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ সুদেবকে অসময়ে দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়। তাছাড়া সুদেব নাকি পার্টির বুদ্ধিজীবী হওয়ার পর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবসময় পার্টির পত্র-পত্রিকায় লেখার ব্যাপারে পড়াশুনা করতে হয়। এমন সব অজুহাতও দিয়েছিল সুদেব। কিন্তু আজ এই ছুটির দুপুরে বন্ধুরা সুদেবকে পেয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অমিত দত্ত অনেকদিন পার্টি ছেড়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে সুদেব আর অমিত কথা হয়। সুদেব খুব সাবধানে তার আত্মজিজ্ঞাসাকে অনুচ্চারিত রেখে যায়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কথা শেষপর্যন্ত অমিত স্বীকার করে। চিনেও কৃষকদের রক্ত ঝরছে। স্ট্যালিন আজ বিশ্বের কাছে নরঘাতক বলেও তথ্য উন্মোচিত হয়েছে পার্টি কংগ্রেসে। ক্রুশ্চেভ ঝুলির বেড়ালগুলো বার করে দিয়েছিল। সেই সময় থেকে অমিতের আত্মজিজ্ঞাসার শুরু। তারপর রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে পড়াশুনাতে ডুবে আছে। অফিস আর লাইব্রেরি এবং তার ছোট সংসার নিয়ে সন্তুষ্ট। এছাড়া অন্য বন্ধুদের মধ্যেও এখন সুদেবের আত্মজিজ্ঞাসার গোপনীয়তা। জিজ্ঞাসায় নিষিদ্ধ উচ্চারণ কেউ কেউ করতে সাহস পাচ্ছে না। এখন বুশের বাণিজ্য উপদেষ্টা সুসান সি সোয়াব দীর্ঘ বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। উন্নয়নের গতিতে এ রাজ্য এগিয়ে বলে তারিফ করছেন। সুদেব একমাত্র অমিত ছাড়া কোথাও কোন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা শুনতে পায়নি। সবাই এখন পার্টির ভাবমূর্তি রক্ষায় খুন, জখম, ধর্ষণ, শিশুহত্যার সমর্থক। কারণ অনেকেই পায়ের তলার শক্ত মাটিটা পেয়েছে অন্ধ আনুগত্য পার্টির বসদের কাছে দেখাতে পেরেছে বলে। চাকরি, ব্যবসা এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা সবই পার্টির দান। সুদেব ভাবে মার্কস বোধহয় কবর থেকে উঠে শব সাধনা করতে বসেছেন এ দেশের মার্কসিস্ট পুলিশ অফিসারদের শান্ত করতে। মণীষা ও রণেশদার দল মেদিনীপুরে যাচ্ছে কী করতে? সুদেব মনে মনে বুঝতে পেরেছে। রণেশদার বিরাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতব্যাগের মধ্যে যে পুলিশের ইউনিফর্ম নেই সুদেব এখনও নিশ্চিত করে জানতে পারেনি। কিংবা কৃষকের রক্তমোছা গামছা, গেঞ্জি।

গভীর রাতে শূন্য ফ্ল্যাটে সুদেব ফিরে আসে। লোটন দরজা খুলে ঘুম চোখে সুদেবকে দেখে। লোটনের ঘুমচোখও সুদেবের অপ্রকৃতস্থ অবস্থা বুঝতে পারে। সুদেব প্রচার মদ খেয়ে এসেছে। এ অবস্থায় তাকে লোটন কোনওদিনও দেখেনি। শুধু মদের গন্ধটা লোটনের কাছে চেনা, কারণ তার বাবা ছিল মাতাল। শুধু মদ খাবার পয়সা যোগাতে নিখিলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিল। নিখিলের অনেক পয়সা ছিল। নিখিল বোধহয় তাদের পরিবারের দুর্বলতাটা বুঝতে পেরেছিল।

লোটন দরজা বন্ধ করে তার শোওয়ার ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ মাঝরাতে সুদেবের বিকট বমির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সুদেব বমি করছে ঘরের মধ্যে তার সোফায় বসে। লোটন দরজা খুলে বাইরে আসে। ঘোলা চোখে সুদেব জড়ানো স্বরে শুধু বলে, 'লোটন এত রক্তের গন্ধ কেন এ ঘরে। কে এতো রক্তের দাগ রেখে গেছে আমার বিছানায়, সোফায় লেখার টেবিলে। কে ... কে কে?' বলতে বলতে সুদেব আবার বমি করে। লোটন ভয় পেয়ে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করে। ভীষণ ভয় হয় সুদেবদা যদি মত্ত অবস্থায় তার ঘরে এসে ঢোকে। তাহলে জন্মের মত এই আশ্রয় থেকেও চলে যেতে হবে কোনও অন্ধকার জীবনে।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৪ জুন ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের রূপকথা

হিমানীশ গোস্বামী

এত ছেলেকে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যায় আর তোকে কেন যে ধরে না ভেবে অবাক হই। রাতদিন আজেবাজে ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা, লেখাপড়ার নাম নেই, তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বুঝলি ঘেঁটু? যিনি একথা বললেন, তাঁর নাম হেরুনিধি সামন্ত। তিনি নিজের নামটি সই করতে পারেন, বাংলা আর ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষর চেনেন, অতএব তাঁকে শিক্ষিতই বলা চলে। তবে তিনি যে কর্মটি করেন তাতে এর চাইতে বেশি বিদ্যের দরকার হয় না। দশ বছর আগে তাঁর পিতৃদেব মারা যান, রেখে যান আড়াই কাঠা জমির ওপর ছোট একটা একতলা বাড়ি, যেটি ছিল তাঁরও পিতার। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে ছিল হাজার চল্লিশের টাকা। হেরু নানারকম জুয়া খেলে রোজগার মন্দ করেন না, তবে আট বছর বয়স থেকেই সিগারেট, এগারো বছর বয়সে গাঁজা আর পনেরো বছর বয়সে ধেনো ধরেন। বাড়িতে রয়েছেন মা আর স্ত্রী। একটি মাত্র পুত্র ঘেঁটু, যার কথা আগেই বলেছি। হেরুবাবু রাত দশটা-এগারোটা নাগাদ বাড়িতে ফেরেন নেশায় বুঁদ হয়ে—অনেক সময়েই রাতে খাওয়া হয় না। কথা বলারও ক্ষমতা থাকে না—এসেই বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়েন—আর তারপরই গভীর নিদ্রা। ঘেঁটুকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন। কম মাইনের ইস্কুলে—কিন্তু সেখানে গিয়ে তার লেখাপড়ার সব আগ্রহই চলে গিয়েছিল। পড়া না পারার জন্য প্রায়ই নিলডাউন হয়ে থাকা, কানমলা খাওয়া, বেঞ্চের ওপর দাঁড়ানো ইত্যাদির ঘনঘটায় পড়ার আগ্রহই তার চলে গিয়েছিল। স্কুলকর্তৃপক্ষ খুব খুশি হয়েই তার নাম কেটে দিয়েছিলেন।

সেই ঘেঁটু কি না সত্যিও একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, সত্যিই তাকে একদিন ছেলেধরা এসে ধরে নিয়ে গেল। হেরুবাবু খুব খুশি হয়ে শিস দিলেন, কিন্তু স্ত্রী কমলা আর মা সর্বাণী কেঁদেকেটে অস্থির হলেন। পাড়ার লোক পুলিশকে খবর দিয়ে এলেন এবং আহা-উহু পর্যন্ত করলেন, মনে মনে তাঁরাও খুশি হলেন। কেন না ঘেঁটু তো বিড়ি-সিগারেট টানা শিখে গিয়েছিল। এ ছাড়া যাচ্ছেতাই গালাগালও শিখেছিল—কোনও ভদ্রবাড়িতে, ভদ্রপাড়ার পক্ষে সে ভাষা ভারি অশ্রাব্য এবং অকথ্যও।

শেষে যা হওয়ার তাই হল—একজন রোগা টিংটিঙে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের গেঞ্জি গায়ে একটি লোক এসে হেরুবাবুকে বললেন, ছেলেকে যদি জীবিত অবস্থায় ফেরত চান তা হলে ছলাখ তিন হাজার টাকা বিশ দিনের মধ্যে না দিলে তাকে খুন করেই ফেলা হবে। আমি যে এসেছি একথা কাউকে বলবেন না, বললে আপনার ছেলেকে আর জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাবেন না।

—এখনও ঘেঁটু বেঁচে আছে? একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে শান্তভাবে বললেন হেরুবাবু। তা আমি বলি কী অত সময়-ফময় দেওয়ার দরকার নেই মশাই, আমি আমার ছেলের জন্য বড় জোর দু আড়াই শো টাকা ছাড়তে পারি। যদি তাতে আপনার মন না ওঠে তা হলে সরিয়েই দিন ওকে পৃথিবী থেকে। ও বেঁচে থাকলে আমাকেও জ্বালিয়ে মারবে আর পৃথিবীরও খুব একটা মঙ্গল করবে না বলেই মনে হয়—অতএব আপনি কেটে পড়ুন।

রোগাপটকা লোকটি এমন কথা শুনে চমকালেন। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি কখনও, হতে যে পারে সেটাও ভাবেননি। তিনি বললেন, এই আপনার শেষ কথা? হেরুবাবু বললেন, প্রথম কথাই আমার শেষ কথা। ঘেঁটু হারিয়ে গেছে, হারিয়েই থাকুক।

রোগাপটকা লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন, ঘেঁটু আপনার ছেলে তো, নাকি আমার ভুল হচ্ছে?

—না মশাই ঘেঁটু আমারই ছেলে। ভারি কুপুত্তুর মশাই। গেছে চলে আর তার মুখ দেখতে চাই না।

—আপনারা ইস্ত্রী-র সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?

—কেন? আমার স্ত্রী-র সঙ্গে আবার আপনার কী দরকার?

—একটু কথা বলতুম। ওঁর মায়াদয়া নিশ্চয় আছে—নইলে মশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার মতো নিষ্ঠুর লোক আমি জীবনে দেখিনি।

হেরুবাবু বললেন, ছ লাখ ত্রিশ হাজার টাকাও আমি জীবনে দেখিনি মশাই। শেষ কথা বলছি—আজ যদি লাক ভাল থাকে তাহলে খ্যাঁদা আর পিকলু যদি দুটো ইভেন্টে ফার্স্ট হয় তাহলে হাজার দুয়েক দিতে পারব। খোঁজ নেবেন কাল। এখন কেটে পড়ুন আমার অত বকবক করার মতো বাড়তি সময় নেই। লোকটি হেরুবাবুর দিকে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর চলে গেলেন।

রাত দশটার পর হেরুবাবুর সেলফোনটা বেজে উঠল।—বাবা আমি ঘেঁটু বলছি। হ্যাঁ ঘেঁটু। শুনতে পাচ্ছ? শোনো ছেলেধরারা আমাকে ধরে এনেছে, বেশ আছি। জানো বাবা সকালে পরোটার সঙ্গে ডিমের তরকারি দেয়, চা দেয়, দুপুরে রোজ হয় মাছ নয়তো মাংস—আঃ বাবা কী চমৎকার রান্না! আমার জন্য কিছু ভেবো না, বেশ আছি। টাকা খরচ করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেয়ো না—আমার দ্বারা সত্যি কিছু হবে না। বিকেলে কী খাওয়ায় জানো বাবা—পায়েসের সঙ্গে হাতেগড়া রুটি আর ঘোলের শরবত। রাতে তিনরকম তরকারি আর ভাত। রাতে কেবল ভেজিটেরিয়ান—তা মন্দ নয় বাবা। তুমিও যদি আসতে আর থাকতে বেশ হত।

ঘেঁটু উৎসাহে বলেই চলে, বাবা আমি সমুদ্দুর দেখেছি—ওই যে টিভিতে যেমন দেখেছি সেই রকমই তবে অনেক অনেক ভালো আর কী নীল রং। কত পাখি দেখলাম বাবা সে তুমি ভাবতেও পারবে না। এখানকার লোকগুলো বেশ ভালো, দুজন আবার মাস্টারমশাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা বাংলা জানে না, কেবল ইংরেজি—কথা বোঝা যায় না, তবে জানি ঘর হচ্ছে রুম, বালি হচ্ছে স্যান্ড, জামা হচ্ছে শার্ট—সবই ভালো, তবে...।

হেরু শুনছেন যেন কেমন একটা ঘোরের মতো—বললেন, তবে? তবে কী? খুব অত্যাচার করছে তোর ওপর?

ঘেঁটু বলে, হ্যাঁ বাবা। ভারি অত্যাচার। সকাল ছটার সময় জাগিয়ে দেয়—না উঠলে গায়ে কেটলিতে করে ঠান্ডা জল ঢেলে দেয়।

—তারপর?

—তারপর আধঘণ্টা সমুদ্রের ধারে বালির ওপর দৌড়ঝাঁপ করায়—সেও আধঘণ্টা। বাবা, আর পারছি না!

—তা হলে তুই চলে আসতে চাস?

—না বাবা, এখানে বেশ আছি। তোমার কাছে টাকা চাইলে দেবে না একদম। আর দেবেই বা কোত্থেকে? আমাকে ওরা মেরে ফেললেই হয়—তোমাদেরও ভালো হয়, আমারও ভালো হয়।

একথায় হেরুর জীবনে যা কমই ঘটেছে, তিনি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করলেন। সেটা শুনেই বোধহয় টেলিফোন লাইন কেটে দিল।

কান্না শুনেই হয়তো স্ত্রী গৃহপ্রবেশ। বললেন, তুমি কাঁদছ, তুমি? ভারি বিস্মিত হন স্ত্রী কমলা। বলেন, তুমি কাঁদছ? কেন, কী হয়েছে? হেরুবাবু একথার উত্তর না দিয়ে আরও বেশি করে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝে নিজের মাথায় কিলও মারতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, ও হো-হো ঘেঁটুকে যে ওরা মেরেই ফেলবে—দেবতুল্য ছেলে, ওকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। ঘরে মা সর্বাণী প্রবেশ করলেন, আর কিছু করতে হবে মনে করে একটা হাতপাখা নিয়ে হেরুকে বাতাস করতে লাগলেন। বললেন, বউমা দাঁড়িয়ে থেকো না ওর মাথায় ঠান্ডা জল ঢালো।

হেরুবাবু বললেন, না-না, ওসব আর দরকার নেই—আমার পাপের ফল ভোগ করতে দাও। আমি অতি জঘন্য এক অপরাধী, আমি আমার নিজের জীবনটাকে নিয়ে খেলেছি—কেবল তাই নয়, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত গোল্লায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। আমি এ জীবন আর রাখতে চাই না।

বললেন বটে, কিন্তু তিনি জীবন রাখলেন। তিনদিন খুবই বিচলিত হয়ে রইলেন। গাঁজা, মদ ছুঁলেন না, খাদ্যও কোনও মতে একটু খেলেন। দিনে অবশ্য কয়েকবার চা খেলেন, লেবু-চা। নেশা না করে তাঁর চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, জল খেয়ে দুর্বল শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। চতুর্থ দিনে তিনি ঘোষণা করলেন, বাড়ি বাঁধা দিয়ে তিনি ছেলেকে বাঁচাবেন। ছ লাখ ত্রিশ হাজার টাকার অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে—আজকালকার বাজারে দশ লাখও পাওয়া যেতে পারে। ভাবলেন, ছ লাখ ত্রিশ হাজার না দিয়ে দরদাম করে লাখ দশেক করলেই বেশি সুবিধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এর পর তিন-চারদিন হঠাৎই প্রায় আধডজন ব্যক্তি—সবাই ভদ্রলোক, বাড়িতে এসে হেরুবাবুর সঙ্গে নানা আলোচনা করতে লাগলেন। প্রত্যেকের হাতেই ছোট ছোট ব্যাগ—প্রত্যেকেই বলছেন তাতে রয়েছে নগদ ছ লাখ ত্রিশ হাজার টাকা। সব নতুন নতুন কারেন্সি নোট।

এ এক নতুন সমস্যা বটে। যাকে অনায়াসেই বলা যায় অভিনব। এমন অভিজ্ঞতা হেরুবাবুর কখনও হয়নি, পৃথিবীর আর কারও কি হয়েছে? এই যে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, ওঁরা এসেছেন হেরুবাবুকে তাঁর হারানো ঘেঁটুকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মানবিক একটা ব্যাপারে—হয়তো বলা যায় মহামানবিক। এরকম ব্যাপার হেরুবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি তা নয়—রেসের মাঠে গিয়ে প্রতি শনিবার এর চাইতেও উন্নত স্বপ্ন তিনি দেখেছেন জেগে জেগেই, দু-তিনবার নিজের গায়ে চিমটি কেটেও পরখ করে নিয়েছেন। তিনি এক উন্নতমনা দয়ালু ব্যক্তিকে বললেন, টাকা তো সত্যিই দরকার কিন্তু কী বাঁধা দেব বলুন—আমার এই বাড়ি আমারই, তবে কি না এটা বাঁধা দেওয়া যাবে না—বাবা উইল করে সে পথ বন্ধ করে গেছেন। সুবিধে থাকলে কি আর আমি এতদিন চুপ করে থাকতাম। দিন আনি দিন খাই। টাকার দরকার আমার আছে, তবে বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

—আহা সেকথা কে বলেছে আপনাকে? আমাদের এই আন্দামান-তিব্বত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ও-সব দলিল-ফলিল চলে না। আপনাকে টাকা দরকার আমরা দেব। আপনি মাসে মাসে ধরুন গিয়ে চার হাজার টাকা দিয়ে শোধ করে দেবেন—।

—তা হলে? হেরুবাবু বলেন, এই ছ লাখ ত্রিশ হাজারটাকা দিয়ে ঘেঁটুকে মুক্ত করব, তারপর মাসে চার হাজার টাকা? সে কোত্থেকে পাব?

—আহা, সেটার ব্যবস্থা আমরাই করব মশাই। সুদ মাত্র বছরে পাঁচ শতাংশ—কোনও শালার সাধ্য নেই এত কম সুদে টাকা ধার দেয়।

এই রকম নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরপর চারজন এলেন হেরুবাবুর কাছে। দুজনের কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা নিলেনও। এদিকে দরাদরি করে ঘেঁটু উদ্ধারে খরচ হল মাত্র দেড় লাখ। ঘেঁটু ফিরে এল হাসতে হাসতেই। বলল, বাবা এখন থেকে আমি তোমার সব কথা শুনব। বাড়িতে আনন্দের ঢেউ আর স্রোত বয়ে গেল। সাতদিন ধরে হাজার লোককে খাওয়ালেন হেরুবাবু।

এই রহস্যের সমাধান হল অবশ্য বছর খানেক পর। ভারতবর্ষে তো বটেই এমনকী পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত সব ব্যাঙ্কে টাকা উছলে পড়ছিল—কেউ ধার নিচ্ছিলেন না। এদিকে ব্যাঙ্কের আসল ব্যবসাই হল গিয়ে ধার দেওয়া। শেষে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই তারা নিজেরাই সব ছেলে ধরে ধরে তাদের মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে বাবা-মাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার কৌশল করে তারা। এই ভাবে বেশ কয়েক কোটি টাকা তারা প্রতি মাসে ধার দিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তবে ব্যাপারটা খুব বেশিদূর গড়ায়নি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়ে এসব বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি এখন নতুন মতলব ভাঁজছে।

তবে এর মধ্যে একটা বড় সুখবর আছে। ঘেঁটু সত্যি সত্যি লেখাপড়া শুরু করেছে। তার এখন দুজন মাস্টারমশাই, বড় স্কুলে ভর্তি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আর হেরুবাবু মদ, গাঁজা সব ছেড়ে দিয়েছেন—এই মাঝে মাঝে একটু-আধটু বিলিতি টানেন নিজের পয়সায় আর রেস খেলা? সে সপ্তাহে মাত্র একবার, তাও পকেটে নিয়ে যান মাত্র হাজার টাকা।

রেস শেষ হলে জিতুন বা হারুন ট্যাক্সি করে বাড়িতে ফিরে এসে ঘোলের শরবত খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখেন।

এই আখ্যানটি সর্বাংশে সত্য বলা যেমন যায় না, তেমনই এটিকে সর্বাংশে মিথ্যা বলারও মতো মনে জোর আমার নেই। যাঁরা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক, তাঁদের প্রতি আমার আবেদন, যদি মনে করেন আমার এই আখ্যান লেখকের মিথ্যাচারিতার প্রমাণ, তাঁরা এটিকে আজকের রূপকথা বলে আমাকে মাফ করে দেবেন।

আজকাল, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া আসা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

এই একটা রাস্তাই নিঝঞ্ঝাট ছিল, মেট্রো, সেটাও অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। নির্মল রীতিমতো লড়াই করে ইঞ্চিদশেক ভেতরে ঢুকে টাল সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অনেক দিনের অভ্যেস, অ্যাকাডেমি চত্বরে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে বিকেল বেলা বেরিয়ে পড়া। এমন কিছু ব্যাপার নয়, গুটি গুটি পায়ে দমদম স্টেশন, মিনিট দশেক।

রবীন্দ্রসদন স্টেশনে নেমে পড়, ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় যেটুকু ধুপপুকুনি। ফেরার সময়ও তাই। আগে প্রায়ই যাওয়া হত, বয়স হয়েছে, ইদানীং সেটা কমতে শুরু করেছে। কিন্তু মাসে অন্তত তিন-চার বার না বেরোলে ভাল লাগে না।

ফিরবার সময় সেই ভাল লাগারই গুনাগার দিচ্ছে এখন। প্রথমেই তো টিকিটের লাইনে দমবন্ধকরা ভিড়, বেশ কয়েকটা শাখাপ্রশাখা। একই রকম ভিড় প্ল্যাটফর্মে, থিকথিক করছে। ডিজিটাল নাম্বারে ইন্ডিকেটর, দু'মিনিট পরেই ট্রেন আসবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দেব এই ট্রেন, পরের ট্রেনে গেলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। দু'মিনিট কাটল, চার মিনিট কাটল। ভিড় বাড়ছে, অস্বস্তি বাড়ছে। তার পরই ডিজিটালে পরের ট্রেনের টাইম ফুটে উঠল, কোনও অ্যানাউন্সমেন্ট নেই।

এই একটা ব্যাপার হয়েছে ইদানীং মেট্রোয়। সময়ে না এলে ও ট্রেন আর এল না, সকালের ঠিকে ঝিয়ের মতো। সেটা তোমায় বুঝে নিতে হবে। যেন আগের ট্রেনটা ঠিক সময়েই গেছে, এইভাবে পরের ট্রেনের টাইম। সুতরাং যে ট্রেনটা আলো দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত গর্তে মাথা সেঁধিয়েছে, তাতে তোমাকেও মাথা গলাতে হবে, অনিশ্চয়ের দুটো পাখির ভরসায় থেকে কী লাভ!

টাল সামলাচ্ছিল নির্মল এবং ভিড়ের ধাক্কায় যান্ত্রিকভাবেই এগুচ্ছিল, হঠাৎই চোখে পড়ে গেল সিটে ওপরে লেখা বড় মধুর কয়েকটা শব্দ, 'ফর সিনিয়র সিটিজেন ওনলি'। এবার নিজের চেষ্টাতেই আরও দু-এক পা এগিয়ে সিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজনের সিটে একজনই জেনুইন বুড়ো ছিল, নির্মলের চেয়েও বয়স বেশি, অন্য দুটি তা নয়। তবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেও নির্মলের অস্বস্তি হচ্ছিল।

নিতান্তই অল্পবয়সী একটি দম্পতি, সদ্যবিবাহিত কিংবা বড়জোর বছরখানেক আগে বিয়ে-থা হয়েছে। দেখতে ভাল, দুজনেই, খই ফুটছে মুখে একেবারে— মেয়েটিরই বেশি। বরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হাত প্লাস্টার করা, সেটাও একেবারে নতুন, রঙ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বেরসিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকাটা নির্মলের স্বভাব নয়। বস্তুত আরও একটু আগ বাড়িয়ে সে পরের কম্পার্টমেন্টের দিনেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল, যেতও তাই, যদি না—

যদি না, চকিত ওই মূকাভিনয়টুকু তার চোখে পড়ত।

প্রবল মত্ততায় বধূ গল্প করে যাচ্ছিল বরের সঙ্গে। এক বছর বিয়ে হলে আশপাশের পৃথিবীতে কে আছে কে নেই সেটা খেয়াল না থাকবারই কথা, না থাকলেও সত্যিই কিছু বলার ছিল না। কিন্তু বধূর যে সেটা খেয়াল আছে, এবং বরেরও, এক লহমায় সেটা বোঝা গেল যখন চোখে চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল— চোখে, মুখে, ভ্রূভঙ্গিতে ক্ষণচকিত সচেতনতা এবং তা অতি দ্রুত মিলিয়ে যাওয়ায়। যার অর্থ একটাই, এইরে, বেশ ছিলাম, একটা উৎপাত এসে হাজির হল দেখ সামনে।

না, উৎপাত করার মতো মানুষ নির্মল নয়, এ বয়সে সে উৎসাহও তার নেই। কিন্তু চোখের সামনে এমন একটা উদাসীন তাচ্ছিল্যও সে সহ্য করতে পারছিল না, যখন দেখতে পেল তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রাহ্য করে ওরা নিজেদের গভীর ও চটুল আলোচনায় ডুবে গেল একেবারে।

এগিয়ে গেলে হয়ত এগিয়েই যেত, কিন্তু ওরা আমাকে দেখেছে, নিজেদের মধ্যে সঙ্গে আপনে সেই আশঙ্কা নিয়ে একটা চোখাচোখিও হয়েছে, তার পরই দ্বিগুণ উৎসাহে আমার অস্তিত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার একটা অপমানকর খেলা শুরু হয়েছে, এই ব্যাপারটা নির্মলের পা-দুটোকে সেখানে সেঁটে রেখে দিল। এরকম একটি দম্পতি, কপোত-কপোতী যথা বকবকম, সেখানে দৃকপাত করার অশোভন এবং অস্বস্তিকর হওয়া সত্ত্বেও একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখে নিল, একটি প্রৌঢ় মানুষকে একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না ওরা।

একটা কাজ অবশ্যই করা যেত, সোজাসুজি ওদের দিকে চেয়ে বলা যেত, 'এক্সকিউজ মি, সিটটা সিনিয়র সিটিজেনের। দয়া করে একটা সিট ছেড়ে দিন।' এ কথা বললেও নির্বিকারভাবে ওরা বসে থাকবে, এমনটা নিশ্চয়ই হত না। প্রচুর ভিড় গাড়িতে, তাকে সমর্থন জানাবার মতো দু-চারজন লোক নিশ্চয়ই জুটে যেত, কারণ ন্যায়সঙ্গত অধিকারই সে পেতে চাইছে, কারও দয়াদাক্ষিণ্য প্রার্থনা করছে না। এতে আপত্তির কারও কিছু থাকতেই পারে না।

অথচ আশ্চর্য, কথাটা মুখ থেকে উচ্চারণ করতে পারল না নির্মল। সামনে একজন প্রৌঢ় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ওরা দেখতে পাচ্ছে। বয়সে ওরা প্রায় নির্মলের ছেলেমেয়ের মতোই হবে, সিটটা রিজার্ভড না হলেও তো ওরা অনুরোধ করতে পারত ওকে বসার জন্য। ওদের মধ্যে একজনের হাতে প্লাস্টার, অন্যজন অল্পবয়সী বউ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, ওরা নিউলি মেড কাপল। সুতরাং অনুরোধ করলেই যে নির্মল রাজি হত এটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক নয়, হয়ত হেসে বলত, 'না না, তোমাদের এভাবে আলাদা করে অভিশাপ কুড়োতে চাই না'—এইভাবেই কথা বলে সাধারণত নির্মল। কিন্তু ওরা একটা অনুরোধ পর্যন্ত করবে না নির্মলকে, একবার তাকিয়ে দেখবে না পর্যন্ত, এইভাবে তাচ্ছিল্য সহকারে ওকে অস্বীকার করে যাবে, এটা কোনওমতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না নির্মল।

পেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা স্টেশন। ভিড় একই রকম প্রায়, কিছু নামছে, কিছু উঠছে। সামনের কপোত-কপোতী তেমনই নির্লজ্জভাবে প্রগল্‌ভ, প্রমত্ত উদ্দামতায় ওরা নিজেদের কলরবে মত্ত। জগৎ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। কিন্তু এই চপল আনন্দ-বিলাসে ওদের মনের অন্ধকার দিকটা যে কেমনভাবে প্রকট হয়ে উঠছে সেটা ওরা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। সামান্য একটু সৌজন্য, সামান্য একটু ভদ্রতা, ছোট্ট একটা অনুরোধ করলেই নির্মলের মনের প্রগাঢ় ভার অনেকটাই হয়ত কমে যেত। যত সময় যাচ্ছে তত যেন সেই পাথর আরও গুরুভার হয়ে চেপে বসছে নির্মলের বুকে। এমনিতে বসার জন্যে সে ব্যাকুল, সেরকম কিছু নয়। আর কটাই বা স্টেশন, বড়জোর মিনিট কুড়ি-বাইশ, কিন্তু এরকম নির্মম অবজ্ঞা, বয়স্ক মানুষের প্রতি চরম ঔদাস্য ওকে কুকে কুরে খাচ্ছিল। সর্বাঙ্গে কীরকম এক ঘিনঘিনে অস্বস্তি যেন ভিজে গেঞ্জির মতো লেপটে বসছিল গায়ে। ঠিক কোনও দিকেই চাইতে পারছিল না ও, কম্পার্টমেন্টের সমস্ত লোক যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে একটা বীভৎস মজা উপভোগ করছে, এই রকমই মনে হচ্ছিল ওর।

কপোত-কপোতীর মগ্নতায় যেন চিড় ধরেছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে ওরা। শ্যামবাজার স্টেশন আসছে। না, খালি সিটে বসল না নির্মল, বেরুবার দরজার দিকেই পা বাড়াল।

এক ঘণ্টা পরে নির্মল এখন ফড়িয়াপুকুরে একটি ছিমছাম ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপছে।

দরজা খুলে দিয়েছে যে, সে কাজের মেয়ে এই রকমই অনুমান হয়, বললে, কাকে চান?'

বাবু আছেন?'

বাবু তো বাথরুমে, আপনি—'

'বৌমাকে পেলেও চলতে পারে।'

'এট্টু দাঁড়ান।' দরজা খোলা রেখেই ভেতরের দিকে গেল। ব্যাপারটা রিপোর্টিং করছে কোথাও বোঝা গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'ভিতরে এসে বসুন একটু।'

মনে মনে হাসল নির্মল। বৌমাকে পেলেও চলতে পারে, অর্থাৎ পরিবারের চেনাশোনা কেউ, এই রকমই ধরে নিয়েছে।

আধুনিক সাজানো বসার ঘর যেমন হয়। সোফাসেট, আলমারি, ছোট বুক শেলফ। দুটো ওয়াল-হ্যাঙ্গিং, একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা আধুনিক ছবি—হাতটা চেনা মনে হল। সেন্টার টেবলে ফুলদানি, সিন্থেটিক ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে আসছিল, চোখে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে গেল। চিনতে পারল না? মনে হয় না, ঘণ্টা দেড়েক আগেই দেখেছে। দেখেনি অবশ্য ভাল করে, চকিতে এক পলকে যেটুকু দেখা যায়। দেখবার যেটুকু নির্মলই দেখেছে। তবু চিনতে পারছে না, এরকম মনে হল না নির্মলের।

'কী ব্যাপার, আপনাকে তো ঠিক—'

'চেনেন না। নামও জানেন না, আয়াম শিওর'—নির্মল বলল, 'ইন ফ্যাক্ট, আমিও আপনার নাম জানি না, নেমপ্লেটে টি কে মিত্রটা মিনিট কুড়ি আগে দেখেছি?'

'কুড়ি মিনিট আগে আপনি এসেছিলেন এখানে?'

'এসেছিলাম, কিন্তু নক করিনি। ভদ্রতা। আপনি জাঙ্ক ফুডের দোকান থেকে কিছু খাবার কিনেছিলেন, তক্ষুনি ফিরলেন। তখন ডিসটার্ব করাটা আমি উচিত বলে মনে করিনি।'

'স্ট্রেঞ্জ। আপনি তার মানে আমাদের ফলো করেছেন?'

'ওভাবে বলবেন না, আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করছিলাম, সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আপনি মেট্রো থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় ফুল কিনলেন, কে সি দাস থেকে শাড়ি কিনলেন, একটা, মে বি আজকে একটা স্পেশ্যাল ডে সেলিব্রেট করতে চান আপনি—

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কী কথা বলতে চান সেটাই দয়া করে বলে ফেলুন।'

'খুব ইনোসেন্ট কথা, অন্তত অভদ্রতা করতে একটা বয়স্ক লোক আপনার বাড়ি এভাবে তন্নতন্ন করে খুঁজে আসেনি, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। কথাটা বলেই আমি চলে যাব, কিন্তু তার আগে আপনি মিসেসকে একবার ডাকুন মিস্টার মিত্র।'

'মিসেস? কেন, তার সঙ্গে আবার আপনার কী দরকার?'

'আপনার সঙ্গে যা দরকার, সেটুকুই দরকার তাঁর সঙ্গে। ভয় নেই মিত্তির সাহেব, মেয়েদের সম্মান আমি রক্ষা করতে জানি।'

মুখ কঠোর হচ্ছিল, তবু গলাটা একটু তুলে বলল, শুনছ—একবার এসো তো এ ঘরে।'

এখন শাড়ি নয়, সালোয়ার-কামিজ পরা। ভেজা মুখ। দেখতে সত্যিই ভাল নির্মল বললে, 'এসো বৌমা। মিসেস মিত্র বলতে পারতাম, আপনি-আজ্ঞেও করতে পারতাম, কিন্তু আমার মেয়ের চেয়েও ছোট তুমি, ও সব করতে আমার ভাল লাগছে না।'

চিনতে যে তাকে পেরেছে, বুঝতে পেরেছিল নির্মল, সুতরাং এত আত্মীয়তার কথা শুনিয়েও বিশেষ নরম করা গেল না তাকে, মুখে একটু হাসি আনার চেষ্টা করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলুন। বলুন না কী বলবেন।'

'বোসো বৌমা। ভয় নেই, বেশিক্ষণ তোমাদের ডিসটার্ব করব না, জাস্ট দু-তিন মিনিট লাগবে আমার কথাটা শেষ করতে। সেটা জিজ্ঞাসা করেই আমি বিদায় নেব এখান থেকে। সেটুকু সময় যদি একটু মন খুলে তোমরা—'

'প্লিজ, অত ভণিতা করার দরকার নেই' —মিত্র বললে, 'কথাটা আপনি বলে ফেলুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হলে আপনি স্বীকার করুন, আপনারা আমাকে চিনতে পেরেছেন।'

'মেট্রোতে আমাদের কম্পার্টমেন্টে ছিলেন আপনি?'

'কম্পার্টমেন্টে নয়, আপনাদের সিটের সামনে। দাঁড়িয়ে। মনে পড়ছে না?'

'কী হবে পড়লে?'

'সেই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে করতে হবে, সিটটা ছিল প্রবীণ নাগরিকদের জন্যে এবং আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'সো?'

'সো—এটা কি আপনাদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল না যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সিনিয়র সিটিজেনকে তাঁদের জন্য সিটে তাঁকে বসতে বলা?'

চুপ করে চেয়ে রইল মিত্র খানিক। না, যে ভাবান্তর দেখাবে আশা করেছিল নির্মল সেই রকমটা ঘটল না। বলল, 'এই কথাটা জানবার জন্যে আপনি সেই শ্যামবাজার থেকে আমাদের পেছন পেছন ঘুরছেন?'

'শ্যামবাজার নেমেছিও আপনারা নেমেছেন বলে। এখানে আমি থাকি না।'

'স্ট্রেঞ্জ।' বউ চোখে-মুখে অদ্ভুত ভাব ফুটিয়ে বলল, 'আপনার মাথার ঠিক আছে তো? আমার তো মনে হচ্ছে হেড অফিসেই আপনার কোনও—'

'স্টপ ইট, স্টপ ইট।' বউকে থামিয়ে মিত্র নির্মলের দিকে চাইল, বলল, 'কাম টু দা পয়েন্ট। আপনি ওই সিটটা ছেড়ে দেবার জন্যে আমাদের অনুরোধ করেছিলেন কি?'

'নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সামনে একজন প্রবীণ দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও আপনি সিটটা অকুপাই করে থাকবেন?'

'আমি একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে?'

'উইথ প্লেজার, করুন না।'

'মেনে নিলাম আপনিও আমাদের দেখেছেন, আমরাও আপনাকে দেখেছি। আমাদের দেখার পরও আপনি ওই সিট ছেড়ে দেবার কথা আমাদের বলেননি, তার মানে কি এটাই আমরা ধরে নিতে পারি না যে ওই সিটে আপনি বসতে চাননি? আপনার হয়ত মনে হয়েছে মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে তুলে আমি বসব না। একটা উন্ডেড ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি সেই সিট দখল করব না।'

'আশ্চর্য! এই সামান্য কথাটা একবার কষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে কী ক্ষতি হত? আমি কি এতই অমানুষ বলে আপনি মনে করেন যে হাতে প্লাস্টার করা একটা ছেলেকে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখব।'

'অমানুষ কি তা হলে আপনি আমাকেই বলছেন, আপনার মতো একটা বুড়োকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে বসাইনি বলে?'

'কথাটাই আমি বোঝাতে পারছি না—আমি শুধু একটা রিকোয়েস্টের কথা বলছিলাম। এট উড হ্যাভ বিন ডিসেন্ট যদি আপনি শুধু আমাকে একবার বলতেন কথাটা। সিটে বসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য আমি মোটেই লালায়িত ছিলাম না।'

'ছিলেন কি না ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে'— নিজের কঠোর মূর্তি প্রকাশ করে বউ বললে, 'মনের দুঃখ ভুলতে না পেরে একেবারে ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন, আবার বলছেন—'

'বাজে কথার দরকার নেই'—মিত্র বললে, 'প্রশ্ন শেষ হয়েছে, আপনি এখন যেতে পারেন।'

'তা হলে আপনি এর জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন?'

'একটুও না। আপনি সিট ছেড়ে দিতে বলেননি, আমিও দিইনি, দেয়ার এন্ডস দা ম্যাটার।'

'চমৎকার। এত চেষ্টা করলাম, তবু আমি আপনার কাছে পৌঁছতেই পারলাম না।'

'আর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন না, তা হলে আমি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করব, বলব আপনি সেই মেট্রো থেকে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ফলো করছেন'— মিত্র দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'অবশ্য তারও কোনও দরকার নেই, আপনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার পক্ষে আমি একাই যথেষ্ট, হ্যাঁ, এই একটা হাতই।' 'আমার নিজেরও তাই মনে হয়, সেটা আপনি পারেন।' উঠে পড়ল নির্মল, বলল, 'সরি, অনেক বিরক্ত করে গেলাম, আর জ্বালাব না।'

'থ্যাঙ্কিউ।'

'সন্ধেটা খারাপ করে দিয়ে গেলাম আপনাদের, কিছু মনে করবেন না। একটা স্পেশ্যাল ডে ছিল আজ, আন্দাজ করতে পারছি, বেস্ট উইশেজ ফর দা ডে'— দেখতে পাচ্ছিল মিত্রর চোয়াল শক্ত হচ্ছে, কিছু একটা বলতে যাচ্ছে, ওকে থামিয়ে দিয়ে নির্মল বলল, 'না, এতে আপনার দরকার নেই বলবেন না, দরকার আছে। আমি সেটা জানি।'

এর পর আর একটি কথাও না বলে নির্মল বেরিয়ে এল, খোলা রাজপথে।

আজকাল, ১৮ মার্চ ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি ক্রিসমাস

হর্ষ দত্ত

ওয়ারেন, ইউ, কেউ যে ওকে খুঁজে বের করতে পারে, বিলের বিশ্বাসই হচ্ছে না।

কোমরে দুটো হাত রেখে কাউবয়দের মতো চোখ নাচিয়ে হাসছে ওয়ারেন। লোকটার চেহারা একটু বদলেছে। হাসি মুখেই ওয়ারেন বলল, আমি জানতাম তুমি আছ। ভীষণ ভাবে আছ। ইউ আর স্টিল অ্যালাইভ।

আমার ঠিকানা তোমাকে কে দিল? বিল চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল।

কেউ দেয়নি। কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ারেন, অনেক দিন আগে তোমার কাছ থেকেই শুনেছিলাম, ক্রিক লেনে তোমার এক মাসি থাকে। ভেবেছিলাম, উনি যদি কোনও হদিশ দিতে পারেন! প্রথমে ভুল করে গোমস্ লেনে তোমার খোঁজ করছিলাম। ওই গলির এক বুড়ো হিন্দুস্থানি ধোপা কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, আপ কেয়া লম্বু বিল কো ডন্ত রহে হো? ব্যস, আমি কথাটা লুফে নিলাম। কাজটা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কি আমাকে ভেতরে বসতে বলবে না!

বিল লজ্জায় কুঁকড়ে গেল, ছি ছি। এই দেখো, তুমি হঠাৎ এই ভাবে আসাতে ...। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না ওয়ারেন, তুমি সত্যি সত্যি এসেছ। এসো, এসো।

তা হলে কি আমি ভূত? অ্যাম আই আ গোস্ট? ওয়ারেন ঠোঁট কামড়ে হাসল।

না, না, আমি সে কথা বলতে চাইনি। বিল হাত বাড়িয়ে ওকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল।

ওয়ারেন দেখল, এক তলা বহু পুরনো বাড়ি। চারিদিকে জীর্ণতার ছাপ। জরাগ্রস্ত এই বাড়িটার মতনই বিলের চেহারা ভেঙে আদ্দেক হয়ে গেছে। চোখে পড়ার মতো উচ্চতাটুকুই এখন ওর শেষ আইডেনটিটি। বাড়িটা মূল গলির ভেতর একটা ব্লাইন্ড বাই লেনে। সম্ভবত এটাই শেষ বাড়ি। এই তস্য তস্য সরু গলিটায় ঢুকে ওয়ারেন একটু দমে গেছিল। বিলের ও অনুরাগী। লোকটা সারা জীবন কিছু করতে পারল না। এক পা, দু'পা, তিন পা করে পেছতে পেছতে বিল এই প্রান্তসীমায় কবে পৌঁছেছে কে জানে? ওকে দেখে বিলের চোখে-মুখে যে ভাবে এখনও বিস্ময় মাখামাখি হয়ে আছে, তাতে এ কথা স্পষ্ট, মানুষটাকে কেউ মনে রাখেনি। মনে রাখার মতো যা কিছু ছিল, তা লোকটা নিজেই ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেলচিটে, রংচটা রেলিং মোড়া লোহার পাইপের ওপর তৈরি সোফাটার স্প্রিংগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। ধপ করে বসতে গিয়ে ওয়ারেনের পেছনে লাগল। ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজও হল। এই শ্রীহীন, দারিদ্রের চিহ্নে বিবর্ণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিল নিজেই বিব্রত হচ্ছে। ছাদের দিকে তাকাল ওয়ারেন। চুন-সুরকির চাঙড় খসে পড়ে গেছে বেশ কিছু জায়গায়। লোহার পাত আর রুফ ব্রিক বেরিয়ে এসেছে। বিলের পরনে একটা সস্তা নস্যি রঙের পাতলুন, গায়ে ঢিলে টি-শার্ট। দুটোই অনেক দিন কাচা হয়নি। এখন গরমকাল নয় বলে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। এই বাসস্থান আর বিলের চেহারা, জামাকাপড় সব কিছু বলে দিচ্ছে মানুষটা জীবনের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন মৃতপ্রায় কাউকে নতুন করে জাগিয়ে তোলা দুরূহ। ঠিক জায়গায় ফুটস্টেপ ফেলতে পারলে, কেউ কেউ যে ঘুরে দাঁড়ায়, তেমন উদাহরণ আছে। কিন্তু বিলের ক্ষেত্রে কী হবে ওয়ারেন জানে না। তবে একটা চান্স ও নেবে। যদি পারে তবে লোকটা বেঁচে যাবে। ফিনিক্স পাখির গল্প তো আসলে মানুষেরই গল্প। এই পাখি উড়ে বেড়ায় মানুষের হৃদয়ে। ওয়ারেন নিজের জীবন দিয়ে এ কথা বুঝেছে তা নয়, কয়েকটা উদাহরণ ওর অভিজ্ঞতায় ধরা আছে।

কী চলবে বলো? চা না কফি? ফিকে হেসে জিজ্ঞেস করল বিল। ওর বিব্রত অবস্থাটা এতটুকু কাটেনি। বরং এই আপ্যায়নের মুহূর্তে তা যেন বেড়ে গেল।

বিলকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল ওয়ারেন, আরে তুমি বসো তো। চা-টা পরে হবে। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। তাই এসেছি। বাই দি বাই, বোনের নামটা যেন কী? ভুলে যাচ্ছি— এনিড, না কি এমিলি? ওয়ারেন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

করুণ হাসিটা আবার ফিরিয় আনল বিল। বলল, ভুলে গেছ ওয়ারেন। শি ইজ এনিড।

এইভাবে জিজ্ঞেস করা হয়তো ঠিক হল না। ভেতরে ভেতরে নিজেকে শাসন করল ওয়ারেন। এনিড কবেই তো ওর জীবনে অতীত হয়ে গেছে। এনিডকে ভাল লাগার পর্বটা আর মনে থাকার কথাই নয়। তবু কেন যে এনিডের নাম জিজ্ঞেস করার এই ছলনাটুকু করল। না করলেই ভাল হত। বিল নিশ্চয়ই সেই ব্যর্থ অতীতে ফিরে গিয়ে একগাদা কষ্ট পাচ্ছে।

এনিড কি এখনও সেই চাকরিটা করছে? ব্ল্যাকবার্ন লেনে সেই মিস্টার কিম লু সুনের অফিসে? চিনে খ্রিস্টানটা ওঁর অফিসে গেলে চমৎকার চা খাওয়াত। মনে আছে বিল?

এ বার দাঁতে দাঁত চেপে বিল উত্তর দিল, ইয়েস। মনে আছে। তবে মিস্টার সুন ইজ নো মোর। এনিডও ওখানকার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।

সে কী, কিম নেই। কতই বা বয়েস হয়েছিল লোকটার। ওয়ারেন একটু বেশি অবাক হল, কত কী ঘটে গেছে, আমি কিছুই জানি না। একটু থেমে ওয়ারেন আবার আলতো প্রশ্ন করল, তুমি এখন কী করছ? না কি কিছুই করছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোয়াল শক্ত করে বিল উত্তর দিল, দেখে বুঝতে পারছ না? উইক ডে-তে বাড়িতে বসে আছি কেন? বিকজ আই হ্যাভ নো ওয়র্ক। আই অ্যাম এ জবলেস ভ্যাগাবন্ড। টোটালি বেকার।

কোথাও তোমাকে দেখতে না-পেয়ে মনেই হয়েছে, তুমি অসুবিধের মধ্যে আছ। ওয়ারেন গলা ভারী করে বলল, জরুরি দরকারের সঙ্গে এই দিকটাও মিশে আছে। তুমি শুনলেই বুঝতে পারবে। সহসা দেবদূতদের মতো দু'হাত তুলে ওয়ারেন বলল, তুমি যখন বেঁচে আছ, তখন তোমার স্কিলও বেঁচে আছে। আই বিলিভ ইট। কোথায় তোমার গিটারটা? ফেলে দাওনি তো?

তার ছিঁড়ে গেছে। থমথমে মুখে বলল বিল, গিটারের কথা কেন জানতে চাইছ? আমি তো ওই জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি।

ওয়ারেন ওকে পাত্তাই দিল না, কে বলল সরে এসেছ? বিল, তোমাকে আবার ওই আশ্চর্য বাজনাটা হাতে তুলে নিতে হবে। আমি বলছি, নিতে হবে।

কেন ফালতু এই সব মরে যাওয়া সেন্টিমেন্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছ, ওয়ারেন? তুমি কে এই অপকম্মটা করার জন্যে খুঁজে পেতে আমার কাছে এসেছ?

না বিল, সেন্টিমেন্ট নয়। আমি সিরিয়াস, আমি ইউ মাস্ট বি সিরিয়াস। শোনো আমি আবার একটা মিউজিক ট্রুপ খুলেছি। রিপন স্ট্রিটের একটা মাঝারি টাইপের বার-এর সঙ্গে আমার কনট্র্যাক্ট হয়েছে। ওদের ফ্লোরটা সপ্তাহের সাত দিন আমাদের মিউজিকে ভরে থাকবে। ডোন্ট ফরগেট বিল, তুমি এক জনমজাবর্ন এন্টারটেনার। নিউজিক তোমার রক্তে। আমার গ্রুপের কী নাম দিয়েছি জানো?—টিনড্রাম।

প্রবল ঝাঁকুনিতে মাথা দোলাতে দোলাতে বিল যেন ককিয়ে উঠল, না, না, দোলাতে আই অ্যাম ফিনিশড্। আমাকে আর এক ভিতরে টেনে নিয়ে যেয়ো না। আমি আগেও পারিনি, এখনও পারব না। আই লস্ট মাইসেলফ, বিলিভ মি।

ওয়ারেনের চোখ ঘরের চার পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুরছে। এই ঘরে কোনও বাদ্যযন্ত্রের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ওর মাসি কি কেবল বিলকেই থাকতে দিয়েছেন, ইন্সট্রুমেন্টগুলোকে নয়? সেই ভদ্রমহিলা বাড়িতে আছেন কি না ওয়ারেন বুঝতে পারছে না। বিল চা-বা কফি অফার করেছিল। কিন্তু ধূমায়িত কাপকে সামনে নামিয়ে দিয়ে যেত? ওয়ারেন আর ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, বিল, তোমার আন্টিকে দেখছি না কেন? বাড়িতে নেই বুঝি? তুমি যে আর বিয়ে করোনি, সেটা জেমস মণ্ডলের কাছ থেকে শুনেছিলাম।

কে জেমস মণ্ডল? বিল মনে করতে পারল না।

আরে খিদিরপুরে থাকত। নিকোলাসের হান্টার ট্রুপে ছিল। দুর্দান্ত পারকাশন বাজাত। গাট্টা-গোট্টা। অ্যাংলো নয়, অ্যাপটাইজড। বাজানোর হাত ছিল চমৎকার। আমাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাস গ্লিনারি-তে বাজিয়েছিল। ড্রাম বাজানোর ভঙ্গি করে ওয়ারেন থামাল।

ভুলে গেছি, একেবারে ভুলে গেছি। ও হ্যাঁ, মাসি বাজারে গেছে। বেলার দিকে বাজারে গেলে নানা জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়।

বেশ করেছ ভুলে গেছ। কিন্তু বিল, আমাকে ভুললে চলবে না কিন্তু! ডোন্ট ফরগেট মি, মাই ব্রাদার। শোনো ...

বলতে বলতে ওয়ারেন হিপ পকেট থেকে পার্স তুলে এনে ভাঁজ খুলে ফেলল। তার পর কম দামি কাগজে ছাপানো এক টুকরো ভিজিটিং কার্ড বের করে বিলের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও, এটা রাখো। এখানে আমার ঠিকানা, কনটাক্ট নম্বর—সব দেওয়া আছে। তুমি কবে থেকে আসবে বলো? একটু রিহার্সাল দিয়ে নিতে চাই। আমাদের আঙুলগুলোতে সব জং পড়ে গেছে। একটু ঝালিয়ে নিতে হবে বস্। ওঃ, গ্লিনারি-তে তুমি সেই বিখ্যাত সুর টাকিলা-র লিডটা কী মারাত্মক শুরু করতে!

তুমি এখনও সে-সব রাতগুলোর কথা মনে রেখেছ? কী করে ভুলে যাব? ফ্লোর মিউজিকে তোমাদের মতো আর্টিস্ট আর জন্মায়নি। মনে নেই আবার! সেই যে আমাদের দলের রিদম গিটারিস্ট গঙ্গাদীন আর আমি দুটো কর্ড আট মাত্রা বাজাবার পর বেস গিটারিস্ট মোহন চট্টরাজ রিদমের তালে কী অপূর্ব বেস বাজাত। আরও আট মাত্রা চলার পর বঙ্গে াতে তাল তুলত স্টফেন লিকক। তুমি এ-জেরে টাকিলার লিডটা ধরতে। পারকাশনে কখনও জেমস কখনও আসাদুল ইকবাল। এক এক হইহই কান্ড। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজাত ভেগা রয়।

ঠিকানা লেখা কার্ডটা চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে বিল হতাশ স্বরে বলল, আমাকে ভাবতে দাও। কোনও প্রায়র ইনটিমেশন নেই, দুম করে তুমি আমাকে প্রোপোজল দিচ্ছ। এভাবে কী হয়?

খুব হয়, আলবাত হয়। তুমি তো আর জিসাস ক্রাইস্টের সঙ্গে দেখা করতে ওপরে চলে যাওনি। ওয়ারেন মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, বুঝতে পারছ না, তুমি বুঝতে পারছ না, দি ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং অন।

আমরাই পেছনে পড়ে আছি। শোনো, যেটুকু পোটেনশিয়ালিটি এখনও আছে, সেটুকু আর নষ্ট হতে দেব না। আমাদের এই ভাবেই বেঁচে থাকতে হবে বিল। উই আর মাইনরিটি ইন অল সেন্সেস। কেউ ব্যাক করবে না। এনডেজার্ড স্পিসিসরা যে ভাবে সারভাইজ করছ, আমাদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।

এ সব কথা শুনতে বিলের একদম ভাল লাগছে না। কিন্তু ওয়ারেন ওর লক্ষ্যে স্থির। যে ভাবেই হোক বিলকে নিজের গ্রুপে ও ঢোকাবেই। কাজটায় স্বপ্ন মাখিয়ে এনেছে, কিন্তু টাকা-পয়সার কথা এক বারও বলছে না। ওয়ারেন লোক খারাপ নয়, কিন্তু ওর শুধু রাজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজির মারার পরিকল্পনা। অথচ সে ভাবে একটা খরগোশও আজ পর্যন্ত শিকার করতে পারেনি। বার-কাম-রেস্তোরাঁগুলোতে এখনও পুরনো মিউজিশিয়ান যে দু'চার জন টিকে আছে, তাদের কারও কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। ওদের কাছেই ওয়ারেনের খবর পায় বিল। নিজের ব্যর্থতাকে ওয়ারেন স্বীকার করে না। মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায়। এটা অবশ্য বিরাট গুণ। ওর মতো ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা বিলের নেই। ভেতরে ভেতরে ও অবসাদগ্রস্ত হতাশ মানুষ। প্রতি বছরই মেরি ক্রিসমাসের সময় বিলের মনে হয়, আগামী বছর এই উৎসবের দিনগুলোতে ও যেন আর পৃথিবীতে না থাকে। ওর ঠিকানা যেন হয় কোনও সেমেট্রি।

এনিড এখন কোথায় থাকে? ওর ছেলে-মেয়ে ক'টি? ওয়ারেন হাসার চেষ্টা করল।

চোয়াল শক্ত করে বিল বলল, বো স্ট্রিটে। ওর কোনও ইস্যু হয়নি।

মাই গড! ওয়ারেন একটু বেশি রকম অভিভূত হওয়ার ভান করে বলল, এনিড মা হতে পারল না! ইস, মনটা খারাপ হয়ে গেল, বিল। আমাদের কমিউনিটিটা কমে যাওয়ার মূলে এও একটা কারণ—বহু নারীর ইনফার্টিলিটি। ... ওকে। তা হলে, ওই কথা রইল। আমরা মহড়ায় বসব কামিং ফ্রাইডে। অ্যাট ইলেভেন এএম। আমাদের ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স কাম ফার্স্ট শো চব্বিশে ডিসেম্বর, ক্রিসমাস ইভে। এই অসপিশাস ডেট-টা মিস করতে চাই না। প্লিজ বিল, এ'টে' ইওর ফুল কোঅপারেশন। তুমি কথা দাও, আমার নতুন ট্রুপে আসছ ...

বলতে বলতে হাত বাড়িতে ওয়ারেন উঠে পড়ল। বিল সদর দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে আমার রিটা আন্টি এসে গেছে।

ঘাড় ঘোরাল ওয়ারেন। সামনে ফ্রিল দেওয়া, সস্তা ছিটকে ফ্রক আর হাওয়াই চটি পরা এক বয়স্ক পৃথুলা মহিলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়িতে ঢুকছে। হাতে একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি টাইপের ব্যাগ। মহিলার মুখ যন্ত্রণায় কালো হয়ে আছে। তার ওপর বিরক্তির প্রলেপ। বিল একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এসে, ঝুড়িটা ওর হাত থেকে নিয়ে বলল, আন্টি, এ আমার পুরনো বন্ধু।

চোখের ওপর হাতের তালুর আড়াল দিয়ে রিটা ওকে খানিকক্ষণ দেখে বলল, আই থিংক আই নো ইউ। ইউ আর ওয়ারেন হিউজ। মিউজিশিয়ান। বার-এ গিটার বাজাতে।

ইয়েস মাম। ওয়ারেন মাথা নিচু করে বলল, আমাকে আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ। তা এত দিন পরে হঠাৎ বিলকে তোমায় মনে পড়ল কেন? বুড়ির গলার স্বর রুক্ষ হয়ে গেল সহসা।

কী উত্তর দেবে ওয়ারেন ঠিক করে উঠতে পারল না। বুড়ি ওকে স্পষ্টতই অপমান করছে। রিটা এ বার হিম গলায় বলল, শোনো ওয়ারেন, এনিড ভাল আছে। তুমি ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিটিং করা সত্ত্বেও ভাল আছে। ইয়েস ...

হাত পেতে নোটগুলো নেওয়ার সময় বিলের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। মানুষ যে ভাবে ভিখিরিদের হাতে একটু উঁচু থেকে আলতো ভঙ্গিতে পয়সা ফেলে দেয়, সেই ভাবে ওয়ারেন টাকাগুলো দিল। মুখে অবশ্য বলল অ্যাডভান্স, কিন্তু এই টাকা ক'টা দিয়ে ওকে লোকটা আদতে কিনেই নিল। আর না বলার কোনও জায়গা থাকল না। ওয়ারেনের টিনড্রাম-এ গিটার বাজাতে বিল এখন বাধ্য। সপ্তাহে প্রতিদিন সন্ধের পর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ওর ঠিকানা হয়ে গেল রিপন স্ট্রিটের ওশান গোল্ড বার।

আজও রিহার্সালের সময় 'পেয়ারি পেয়ারি লম্‌হে, পেয়ারি পেয়ারি বাতে' গানটার স্কেল ঠিক ঠিক ধরতে পারছিল না। তাল মেলেনি বেশ কয়েক বার। ড্রামার ছোকরার ভুরু কুঁচকে গেছে। রিদম গিটারিস্টরা খানিকটা অবাক চোখে তাকিয়েছে, যদিও বাজনা থামায়নি। প্লেকট্রাম দিয়ে গিটারের তারগুলোতে আস্তে আস্তে স্ট্রোক মেরে, একটার পর একটা কর্ড চেঞ্জ করে সঠিক স্কেলটা খুঁজেছে বিল। এ-মেজরে স্কেল মিলছে না দেখে জি-শার্প মেজরে ধরেছে। হারানো স্কেলটাকে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু নিজের এই ক্রমাগত ব্যর্থতায় বুকটা টনটন করছিল। অন্যদের চোখের ভাষা যাই হোক, ওয়ারেন ওকে প্রতি মুহূর্তে উৎসাহ দিয়ে গেছে। পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলেছে, মনে আছে বিল, আমাদের যৌবনে পার্ক স্ট্রিটের বারগুলোতে আমরা মিউজিক শুরু করতাম টেগোরের কোনও গানের সুর বাজিয়ে। যেমন 'ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে' অথবা কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া' কিংবা 'পুরানো সেই দিনের কথা'। এখন ভাবলে হাসি পায়। তবে ওয়েস্টার্ন টিউনে বাঁধা এই গানগুলোর মিউজিক তখনকার খদ্দেরদের ভালই লাগত। ওয়ারেনের গ্রুপের ছোকরারা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না, বার-এ টাগোরস্ সং। বিল ফিকে হেসে ওয়ারেনের কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

ট্রাউজারের পকেটে বিল টাকাটা ঢুকিয়ে রাখতেই ওয়ারেন বলল, শোনো, তুমি প্লিজ গায়ে ব্লেজার বা কোট চাপিয়ে ফ্লোরে নামবে। যেমন আমরা আগে নামতাম। ব্ল্যাক বা ডিপ চকোলেট কালারের হলেই ভাল। নিউ ইয়ারে আমি সবার ইউনিফর্ম করাব। এখন হাতে অত টাকা নেই। তোমার কোট বা ব্লেজার নিশ্চয়ই আছে।

বিল চোখ নামিয়ে বলল, আছে। তবে তোমার পছন্দ হবে না। অবস্থা খারাপ।

ঠোঁট উল্টে ওয়ারেন একটু ভাবল, তার পর বেশ ভারী গলায় বলল, তা হলে তো মুশকিল। কিনে নিতে পারবে না?

দপ করে ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল যেন। ওয়ারেন নিজের চোখে ওর অবস্থা দেখে এসেছে, সব শুনেছে, তা সত্ত্বেও ফালতু এই সব কথা কেন বলছে কে জানে। বিল শক্ত মুখে বলল, পারব। কিন্তু টাকায় ব্লেজার কিনতে, কোট তৈরি করাতে তো টাকা লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে তোমাকে দিলাম! ওয়ারেন বাঁকা হাসল।

কত দিয়েছ? বিল এ বার রেগে গেল, দু'হাজার টাকায় কী হবে?

ওয়ারেন ওর সঙ্গে ঝগড়া বা তর্কে নামল না, বরং ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার আপত্তি না হলে, একটা জায়গায় যেতে বলব। শ'চারেক টাকার মধ্যে ভাল কোট পেয়ে যাবে। ছশো খরচা করলে একটা স্যুটও হয়ে যাবে। বলতে গেলে জলের দরে ...

তা কোথায় যেতে হবে? বিল কিছুতেই বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না।

তুমি নিশ্চয়ই জানো, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, বো স্ট্রিটে একটা আ'ারটেকার্স কোম্পানি আছে। ওদের অফিসে গেলে পেয়ে যাবে।

হোয়াট? আন্ডারটেকার্স? যারা কফিন বানায়, কফিন সাজায়, শবযাত্রার ব্যবস্থা করে, কবর দেয়, মরা মানুষের জামাকাপড় বিক্রি করে? কী বলছ, ওয়ারেন? আমি কি মরে গেছি? বিলের গলার স্বর ভয়ানক চড়ে গেল। রিপন স্ট্রিটের দুপুর নিউ মার্কেটের মতো জনাকীর্ণ। ওর চিৎকারে কেউ কেউ ঘাড় ঘুরে তাকাল। কিন্তু ওইটুকুই! কেউ কোনও ঔৎসুক্য দেখাল না।

তুমি রেগে যাচ্ছ বিল। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ। এ ছাড়া আর কী ভাবে সম্ভব? আই ডোন্ট নো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারচেজ আই ক্যান অ্যারেঞ্জ। মৃত মানুষের জাপাকাপড় অনেকেই আর বাড়িতে রাখে না, বিক্রি করে দেয়। এতে একটা গা ঘিনঘিনে ব্যাপার থাকে ঠিকই, তবে তুমি যদি ওপেন মাইন্ডেড হও তা হলে নো প্রবলেম। আর কে না জানে, নেসেসিটি নোজ নো ল'।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করে আনতে গিয়েও বিল থমকে গেল। আজ সকালেও আন্টি ওকে বলেছে, নিজেকে যে তুই এই ভাবে ফিরে পাবি, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। জিসাস মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনিই আমাদের মতো গরিবদের একমাত্র সহায়। বিল তোর জন্যে আমি কত প্রার্থনা করি। টাকা-পয়সাটা ওয়ারেনের কাছ থেকে বুঝে নিস।

বিলও ভাবেনি। দু'হাজার টাকা থেকে যদি পাঁচশা টাকাও মাসির হাতে তুলে দিতে পারে, তা হলে দুঃখে-কষ্টে-রোগে ভুগতে থাকা এই নারীর আনন্দের শেষ থাকবে না। ক্রিসমাসের আগে ওর এই ইনকাম যেন আকাশ থেকে নেমে এল। যদিও ওয়ারেন সুযোগ পেলেই ওকে ঘুরিয়ে অপমান করছে। অভাবীদের যেন কোনও ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই। মরে যাওয়া মানুষের কোট-প্যান্ট ব্যবহার করতে হবে, কেননা বিল বেকার, বিল দরিদ্র। নতুন কিছু কেনার ক্ষমতা নেই। ওয়ারেন ঘুরিয়ে ওকে কন্ডিশনগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে। অন্য কেউ হতে বিল হয়তো হাত চালিয়ে দিত। রেয়াত করত না। কিন্তু আন্টির মুখ মনে করে আর ওয়ারেন এই যে ওকে খুঁজে বের করে পুরনো সম্মানটুকু দিচ্ছে, এটা ভেবে বিল সংযত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আই হোপ ইউ উইল রিয়ালাইজ দি সিচুয়েশন। ওয়ারেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, একটা কথা বিল, কিছু মনে কোরো না, রিটা আন্টি সে-দিন যে ভাবে আমাকে অকারণে অপমান করলেন, তাতে আমি কষ্ট পেয়েছি। নিডের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার ম্যাচিওর করেনি ঠিকই, কিন্তু করেনি নানা কারণে। আমরা দু'জনে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। বিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকতে পারতাম না।

বিল চোখ নামিয়ে একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, অ্যান্টির মাথার ঠিক নেই। বয়েস হয়ে গেছে। তার ওপর আমি একটা বার্ডেন। ওর সামান্য পেনশনের টাকাতে চলছে। প্লিজ, তুমি কিছু মনে কোরো না। এনিড এখন সুখে আছে। ওনলি শি ডিড নট গেট মাদারহুড।

শরীর মুচড়ে ওয়ারেন এমন ভঙ্গি করল যেন, বিলের কথা বিশ্বাস করছে, আবার করছেও না। তার পর অযথা শিস দিল। বলল, আন্ডারটেকার্স নিয়ে তোমার আপত্তি আছে ঠিকই, কিন্তু অন্য কোনও সোর্সই বা কোথায়? আবার ড্রেস হায়ার করে কোনও লাভ নেই। একগাদা বাজে খরচ হয়ে যাবে। কাল দুপুরে আসতে হবে কিন্তু। লাস্ট ফ্লোর রিহার্সালটা দিয়ে নেব। সি ইউ এগেন। ওয়ারেন ওর হাতে হাত রাখল। তার পর বাই করে ঢুকে গেল বার-এ।

বিল আর দাঁড়াল না। ভেবেছিল রেস্তোরাঁর মালিক দুপুরে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ফুলকোর্স লাঞ্চ নয়, অন্তত হাই টি। কিন্তু এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। সম্ভবত কফির ব্যবস্থা করেছিল ওয়ারেন। বেশ খিদে আর তেষ্টা পেয়েছে। এ জে সি বোস রোডে এসে বাসে উঠে পড়ল বিল। বাসের ছাদ প্রায় ওর মাথায় ঠেকে যায়। চেহারাটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাওয়াতে ওর উচ্চতার দিকে কেউ আর সবিস্ময়ে বা প্রশংসার চোখে তাকায় না। বিল এখন ভিড়ের মানুষ হয়ে গেছে। বাসটা শিয়ালদার দিকে না গিয়ে এস এন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে পড়ল। তেষ্টাটা আরও বেড়ে গেল কি? যতটা সম্ভব নিচু হয়ে, অন্য যাত্রীদের হাতের ফাঁক দিয়ে, বাসের জানলায় চোখ রেখে বেশ কষ্ট করে বিল দেখল তালতলা বাজারের কাছাকাছি এসে গেছে।

নেমে পড়ল বিল। এখানে এই আশেপাশে একটা কান্ট্রি স্পিরিটের দোকান আছে। রামযতন রেনু নামে এক বিহারি দোকানটা চালায়। বেশ কয়েক বছর পরে দোকানটায় ঢুকে বিল একটা পাইট পুরো শেষ করবে। চাট হিসেবে নেবে মিরচ-বাদাম। রেনুর দোকানে বিলিতি মদও পাওয়া যায়। ইচ্ছে হলে একটা বোতল নিয়ে নেবে। তার পর হাঁটতে হাঁটতে জানবাজারের পেছন দিয়ে নিউ মার্কেটে পৌঁছে যাবে। ওখান রহমতুল্লার রোলকর্নার থেকে দুটো বিফ রোল কিনে, দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চে বসে আরাম করে খাবে। দুটো গ্রিন চিলি নিতেও ভুলবে না। পকেটে এখন মাত্র করার মতো কুড়িটা একশো টাকার নোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল খালাসিটোলা কিংবা বারদুয়ারিতে যেতে পারত। কিন্তু ওখানে কোনও না কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। যাদের কাছে ও টাকা ধার করে শোধ দিতে পারেনি। কিংবা ছোটখাটো ঝামেলায় কখনও জড়িয়ে পড়েছিল। রামযতনের দোকানে ঢুকতেই বিলের তেষ্টা যেন আরও বেড়ে গেল। মদের গন্ধে একটেরে ঘরটা ম'ম' করছে। আঃ। বুক ভরে শ্বাস নিল বিল। পয়সার অভাবে কত দিন দিশি মদের ঠেকেও আসতে পারেনি। কাঁহাতক আর লোকের কাছে হাত পাতা যায়? মাসিকে ঢপ দেওয়ার অস্ত্রগুলোও এত দিনে ভোঁতা হয়ে গেছে। আজকাল আর মানুষের কাছে নিচু হতে ভালও লাগে না।

বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখটা সইয়ে যাওয়ার পরই বিল দেখল, দরজার ডান দিকের টেবিলে বসে আছে স্যামুয়েল গড়াই। পাশে একটা অল্প বয়সী ছেলে। সেন্ট জোসেফ চার্চইয়ার্ডের কোয়ারটেকার। লোকটা ভীষণ বদমায়েশ। বিলের নামে এক সময়ে অকারণে নানা কেচ্ছা রটিয়েছিল। গড়াইয়ের হাতে গেলাস, চোখের পাতা নেশার ঘোরে অর্ধেক বুজে আছে। বিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সম্ভবত নামটা মনে করতে পারছে না। ওর ভেতরটা সহসা হিংস্র হয়ে উঠল। কাউন্টারে না গিয়ে সোজা চলে এল স্যামুয়েলের সামনে। তার পর নেশাগ্রস্ত লোকটার দু'গালে সপাটে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে চাপা গর্জনে বিল বলল, কেমন আছিস ব্লাডি সোয়াইন? সন অফ গ্লাট বিচ! চিনতে পারছিস আমায়? আমি উইলিয়াম। আমাকে নিয়ে নতুন কোনও কেচ্ছা কি তৈরি করেছিস, শুয়োরের বাচ্চা!

স্যামুয়েল আর একটু হলে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা ধরে ফেলল। কাউন্টারের দিকে যেতে যেতে বিল ছেলেটাকে চেঁচিয়ে বলল, অনেক দিনের রাগ পুষে রেখেছিলাম। শালাকে আরও মারব। আমি এখন কাউকে পরোয়া করি না। আমার পকেটে টাকা আছে।

এনিডের হাজব্যান্ড মিস্টার ভিনসেন্টের সঙ্গে বিলের কালেভদ্রে দেখা হয়। বোনের কাছে ন'মাসে ছ'মাসে এক বার বিল যখন আসে, তখন ভিনসেন্ট বাড়ি থাকে না। ভদ্রলোক শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। এ ছাড়াও অন্য কাজ, যেমন নানকিন রেস্টুরেন্টের আশেপাশে যে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় ছড়াছড়ি, সেখানেও ভিনসেন্ট ধান্দাবাজি করে, বিল শুনেছে। আজ ওর সঙ্গে বিলের দেখা হয়ে গেল। শরীরটা ভাল নেই বলে কাজে বেরোতে পারেনি। ভিনসেন্ট বিলকে দেখে একটু বেশিই খুশি হল, হাই বিল। হাউ আর ইউ? অনেক দিন পরে ...

ফাইন! হাউ আর ইউ? বিল ওর লম্বা শরীরটাকে ভাঁজ করে, এক চিলতে বারান্দার কোণে রাখা চেয়ারে বসল। এনিড আর ভিনসেন্ট মেঝেতে সিনথেটিক ম্যাট পেতে দুপুরের রোদ পোয়াচ্ছে। রোদের আমেজে যেন ছোট হয়ে এসেছে এনিডের চোখ।

শুনলাম তুমি আবার গিটার হাতে তুলে নিয়েছ। রিটা আন্টি এনিডকে ফোন করে সব জানিয়েছে। শি ইজ ভেরি মাচ হ্যাপি ইনডিড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই কি লাঞ্চ করে এসেছিস? এনিড খবরের কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, লুকোস না বল, না খেয়ে এলে এখুনি কিছু করে দেব। এগ, প্রন, চিকেন, পর্ক, সসেজ, ক্রিম, চাউমিন সব আছে।

ক্রিসমাসের জন্যে তোমার বোন সব স্টোর করেছে। ভিনসেন্ট বিষণ্ণ গলায় বলল, কার জন্যে যে এ সব জমাচ্ছে। তুমি কি লক্ষ করেছ বিল, ক্রিসমাস ফেস্টিভালের ছন্দে এই শহরটা আর তেমন ভাবে পা মেলায় না। আমাদের মতো কোনওরকমে টিকে থাকা অ্যাংলোদের কাছে, কেন জানি না, এই উৎসব তীব্র ব্যঙ্গ বলে মনে হয়।

বিল পাতলা হেসে বলল, ঠিকই বলেছ। বিকজ উই আর বিকামিং স্মল। তবু দেখো তোমাদের বাড়িগুলোতে রাংতার স্টার, বেল, কাগজের ফুল আর টুনি লাইট ঝুলছে। ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়েছে কেউ কেউ। এনিড, আমি খেয়ে এসেছি রে।

একটু চুপ করে থেকে বিল জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আমার জীবনের পুরনো দিনগুলো কি আবার ফিরে আসছে?

নিশ্চয়ই। ভিনসেন্ট বলল, এনিড তোমাকে নিয়ে প্রায়ই ভাবে, কষ্ট পায়। যদিও তোমার জন্যে আমরা কিছুই করতে পারিনি, তবে এ কথা বিশ্বাস করি, ইচ ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ হিজ ওন ফেট।

এ সব ছেঁদো বাণী বিলের কাছে অসহ্য। এনিড বা ভিনসেন্ট কেউ বুঝতেই পারছে না, এই সময়ে ওর বো স্ট্রিটে থাকার কথা নয়। রিপন স্ট্রিটের ওশান গোল্ড বারের ফ্লোরে গিটার হাতে নিয়ে দাঁড়াবার চূড়ান্ত মুহূর্ত এখন। ওয়ারেন নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। বিলের মোবাইল নেই। কোনও যোগাযোগই করতে পারছে না ওয়ারেন। একটু পরেই মাথার চুল ছিঁড়বে। টিনড্রামের অন্য সদস্যরা— জো, মার্টিন, সনৎ, খড়্গ বাহাদুর, মিং লি—বাজনা শুরু করে দিয়েছে। ওরা কেউ থেমে নেই। কেবল বিল নিজেকে আবার স্বপ্নস্রোতের বাইরে বের করে এনেছে। ওয়ারেন ভেবেছেটা কী? ওকে আ'রটের্কারের কাছ থেকে পোশাক কিনতে বাধ্য করবে? ধুঁকতে ধুঁকতেও বিল বেঁচে আছে। হ্যাঁ, এটাকে বাঁচার মতো বাঁচা বলে না। কিন্তু তাই বলে মরা মানুষের ড্রেস পরে জীবন্ত লাশ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।

দাদা, তোর তাড়া নেই তো! হালকা কিছু মুখে দিবি নিশ্চয়ই। এনিড উঠে পড়ল।

আঃ, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? বিল চাপা ধমকের সুরে বলল, চুপ করে রোদে বসে থাক। পরে কোনও হট ড্রিংকস করে দিলেই হবে।

মুখ ব্যাজার করে এনিড বসে পড়ল। বিলের মনে হল, বোন এবং ভিনসেন্ট যেন ওর পুনর্জীবনটাকে সেলিব্রেট করতে চাইছে। ভেতরে ভেতরে হাসল বিল। আগামী কালই আন্টি হাউমাউ করে কেঁদে ওদের জানাবে, বিল যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন হয়নি। শয়তানটা ওয়ারেনের অফার ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। বার-এ বাজাতে গেলই না। এর চেয়ে সুইসাইড করতে পার। ওর দ্বারা কিস্যু হবে না। বিলটা একটা ইডিয়েট, স্কাউন্ড্রেল। আই প্রে ফর হিজ ডেথ।

ভিনসেন্ট কিছু বলতে চাইছিল, তার আগেই কথা ঘোরানোর জন্য বিল পাতলা হাসল, এনিড, ওয়াল্টার স্কটের কবিতার সেই লাইনগুলো মনে আছে। ছেলেবেলায় পড়েছিল, সেই যে ..., বিল কপালের দু'পাশটা চেপে ধরে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

যেন এক লহমায় শৈশবে ফিরে গেল এনিড। ঘুমের আমেজ মুছে গিয়ে ঝকমক করে উঠল ওর মুখ। এনিড বলল, হ্যাঁ খুব মনে আছে—'হিপ অন মোর উড! দি উইন্ড ইজ চিল/বাট লেট ইট হুইসেল্ অ্যাজ ইট উইল/উই উইল কিপ আওয়ার ক্রিসমাস মেরি স্টিল।'

হাততালি দিয়ে উঠল বিল, দারুণ, দারুণ। তোর কোনও তুলনা নেই।

আরও খানিকক্ষণ ওদের সঙ্গে উল্টোপাল্টা গল্প করল বিল। ওয়ারেনের প্রসঙ্গও উঠল এক বার। তবে কথার ধার ঘেঁষে বিষয়টা চলে গেল। শীতের দুপুর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। বো ব্যারাকের দক্ষিণমুখী কোয়ার্টারগুলোর বারান্দা থেকে পশ্চিম আকাশের রোদ একটু পরেই মুছে যাবে। ঋতুবদলের চোরা বিষণ্ণতায় ভাসতে থাকবে এক ধরনের দেখতে তিনতলা বাড়িগুলো। পৌনে চারটে নাগাদ মুখে তৃপ্তির শব্দ করে উঠে পড়ল বিল। ভিনসেন্টকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, মেরি ক্রিসমাস। এনিডের কপালে চুমু এঁকে দিল পরম মমতায়। নিজেকে ওর আজ ভীষণ নির্ভার লাগছে। রাস্তায় নেমে হাত নেড়ে বিল ওদের উইশ করল।

এনিডদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'মিনিট হেঁটে আসতেই বিলের চোখে পড়ল, যে-আন্ডারটেকার্স কোম্পানির কথা ওয়ারেন বলেছিল, রাস্তার ওপরেই তাদের অফিস কাম শপ। দরজাটা খোলা। বড়সড় ঘরটার এক দিকে বসে একটি যুবক এক মনে কফিনের ভেতরে সবুজ সাটিনের কাপড় পেরেক মেরে টানটান করে লাগাচ্ছে। দুটো পুরোপুরি তৈরি কফিন উঁচু স্ট্যান্ডের ওপর রাখা আছে কারও মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। টিউব লাইটের আলোয় পালিশ করা কফিন দুটোকে মনে হচ্ছে পারাপারের মায়াবি মিশরীয় নৌকো। পাশের দেওয়ালের শো-কেসে ঝুলছে মার্বেল ও কাঠ দিয়ে তৈরি নানা মাপের ক্রস।

ঘরটায় ঢুকে এল বিল। যুবকটি ওর দিকে হাত থামিয়ে তাকাতেই বিল হাসতে হাসতে জানতে চাইল, এই কফিনের যা সাইজ, তাতে কি আমার মতো লম্বা লোক এঁটে যাবে?

হয়তো খুবই বেয়াড়া প্রশ্ন। ছেলেটি তাই ভুরু কুঁচকে বলল, কফিনের রানিং সাইজ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি থেকে ছ'ফুট। যার জন্যে কফিন চাইছেন, সে কি ছ'ফুটের চেয়েও লম্বা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরো আরও দু'-তিন ইঞ্চি বেশি। তখন কী হবে?

তরুণটি আবার কাজে ফিরে গেল, খানিক পরে বলল, তা হলে টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে অর্ডার দিতে হবে।

যেন বহু প্রত্যাশিত বন্ধ দরজাটা ওর সামনে সহসা খুলে গেল, এমন ভাবে বিল তীব্র আগ্রহে বলল, এখুনি অর্ডার দিতে চাই। অ্যাডভান্সও দিতে পারব। কত?

তরুণটি এ বার ওকে আগাপাস্তলা জরিপ করে কড়া গলায় বলল, জানি না। ওই চেয়ারটায় বসুন। দোকানের ম্যানেজার সাহেব একটু বেরিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

অ্যান্টিক টাইপের কাঠের চেয়ারটায় বসে বিল জোরে শ্বাস নিয়ে বলল, ইয়েস, আমি ম্যানেজারের জন্য ওয়েট করব। ভাই, আমার নাম উইলিয়াম ব্রাইটন। মনে রেখো। মেরি ক্রিসমাস টু ইউ।

কফিন মেকার যুবকটি সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে ওর সৌজন্য ফিরিয়ে দিল। কিন্তু মনে মনে বলল, ল্যাদাড়ু পাগল আর কাকে বলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টারোর চোখ

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

খাদের কিনারে ঝুলন্ত পাথুরে তাকের মতো জায়গাটাতে এসে বসল সোমক। এর আগে মিসমির সঙ্গে একদিনই এখানে এসেছিল সে। অনেকটা চড়াই ভাঙতে হয়। বেশ উঁচু জায়গাটা। উঠতে হাঁফ ধরে গেছে সোমকের। তার পায়ের নীচ আওমিজ নাগাদের গ্রামটা।

চারপাশের পান্না সবুজ পাহাড়ের ঢাল চুঁইয়ে নেমে আসা সব রোদ্দুর যেন গিয়ে জমা হয়েছে ওই ছোট্ট গ্রামটাতে। বাঁশের তৈরি ছোট ছোট ঘরগুলোর মাথায় ঝুঁটির মতো করে বাঁধা খড়ের চালগুলোতে সোনার রং। আর কুঁড়েগুলোর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়ি, সাদা রঙের ব্যাপটিস্ট চার্চের মাথার ওপর রূপোলি ক্রসটা মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে। ঠিক যেমন চিকচিক করছে চারপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামা রূপোলি ফিতের মতো দাগ, নাম না জানা পাহাড়ের ঝোরাগুলো। মিসমি অবশ্য ওদের প্রত্যেকটার নাম জানে। সোমককে একদিন বলেওছিল নামগুলো। মনে রাখেনি সোমক। কী হবে রেখে? ও নাম মিসমিরই জানা থাক। সোমক তো আর তার মতো অরণ্যচারী হয়ে দিন কাটাবে না এই সবুজ পাহাড়ের দেশে। 'ফাদার উইলিয়ামের জিপ কালই তাকে পৌঁছে দেবে এয়ারপোর্টে। তবে ওই ঝরনাগুলো নাকি মিসমিদের গ্রামের পিছনে মিলেমিশে একটা বড় জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। সোমক একদিন সে জায়গাতে যাবে বলাতে মিসমি ঝরনার মতো হেসে বলেছিল, 'ওখানে পুরুষদের যেতে নেই ট্যারো। গ্রামের মেয়েরা ওখানে স্নান করে। গায়ে কোনও শাল থাকে না। একদম খালি গা।' তার কথা শুনে সোমক মনে মনে ভেবেছিল, ভাগ্যিস এ জায়গা নাগাল্যান্ডের প্রত্যন্ত এক গ্রাম বলে সাধারণ টুরিস্টরা আসে না এখানে। নইলে আন্দামানের জারোয়াদের ছবির মতো এ গ্রামের প্রকৃতিকন্যাদের ছবিও কারও ক্যামেরা বন্দি হয়ে ইন্টারনেটে, মোবাইল ক্লিপিংসে ছড়িয়ে পড়ত সারা পৃথিবীতে।

কিন্তু এ কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোমকের মনে হয়েছিল, সে নিজে কী করতে এখানে এসেছে? সেও তো এসেছে...তবে চিন্তাটাকে মনের মধ্যে বেশিক্ষণ ঘুরপাক খেতে দেয়নি সোমক। নিজেকে সে বুঝিয়েছে, যারা নিজের বা অন্যের যৌনতার উদ্রেক ঘটাতে প্রাকৃতকন্যাদের নগ্ন ছবি তোলে সে তাদের সমগোত্রীয় নয়। সে এখানে এসেছে কর্পোরেট ক্রিওপ্রেটার একটা ভুলভাই-পর্যটক কাজটা সঙ্গে তার একটি [illegible] আড়ত। সিংগানিয়া

www.amarboi.com

সাহেব বলেছেন, কাজটা তুলে দিতে পারলে দু-লাখ, সঙ্গে একটা ইনক্রিমেন্ট। ওই দু-লাখ এখনও বকেয়া অছে বলেই রাজারহাটের ফ্ল্যাটের পজেশন পাচ্ছে না সোমক। কৃত্তিকা প্রায় রোজই তাকে কবার জিজ্ঞেস করে, টাকাটার ব্যবস্থা কবে হবে? না, সোমকের এ কাজে কোন অনুশোচনার ব্যাপার নেই। কাজ কাজই, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া সে রাজি না হলে সিংঘানিয়া সাহেব কাজটা সোমকের সহকর্মীদের অন্য কাউকে দিয়ে করাতেনই। এ কাজের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার কলকাতা ইউনিটের কর্মদক্ষতার প্রশ্ন জড়িত। সিংঘানিয়া সাহেব আমেরিকার হেড অফিসকে দেখাতে চান যে প্রফেশনালিজমের ক্ষেত্রে কলকাতা ইউনিট, অন্য কারও চেয়ে কম নয়।

সোমক একবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করল চার্চ সংলগ্ন সুঁড়ি পথটা। যে পথটা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের ওপরে উঠে এসেছে। যে পথ ধরে ওপরে উঠেছে সোমক। মিসমি কি উপরে উঠে আসছে? চার্চের সামনের কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি পথটা পাথর আর জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য। আবার তার দেখা মিলেছে সোমক যেখানে বসে আছে তার কিছুটা নীচে। তবে চার্চের জানলা থেকে পাকদণ্ডীর অনেকটা অংশ দেখা যায়। দেখেছে সোমক। প্রায় একমাস ধরে ওই চার্চে ফাদার উইলিয়ামের আতিথ্যে আছে সোমক। উইলিয়ামের অবশ্য সোমকের এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য জানা নেই। তিনি শুধু জানেন, সোমক এসেছে 'ক্লিওপেট্রা' নামের এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে চার্চের মাধ্যমে এই পাহাড়ি উপজাতি গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনার কাজে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস করার মতো কিছু নেই। কারণ বহু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, এনজিও, আজকাল এ ধরনের কাজ করে নর্থ ইস্টের এই সব ছোট ছোট অখ্যাত পাহাড়ি জনপদগুলোতে। যদিও এসব কাজের পিছনে অনেক সময়ই লুকিয়ে থাকে সংস্থাগুলোর কর ফাঁকি দেওয়া বা প্রচারের উদ্দেশ্য, তবে কাজও যে কিছুটা হয় তা অস্বীকার করা যায় না। সরকারি সাহায্য তো ছিটেফোঁটা, এ সব বেসরকারি সাহায্য যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই কাজে লাগে। উইলিয়াম হাতছাড়া করতে চান না এ সুযোগ। তাই চার্চেই আশ্রয় দিয়েছেন তাকে। যথা সম্ভব খাতির যত্নও করেছেন। কারণ, সোমকের রিপোর্টের ভিত্তিতেই টাকা দেবে কোম্পানি। উইলিয়াম গ্রামে একটা স্কুল বানাবার প্রস্তাব দিয়েছেন, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই অক্ষরজ্ঞানহীন। একমাত্র মিসমি চার্চের আশ্রিতা বলে উইলিয়ামের সংস্পর্শে ইংরাজিটা বলতে বুঝতে পারে। মিসমির ইংরেজি বোঝাটা বেশ কাজে লেগেছে সোমকের। নইলে ভাষার সমস্যা সোমকের কাজকে অনেক কঠিন করে তুলত। পৌঁছোনো যেত না মিসমিরি মনের কাছে।

সব ঠিকঠাক মতো হলে কাল ভোরেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা সোমকের। উইলিয়াম আর মিসমি অবশ্য জানে, এক মাসের মধ্যেই সোমক আবার ফিরে আসবে। উইলিয়ামের স্কুলের টাকা নিয়ে, মিসমির জন্য ভালোবাসা নিয়ে। তবে মিসমির সঙ্গে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছদ্ম সম্পর্কের ব্যাপারটা অবশ্য জানা নেই বৃদ্ধ উইলিয়ামের। তিনি কোনও সন্দেহও করেন না। সোমকের মতো শহুরে শিক্ষিত ভদ্র মানুষের সঙ্গে এ গ্রামের কোনও অশিক্ষিত উপজাতি রমণীর প্রেম সম্পর্ক তিনি ধারণায় আনতে পারেন না। তাই তিনি অতিথির সুখ সুবিধার জন্য নিয়োজিত করেছেন মিসমিকে।

মিসমির জন্য অপেক্ষা করতে করতে চারদিক দেখতে লাগল সোমক। এ জায়গাতে মিসমির সঙ্গে আগে এসেছে সোমক, বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায় এখান থেকে। আজই তো শেষ দেখা। কিছুদিন থাকতে থাকতে এ জায়গার ওপর কিছুটা মায়া জন্মে গেছে সোমকের। হয়তো বা মিসমির ওপরেও। যতদূর চোখ যায় সবুজ পাহাড়ের সারি মিশে গেছে নীল আকাশের বুকে। নীল চাঁদোয়া আর সবুজ পাহাড় ঘেরা নীচের ওই রৌদ্রস্নাত ছোট্ট গ্রাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা নির্ঝর। তারা প্রত্যেকেই যেন এক একজন মিসমি। উচ্ছল যুবতীর মতো নাচতে নাচতে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী। ভালো লাগার, ভালোবাসার মতোই। সোমকের মনে হঠাৎ-ই একটা প্রশ্ন এল, এই মুহূর্তে এত ওপর থেকে দেখা পৃথিবী, নাকি তার দশতলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে দেখা পৃথিবী, এর কোনটা বেশি সুন্দর? দ্বিতীয়টা অবশ্য এখনও দেখা হয়নি তার। সময় কাটাবার জন্য সে কল্পনা করতে লাগল সেই অদেখা পৃথিবীটা। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ তার চোখ গেল আরও কিছুটা ওপরে পাহাড়ের গায়ে জেগে থাকা গুহামুখটার দিকে। মিসমির সঙ্গে সোমক যেদিন প্রথমবার এখানে এসেছিল সেদিন মিসমি তাকে গুহাটা দেখিয়ে বলেছিল, 'ওটা টাঁরোর গুহা। এখানে আসতে সবাই ভয় পায়।'

'টাঁরো কে?' জানতে চেয়েছিল সোমক।

মিসমি জবাব দিয়েছিল, 'টাঁরো একটা দৈত্য, যে পাহাড়ের রানি লোবিনোকে চুরি করেছিল।'

'রানিকে চুরি করেছিল সে? সত্যি নাকি?'

সোমকের ছদ্ম আগ্রহের জবাবে মিসমি চোখ বড়বড় করে সরল মনে বলেছিল, 'হ্যাঁ, একদম সত্যি ঘটনা! গ্রামের সবাই জানে। অনেক অনেক দিন আগের ঘটনা। পাহাড়ের দেবী লোবিনো তখন ঘুরে বেড়াতেন এই সবুজ পাহাড় ঝরনার দেশে। খুব সুন্দরী দেখতে ছিলেন তিনি। আর ওই টাঁরো ছিল কুৎসিত। তার তিনটে চোখ, কিন্তু সে একদিন সুন্দর মানুষের ছদ্মবেশে কোত্থেকে এসে যেন হাজির হল এ দেশে। নিজের রূপে সে ভুলিয়ে ফেলল লেবিনোকে। তারপর লোবিনো যেই না একদিন তার পিছন পিছন টাঁরোর গুহায় ঢুকেছে, ওমনি দুষ্টু দৈত্যটা ভিতর থেকে মন্ত্র দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে আটকে ফেলল লোবিনোকে। লোবিনো অন্ধকারে আটকে পড়ায় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল। সবুজ পাহাড়ের রং হলুদ হয়ে গেল, গাছের পাতা ঝরে পড়ল, ঝরনারা সব শুকিয়ে গেল, হ্রদের সব মাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরতে লাগল। কিন্তু দৈত্যের মায়ায় কেউই গুহায় ঢুকে ফিরিয়ে আনতে পারল না পাহাড়ের রানিকে। এদিকে বাইরে সবার মরার অবস্থা! বাঁচার জন্য সবাই এরপর আকাশ দেবতার প্রার্থনায় বসল। দশমাস তাকে ডাকার পর সাড়া দিলেন আকাশ দেবতা। গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে তিনি একটা তির ছুঁড়লেন গুহায়। সেই তির গুহার ভিতর দিয়ে এগিয়ে ও পাশের পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেল। দৈত্যটা আটকে রইল গুহার ভিতর। কিন্তু ওই তিরের ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন লোবিনো। তবে তিরের ফুটো তো। তাই মানুষ হয়ে নয়, ঝরনা হয়ে। পাহাড়ের ওপাশেই আছে ঝরনাটা। আমরা তাকে লোবিনো নামেই ডাকি। লোবিনো বেরিয়ে আসার পর আবার সব আগের মতো সুন্দর হয়ে গেল। তোমাকে ওই ঝরনাটা দেখাতে নিয়ে যাব। যাবে তো?'— একটানা কথাগুলো বলে সোমকের উত্তরের প্রত্যাশ্যায় তার দিকে তাকিয়েছিল মিসমি।

লোবিনো নয়, ওই গুহাটাই বেশি আকর্ষণ করছিল সোমককে। মিসমির কথা শুনতে শুনতে গুহার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পরিকল্পনাটা এসে গেছিল সোমকের মাথায়। ওটাই আদর্শ জায়গা তার কাজের পক্ষে।

মিসমির প্রশ্নের জবাবে সোমক বলেছিল, 'হ্যাঁ, লোবিনোকে দেখতে যাব, তবে তোমাকে নিয়ে আমি একদিন ওই গুহার ভিতরও দেখতে যাব।'

'আমাকে নিয়ে গুহার ভিতর যাবে? তুমি কী টারো নাকি? হেসে ফেলেছিল মিসমি।

সোমক তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, 'তুমি তো লোবিনোর মতোই সুন্দর। আমি না হয় টারোই হব।'

মিসমি বলেছিল, 'তাহলে তোমাকে টারো বলেই ডাকব আজ থেকে। তবে লোকজনের সামনে নয়, যখন একলা থাকবে তখন। কিন্তু টারোর তো তিনটে চোখ ছিল। তোমার আর একটা চোখ লাগবে।' মিসমির কথার শেষে এরপর হাসতে শুরু করেছিল দু'জনেই, সোমক অবশ্য শুধু বাইরে নয়, মনে মনেও হেসেছিল মিসমির শেষ কথাটা শুনে। মিসমির জানা নেই, সোমকের একটি তৃতীয় নয়ন আছে। মিসমি জিনিসটা একদিন সোমকের ঘরের টেবিলে দেখেছিল, কিন্তু চিনতে পারেনি। জিনিসটাকে সে কবচ বা মাদুলি ধরনের কোনও জিনিস ভেবে সোমককে জিজ্ঞেস করেছিল, ওটা সে কোথায় পরে? সোমক জবাব দিয়েছিল, 'কোমরে।' ছোট্ট সেই কবচ। কিন্তু টারোর চোখের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতা তার। এমনকী সে চোখ অন্ধকারেও দেখতে পারে। সে চোখ কীভাবে দ্যাখে সিংঘানিয়া সাহেব তো ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল সোমককে।

কিন্তু মিসমির আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? তার তো চার্চ ছেড়ে বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ার কথা। সে রাস্তায় কি না তাও বোঝার উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে সে মত বদল করল না তো? অথবা ফাদার উইলিয়াম তাকে অন্য কাজে লাগিয়ে দেননি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো? মিসমির দেরি দেখে একবার কোমরে হাত দিয়ে তার তলপেটে সেই তৃতীয় নয়নের অস্তিত্ব অনুভব করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উৎকণ্ঠিত সোমক। তারপর এগোল আর একটু ওপরে ট্যারো গুহার দিকে। যদি সেখান থেকে দেখা যায় মিসমিকে সে জন্য।

।। ২ ।।

গুহার সামনের পাথুরে চাতালে উঠে এল সোমক। কিন্তু এ জায়গা থেকে নীচের সুঁড়ি পাথটা আরও অদৃশ্য। পাহাড়ের গায়ের একটা ঝুলন্ত গাছ নীচের দৃশ্যপটকে আড়াল করে রেখেছে, সোমক এরপর তাকাল গুহামুখের দিকে। জমাট বাঁধা অন্ধকার খেলা করছে গুহার ভিতর। সুড়ঙ্গটা কতদূর এগিয়েছে বাইরে থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না। গুহার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সোমকের হঠাৎই মনে পড়ে গেল সিংঘানিয়া সাহেবের চেম্বারের কথা। মাসখানেক আগে যেদিন তিনি ক্লিওপেট্রার জুনিয়র ফোটোগ্রাফার সোমককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার চেম্বারে। হ্যাঁ, সেদিন এ রকমই অন্ধকার ছিল সেই ঘরটা। শুধু সিংঘানিয়া সাহেব ডেস্কটপ থেকে হালকা একটা আলো ছড়াচ্ছিল। আর তাতে ঘরের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় মনে হচ্ছিল। সোমকের মনে ভেসে উঠল সেই ঘরের দৃশ্য।

প্রথমে সে ঘরে ঢুকে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না সোমক। সে ঘরে ঢুকতেই সিংঘানিয়া সাহেব বললেন, 'এসো, আমার পাশে এই চেয়ারটাতে বসো, কথা শুরুর আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

অন্ধকার হাতড়ে সোমক গিয়ে বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। সিংঘানিয়া সাহেব ডেস্কটপের স্ক্রিনটাকে মৃদু ঘুরিয়ে দিলেন সোমকের দিকে। সোমক তাকাল সে দিকে। টেবিল ম্যাটের ওপর সিংঘানিয়া সাহেবের হাতে ধরা মাউসটা মৃদু অস্পষ্ট শব্দে নড়তে শুরু করল। একটা ফাইল খুলছেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সিংঘানিয়া সাহেবের ইঙ্গিত ছবিটা ফুটে উঠল স্ক্রিনে। চমকে গেল সোমক। সিংঘানিয়া সাহেব কী পর্নোসাইট দেখাতে ডেকেছেন তাকে। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে একজন নগ্ন মহিলার ছবি। দু-হাঁটু বুকের কাছে মুড়ে সে শুয়ে আছে বিছানাতে। তার মুখ বুক হাঁটুর আড়ালে অদৃশ্য। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার গোপনাঙ্গ। সোমকের ফোটোগ্রাফারের চোখ এক ঝলক তাকিয়েই বুঝে নিল যে অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে তাতে নারীদেহের ওই অংশটা ছিল ফোটোগ্রাফারের লক্ষ্য। বিস্মিত সোমক একবার তাকাল সিংঘানিয়া সাহেবের মুখের দিকে। কিন্তু তার অস্পষ্ট মুখবয়বে কোনও প্রতিক্রিয়া ধরতে পারল না সোমক। সিংঘানিয়া সাহেব ততক্ষণে মাউস ক্লিক করে পিক্সল বাড়াতে শুরু করেছেন। ছবিটা বড় হচ্ছে। তারও লক্ষ্য দেহের ওই বিশেষ অংশটাই। এক সময় স্ক্রিন জুড়ে ভেসে উঠল ওই বিশেষ জায়গাটাই। সোমক ততক্ষণে অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। 'এ জায়গাটা ভালো করে দেখো।' সিংঘানিয়া সাহেবের কথায় আবার সে দিকে তাকাল সোমক। স্ক্রিনের ছবির এক জায়গাটা তর্জনি ছোঁয়ানো সিংঘানিয়া সাহেবের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমক তাকাতেই তিনি আঙুল সরিয়ে নিলেন। সোমক ভালো করে দেখার চেষ্টা করল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটা। আর তারপরই ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। ছবিটা যখন ছোট ছিল তখন যৌনাঙ্গের ওপর নিম্ননাভি বা তলপেটে যেগুলোকে সে যৌনকেশ বলে ভেবে ছিল, সেগুলো আসলে তা নয়। সূক্ষ্ম অলঙ্করণ চিত্রিত আছে সেখানে। যদিও নিম্ননাভির সম্পূর্ণ অংশটা ধরা দিচ্ছে না। আর পিক্সল বাড়ার কারণে রেখাগুলোও কিছুটা ধেবড়ে গেছে, তবুও ব্যাপারটা ধরা যাচ্ছে।

পাশ থেকে সিংঘানিয়া সাহেব মন্তব্য করলেন, 'ট্যাটু-ট্যাটু। একজন নাগা যুবতীর ছবি এটা। ট্রাইবাল গার্ল। আরও কয়েক মুহূর্ত ছবিটা রেখে তিনি স্ক্রিন থেকে ছবিটা সরিয়ে দিয়ে যে প্রশ্নটা করলেন তাতে আরও চমকে গেল সোমক।

তিনি বললেন, 'তুমি পারবে ওরকম ট্যাটুর ছবি তুলে আনতে?'

'মানে?' বিস্মিত সোমকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অস্পষ্ট শব্দটা।

রিভলভিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে সোমকের মুখোমুখি বসে শান্ত ধীর গলায় পেশাদারি ঢঙে সিংঘানিয়া সাহেব বললেন, 'মানেটা তোমায় বলছি, তবে সিক্রেসি মেইনটেনের ব্যাপার আছে। এই মুহূর্তে ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে আমাদের কোম্পানি ক্লিওপেট্রার একটা পরিচিত নাম। ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে কাজ করতে হয় আমাদের। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে সারা পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত ক্লায়েন্ট আছে আমাদের। আর এও হয়তো জানো যে আমেরিকান ইওরোপিয়ন কান্ট্রিগুলোতে লেটেস্ট ফ্যাশন ট্রেন্ড দেহে ট্যাটু আঁকানো। যা এক সময় ছিল প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অঙ্গ, অনেক ক্ষেত্রে গোপনীয়ও, আজ তা উচ্চবিত্ত সমাজের ফ্যাশন সিম্বল, কমোডিটি। বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আফ্রিকা এশিয়া জনজাতিদের ট্যাটুর চাহিদা প্রচুর। সে ট্যাটু হতে হবে একদম অরিজিনাল। তথাকথিত সভ্য জগতে যে ট্যাটু আগে কোনওদিন কেউ গায়ে আঁকেনি সে ট্যাটু গায়ে আঁকাতে পারলে তবেই না অন্যদের চমকে দেওয়া যাবে। তাই ও সবের খোঁজে অনেকে ওসব দেশে কয়েক লক্ষ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে রাজি থাকে। যারা ও সব ট্যাটুর খোঁজ আনে তাদের বলে ট্যাটু হান্টার। তারা আফ্রিকা, এশিয়ার দুর্গম অঞ্চলে প্রাচীন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে খোঁজ চালিয়ে ডিজাইন তুলে এনে সভ্য জগতের হাতে তুলে দেয়। ট্রেজার হান্টারের তুলনায় তাদের কাজ কম কঠিন নয়। আর ও সব ট্যাটু ডিজাইন যে দামে বিক্রি হয়, তাতে ট্রেজারই বটে।'

একটানা কথাগুলো বলে একটু থেমে সোজা হয়ে বসলেন সিংঘানিয়া সাহেব। ভালো করে একবার সোমকের দিকে তাকালেন সোমকের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য। অবশ্য এতক্ষণ তিনি যা বললেন তা অনেকটাই সোমকের জানা।

তিনি আবার শুরু করলেন, 'তুমি যে ট্যাটুর ছবি দেখলে তা এক নাগা জনগোষ্ঠীর মেয়েরা ঋতুমতি হবার পর এঁকে দেওয়া হয় তার ওই নির্দিষ্ট জায়গাতে। ওখানেই শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকা হয় ওই ডিজাইন, দেহের অন্য কোথাও নয়। লাসভেগাসে ক্লিওপেট্রার একটা ট্যাটু ইউনিট আছে। ছবিটা ওরাই পাঠিয়েছে। যদিও ছবিটা ওদের হাতে গেল কী করে তা আমার জানা নেই। একজন ধনী ক্লায়েন্ট তার দেহে ওই ট্যাটু আঁকাতে চান। হয়তো তিনি নিজেই কোনওভাবে সংগ্রহ করেছেন ছবিটা...।'

'কে তিনি?' কথার মাঝে প্রশ্ন করল সোমক।

সিংঘানিয়া সাহেব বললেন, 'ক্লায়েন্টের প্রাইভেসি রক্ষার জন্য ওরা আমাকে তার নাম জানায়নি। শুধু বলেছে ক্লায়েন্ট একজন নামকরা মহিলা টেনিস তারকা। পৃথিবীতে অনেকেই তাকে চেনে। বিশেষত আরও ওই কারণেই তার সম্বন্ধে গোপনীয়তা বজায় রাখা জরুরি। তবে পরে হয়তো নামটা জেনে তোমাকে বলতে পারব। এখন আমাদের কাজ শুধু ওই ট্যাটুর পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে লাসভেগাস ইউনিটকে পাঠিয়ে দেওয়া। এ দেশে ওদের কোনও ট্যাটু হান্টার নেই তাই ও কাজটা...।'

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সোমক বলে উঠল, 'কিন্তু এ তো কোনও স্টুডিয়োতে বা ফ্যাশন র‍্যাম্পে কোনও মডেলের ছবি তোলা নয়। ওই ট্যাটুর ছবি কোনও মহিলা কীভাবে তুলতে দেবে?'

সিংঘানিয়া সাহেব বললেন, 'ওটাই তো এ কাজের আসল চ্যালেঞ্জ। নইলে তো যে কেউ করতে পারত কাজটা। ব্যাপারটা নিয়ে আমি ইতিমধ্যে স্টাডি করেছি। কোথায় যেতে হবে, কোথায় থাকতে হবে সে ব্যাপারে সব পরিকল্পনাও ভেবেছি। ক্লিওপেট্রা সব অ্যাফোর্ড করবে। কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আসল কাজটা তোমাকেই করতে হবে। আর সেটা তুমি কী কৌশলে করবে সেটা তোমার ব্যাপার। টাকা দিয়ে হোক, আর অন্য কোনও পথেই হোক, অ্যাসাইনমেন্ট তুলে দিতে হবে তোমাকে।' শেষ কথাগুলো অনেকটা নির্দেশের ভঙ্গিতেই বললেন সিংঘানিয়া সাহেব।

'কিন্তু এক্ষেত্রে একটা এথিকসের ব্যাপারও তো আছে? একজন নগ্ন নারীর ছবি এভাবে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া?' অন্ধকারের মধ্যেও সোমক যেন দেখল তার প্রশ্ন শুনে সিংঘানিয়া সাহেবের ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে উঠল। মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, এথিকস, ইমোশন, এসব শব্দের চেয়ে কমোডিটি, মার্কেটিং, প্রসপেক্ট, রিয়েলিটি অনেক বেশি জোরালো শব্দ। বছরখানেক আগে ক্লিওপেট্রা একটা ময়েশ্চারাইজিং প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছিল। কেমিক্যাল কম্পোজিশনের একটু গন্ডগোল ছিল প্রোডাক্টে। মাখলে ভবিষ্যতে স্কিন প্রবলেমের সম্ভাবনা আছে। ব্যাপারটা জেনে আমি কলকাতায় ওর মার্কেটিং বন্ধ করলাম। আর দুবে ব্যাপারটা জেনেও মুম্বাইতে প্রোডাক্টটার চুটিয়ে ব্যবসা করল। তার রিওয়ার্ডও পেল। ও এম ডি হয়ে গেল। এই হল এ দুনিয়ার এথিকস। প্রথমে বিজনেস তারপর এথিকস। তবে একটা ব্যাপার, বিষয়টা যাতে সোশ্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিটিক্যাল ইস্যু না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য সিক্রেসি মেইনটেন করতে হবে। আমি আর তুমি ছাড়া এ অ্যাসাইমেন্টের ব্যাপার অন্য কেউ জানবে না...।'

'ট্যারো? ট্যারো? কোথায় তুমি? আমি এসেছি, এসেছি...।'

—নীচ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে সোমকের চিন্তাজাল ছিন্ন হল। প্রতীক্ষিত ডাকটা কানে যেতেই গুহার থেকে চোখ ফিরিয়ে সোমক জবাব দিল, 'এই তো আমি এখানে।' মিসমি এসে গেছে।

।। ৩ ।।

মিসমি ওপরে উঠে এল। তার পরনে গলা থেকে উরু পর্যন্ত জড়ানো লাল-কালো ডোরাকাটা নাগা পোশাকে। যাকে শাল বলে, গলায় একগুচ্ছ রংচঙে পাথরের মালা। মৃদু হাঁফাচ্ছে মিসমি। তার বুকের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু ঝিলিক দিচ্ছে পাথরের টুকরোগুলো। অনেকটা যেটা মিসমির ওষ্ঠাধারে ফুটে ওঠা হাসির মতোই। নির্জন দুপুরের রোদ পিছলে পড়ছে উন্মুক্ত বাহু বেয়ে। বাতাসে উড়ছে তার রেশমের মতো চুল। সোমকের হঠাৎ মনে হল, সে কোনও মানবী নয় সে লোবিনো। দু'জনেই একটু ধাতস্থ হবার পর মিসমি বলল, 'চার্চের জানলা থেকে ওপরে ওঠার রাস্তাটা দেখা যায় তো। তাই একটু ঘুর পথে এলাম। যদি ফাদার উইলিয়াম আমাকে দেখে ফেলেন।' কথাগুলো বলে সে বসে পড়ল গুহামুখের সামনে একটা পাথরের ওপর।

ফাদার উইলিয়ম দেখলে কী হবে? তিনিই তো সোমকের সঙ্গে মিসমিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এক সঙ্গে তারা দু'জনে কত ঘুরে বেড়িয়েছে এই নির্জন উপত্যকায়। উইলিয়াম তো কোনওদিন কিছু মনে করেননি। তবে আজ মিসমি ঘুর পথে এল কেন?—এ প্রশ্ন মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভাব্য একটা উত্তরও সোমক পেয়ে গেল নিজের মনে। তা হল, ফাদার উইলিয়ম বা অন্য কেউ না জানুক, মিসমি জানে তার আজকের এই আসা অন্যরকম। আজ সে এসেছে অভিসারে। প্রেম গোপনীয়তার জন্ম দেয়। মিসমির অবচেতনেই তার মনে জেগেছে এই গোপনীয়তা।

মিসমি বলল, 'বসো।' তার গা ঘেঁষে বসল সোমক। মিসমির দৃষ্টি দূরের নীল আকাশের দিকে নিবদ্ধ। উপত্যকার বাতাস বিলি কেটে যাচ্ছে তার চুলে। একটা মিষ্টি গন্ধ, এসে লাগছে সোমকের নাকে। বুনো ফুলের গন্ধ—নাকি মিসমির শরীরের আঘ্রাণ। সোমক তাকে কী বলবে বুঝে উঠতে না পেরে তার হাতের ওপর হাত রাখল।

মিসমি এবার বলে উঠল, 'তুমি কাল চলে যাচ্ছ তাই না?'

মিসমির বিষণ্ণতা মুহূর্তের জন্য একবার ছুঁয়ে গেল সোমককে। পাহাড়ি হ্রদের মতো গভীর মিসমির কালো চোখের দিকে চেয়ে সোমকের মনে হল, কী হবে ওই টারো গুহায় ঢুকে? তার চেয়ে এভাবে মিসমির হাতে হাত রেখে বসে থাকবে সে। যুগযুগ ধরে, জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মান্তর ধরে ওই গভীর হরিণ চোখে চোখ রেখে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। মিসমির গলা জড়িয়ে সে বলে উঠল, 'যাচ্ছি তো কী হয়েছে? সামনের মাসেই তো ফিরব। কটা তো মাত্র দিন। আর এসেই প্রথমে উইলিয়ামের কাছে আমাদের দু'জনের কথাটা পাড়ব।'

সোমকের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মিসমির বিষণ্ণতা এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। সে হেসে উঠে বলল, 'আমি জানি তুমি আসবে। আমার ট্যারো ফিরে আসবে।' মিসমির হাসি পাহাড়ি ঝরনার মতোই স্বচ্ছ, মাথার ওপরের নীল আকাশের মতোই নির্মল। এক অপূর্ব সরলতা মাখানো সেই হাসি। কথায় সোমকদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তুঙ্গ দৃঢ় পাহাড়গুলোর মতোই আত্মবিশ্বাস। টারো ফিরে আসবে।

সোমকের এবার হঠাৎ নজরে পড়ল মিসমির কোমরে ঘাসের দড়িতে ঝোলানো মুখ-বন্ধ কালো রঙের বাঁশের চোঙার দিকে। মিসমির কোমরে ওটা কোনওদিন না দেখলেও জিনিস এ গ্রামে কয়েকজনের কাছে দেখেছে সোমক। ওর মধ্যে থাকে রং। কাঠকয়লা পুড়িয়ে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে গাছের ছালের রস মিশিয়ে রংটা তৈরি করা হয়। ঈর্ষৎ সবুজাভ ওই কালো রং দিয়ে উল্কি আঁকা হয়। বাঁশের ধারালো ছিলা দিয়ে ত্বক চিরে তাতে ওই রং ঢেলে দিলে সারা জীবনের মতো নকশাটা আঁকা হয়ে যায় শরীরে। এই প্রাচীন জনজাতির নিজস্ব পদ্ধতিতে আঁকা পার্মানেন্ট ট্যাটু। ট্যাবু।

জিনিসটা দেখে সোমক বলল, ওটা তোমার সঙ্গে কেন?'

মিসমি সোমকের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে আজকে একটা ট্যাটু এঁকে দেব। ছোট্ট একটা ট্যাটু। তোমার বুড়ো আঙুলের ছাপের মতো ছোট্ট। তোমার একটু ব্যথা লাগবে না।'

সোমক বলল, 'আমি ফিরে আসার পর ওটা আঁকলে হয় না?'

মিসমি তার গলাটা আরও একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না হয় না। আমি তো আর তোমাকে একটা মাস ছুঁতে পারব না। আমার আঁকা ছুঁয়ে থাকবে তোমার শরীর। চিন্তা নেই, এমন জায়গায় ট্যাটু আঁকব যে বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না।'

বেলা পড়ে আসছে। বেশি দেরি করা যাবে না। আবদার না রাখলে মিসমি অভিমানে বেঁকে বসতে পারে। শিশুর মতোই সরল তার মন। সোমক তাই তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলল, 'চলো আগে গুহার ভিতর যাওয়া যাক তারপর। দু'জনে হাত ধরে উঠে পড়ল ভিতরে যাবার জন্য।

টারোর গুহা। ভিতরে ঢোকার পর মিসমি যেন একটু ভয় পেয়েই সোমকের কোমরটা জড়িয়ে ধরল। এঁকে বেঁকে এগিয়েছে গুহাটা। কিছুটা এগোবার পরই অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল। স্থানে স্থানে মাথার ওপরে ছাদের ফাটল গলে বাইরের আলো ঢুকছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে। গুহার ছাদ থেকে, দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে এসেছে চুনা পাথরের ঝুরি। প্রকৃতির আপন খেয়ালে তারা গড়ে তুলেছে নানা ভাস্কর্য। কোথাও তাদের গড়ন মানুষের মতো, কোথাও বা জীবজন্তু, গাছপালার অবয়ব। এ এক অদ্ভুত আশ্চর্যপৃথিবী। অন্য কোনও সময় হলে হয়তো সোমক মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত ওই সব অপরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টির দিকে। কিন্তু এখন আর তার কোনও দিকে নজর নেই। উত্তেজনায় বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় যৌন উত্তেজনা নয়। যান্ত্রিক এক উত্তেজনা। সোমকের নাভির নীচে বাঁধা সেই ছোট্ট মাদুলির মতো যন্ত্রটার উপস্থিতি সোমককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সোমক এখন একজন যন্ত্রমানুষ। কর্পোরেট যন্ত্র। শরীর তার রক্তে-মাংসে গড়া হলেও সে আসলে একটা অ্যাসাইনমেন্ট। যন্ত্রের মতোই সে মিসমিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট এক কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে।

এক জায়গায় এসে থামল সোমক। মাথার ওপর থেকে জায়গাটাতে বেশ আলো আসছে, মেঝেটাও সমতল। গুহার ভিতর এরকমই একটা জায়গা খুঁজছিল সোমক। ততক্ষণে মিসমির ভয় অনেকটা কেটে গেছে। সে সোমকের কোমর থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সোমকের ঠোঁট দুটো চেপে বসল মিসমির ঠোঁটে। অনেকটা যন্ত্রের মতোই। কিন্তু মিসমি যন্ত্র নয়। ইপ্সিত পুরুষের ঠোঁটের স্পর্শে মিসমি হারিয়ে ফেলল নিজেকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সোমক তাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। খসে যেতে লাগল দু'জনের শরীরের আবরণ। আদিম পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী যেন তারা। মিসমির শরীরে শরীর মিশিয়ে দেওয়ার আগে মুহূর্তের জন্য একবার দৃষ্টিগোচর হল সেই ইপ্সিত জিনিসটা। মিসমির নিম্ন নাভি থেকে আর নীচের দিকে নেমে গেছে বিচিত্র এক অলঙ্করণ। আর এরপরই মিসমি টেনে নিল সোমককে। কিন্তু তার মাঝেই সোমক একবার হাত ছুঁইয়ে নিয়েছে নিজের তলপেটে বাঁধা তৃতীয় নয়নে। টারোর চোখে।

মিসমির দেহের ওপর আঁধো অন্ধকারে পিস্টনের মতো ওঠা নামার মাঝে হঠাৎ চতুস্পদ শ্বাপদের ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াচ্ছে সোমক। মিসমির জানা নেই তার সঙ্গী এই মুহূর্তে একজন রক্ত মাংসের রোবট। ওইভাবে মাঝে মাঝে সে উঠে দাঁড়াচ্ছে তার যান্ত্রিক তৃতীয় নয়নকে আরও ভালোভাবে দেখার সুযোগ করে দিতে। মিসমির ভালোবাসার সঙ্গে এক অদৃশ্য লড়াই চলছে কর্পোরেট যন্ত্র মানবের। দু'জনেই নিজেদের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করছে আপ্রাণ। নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে নির্ঝরের কলহাস্য মুখর সবুজ বনানী ঘেরা যে আদিম পৃথিবী, তার সঙ্গে পণ্যময় আধুনিক কর্পোরেট পৃথিবীর এ এক অদ্ভুদ অদৃশ্য মনস্তাত্ত্বিক লড়াই যেন সংগঠিত হচ্ছে গুহার ভিতর। কিন্তু শেষপর্যন্ত মনে সাময়িক জয় হল প্রকৃতি কন্যারই। কাঁধ ছুঁয়ে থাকা মিসমির দু হাতের প্রচণ্ড আকর্ষণে, সোমক সত্যিই মিশে গেল মিসমির সঙ্গে। সোমকের মন থেকে মুছে গেল তার তৃতীয় নয়নের উপস্থিতি, সিংঘানিয়া সাহেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই চেম্বার, অ্যাসাইনমেন্টে মোড়া কর্পোরেট পৃথিবী, এক বুনো ফুলের আঘ্রাণ তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সোমক তলিয়ে যেতে লাগল সেই বুনো ফুলের গন্ধে।

অসীম ক্লান্তি, অথবা চূড়ান্ত সফলতার পর যে অবসাদ নেমে আসে, সে রকমই কোনও ক্লান্তি অবসাদে মড়ার মতো চোখ বন্ধ করে মাটিতে পড়েছিল সোমক। চোখ খোলার পর ধীরে ধীরে আবার তার মনে পড়ে গেল সিংঘানিয়া সাহেবের চেম্বার, অ্যাসাইনমেন্ট, তার কোমরের নীচে বাঁধা ছোট্ট ক্যামেরাটার কথা। হুটোপাটিতে জিনিসটার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? কথাটা মনে হতেই সোমক উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিসমি তাকে বলল, 'উঠো না উঠো না, আর দু'মিনিট, কাজটা হয়ে এসেছে।' সোমকের আগেই কখন যেন উঠে বসেছে সে। তার এক হাতে ধরা সেই কালো বাঁশের চোঙাটা। সোমকের তলপেটের কাছে মৃদু চিনচিনে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। মাথার ওপরে ছাদের ফাটল বেয়ে শেষ বিকালের একটা সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে সোমকের উন্মুক্ত নিম্নাঙ্গে। সেই আলোতে সোমকের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে উল্কি আঁকছে মিসমি। সোমকের দেহে সে এঁকে দিচ্ছে তার অভিসারের স্বাক্ষর।

কিছুক্ষণ পর মিসমির ডাকে সাড়া দিয়ে উঠে বসল সোমক। তলপেটটা দেখার চেষ্টা করল সে। না যন্ত্রটা ঠিকই আছে। তার নীচে উল্কির ক্ষতস্থানের ওপর একটা বুনোপাতা চাপা দিয়েছে মিসমি, অনেকটা স্টিকিং প্লাস্টারের মতো। সোমক বলল, 'কী আঁকলে তুমি?'

মিসমি জবাব দিল, 'একটা চোখ— টারোর তো তিনটে চোখ ছিল, তাই তোমারও আর একটা চোখ এঁকে দিলাম। ওই চোখেও দেখতে পাবে তুমি।'

তারা যখন গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল তখন দিন শেষের আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের ঢালে। পাহাড়ের ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারপাশের ওই সবুজ পাহাড়, নির্ঝর, নিচের ওই নাগা গ্রাম, সব কিছু হারিয়ে যাবে অন্ধকারের আড়ালে। দূরের পাহাড় থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা বাতাস সে ইঙ্গিতই বহন করে আনছে। সোমক তাকাল মিসমির মুখের দিকে। অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় রাঙা তার মুখ, বাতাসে উড়ছে রেশমের মতো চুল। গায়ে তার বুনো ফুলের গন্ধ। সোমকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রূপকথার রাজকন্যা লোবিনো। সে সোমককে আর একবার জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'আমি জানি আমার টারো আবার ফিরে আসবে এখানে। আমি এসে নীচ থেকে ডাক দেব 'টারো টারো তুমি কোথায়? আমি এসেছি...।'

আর কোনও কথা না বলে দিন শেষের ক্লান্ত স্নিগ্ধ অথচ ছন্দোবদ্ধ নির্ঝরের মতো নীচে নামতে শুরু করল মিসমি। কুয়াশার চাদরে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল নীচে মিসমিদের গ্রাম। পাকদণ্ডী। আর আড়ালে হারিয়ে গেল মিসমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

ঘরটা তখন অবিকল যেন টারোর গুহা। একই রকম আলো আঁধারি খেলা করছে নীল নাইট ল্যাম্পের আলোতে। এয়ার কন্ডিশনড মেশিনের ঠান্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে একটা শীতল আমেজ এনে দিচ্ছে টারো গুহার মতোই। এখানেও সেই দুই আদিম নরনারী। বিছানায় শুয়ে থাকা এক নারীদেহের ওপর তাকে আবৃত করে হাঁটু মুড়ে চার হাত পায়ে পশুর মতো নিশ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সোমক।

কৃত্তিকা একবার শেষ চেষ্টা করল সোমেকের কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের দেহে টেনে নিতে, কিন্তু পারল না। সোমক যেন পাথরের মূর্তি। এবার আর সহ্য করতে পারল না কৃত্তিকা। মাস খানেক ধরেই এ ঘটনা ঘটছে। কৃত্তিকাকে উত্তেজনার শীর্ষে পৌঁছে দেবার আগেই এভাবে উঠে পড়ছে সোমক। অনেকবার এর কারণ জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ হয়নি। কৃত্তিকা এক ঝটকায় বুকের ওপর থেকে সোমককে ছিটকে ফেলে দিয়ে খাট থেকে নেমে বাতি জ্বালিয়ে সোমককে স্বক্ষোভে বলে উঠল, 'তুমি কী নপুংসক হয়ে গেছ?'

সোমক কোনও জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পাথরের মূর্তির মতো সে শুয়ে আছে বিছানায়। সম্পূর্ণ নগ্ন।

কৃত্তিকা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠেল বলল, 'জবাব দিচ্ছ না কেন? এভাবে আমাকে প্রতারিত করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে।

এবারও কোনও জবাব মিলল না। কৃত্তিকার হঠাৎ নজর পড়ল সোমকের তলপেটে আঁকা চোখটার ওপর। এটা দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি হয় কৃত্তিকার। মনে হয় যেন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ও ট্যাটুটা এই ফ্ল্যাটে আসার মাস ছয়েক আগে আঁকিয়েছিল সোমক। ওখানে কেন আঁকিয়ে ছিল কে জানে? কৃত্তিকা ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলে সোমক শুধু হাসে। কৃত্তিকার আজও মনে হল ওই চোখটা যেন তাকিয়ে আছে তার নগ্ন শরীরটাকে। ঘৃণা মিশ্রিত একটা অস্বস্তিতে বাতিটা নিভিয়ে ফেলে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল কৃত্তিকা। আধ্যে অন্ধকার ঘরে শুধু জেগে আছে একটা চোখ। টারোর চোখ।

সোমকের দু'চোখ বন্ধ। কিন্তু সেই তৃতীয় নয়নটাই এক সময় বিছানা থেকে টেনে তুলল তাকে। ঘরের পিছনের ব্যালকনির দরজা খুলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল সে। দু'পাশে ঘুমন্ত হাইরাইজ, সাততলার নীচেও বিষণ্ণ ল্যাম্পপোস্টের ক্ষয়াটে আলোতে রাস্তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে মেঘ আছে। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। একবারের জন্য দু'চোখ খুলে আকাশের দিকে তাকাল সোমক। এক খণ্ড কালো মেঘ চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মেঘ ঢেকে দিল চাঁদটাকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল চারপাশ। সোমকও বন্ধ করল চোখের পাতা। কিন্তু মুহূর্ত খানেকের মধ্যেই সোমকের মনে হল সে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাচ্ছে। পলকহীন টারোর তৃতীয় নয়নে সে দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। কিন্তু কোথায় সেই হাইরাইজগুলো। তার চারপাশে যত দূর চোখ যায় সব সবুজ পাহাড়। সেখান থেকে বয়ে আসছে ঠান্ডা বাতাস। কোথায় তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি? সে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সেই চাতালে। পিছনে ট্যারোর গুহা। নীচে ওই তো আওমিজ নাগামের গ্রাম। ওই তো সেই পাকদণ্ডী। যে পথ বেয়ে তার আসার কথা। যার প্রতীক্ষায় অনন্তকাল ধরে এই টারো গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আসে সে! আর এরপরই সোমক শুনতে পেল নীচ থেকে সেই ডাক, 'টারো টারো তুমি কোথায়? আমি এসেছি, আমি এসেছি...' পাকদণ্ডীর বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য তার শরীর। শুধু তার আহ্বানই শুনতে পাচ্ছে সোমক। পাথরের খাঁজ বেয়ে ওপরে ওঠার মতো ব্যালকনির রেলিং-এ উঠে দাঁড়াল সোমক। তারপর বলে উঠল, 'লোবিনো আমি আসছি... আমি আসছি...।'

এ ঘটনার কিছুদিন আগেই ফাদার উইলিয়ামের প্রেরিত একটা চিঠি এসে পৌঁছেছিল সিংঘানিয়া সাহেবের নামে। সাহায্যের ব্যাপারে কী হল তা জানতে চেয়েছেন উৎকণ্ঠিত উইলিয়াম। সিংঘানিয়া সাহেব চিঠিটা দেখিয়েছিলেন সোমককে। দীর্ঘ সে চিঠিতে একটি ছোট্ট দুঃসংবাদও ছিল। মিসমি নামের চার্চের আশ্রিতা একটি মেয়ে নাকি ক'দিনের অসুখে মারা গেছে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বিশ্বাস মেয়েটাকে নাকি টারো নামে কোনও এক অপদেবতায় পেয়েছিল। কারণ মৃত্যুর আগে মেয়েটা বারবার ওই নামটাই করছিল। ক্লিওপেট্রা যদি গ্রামে স্কুল খোলার জন্য অর্থ সাহায্য করে তবে গ্রামবাসীদের এসব কুসংস্কার দূর করা যায় সে কথা জানিয়ে দ্রুত সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ফাদার উইলিয়াম।

খবর ৩৬৫ দিন, ১২ আগস্ট ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাময়িক পত্রিকার পাতাতেই ছোটগল্পের উদ্ভব, দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে তার সমৃদ্ধি ও প্রসার। সেদিনকার যুগান্তর, বসুমতী, লোকসেবক, জনসেবক আজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পারলেও আনন্দবাজার পত্রিকা সগৌরবে বিরাজ করছে। এছাড়া সংবাদ প্রতিদিন, আজকাল, দৈনিক স্টেটসম্যান থেকে শুরু করে সকালবেলা, ৩৬৫ দিন প্রভৃতি প্রত্যেকটি পত্রিকাই রবিবাসরীয় গল্প প্রকাশ করে চলেছে। পুরনো দিনের প্রথিতযশা সাহিত্যিক থেকে আজকের প্রতিশ্রুতিমান সাহিত্যিকদের ছোটগল্প নিয়ে সুসম্পাদিত একটি গ্রন্থ আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি, সম্পাদনা করেছিলেন একালের অন্যতম সমর্থ লেখক আবুল বাশার। এই গ্রন্থ তারই একটি প্রলম্বিত প্রয়াস, সম্পাদনায় আছেন একই সাহিত্যিক। এর অতিরিক্ত আকর্ষণ, কিছু প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, অভিনেতা ও সংগীত শিল্পীও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ছোটগল্প কীভাবে এগিয়ে চলেছে, নতুন কী পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে বিষয়ে ও আঙ্গিকে, এ বই তারই একটি দলিল হয়ে উঠেছে।

AMARBOI.COM

প্রচ্ছদ দেবাশীষ সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

978-93-81927-17-8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~